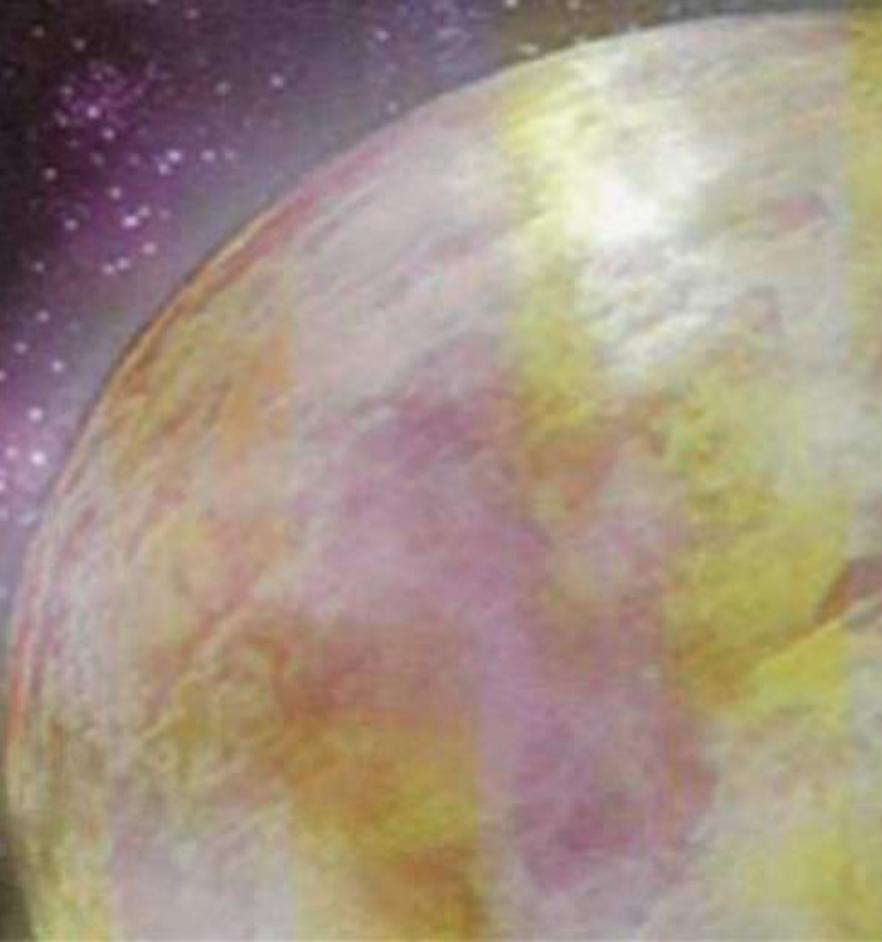


সৃষ্টি-ঘৰাপ্লবতত্ত্বে ঝ্যাকহোল

৩

কেৱাৰ্ণ-হাদিস



প্ৰকৌশলী মোঃ মাহবুব আলম

সৃষ্টির-মহাপ্রলয়ত্বে ব্ল্যাকহেল
ও
কোরান-হাদীস



প্রকৌশলী ম্যাং মাটচুরুল আলম

সৃষ্টি-মহাপ্রলয়তত্ত্বে ব্ল্যাকহেল

৩

ক্ষেত্রান-হাদীস

প্রকোশলী মোঃ মাহবুবুল আলম

চট্টগ্রাম, কাতাড়।

e-mail: servicepublishers@gmail.com

◆ প্রকাশনায়

ঃ মোঃ মোজাফিজার রহমান
সার্ভিস পাবলিশার্স
কবি নজরুল ইসলাম সড়ক, বগুড়া।

◆ প্রকাশকাল

ঃ আগস্ট-২০০৫

◆ প্রচ্ছদ

ঃ কায়সার আলম

◆ কম্পিউটার কম্পোজ

ঃ তাজমা কম্পিউটার সিক্রেটেম, সপ্তপদী মার্কেট, বগুড়া।

ছোয়া এ্যাডভাটাইজার্স, আজিজ সুপার মার্কেট, ঢাকা।

◆ মুদ্রণে

ঃ সার্ভিস প্রিন্টিং প্রেস
কবি নজরুল ইসলাম সড়ক, বগুড়া।

◆ প্রাপ্তিশ্বান

ঃ আফতাবিয়া লাইব্রেরী, ৩৬ বাংলা বাজার, ঢাকা।
নবপথিঘর, ৩৮ বাংলা বাজার, ঢাকা।

আফতাবিয়া লাইব্রেরী, নিউ মার্কেট, বগুড়া।

মূল্য : ১২০/০০ টাকা।

Srishti-Mohaproley Thathe Blackhole-O-Quran-Hadish in Bengali: Black Hole in the Creation (Big Bang)-Annihilation (Big Crunch) Theory and the Quran-Sunnah: By Engr. Mahbubul Alam.

অভিমত

ইনশাল্লাহ্ যারা পবিত্র কোরআনুল করিমে বর্ণিত আসমান তথা সৌর- জগত নিয়ে ভাবেন তাদের ভাবনাকে আরো পরিমিলিত করবে প্রকৌশলী মাহবুবুল আলমের গবেষণাধর্মী ‘সৃষ্টি-মহাপ্রলয়তত্ত্বে ঝ্যাকহোল ও কোরান-হাদিস’ গ্রন্থটি। এ গ্রন্থে বিশ্বাসী মানুষের চেতনাকে যুক্তিযুক্ত করতে এবং অবিশ্বাসী মানুষ নতুন ভাবনায় আপৃত হবেন। মহবিশ্ব ও সৌরজগতের রহস্য নিয়ে লেখকের তত্ত্বায় আলোচনা কঠিন ও দুর্বোধ্য হয়নি। এ জাতীয় লেখায় সচারচর যা হয়ে থাকে। এ গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায় ও আলোচনা সকল শ্রেণীর পাঠকের জন্য সহজবোধ্য হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আর সেজন্য লেখকের পরিশ্রম প্রতিফলিত হয়েছে গ্রন্থের পাতায়-পাতায়। আমরা ধর্ম ও বিজ্ঞান ভিত্তিক ‘সৃষ্টি-মহাপ্রলয় তত্ত্বে ঝ্যাকহোল ও কোরান- হাদিস’ গ্রন্থটির বহুল কাটতি আশা করছি।

ইমাম মাওলানা আবুল কালাম আজাদ
ইসলামী চিন্তাবিদ, সমাজ সংগঠক ও লেখক
বণ্ডা।

প্রকাশকের কথা

সৃষ্টি-মহাপ্রলয়তত্ত্বে ব্ল্যাকহোল ও কোরান-হাদীস গ্রন্থটি সময়মত প্রকাশিত হওয়ার জন্য সকল প্রশংসার মালিক ও কর্তনাময় আল্লাহর নিকট আমরা কৃতজ্ঞ ।

পবিত্র কোরান ও হাদীস অনুসরণ করে বিজ্ঞান মনস্ক ও বাংলাভাষী মানুষদের জন্য বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনার দুর্বল প্রয়াস নিতে খুব নিতান্ত সংখ্যক লেখককেই অগ্রসর হতে দেখা যায় । তাদের মধ্যে প্রকৌশলী মাহবুবুল আলম এ ক্ষেত্রে এক দুঃসাহসিক পদক্ষেপ নিয়েছেন । আমরা আশা করছি মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও মহাপ্রলয়ে ব্ল্যাকহোলের ভূমিকা ও সৌরজগত সম্পর্কিত কোরান-হাদীসের উন্নতি ও বিজ্ঞানের তথ্যসূত্র বিশ্লেষণমূলক তার এই বই বাংলা ভাষাভাষী মানুষের ভাবনাকে সমর্পিত করবে । স্বষ্টার সৃষ্টি নৈপুণ্যের কাছে তার কঠিন অধ্যবসায় ও গবেষণার ফসল এই বই প্রকাশনা ও মুদ্রণের ক্ষেত্রে আমরা যথেষ্ট সর্তকতা অবলম্বন করেছি । তবুও বইটি বিভিন্ন হাতে কাজ করতে হয়েছে যেমন- কম্পিউটার কম্পোজ, প্রফ দেখা, ছাপা ও বাইডিং কাজগুলি করতে গিয়ে কিছু ভুল-ভাস্তি হয়ে যেতে পারে এই জন্য প্রথমে আল্লাহর নিকট ও আপনাদের নিকট ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি । পরবর্তীতে দ্বিতীয় সংস্কারে আপনাদের মূল্যবান চিঠি ও মতামত সংশোধনের জন্য সহযোগিতা আশা করি । অনেকের খন্ডিত বিশ্বাস ও অসম্পন্ন বোধ-বুদ্ধির ক্ষেত্রে বইটি মানুষকে অধিকতর কোরান মনস্ক করবে বলে আমাদের বিশ্বাস । আর তাহলেই আমাদের এই গ্রন্থ প্রকাশনা সার্থক হবে ।

আল্লাহ আমাদের সহায় হউন ।

গ্রন্থ পরিচিতি ও লেখকের কথা

সর্বপ্রথমে মহান আল্লাহ যিনি সমস্ত প্রশংসার মালিক, একমাত্র রব, প্রতিপালক, পরিচালক, রক্ষণাবেক্ষক সেই করুণাময়কে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই বইটি প্রকাশের সুযোগ দানের জন্য।

এই গ্রন্থটির পরিচিতির প্রারম্ভে বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে দীর্ঘদিন থেকে প্রচলিত এক অঘোষিত শীতল যুদ্ধ বা দ্বিধা-বন্দ সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করতে চাই।

আমরা মহাবিশ্বে খালি চোখে এবং অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যা কিছু দেখছি তার চেয়ে অকল্পনীয় সংখ্যক আল্লাহ রাববিল আ'লামীনের সৃষ্টি আমাদের অন্তরালে আছে। আজকে আমরা মহাসৃষ্টির যে ক্ষুদ্র অংশটুকু সম্পর্কে জানতে পেরেছি মাত্র একশত বছর পূর্বে এর চেয়ে অনেক অনেক শুণ কর জানতাম। অতিক্রান্ত সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ পর্যবেক্ষণ, গবেষণা, অনুসন্ধান এবং নিরীক্ষণের মাধ্যমে আজকে আমরা যাকে বলি বিজ্ঞান তা জানাতে সাহায্য করেছে। বিজ্ঞানের নতুন কোন আবিক্ষারকে বস্ত্ববাদী বা অবিশ্বাসীরা সম্পূর্ণ কৃতিত্ব বিজ্ঞানের দিয়ে থাকে। ফলে, অনেক বিশ্বাসীর মনে নানা রকম সংশয়ের সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানীদের সম্পর্কে একটা ভুল ধারণাই এই সংশয় সৃষ্টির মূল কারণ।

বিজ্ঞান শব্দের অর্থ বিশেষ জ্ঞান এবং এই বিশেষ জ্ঞান অর্জনের জন্য নিয়োজিত কর্মীরাই বিজ্ঞানী। মহাবিশ্বের সবকিছু শক্তি ও পদার্থ দিয়ে সৃষ্টি। বিজ্ঞানীরা কিন্তু কোন দিন কোন কিছুর সাহায্য না নিয়ে এই শক্তি বা পদার্থের কিছুই সৃষ্টি করতে পারবে না। বিজ্ঞানীরা সৃষ্টি শক্তি ও পদার্থের বিভিন্ন গুণাবলী, বৈশিষ্ট্য বা প্রাকৃতিক আইন (Law of Nature/Physical law) পর্যবেক্ষণ, গবেষণা, অনুসন্ধানের মাধ্যমে জেনে বিভিন্ন রূপান্তর ঘটিয়ে আমাদের ব্যবহার উপযোগী কিছু উপকরণ তৈরী করে মাত্র। জিনিসটি সহজে বোধগম্যের জন্য একটা উদাহরণ জমিতে ধান উৎপন্ন থেকে শুরু করে নানা ধরণের পিঠা-তৈরীতে একটা কৃষক পরিবার যে ভূমিকা পালন করেন, একটা সর্বাধুনিক মহাশূন্যান্বয় বা রকেট তৈরীতেও বিজ্ঞানীরা কৃষক পরিবারের মত একই ভূমিকা পালন করে থাকেন। আর একটা উদাহরণ হ'ল আমরা শুধু লৌহ বা লৌহ এর সঙ্গে অন্য পদার্থ ও শক্তির সংযোগ ঘটিয়ে হাজার হাজার উপকরণ তৈরী করে দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করছি। কিন্তু পৃথিবীতে কোন দিনই লৌহের নতুন অণু/পরমাণু সৃষ্টি সম্ভব নয়। উপরোক্ত পদার্থ ও শক্তির বিভিন্ন প্রাকৃতিক আইনের জ্ঞান অর্জন করার ফলেই তা সঠিক পছাড় প্রয়োগ সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞানীদের অর্জিত এই প্রাকৃতিক আইনের জ্ঞানটিও আল্লাহ যথাসময়ে প্রয়োজন অনুসারে দিয়ে থাকেন। এ সম্পর্কে ইঙ্গিত রয়েছে কোরানের নিম্নের দু'টি আয়াতে-

- যতটুকু তিনি চান তা ছাড়া, কেহ তার অনন্ত জ্ঞানের কোন কিছুই পেতে পারে না।
২৪২৫৫।

- এমন কোন বিষয় নেই যার ভাস্তর আমার নিকট নেই এবং আমি তা প্রয়োজনীয় পরিমাণেই সরবরাহ করে থাকি। ১৫৪২১

বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পদার্থ ও শক্তির গুণাবলী, বৈশিষ্ট্য বা ধর্মকেই নাম দিয়েছেন প্রাকৃতিক আইন (Law of Nature or physical law)। মহাবিশ্বের সব কিছুই এই আইন মেনে চলে। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানীদের দেওয়া এই নাম প্রাকৃতিক আইন বিশ্বাসীদের দৃষ্টিকোণ থেকে কি হতে পারে তা এবার লক্ষ্যণীয়।

কোরানের একটা আয়াতে আছে ‘আমি মানুষ ও জিনকে সৃষ্টি করেছি আমার ইবাদতের জন্য’ (৫১:৫৬)। ইসলামী আলেমদের মতে আল্লাহর আদেশ পালনই ইবাদত। অন্য কথায় আল্লাহ যা করতে বলেছেন তা করা এবং যা নিষেধ করেছেন তা থেকে দূরে থাকাই ইবাদত। কোরানের অনেক সংখ্যক আয়াতে আমরা দেখতে পাই মহাবিশ্বের সবকিছু (দৃশ্য ও অদ্রশ্যমান) আল্লাহকে সেজদা ‘সবীহ’ পবিত্রা, মহিমা ঘোষণা ও আত্ম-সমর্পণের কথা বলা আছে। (যেমন ১৬:৪৯-৫০, ২৪:৪১, ২২:১৮, ১৭:৮৪, ৫৯:১, ৬১:১, ৬২:১, ৬৪:১, ৮৭:১, ৩৩:৪২, ৩৮:৩ ইত্যাদি)। অন্য কথায় আল্লাহর ইবাদত করছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন মহাবিশ্বের সব কিছুই বিভিন্ন গুণাবলী, ধর্ম, বৈশিষ্ট্য বা প্রাকৃতিক আইন সব সময় মেনে চলে। উপরের আয়াতগুলি কি বিজ্ঞানীদের দেওয়া নাম প্রাকৃতিক আইনগুলির কথাই বলছে?

পৃথিবী এবং মহাবিশ্বের অন্যত্র বিভিন্ন ধরণের জীবন ব্যবস্থাকে টিকেয়ে রাখার জন্য। এই প্রাকৃতিক আইনগুলি আল্লাহতায়ালাই সৃষ্টি করেছেন। একটা আর উদাহরণ আমরা জানি কোন পদার্থের উত্তাপ বৃদ্ধি পেলে সম্প্রসারিত হয় আর উত্তাপ হ্রাস পেলে সঞ্চুচিত হয়। এটি একটি প্রাকৃতিক আইন, এই আইনটি সাধারণত সকল পদার্থের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু পানি বাস্পীভূত হয় 100° সেন্টিগ্রেডে (অর্থাৎ সম্প্রসারিত হয়) এবং শূন্য ডিগ্রীর নীচে তা বরফে পরিণত হয় এবং -8° সেন্টিগ্রেডের নিম্ন তাপমাত্রায় পানি সঞ্চুচিত না হয়ে সম্প্রসারিত হয়। ফলে, বরফ পানির উপরে ভাসে। পানির ক্ষেত্রে এটিই প্রাকৃতিক আইন। যদি এই ব্যতিক্রমধর্মী আইনটি পানির জন্য না হ'ত তবে শীত প্রধান দেশে বরফ জমা হ'ত পানির উৎসহের তলদেশ থেকে, ফলে সমস্ত জলজ প্রাণী ধ্বংস হয়ে যেত। শুধু তাই নয় শীত প্রধান দেশের সমস্ত পানির উৎস অর্থাৎ নদ-নদী, খাল, হ্রদ, সমুদ্র সম্পূর্ণ বরফে পরিণত হত চিরদিনের জন্য। মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর রাবিল আলামীন জীবন ব্যবস্থাকে রক্ষার জন্য এ ব্যতিক্রমটি ঘটিয়েছেন। ‘পানি’ আল্লাহর বেধে দেওয়া এই আইনটি কখনও ভঙ্গ করে না। প্রকৃতির সব কিছুই আল্লাহর বেধে দেওয়া আইন মেনে চলে। আল্লাহর আদেশ মেনে চলাই যদি ইবাদত হয়ে থাকে, তবে প্রকৃতির সবকিছুই আল্লাহর ইবাদত করছে তাতে কোন সন্দেহ আছে কি? কোরানের নিম্নের আয়াতটিও তাই সাক্ষী দেয়।

— তুমি কি দেখনা যে, নভোমভল ও ভূমভলে (মহাবিশ্বে) যা কিছু আছে তা এবং উড়ীয়মান বিহুগুল আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? প্রত্যেকেই জানে তার প্রার্থনার এবং পবিত্রতার মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি এবং তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ সমক্ষ্যক অবগত। ২৪:৪১।

আলবার্ট আইনষ্টাইন ১৯০৫ সালে যুগান্তকারী বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ এবং ১৯১৫ সালে ব্যাপক আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব (Theory) দেন। এই তত্ত্বের ফলে পদাৰ্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, কণাবাদী পদাৰ্থবিদ্যাসহ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় এক নতুন অধ্যায়ের সংযোজন হয়। আইনষ্টাইনের এই আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব প্রকাশ হওয়ার পর মহাবিশ্বের সৃষ্টি এবং ভবিষ্যত পরিণতি সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা বেশ কিছু চমকপ্রদ তত্ত্ব প্রকাশ করেন যার অনেক অংশই স্যাটেলাইট এবং হাবল স্পেস দুরবীক্ষণ যত্নের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য থেকে প্রত্যেক বা পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এই সমস্ত তথ্য আল্লাহ মানুষকে অবহিত করবেন তার প্রতিক্রিতিও কোরানের নিম্নের আয়াতে আছে।

—আমি ওদের জন্য আমার নির্দশনাবলী (Sign) বিশ্বজগতে ব্যক্ত করব এবং ওদের নিজেদের মধ্যে, ফলে ওদের নিকট সৃষ্টি হয়ে উঠবে যে এই (কোরান) সত্য। একি যথেষ্ট নয় যে, তোমার প্রতিপালক সর্ববিষয়ে অবহিত। ৪১:৫৩

— বিশ্বজগতের জন্য এ (কোরান) উপদেশ মাত্র। এর সংবাদের (তথ্যের) সত্যতা কিছুকাল পরে তোমরা অবশ্যই জানবে। ৩৮:৮৭-৮৮

কানাডার ম্যাকমাট্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীগণ আইনষ্টাইনের সংরক্ষিত মগজের (brain) উপর দীর্ঘদিন এক গবেষণায় দেখতে পান তার 'ইনফির্যাইর প্যারাইটল লোব' অংশটুকু স্বাভাবিক মানুষের মগজের চেয়ে শতকরা পনর ভাগ প্রশস্ত। মগজের এই অংশটুকু গণিত শাস্ত্র, গতিবিদ্যা, স্থান সংক্রান্ত মানসচিত্র ইত্যাদির বোধশক্তি প্রবলভাবে নির্ভরশীল। আইনষ্টাইনের প্রভাবশালী দূরদৃষ্টি প্রথমে কল্পনার প্রতিমূর্তির স্বত্ত্বাত হন এবং পরে তা গণিতের ভাষায় রূপদেন। এছাড়া তার মগজের অবয়বে ফাটলগুলি (সিলভিয়ান ফিশ্যার) স্বাভাবিকের চেয়ে ছোট। খাঁজগুলি না থাকায় মগজের কোষগুলি খুবই সন্ধিকটবর্তী। ফলে, দূরদৃষ্টি সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন তথ্য ধারণের জন্য পারস্পরিক আন্তসংযোগ সহজে হয়।

সৃষ্টির নির্দশন সমূহ মানুষকে অবহিত করবেন বলেই হয়ত আল্লাহ আইনষ্টাইনের ব্রেনের ব্যাতিক্রম হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। অবিশ্বাসী এবং বিধমীদের কাছে ইহুদী আইনষ্টাইনের তত্ত্বের গ্রহণযোগ্যতা সহজে হবে বলেই হয়তো সর্বজ্ঞানী আল্লাহতায়ালা আইনষ্টাইনকে এই যোগ্যতা দিয়েছেন।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মহাকাশে কোন কিছু না পাঠিয়ে সুদূর গ্যালাক্সি, তারকা, ব্ল্যাকহোল ইত্যাদির রহস্য ও খবরা-খবর জানতে পারেন। বর্ণালী চিত্রলিখনীর (Spectrographs) সাহায্যে আলোর প্রতিটি রং পরিমাপ করতে পারেন। ফলে, এই যন্ত্রেই বলে দিতে পারে তারকা, গ্যালাক্সি এবং গ্যাসীয় মেঘে কোন ধরনের মৌল (elements) বিদ্যমান। এছাড়া প্রিজমের মধ্যে দিয়ে আলোর বর্ণালীয় (Spectrum) বিচ্যুতির মাত্রা (Doppler shift) বিশ্লেষণ করে আলোর উৎসের অর্থাৎ তারকা, নেবুলা, গ্যাসীয় মেঘ এমনকি নিকটবর্তী অদৃশ্য বস্তুর (ব্ল্যাকহোল) ভর, গতি ইত্যাদি নির্ণয় করতে পারে। পৃথিবীর বায়ুমন্ডল ভেদ করে রঞ্জন, গামা, অতিবেগনী, অবলোহিত ইত্যাদি আলোর রশ্মি আসতে পারে না। এ জন্য

মহাশূণ্যে পৃথিবীর কক্ষপথে বসান আধুনিক দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এ সমস্ত রশ্মি সহজেই দেখা যায়। উপরে উল্লেখিত সবধরণের আলোক রশ্মি ও বেতার তরঙ্গ এক ধরণের বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বিকিরণ (Electro- Magnetic Radiation) যা তরঙ্গের আকারে চারিদিকে ছড়ায়ে পড়ে।

নিউটনের গতিসূত্র (Newton's Laws of Motion) এবং মহাকর্ষ তত্ত্ব (Theory of Gravity) পার্থিব এবং মহাজাগতিক সমস্ত (গ্রহ, নক্ষত্র, গ্যালাক্সি, ব্ল্যাকহোল, নেবুলা, অদৃশ্যমান বস্তু ইত্যাদি) গতিশীল বস্তুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। পরবর্তীতে আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বের মাধ্যমে মহাজাগতিক সকল দৃশ্য ও অদৃশ্য বস্তুর (ব্ল্যাকহোল) বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করে।

বইটির প্রথম অংশে বর্তমান বিজ্ঞানীদের নিকট মহাবিশ্ব সৃষ্টির সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য বিগ্রাংগ বা মহাবিক্ষেপণ তত্ত্বের বিস্তৃত বিবরণসহ মহাবিশ্বের সম্ভাব্য ভবিষ্যত পরিণতি সম্পর্কে আলোচনার পাশাপাশি কোরান ও হাদীসের এ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

আমাদের কাছে আকাশের চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র যেমন বাস্তব, মহাকাশে ব্ল্যাকহোলের অস্তিত্ব তেমনি আজ জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের নিকট বাস্তব। শত শত বিজ্ঞানীদের গবেষণা, স্যাটেলাইট ও স্পেস দূরবীক্ষণ যন্ত্র থেকে পাওয়া বিভিন্ন তথ্য থেকে ব্ল্যাকহোল সম্পর্কে নতুন নতুন বিশ্লেষকর তথ্য যে কোন বিবেক সচেতন মানুষকে নাড়া দেয়। ব্ল্যাকহোল হ'ল ধ্রংস ও সৃষ্টির একটা লীলা ক্ষেত্র। ব্ল্যাকহোলের অনন্যতা (Singularity) যেমন একটা মহাবিশ্ব ধ্রংস করতে পারে এবং তা থেকে আবার নতুন একটা মহাবিশ্ব সৃষ্টি হতে পারে। বইটিতে ব্ল্যাকহোলের আবিক্ষার, সৃষ্টি, গঠন কাঠামো, শ্রেণী বিন্যাসসহ বিভিন্ন বিচিত্র বৈশিষ্ট্য সচিত্র আলোচিত হয়েছে।

মহাকাশের বিশাল দূরত্ব এবং সমান্তরাল অন্য মহাবিশ্বে অল্প সময়ে নিরাপদে সংক্ষিপ্ত পথে পাড়ি দেওয়ার জন্য ওয়ার্মহোলের অস্তিত্বের কথাও বিজ্ঞানীরা বলছেন। বইটিতে ওয়ার্মহোলের গঠন, শ্রেণী বিন্যাসসহ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সচিত্র বর্ণিত হয়েছে।

এছাড়া মহাবিশ্বের প্রতিটি উপপরমাণু (Sub atomic Particles) থেকে শুরু করে মহাকাশের সমস্ত দৃশ্য ও অদৃশ্যমান আননন্দক্ষণ্ণীয় পদার্থের (নক্ষত্র, গ্রহ, গ্যালাক্সি ইত্যাদি) সরবিক্ষুই চারটি মৌলিক বল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। চারটি মৌলিক বলের মধ্যে প্রফেসর আর্কুস সালাম ১৯৬৭ সালে বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বল এবং দুর্বল কেন্দ্রকীয় বল দু'টির মধ্যে ঐক্য বন্ধ (unified) তত্ত্ব প্রকাশ করেন এবং পরবর্তীতে এ জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বর্তমানে শক্তিশালী কেন্দ্রকীয় বলকেও উপরোক্ত দু'টি বলের সঙ্গে সমন্বয় করে একটি মহান ঐক্যবন্ধ তত্ত্ব গঠন (Grand Unified Theory) করার যথেষ্ট প্রচেষ্টা চলছে।

বিগ ব্যাংগ বা মহাবিক্ষেপণ সংঘটনের পূর্বে এই চারটি মৌলিক বল একত্রিত ছিল। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত চারটি মৌলিক বল একত্রিত হওয়ার জন্য আমাদের জানা

চারমাত্রা বিশিষ্টি মহাবিশ্বে সম্ভব নয়। এর জন্য আরও অধিকমাত্রা (dimensions) বিশিষ্ট মহাবিশ্বের প্রয়োজন। এ থেকেই বিজ্ঞানীদের সমান্তরাল মহাবিশ্বের (Parallel Universe) ধারণা হয়েছে। এছাড়া অন্য অনেক পরোক্ষ প্রমাণও রয়েছে। -বইটিতে সমান্তরাল মহাবিশ্ব বা অন্য মহাবিশ্ব সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের বিচিত্র তত্ত্ব এবং সেখানকার বিচিত্র জীবন সম্পর্কেও আলোচিত হয়েছে।

বইটির শেষ অংশে ব্ল্যাকহোলের আকৃতি, গঠন কাঠামো অসীম ধারণ ক্ষমতা, পুঁজিত চাকতির বিশাল অগ্নিক্ফুলিঙ্গ, পৃথিবীর আবহাওয়াকে প্রভাবান্বিতকারী অকল্পনীয় সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা, ব্ল্যাকহোলের বাহির দিয়ে বিশাল ডিম্বাকৃতি পুরু এলাকা, ঘটনাদিগন্তে সবকিছুর পুনর্জীবিত হওয়ার সম্ভবনার তথ্য। ব্ল্যাকহোলের অনন্যতা অসীম সম্ভবনার এবং অবিরত সৃষ্টি-ধ্রংসের ক্ষেত্র। সাতধরণের ব্ল্যাকহোল, শক্তিশালী মহাজাগতিক রশ্মি সম্ভত জীবন ব্যবস্থার শক্তি এবং যাবতীয় তথ্য আদান-প্রদানের উৎস ইত্যাদি বিশ্ময়কর বৈজ্ঞানিক তথ্যের পাশাপাশি তুলনামূলক কোরানের বিভিন্ন আয়াতের জাহান্নামের বর্ণনা এবং হাদীসের বিভিন্ন তথ্য ও ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। যেমন রেইজনার-নর্ডস্ট্রোম ব্ল্যাকহোলের অনন্যতাটি দুর্বল এবং ঘটনাদিগন্ত অস্থায়ী ফলে সম্পূর্ণ ব্ল্যাকহোলটি বাস্পীভূত হতে পারে যা অন্যসব ধরণের ব্ল্যাকহোল থেকে ব্যতিক্রমধর্মী একটি বৈশিষ্ট্য। এই তথ্যের সঙ্গে হাদীসে বর্ণিত বিপুল সংখ্যক বিশ্বাসীকে পর্যায়ক্রমে জাহান্নাম থেকে উদ্ধার এবং জান্নাতে প্রবেশ।

বিজ্ঞানীদের ওর্যামহোল, আইনষ্টাইন-রোজেন সেতু বা মহাজাগতিক তার (Cosmic String) ব্যবহার করে ব্ল্যাকহোল থেকে অন্য মহাবিশ্বে প্রবেশের সম্ভবনা, সেতুর মুখ দীর্ঘ সময় খোলা রাখার জন্য অস্তুত বহিরাগত পদার্থের (exotic matter) অস্তিত্বের সম্ভবনা, সেতু অতিক্রমের গতি, সেতুতে বিপদজনক বিভিন্ন ধরনের বিকিরিত রশ্মি ইত্যাদির সঙ্গে কোরানের আয়াত এবং হাদীসের বর্ণনা থেকে জাহান্নামের উপর স্থাপিত সেতুর (আল সিরাত) তুলনামূলক তথ্য রয়েছে।

এছাড়া অন্য মহাবিশ্বের বা সমান্তরাল মহাবিশ্বে বিজ্ঞানীদের বর্ণিত বিচিত্র জীবন ব্যবস্থা, আমাদের মহাবিশ্বের সবকিছুর সীমাবদ্ধতা এবং অন্য মহাবিশ্বে সবকিছুই অসীম এ সম্ভত তথ্যের সঙ্গে কোরান ও হাদীসের জান্নাতের জীবনের তুলনামূলক আলোচনা রয়েছে।

সাধারণত ব্ল্যাকহোলের ঘটনাদিগন্ত অতিক্রম করলে আর কোন কিছুই ফিরে আসে না। তবে বিজ্ঞানীরা কের ব্ল্যাকহোলের উন্মুক্ত অনন্যতার ঝণাত্মক অঞ্চল (Negative Region of Naked Singularity) সম্পর্কে এক বিশ্ময়কর তথ্য দিচ্ছেন। এটি কেবলমাত্র বিশেষ ব্যতিক্রম ধর্মী ব্যবস্থাপনায় সৃষ্টি হতে পারে। এই অঞ্চলটির ভিতর দিয়ে পৃথিবীর যে কোন বিন্দু থেকে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় অন্য অনেক মহাবিশ্বের অতীত, ভবিষ্যত অবলোকন করে অবিশ্বাস্য রকম অন্ত সময়ে (আইনষ্টাইন যেমন বলেছিলেন রওয়ানা হওয়ার পূর্বেই) ফিরে আসা সম্ভব। এই তথ্যটিতে বর্ণিত পদ্ধতিতেই কি হ্যারত মুহাম্মদ (সঃ) এর মিরাজ সংঘটিত হয়েছিল, এ সম্পর্কেও এখানে বেশ কিছু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যাবে।

বর্তমানে বিজ্ঞানীরা ব্ল্যাকহোল, ওয়ার্মহোল, সমান্তরাল মহাবিশ্ব ইত্যাদির বর্ণনায় যে সমস্ত টেকনিক্যাল শব্দ ব্যবহার করেছেন, আজ থেকে চৌদশত বছর পূর্বে ক্লপক বর্ণনার (allegorical) অশ্রয় না নেওয়া ছাড়া অন্য কোন পছ্টা ছিল কি? আলু কোরানে কিছু সংখ্যক ক্লপক আয়াত ব্যবহার করার কথা উল্লেখ আছে ৩:৭ আয়াতে। এমনি ক্লপক বর্ণনার একটা উদাহরণ জেতিবিজ্ঞানীরা বলছেন ওয়ার্মহোল অতিক্রম করার সময় ব্ল্যাকহোল থেকে বিকিরিত বিভিন্ন ধরনের বিপদজনক রশ্মি বাধার সৃষ্টি করবে। আর হাদীসে উল্লেখ আছে জাহানামের উপর স্থাপিত সেতুতে আংটা, চিম্টা, কাঁটা (যার দৈর্ঘ্য সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহই জানেন) ইত্যাদি সেতু অতিক্রমকারীদের কর্মফল অনুযায়ী পথ অবরোধ করবে।

বিজ্ঞানীদের অনেক তত্ত্বই (Theory) পরিবর্ত্তন হতে পারে কারণ কোন মানুষই ভূলের উর্দ্ধে নয়। কোরান ও হাদীসের তথ্য সবধরনের ভাস্তির উর্দ্ধে। জ্ঞানের স্বল্পতা ও সীমাবদ্ধতার জন্য ভুল-ভ্রাতি থাকতে পারে। সুধী পাঠক মন্ডলীয় সুচিত্তিত মতামত পেলে তা সাদরে গৃহীত হবে এবং পরবর্তী সংক্ষরণে তা সংশোধন করা হবে।

প্রবাস জীবনের শত ব্যন্ততার মধ্যেও যেটুকু অবসর সময় থাকে তা অবশ্যই আমার পরিবারের সদস্যদের প্রাপ্য। কিন্তু এ নিয়ে তারা কোন দিন আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ না এনে বরং বইটির জন্য বিভিন্ন তথ্য এবং কম্পিউটারে সাহায্য করেছে। এজন্য আমার স্ত্রী আবিদা শামীম রাকা এবং তিনি সন্তান শুনব, শামানা ও শাকিলের জন্য মহান করুণাময় আল্লাহর রাবিল আল-আমীনের নিকট তাঁর অনুগত বান্দা ও সৌভাগ্যবানদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আকুল প্রার্থনা করছি। এছাড়া বইটি রচনার জন্য আরও যাদের নিকট থেকে উৎসাহ ও প্রেরণা পেয়েছি তাদের মধ্যে উইংকম্যান্ডার (অবঃ) আব্দুল জলিল ও প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম সাহেবের নাম স্মরণ করে তাদের সর্বময় কল্যাণ কামনা করছি।

বাংলাদেশের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী, গবেষক, শতাধিক মূল্যবান বৈজ্ঞানিক গবেষণালক্ষ প্রকাশক, সৃষ্টি বিষয়ক বিজ্ঞান ও ধর্মের উপর বেশ কিছু গ্রন্থ প্রণেতা এবং মরহুম ডঃ কুদরাত-এ-খুদার সুযোগ্য পুত্র ডঃ ম. মন্যুর-এ-খুদা আমার এই গ্রন্থটি মূদ্রা চলাকালীণ সময়ে পাঠ করেন এবং বেশ কিছু মূল্যবান উপদেশ ও উৎসাহ দেন। বগুড়া বিশিষ্ট সংবাদিক ও লেখক আব্দুর রহিম বগরা বইটি সম্পর্কে উপদেশ দেন। এজন্য আমি তাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিশেষে আমার শুনেয় মা - যিনি শৈশবে আমাকে অসহনীয় কঠের মধ্যে দিয়ে অকৃত্রিম অতুলনীয় আদর যত্ন দিয়ে মানুষ করছেন তার আশ রোগমুক্তি, ইহজাগতিক সুখ, শান্তি ও দীর্ঘায় এবং পরজাগতিক কল্যাণময় জান্মাতি জীবন এবং আমার মরহুম পিতা আলহাজু মজিবর রহমান যিনি দীর্ঘদিন কঠোর পরিশ্রম করে আমাদের বৃহৎ পরিবার লালন পালন করেছেন সেই শুভাকাঞ্জী ও দরদী পিতার ক্ষেত্রে মাগফিরাত ও জান্মাত প্রদানের জন্য মহান আল্লাহর শাহী দরবারে আরজ করছি।

মোঃ মাহবুবুল আলম

সূচীপত্র

ক্রঠনঁ	বিষয়	পুঁতি
০১।	গ্রাম পরিচিতি ও লেখকের কথা	০৪
০২।	মহাবিশ্বের সৃষ্টি	০৯
০৩।	দু'টি পর্যবেক্ষণ এবং বিগ ব্যাংগ তত্ত্ব আবিক্ষার	১১
০৪।	মহাবিশ্বক্ষেত্রের বিগ ব্যাংগ তত্ত্বের নত্যতার প্রমাণ	১৫
০৫।	বিগ ব্যাংগ তত্ত্বের বিবরণ ও মহাবিশ্ব সৃষ্টির দু'টি পর্যায়কাল	১৭
০৬।	বিগ ব্যাংগ (মহাবিশ্বক্ষেত্রের) তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক বিচার বিশ্লেষণ ও আল-কোরান	২১
০৭।	মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ পরিণাম	৪২
০৮।	কোরানে মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ পরিণতি অদ্যশ্য দষ্ট/বল/বিষয়	৫৩
০৯।	সঙ্গ আকাশ	৫৫
১০।	শিংগাধৰনি এবং মহানাদ	৬২
১১।	(কোরানে) পৃথিবী, সৌরজগৎ ও মহাবিশ্বের ধ্বংস	৬৭
১২।	মহাবিশ্বের বিশালতা এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য	৭৯
১৩।	ব্ল্যাকহোল (বৃংঘ গহৰ)	৮২
১৪।	ব্ল্যাকহোলের আকৃতি	৮৩
১৫।	ব্ল্যাকহোলের আবিক্ষার	৮৪
১৬।	ব্ল্যাকহোলের অস্তিত্বের প্রমাণ	৮৫
১৭।	ব্ল্যাকহোলের সৃষ্টি	৮৭
১৮।	ব্ল্যাকহোলের শ্রেণী বিন্যাস	৯৩
১৯।	ব্ল্যাকহোলের গঠন কাঠামো	৯৪
২০।	আইনষ্টাইনের সমীকরণ ঘটনা দিগন্তের ভিতরেও কাজ করে	১১২
২১।	ব্ল্যাকহোলের নিরাপদ কক্ষপথ	১১৩
২২।	ব্ল্যাকহোলের পুঁজিত ঢাক্তির বাইরে বিশাল ডিবাকৃতি এলাকা	১১৪
২৩।	ব্ল্যাকহোলের শেষ স্থায়ী কক্ষপথ থেকে অনন্যতায়	১১৫
২৪।	গ্যালাক্সির কেন্দ্রে বিশাল ব্ল্যাকহোল	১১৬
২৫।	দু'টি ব্ল্যাকহোলের একত্রীকরণ	১১৭
২৬।	ছায়াপথ গ্যালাক্সির কেন্দ্রীয় ব্ল্যাকহোল গ্যালাক্সির সমস্ত কিছুকে গ্রাস করবে	১১৭
২৭।	ব্ল্যাকহোলের ঘনমান আয়তন এবং পদাৰ্থ শোষণের ক্ষমতা সীমাহীন	১১৮
২৮।	ব্ল্যাকহোলের ঘটনা দিগন্তে সব কিছুর পূনরুজ্জীবিত করা সম্ভব	১১৯
২৯।	শ্বেত গহৰ/ হোয়াইট হোল	১২০
৩০।	নীলাচ্ছাদন	১২১
৩১।	ওয়ার্মহোল	১২১
৩২।	ওয়ার্মহোলের শ্রেণী বিন্যাস	১২২
৩৩।	মহাজগতিক তার এবং ওয়ার্মহোল	১২৬

সূচীপত্র

ক্রংক্ৰি	বিষয়	পৃষ্ঠা
৩৪।	সময়ের পথে যাত্রা	১২৭
৩৫।	সোয়ার্জশীল্ড (ছিৱ) ওয়ার্মহোলের স্থান-কালের অনুচিত	১২৯
৩৬।	পরিবহনযোগ্য ওয়ার্মহোল	১৩০
৩৭।	ওয়ার্মহোলকে টাইম মেশিনের রূপান্তর অসম্ভব	১৩৪
৩৮।	সমান্তরাল মহাবিশ্বসমূহ	১৩৬
৩৯।	আমাদের মহাবিশ্বে সবকিছু সীমাবদ্ধ সমান্তরাল মহাবিশ্বের সীমাহীন	১৩৬
৪০।	সমান্তরাল মহাবিশ্বে যাত্রা	১৪০
৪১।	ঘে-হোল	১৫১
৪২।	ব্ল্যাকহোলে পতন	১৫১
৪৩।	ব্ল্যাকহোলের মহাজাগতিক মরীচিকার প্রভাব	১৫৫
৪৪।	ব্ল্যাকহোলের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য	১৫৬
৪৫।	আলো তরঙ্গ	১৫৬
৪৬।	ব্ল্যাকহোল অকল্পনীয় শক্তির উৎস এবং উচ্চ শক্তির গামা-রশ্মি বিকিৰণ	১৫৮
৪৭।	মহাকর্ষ তরঙ্গ	১৬০
৪৮।	ব্ল্যাকহোলের তাপমাত্রা	১৬০
৪৯।	মহাজাগতিক রশ্মি	১৬২
৫০।	মহাজাগতিক রশ্মি বিকিৰণের উৎস স্থান ব্ল্যাকহোল	১৬৩
৫১।	মহাজাগতিক রশ্মি পৃথিবীৰ আবহাওয়া পরিবৰ্তনেৰ রহস্য ব্যাখ্যা কৰতে পারে	১৬৩
৫২।	ব্ল্যাকহোলেৰ বাস্পীভবন মহাবিশ্ব, ব্ল্যাকহোল, ওয়ার্মহোল এবং সমান্তরাল মহাবিশ্বেৰ বৈজ্ঞানিক সারতথ্য ও কোৱান-হাদীস	১৬৪
৫৩।	মহাবিশ্বেৰ বিশালতা, সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্য এবং পরিমাণমিতি	১৬৬
৫৪।	ব্ল্যাকহোল বনাম জাহান্নাম	১৭১
৫৫।	নক্ষত্রে জীবলোপকৰণেৰ সমন্ত মৌল উপাদান সৃষ্টি এবং পরিশেষে তা ব্ল্যাকহোল বা এৱ জ্বালানীতে রূপান্তৰ	১৭২
৫৬।	সাত ধৰনেৰ ব্ল্যাকহোল ও জাহান্নাম	১৭৬
৫৭।	ব্ল্যাকহোলেৰ প্ৰধান চাৰটি অঞ্চল এবং এখান থেকে কোন কিছুই পিছনে ফিরে যেতে পারে না	১৭৭
৫৮।	ব্ল্যাকহোলেৰ পুঁজিৰ চাক্তি বনাম জাহান্নামেৰ অগ্ৰি	১৭৮
৫৯।	ৱেইজনাৰ-নৰ্ডস্ট্ৰোম ব্ল্যাকহোল অস্থায়ী এবং জাহান্নাম থেকে পৰ্যায়ক্ৰমে বিশ্বাসীদেৱ উদ্ধাৰ	১৭৯
৬০।	ব্ল্যাকহোলেৰ অনন্যতা (Singularity) অসীম সম্ভাৱনাৰ ফেনায়িত শব্দ্যা আবাৰ অবিৱত সৃষ্টি ও ধৰংসক্ষেত্ৰ	১৮০
৬১।	ব্ল্যাকহোলেৰ চাৰদিকে বিশাল ডিম্বাকৃতি বলয় (Torus) বনাম শেষ বিচাৰ দিনেৰ সমতল ভূমি	১৮৩

সূচীপত্র

ক্রঃ নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
৬২।	মহাবিশ্বের সবকিছুই ব্ল্যাকহোলে জ্বালানীবৰুপ পতন বনাম জাহান্নামের জ্বালানী এবং পুনঃসৃষ্টি	১৮৬
৬৩।	ব্ল্যাকহোলের ঘটনা দিগন্তে সব কিছুর পূনরুজ্জীবিত করা সম্ভব	১৮৮
৬৪।	ব্ল্যাকহোল বা জাহান্নামের ধারণ ক্ষমতা অসীম	১৮৯
৬৫।	ব্ল্যাকহোল বা জাহান্নামের মরীচিকার (Mirage) প্রভাব	১৯০
৬৬।	ব্ল্যাকহোলের অপসারণ	১৯১
৬৭।	ব্ল্যাকহোলের শক্তিশালী মহাজাগতিক রশ্মি মহাবিশ্বের সন্তুষ্ট জীবন-ব্যবস্থার শক্তির এবং যাবতীয় তথ্য আদান-প্রদানের উৎস	১৯২
৬৮।	ব্ল্যাকহোলের অকল্পনীয় সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এবং তা পৃথিবীর আবহাওয়াকে প্রভাবিত করে	১৯৫
৬৯।	পার্থিব বাযুমণ্ডলের তাপমাত্রা ব্ল্যাকহোল থেকে বিকিরিত মহাজাগতিক রশ্মির উপর নির্ভরশীল	১৯৬
৭০।	ওয়ার্মহোল/আইনষ্টাইন-রোজেন সেতু এবং জান্মাতে প্রবেশের জন্য জাহান্নামের উপর স্থাপিত সেতু	১৯৬
৭১।	অন্তর্বর্তন পদার্থ (exotic matter) ব্যবহার করে ওয়ার্মহোলের মুখ বা সেতুর পথ দীর্ঘ সময় খোলা রাখা সম্ভব	১৯৮
৭২।	ওয়ার্মহোল বা সেতু অতিক্রমের গতি	২০০
৭৩।	বিভিন্ন শক্তিশালী রশ্মির বিকিরণ সংযোগকারী ওয়ার্মহোল বা সেতুকে অত্যন্ত বিশ্ববজ্জ্বলক করে তুলবে	২০২
৭৪।	ব্ল্যাকহোল ওয়ার্মহোলের মাধ্যমে অন্য বহু সংখ্যক মহাবিশ্বের সঙ্গে সংযুক্ত	২০৩
৭৫।	ব্ল্যাকহোলের কেন্দ্র বা ওয়ার্মহোল ব্যবহার করে অন্য মহাবিশ্বে ভ্রমণ বা যাতায়াত সম্ভব নয়	২০৫
৭৬।	দৃশ্যম' (আমাদের মহাবিশ্ব) ও অদৃশ্যমান (সমান্তরাল) মহাবিশ্বসমূহ	২০৬
৭৭।	আমাদের মহাবিশ্বের সবকিছু সীমাবদ্ধ পক্ষান্তরে সমান্তরাল মহাবিশ্বে সবকিছু সীমাবদ্ধ	২০৯
৭৮।	সমান্তরাল মহাবিশ্বে অন্তর্বর্তন পদার্থসমূহ	২১০
৭৯।	আমাদের মহাবিশ্বের সবকিছুই সর্বদা ওয়ার্মহোল দ্বারা সমান্তরাল মহাবিশ্বের সঙ্গে সংযুক্ত	২১১
৮০।	নিখিল মহাবিশ্ব সমপরিমাণ বস্তু এবং প্রতিবস্তু দ্বারা গঠিত	২১৩
৮১।	কের ব্ল্যাকহোলের (ঘূর্ণযামান ব্ল্যাকহোল) উন্মুক্ত অনন্যতার ঝণাঝক অঞ্চল (negative region) ও হ্যারত মুহায়দ (সাঃ) এর মি'রাজ আপেক্ষিকতাবাদ ও কোরান	২১৩
৮২।	GLOSSARY (শব্দ কোষ)	২১৬
৮৩।	Bibliography	২২১
৮৪।		২২৩

মহাবিশ্বের সৃষ্টি

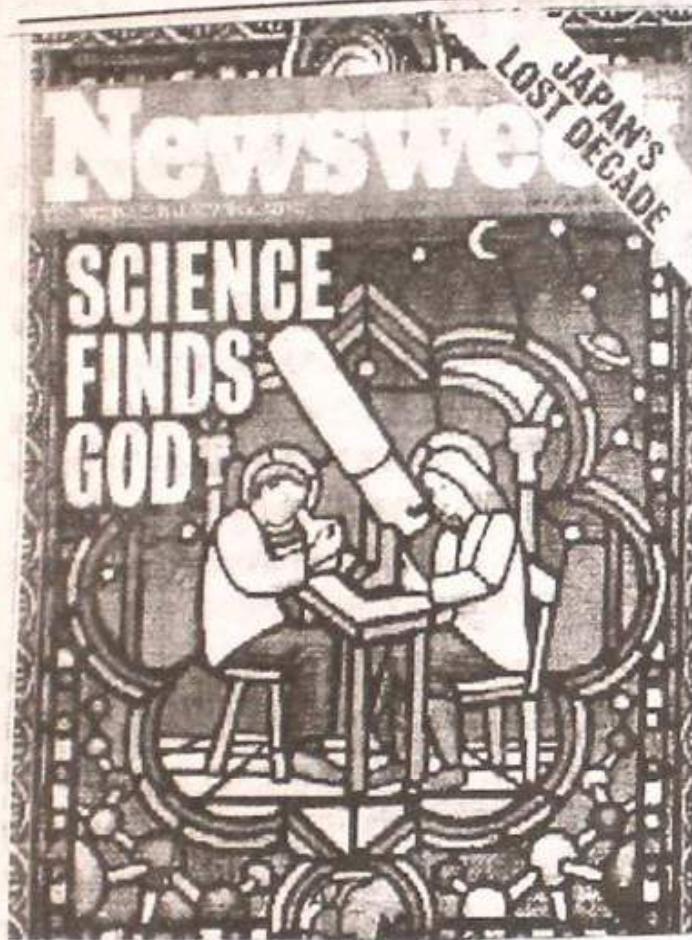
মহাবিশ্বের সৃষ্টি বা উৎপত্তি কী ভাবে হয়েছিল, বর্তমানে তার অবস্থা কী এবং ভবিষ্যতে তার পরিণতি কী হবে এ নিয়ে সুনীর্দিশ দিন বিতর্ক চলছে। মহাবিশ্বের সৃষ্টি কী ভাবে হয়েছিল—এ প্রশ্নের সঠিক উত্তরের উপরেই নির্ভর করছে এই বিশাল মহাবিশ্বের (যার খুব সামান্য অংশ আমরা দূরবীক্ষণ যত্নে দেখতে পাই) বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য পরিণতি। মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কে মূলত চিন্তাধারা ছিল দু'টি; প্রথমত কোনো এক সৃষ্টিকর্তার মাধ্যমে কোনো এক মুহূর্ত থেকে এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি আর হিতীয়টি হচ্ছে বস্তুবাদীরা বিশ্বাস করেন এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির ব্যাপারে সৃষ্টিকর্তার কোনো ভূমিকা নেই। তারা আবার মহাবিশ্ব সৃষ্টির ব্যাপারে দু'টি মতবাদ পোষণ করেন। এক— মহাবিশ্ব অসীমকাল থেকে বিদ্যমান, কারণ এর কোনো শুরু বা শেষ নেই। দুই—মহাবিশ্বের সরকিছু সৃষ্টি কোনো দৈবঘটনাক্রমে (coincidence) এবং এর পেছনে কোনো পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য বা কারণ ইচ্ছা শক্তি কাজ করছে না।

সীমাবদ্ধ এবং অপর্যাপ্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ডিস্ট্রিবিউশনে মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কে বস্তুবাদীদের উপরোক্ত ধারণা দু'টি উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত দৃঢ়ভাবে টিকে ছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক আবিক্ষার উপরের বস্তুবাদীদের দু'টি তত্ত্বকে (Theory) সম্পূর্ণ বাতিল করে দেয়। বর্তমানে বিজ্ঞানীদের কাছে যথেষ্ট তথ্য ও প্রমাণ রয়েছে যে, মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে একটা নির্দিষ্ট সময়ে সম্পূর্ণ শূন্য থেকে একটা মহাবিক্ষেপণ বা বিগ-ব্যাং এর ফলে। বর্তমানে মোটামোটাবে সমস্ত বিজ্ঞানীরাই মহাবিশ্ব সৃষ্টির ব্যাপারে মহাবিক্ষেপণ তত্ত্ব (Big Bang Theory) গ্রহণ করেছেন আর সেই সঙ্গে একজন সৃষ্টিকর্তার ভূমিকার কথা অঙ্গীকার করতে পারছেন না।

জর্জেস পলিতজার একজন অনন্তকালের মহাবিশ্ব, বস্তুবাদী এবং মার্ক্স-ইনজেলসের গোড়া সমর্থক। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তার লেখা বই—এ 'Principes Fondamentaux de Philosophie' মহাবিশ্বের সৃষ্টির ধারণাকে কীভাবে প্রত্যাখান করেন তা লক্ষ্য করুন “মহাবিশ্ব একটা সৃষ্টির বস্তু নয়; যদি তা হয় তবে তা কোনো সৃষ্টিকর্তা মুহূর্তের মধ্যে কোন কিছু নয় (অর্থাৎ শূন্য থেকে) তা সৃষ্টি করেছেন। কেউ যদি সৃষ্টিকে স্থীকার করেন তবে প্রথমেই তাকে কোনো এক সময় এই মহাবিশ্ব ছিল না এবং তা এসেছে শূন্য থেকে তা স্থীকার করতেই হবে, এটা এমন যা বিজ্ঞান সমর্থন করে না।”

পলিতজার মনে করেছিলেন তাঁর অনন্তকালের মহাবিশ্বের ধারণা বিজ্ঞান সমর্থন করবে। কিন্তু বাস্তব সত্য হ'ল বিজ্ঞান আজ বলছে মহাবিশ্বের সূচনা বা আরম্ভ ছিল এবং তা শূন্য থেকে। পলিতজার ঘোষণা করেছেন যদি সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে অবশ্যই একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন।

১৯৯৮ সালের ২৭ শে জুলাই তারিখে 'Newsweek' সাংগ্রাহিক পত্রিকায় 'বিজ্ঞান সৃষ্টিকর্তার সন্দান পেয়েছেন (Science Finds God)' নামে এক প্রচ্ছাদন প্রকাশ করে।



বিংশ শতাব্দীতে জগৎ বিজ্ঞানীগণ আজকের এই বিশ্ব যেভাবে আছে তার ভিত্তিতে বন্ধুর ধর্ম ও বিকিরণ শক্তির উপর নির্ভর করে বিপরীত গণনায় সেই পেছনে ফেলে আসা অস্তিত সময়কে সুদক্ষ গণিতের তত্ত্বের উপর নির্ভর করে খুজে পেয়েছেন মহাবিশ্ব সৃষ্টির রহস্য।

বিজ্ঞানীদের মতে আমরা আজ পর্যন্ত আমাদের চারদিকে খালি ঢোখে এবং শক্তিশালী দ্রব্যীক্ষণের সাহায্যে যা কিছু দেখি তা মাত্র মহাবিশ্বের শতকরা ১ ভাগ আর বাকি ৯৯ ভাগই অদৃশ্য রয়েছে। এই বিশাল সৃষ্টির একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সবকিছু জানেন। মানুষ হলো তার সৃষ্টির সেরা, আর এই সৃষ্টি তথ্য সম্পর্কে মানুষ জ্ঞান লাভ করবে

এমনি একটি সম্ভাবনা বিবেচনায় সৃষ্টিপ্রট ইঙ্গিত আমরা পাই কোরানের নিম্নলিখিত আয়াতগুলিতে :

কী ভাবে সর্বপ্রথম সৃষ্টি হয়েছিল, সে সম্পর্কে যে পৃথিবীতে তথ্য রয়েছে এ সম্পর্কে আল্লাহ মানুষকে নির্দেশ দান করছেন যেন মানুষ পৃথিবীতে অনুসন্ধান পূর্বক উদঘাটন করে।

“ওরা কি লক্ষ্য করে না, কী ভাবে আল্লাহ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন?” (২৯:১৯)

“বল, পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং অনুধাবন কর কী ভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন?” (২৯:২০)

মানুষ প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে এ তথ্যগুলি জানা সম্ভব তা নির্দেশ করেন নিম্নলিখিত আয়াতে ।

“তোমরা তো (ওহে মানুষ) প্রাথমিক সৃষ্টি সম্বন্ধে অবগত হয়েছ তবে তোমরা অনুধাবন কর না কেন?” (৫৬:৬২)

আর মানুষ কী ভাবে এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্য জানতে পারল এবার চলুন তাই আলোচনা করা যাক ।

দু'টি পর্যবেক্ষণ এবং বিগ ব্যাংগ তত্ত্ব (Theory) আবিষ্কার

প্রথম পর্যবেক্ষণ :

১৯২২ সালে রাশিয়ান পদার্থবিদ আলেকজান্ডার ফ্রিডম্যান এক গাণিতিক হিসাবে দেখান যে মহাবিশ্বের গঠন স্থির (static) নয় এবং আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব অনুযায়ী কোনো আকস্মিক শক্তি বা বেগ সমগ্র মহাবিশ্বের গঠন সম্প্রসারণ অথবা সংকোচনের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। বেলজিয়ামের জগৎ বিজ্ঞানবিদ জর্জ ল্যামাইডের ফ্রিডম্যানের গাণিতিক হিসাবকে ভিত্তি করে ঘোষণা করেন যে মহাবিশ্বের একটা শুরু ছিল এবং কোনো কিছুর হস্তক্ষেপের ফলে তা সম্প্রসারিত হচ্ছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন কোনো কিছুর হস্তক্ষেপের (শক্তির) পরিমাপ করতে বিকিরণের (তাপ) হারকে ব্যবহার করা যেতে পারে। উপরোক্ত দুই বিজ্ঞানীর তত্ত্ব বিজ্ঞান জগতে প্রসারলাভ করতে কিছুটা সময় নেয়।

১৯২৯ সালে আমেরিকান জ্যোতির্বিদ (Astronomer) ইডুইন হ্যাবেল যখন কালিফোর্নিয়ার ইউলসন পাহাড়ে তার বিশাল টেলিস্কোপে আকাশ নিরীক্ষণ করেন তখন এক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেন। তিনি দেখতে পান অনেক তারকার আলো বর্ণালির (spectrum) লাল প্রান্তের দিকে সরে যাচ্ছে এবং এই অপসরণ সরাসরি পৃথিবী এবং তারকার দূরত্বের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। হ্যাবেলের এই পর্যবেক্ষণ থেকে জানা যায় আকাশের সমস্ত কিছু আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। পরবর্তীতে তিনি আরও আবিষ্কার করেন যে, তারকাপুঁজি কেবলমাত্র পৃথিবী থেকেই দূরে সরে যাচ্ছে না, তারা পরম্পর থেকেও দূরে সরে যাচ্ছে। এখান থেকে এই সিদ্ধান্তে সহজে আসা যায় যে মহাবিশ্বের সবকিছুই একে অপর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে অর্থাৎ মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে।

সময়ের অগ্রগতিতে যদি মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হতে থাকে তবে সময়ের পেছনের দিকে চললে মহাবিশ্ব অবশ্যই ছোট হতে থাকবে এবং কেউ যদি সময়ের অনেক পিছনে চলে যায় তবে মহাবিশ্বের সবকিছু সংকোচিত হয়ে একটিমাত্র বিন্দুতে পৌছাবে। এখান থেকে এই অভিমতই করা যায় যে কোনো এক সময় মহাবিশ্বের সবকিছু একসঙ্গে জোরালো অবস্থায় অতি সন্নিকটে অসীম ঘনত্বের কোনো এক মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে জমাটবদ্ধ অবস্থায় ছিল।

দ্বিতীয় পর্যবেক্ষণ :

১৯৪৮ সালে বিজ্ঞানী জর্জ গ্যামো, র্যালফ অ্যালফার এবং হাঙ্স বেথে একটি বিখ্যাত গবেষণাপত্রে মহাবিশ্বের উন্নত প্রাথমিক অবস্থার একটি চিত্র প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে তাঁরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন : মহাবিশ্বের আদি পর্বের অতি উন্নত অবস্থার বিকিরণ আলোক কণার আকারে (photons) এখনও থাকা উচিত। তবে তার তাপমাত্রাহাস পেয়ে চরম শূন্যের (-273°)

কয়েক ডিগ্রী বেশি হতে পারে।

১৯৬৪ সালে প্রথম জানা যায় যে, এক অপ্রকাশিত বিকিরণ (Telltale radiation) কেলভিন ক্ষেত্রে চরম শূন্যতার (absolute zero) তিন ডিগ্রী উপরে চারদিকে পরিব্যাঙ্গ। এটা ব্যাখ্যা করে যে, স্থান কাল (space-time) এবং পদাৰ্থ ও শক্তির (matter & energy) অস্তিত্ব আনয়নকারী সম্প্রসারণের চরম উষ্ণতার অদৃশ্য বা মলিনতা প্রাপ্ত হচ্ছে।

উপরোক্ত প্রধান দু'টি পর্যবেক্ষণ থেকেই বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্তে আসেন যে আমাদের মহাবিশ্বটি অতীতের কোনো এক নির্দিষ্ট সময়ে এক অকল্পনীয় উষ্ণতা মহাবিশ্বের মাধ্যমে জন্ম্যাত্তা তৈর করে। এই মহাবিশ্বেরণকেই বলা হয় 'বিগ ব্যাং'। এই মহাবিশ্বেরণের ঘটনা অনেকভাবেই প্রমাণিত হয়েছে। এখানে আরও উল্লেখ্য যে, এই মহাবিশ্বের সৃষ্টির একটা তুরু ছিল যা বস্তুবাদীদের অনন্তকালের মহাবিশ্বের ধারণার বিপরীত।

স্টিফেন হকিং এ যুগের একজন আইনষ্টাইনের সমতুল্য বিজ্ঞানী। তিনি তার বিখ্যাত 'A Brief History of Time' (কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন "প্রসারমান মহাবিশ্ব স্ট্রাকচে অঙ্গীকার করে না।" আবার একই গ্রন্থের অন্যত্র উল্লেখ করেছেন "মহাবিশ্ব প্রসারমান এই আবিকার বিংশ শতাব্দীর বৃহত্তম বৌদ্ধিক বিপ্লবগুলির অন্যতম। পশ্চাদদৃষ্টি দিয়ে আমরা অবাক হয়ে ভাবতে পারি এর আগে কেনো কেউ এমনটা ভাবে নি। নিউটন এবং অন্যদের বোঝা উচিত ছিল, স্থির বিশ্ব অচিরে মহাকর্ষের প্রভাবে সঙ্কুচিত হতে তুরু করবে। ... অথচ স্থির মহাবিশ্ব সম্পর্কে বিশ্বাস এতই দৃঢ় ছিল যে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকটা পর্যন্ত সে বিশ্বাস টিকে রইল। এমন কি ১৯১৫ সালে আইনষ্টাইন যখন ব্যাপক অপেক্ষবাদ গঠন করেন তখনও পৃথিবীর স্থিরত্ব সম্পর্কে তিনি এত নিশ্চিত ছিলেন যে তিনি এ স্থিরত্ব সম্ভব করার জন্য তাঁর সমীকরণে একটা তথাকথিত সৃষ্টি তাত্ত্বিক ধ্রুবক (cosmological constant) ব্যবহার করেছিলেন।

উপরের আলোচনা থেকে একথা সুম্পষ্ট যে তারকাদের পশ্চাদপসরণ এবং মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ একটি যুগান্তকারী আবিকার। বিজ্ঞানীরা তা জানতে পারলেন এই বিংশ শতাব্দীতে। অথচ ১৪০০ বছর আগে নিরস্তর নবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর নিকট অবতীর্ণ মহা গ্রহ আল-কুরআনে তার উল্লেখ আছে, জগৎ বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা তা জানেন কি?

- "আকাশ মণ্ডলিকে আমি সৃষ্টি করেছি শক্তি বলে এবং নিশ্চয়ই তাকে সম্প্রসারিত করছি।" ৫১:৮৭
- "আমি শপথ করছি (নিদর্শন দিচ্ছি) পশ্চাদপসরণকারী নক্ষত্রের" যা প্রত্যাগমন করে এবং অদৃশ্য হয়। ৮১:১৫-১৬

কেবলমাত্র বিগত শতাব্দীতে মানুষ জানতে পেরেছে মহাবিশ্বের কোনো কিছুই স্থির (static) নয়। অথচ সপ্তম শতাব্দীতে অবতীর্ণ আল কোরআনে বেশ কয়েকটি আয়াতে মহাবিশ্বের সবকিছু

ঘূর্ণায়মান তার উল্লেখ আছে—এ সংক্রান্ত কোরআনের বেশ কিছু আয়াতের অংশ বিশেষ লক্ষণীয় ।

- 'কুলুন ফী ফালাকিই ইয়াসবাহুন'— কোরআনের আয়াতের এই অংশটুকুতে 'ফালাক'-শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে আকাশ (মহাশূন্য), কক্ষপথ, নক্ষত্র । এজন্য কোরআনের বিভিন্ন অনুবাদক বিভিন্নভাবে অনুবাদ করেছেন । অনুবাদকগণ কেউ কেউ 'ফালাক' শব্দের অর্থ আকাশ বা মহাশূন্য গ্রহণ করেছেন আবার কেউ কেউ কক্ষপথ গ্রহণ করেছেন । জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ব্যাপক পর্যবেক্ষণে জানতে সক্ষম হয়েছেন মহাকাশের আনন্দনক্ষত্রীয় সকল বস্তুই (all celestial bodies) যার অধিকাংশই নিজ নিজ কক্ষপথে নির্দিষ্ট গতিতে চলমান ।

- সবকিছুই (all celestial bodies) আকাশে/ মহাশূন্যে/ নিজ নিজ কক্ষপথে ভাসমান/ সন্তুরনশীল । (২১:৩৩ এবং ৩৬:৪০)

এবার আরও কয়েকটি আয়াতের একটি অংশ একইভাবে লক্ষণীয় ।

- কুললুই ইয়াজরী লিআজলি সুসামা (৩১:২৯, ৩৫:১৩, ১৩:২, ৩৯:৫)

উপরের অংশটুকু ব্যাপকভাবে অনুদিত হয়েছে— সবকিছুই আবর্তন করে (পরিভ্রমণ) একটা নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত ।

'ইয়াজরী' শব্দের আভিধানিক অর্থ চলমান, প্রবাহ, গতি, দৌড়, ধারমান । এখানে আকাশের সকল বস্তু (all celestial bodies) একটি নির্দিষ্টকালের জন্য একটি নির্দিষ্ট গতিতে চলমান বোঝান হয়েছে ।

আজকের দিনে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা বুলছেন আকাশের সমস্ত তারকাই একটা নির্দিষ্ট সময়ে তার সমস্ত জ্বালানি শেষ করে ফেলবে, পরে অন্যান্য বস্তুসহ কেন্দ্রীয় ব্যাকহোলে পতিত হয়ে খৎসপ্রাণ হবে । কোরআনেও একই ধরনের অনেক আয়াত আছে এ সম্পর্কে আলোচনা গ্রন্থের অন্যত্র পাবেন ।

উপরে বর্ণিত ১৩:২, ২১:৩৩, ৩১:২৯, ৩৫:১৩, ৩৬:৪০ এবং ৩৯:৫ প্রত্যেকটি আয়াতে প্রথমে সূর্য ও চন্দ্রের আবর্তনের কথা বলা হয়েছে এবং তারপরই সবকিছুর (all celestial bodies) কথা উল্লেখ করা হয়েছে । এর সম্ভাব্য ব্যাখ্যার জন্য পাঠক সমাজকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই । আজ থেকে মাত্র দু'শত বছর পূর্বেও সমতল ভূমি (গোলাকার নয়) বিশিষ্ট পৃথিবী এবং তৎকালীন দৃশ্যমান মহাবিশ্বের (দূরবীক্ষণ যন্ত্র তখনও আবিকার হয়নি) স্থিরতা সম্পর্কে মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল । খালি চোখে শুধুমাত্র সূর্য ও চন্দ্রকে গতিশীল ও ঘূর্ণায়মান দেখতো । এই স্থির (static) পৃথিবী এবং মহাবিশ্ব সম্পর্কে মানুষের ভ্রান্ত বিশ্বাস এত প্রবল ছিল যে বিখ্যাত বিজ্ঞানী গ্যালিলি ও গ্যালিলি গোলাকার এবং ঘূর্ণায়মান পৃথিবীর কথা বলে চরম বিপর্যয়ের সমূর্ধীন হয়েছিলেন ।

আজ থেকে প্রায় চৌদশত বছর পূর্বে অবতীর্ণ কোরআনে মানুষকে উপরোক্ত আয়াতগুলিতে সূর্য ও চন্দ্র যেমন নির্দিষ্ট কালের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষপথে আবর্তনশীল তেমনিভাবে আকাশের সবকিছু

(দৃশ্য ও অদৃশ্যমান) নিজস্ব কক্ষপথে নির্দিষ্টকালের জন্য চলমান বার বার এটিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত কোরানে আরও অনেক সংখ্যক পরোক্ষ আয়াত আছে। সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের এই ভাস্তু ধারণা এবং বিশ্বাস ভঙ্গ হবে, আল-কোরানের রচয়িতা মহান আল্লাহত্তালা তা জানতেন। কত সুন্দর পদ্ধতিতে সত্য ভাষণটি বর্ণিত হয়েছে তা এ শতাব্দীতে ভাবলে সত্যিই ভীষণভাবে বিস্মিত হতে হয়। কোরানের অনেক অলৌকিক নির্দর্শনের (miracle) মধ্যে এটি একটি।

সুরা-আত-তাক্তীর(৮১)-এর ১৫ ও ১৬ নং ছোট দু'টি আয়াত কোরানের বিভিন্ন অনুবাদকগণ প্রচলিত জ্ঞানের ভিত্তিতে বিভিন্নভাবে অনুবাদ করেছেন। আয়াত দু'টিতে ব্যবহৃত প্রধান তিনটি শব্দ খুন্নাসি, জাওয়ারি ও কুন্নাসির আভিধানিক অর্থ যথাক্রমে পশ্চাত্য অপসারণকারী, বেগে চলমান এবং অদৃশ্য হওয়া।

সম্প্রতি মহাকাশবিজ্ঞানীরা মহাকাশের অতি পুরাতন অঞ্চলে কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরে অতি উজ্জ্বল তারকা সমতুল্য বস্তু কোয়াসার সঙ্কান পেয়েছেন। এগুলি অকল্পনীয় গতিতে (আলো বা তার অধিক গতিতে) আমাদের মহাবিশ্ব থেকে পশ্চাত্য অপসারণ করে অসীমে হারিয়ে যাচ্ছে। কোরানের ৮১:১৫-১৬ আয়াত কি এগুলিই ইঙ্গিত করছে?

মহাবিশ্বেরণ বা বিগ ব্যাংগ তত্ত্বের সত্যতার প্রমাণ

১৯৪৮ সালে আমেরিকান বিজ্ঞানী জর্জ গামোভ (কল্প অভিবাসী) জর্জ ল্যামাইডের গাণিতিক হিসাবকে আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যান এবং বিগ ব্যাংগ তত্ত্ব সম্পর্কে একটা নতুন ধারণা দেন। যদি মহাবিশ্ব কোনো এক দৈব মহাবিশ্বেরণের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে অবশ্যই এক নির্দিষ্ট মাত্রার তাপের বিকিরণ সেই মহাবিশ্বেরণ থেকে রয়ে গেছে। এই বিকিরণ (ফোটনরূপে) পাওয়া সম্ভব এবং তা মহাবিশ্বে সর্বত্র সমভাবে বিকিরণ হচ্ছে।

১৯৬৫ সনে দুইজন বিজ্ঞানী আরনো পিনজিয়াস এবং রবার্ট উইলসন ঘটনাক্রমে একটি না দেখা বিকিরণ (radiation) সন্ধান লাভ করেন। এই Cosmic Background Radiation মহাবিশ্বের কোনো অঙ্গাত স্থান থেকে অস্বাভাবিকরকম সঙ্গতিপূর্ণ (uniform)। এটা কোনো স্থানীয় বা নির্দিষ্ট কোনো উৎস থেকেও আসছিল না বরং সর্বত্র সমভাবে পরিব্যাঙ্গ। অন্তিবিলছে এটা আর বুঝতে বাকি রইল না যে এই বিকিরণ বিগ ব্যাংগের প্রতিধ্রনি যা মহাবিশ্বেরণের প্রথম মুহূর্ত থেকেই বিস্তৃত হচ্ছে। এই আবিক্ষারের পর বিজ্ঞানীগণ নিশ্চিত হন যে মহাবিশ্বের বর্তমান তাপমাত্রা 2.7 ডিগ্রী কেলভিন যা প্রায় দু'হাজার কোটি (20 বিলিয়ন) বছর আগে মহাবিশ্ব সৃষ্টির সাথে সংগতিপূর্ণ। ফলে মহাবিশ্ব সৃষ্টির ঘটনাকে আরও নিশ্চিত সত্য বলে ধরে নেয়া হয়। আরনো পিনজিয়াস এবং রবার্ট উইলসন তাঁদের কাজের জন্য ১৯৭৮ সালে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

১৯৮৯ সালে জর্জ স্মৃথ এবং তাঁর NASA সহযোগীরা মহাশূন্যে একটা স্যাটেলাইট পাঠান। এই অভিযানটি 'Cosmic Background Emission Explorer' (COBE) নামে পরিচিত ছিল। এই স্যাটেলাইটে রক্ষিত সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি মাত্র 8 মিনিটে পিনজিয়াস এবং উইলসন কর্তৃক প্রাপ্ত বিকিরণের মাত্রার সন্ধান লাভ করেন। এই পরীক্ষার ফলে মহাবিশ্ব সৃষ্টির জন্য বিশ্বেরণের অবশিষ্টাংশ উভাপ ও ঘনত্ব পাওয়া সম্ভব হয়েছে। অধিকাংশ বিজ্ঞানীই মনে করেন COBE সাফল্যজনকভাবে বিগ ব্যাংগের অবশিষ্টাংশ (Remnants) পেয়েছে।

বিগ ব্যাংগ তত্ত্বের সমর্থনে আরও সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্তমানে মহাবিশ্বে প্রকৃতপক্ষে হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম এই দুই মৌলিক পদার্থের যে আপেক্ষিক পরিমাণের অনুপাত মিশ্রণ পাওয়া যায় তা গাণিতিক হিসাবানুসারে মহাবিশ্বেরণের পর থেকে যতটুকু থাকা দরকার ঠিক ততটুকুই আছে অর্থাৎ (হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের অনুপাত 75% : 25%) এখানে উল্লেখযোগ্য যে মহাবিশ্ব যদি অনন্তকাল থেকে বিদ্যমান থাকত তবে সমস্ত হাইড্রোজেন পুড়ে হিলিয়াম হয়ে যেতো।

উপরের তথ্য প্রমাণের উপর ভিত্তি করে সম্পূর্ণ বিজ্ঞান জগৎ বিগ ব্যাংগের সত্যতা গ্রহণ করেছে। ১৯৯৪ সালের অক্টোবর মাসের 'Scientific American' ম্যাগাজিনের এক প্রবন্ধে উল্লেখ

করা হয় যে, একমাত্র মহাবিশ্বের বিগ ব্যাংগ মডেলই সম্প্রসারিত মহাবিশ্ব এবং অন্যান্য প্রাণু তথ্যাবলির জন্য গ্রহণযোগ্য মতবাদ।

বিগ ব্যাংগ-এর ধারণা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দুটি সত্য আঞ্চলিকাশ করে। প্রথমটি হ'ল আদি বন্ধু মূলত শূন্য হতে সৃষ্টি হয়েছে। দ্বিতীয়টি হল- শূন্য হতে মহাবিশ্ব সৃষ্টির ব্যাখ্যা অতিস্তুরীয় কোনো মহাশক্তিশালী মহাবিজ্ঞানীকে কারণ স্থলে দাঁড় করিয়েই কেবল সংজ্ঞাপন আর কোনো ভাবেই নয়।

এ সংক্রান্ত কোরানের নিম্নবর্ণিত আয়াতগুলি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

“নিক্ষয় সৃষ্টিকে তিনিই প্রথম অঙ্গিত্বে আনেন, অতঃপর তিনিই পুনর্বার সৃষ্টি করবেন।” (১০:৮)

“আপনি বলে দিন, আল্লাহই সৃষ্টির সূচনা করেছেন তারপর পুনরঞ্জিত করবেন। অতঃপর তোমরা উদ্বাস্তের মতো কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছো” (১০:৩৪)

“ওরা কি লক্ষ্য করে না, কীভাবে আল্লাহ সৃষ্টিকে অঙ্গিত্বদান করেন, অতঃপর তা পুনরায় সৃষ্টি করবেন? এতো আল্লাহর জন্য সহজ।” (২৯:১৯)

কোরানে অনুরূপ আয়াত রয়েছে অনেক যেমন- ২৭:৬৪, ৩০:১১, ৩০:২৭

“তিনি নিজ ক্ষমতাবলে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি ওদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন? হ্যাঁ, নিক্ষয় তিনি মহাস্তুষ্ঠা ও মহাবিজ্ঞানী। (৩৬:৮১)

বিগ ব্যাংগ তত্ত্বের বিবরণ ও মহাবিশ্ব সৃষ্টির ছয়টি পর্যায়কাল

আজ হতে সম্ভবত দেড় থেকে দু'হাজার কোটি বছর (১৫ থেকে ২০ বিলিয়ন) আগে আমাদের সমগ্র মহাবিশ্বটি ছিল পদার্থের সূক্ষ্মতর পরমাণুর মধ্যস্থিত সূক্ষ্মতম প্রোটন কণার চাইতেও শত সহস্র বিলিয়ন গুণ ক্ষুদ্র (এই মহাবিশ্বের ব্যাস ছিল 10^{-30} সে.মি.) অর্থাৎ বলতে গেলে প্রায় 'শূন্য'। একে আদি একক বা SINGULARITY বলে। সৃষ্টিক্ষণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত স্থান ও কালের কোন অস্তিত্ব ছিল না। 'শূন্য' অবস্থা থেকে আমাদের মহাবিশ্ব সৃষ্টি হতে এক অজ্ঞাত কোনো শক্তির উৎস হ'তে কোনো এক বিন্দুতে বিপুল পরিমাণ শক্তির সমাবেশ এবং তার তীব্র ঘনায়ন ঘটে, ফলে এক মহাবিত্তার উভাপ যার পরিমাণ ছিল 10^{-32} ডিগ্রী কেলভিন এবং যুগপৎ কালে সংগঠিত হয় অকল্পনীয় বিক্ষেপণ আর ঠিক সাথে সাথেই শুরু হয়ে যায় এক মহাস্পস্তরণ। ফলে সৃষ্টি হয় পদার্থের উপপরমাণুর মৌলকণা (subatomic particles), পদার্থ, শক্তি, স্থান এবং কাল। শূন্য সময়ে যে আদি ক্ষুদ্র মহাবিশ্বের জন্ম হয়েছিল তা কোনো এক মহাসূক্ষ বিন্দুতে আবঙ্গ ছিল। এই পদ্ধতিতে সৃষ্টি মহাবিশ্ব বিগ ব্যাংগ তত্ত্ব (Big Bang Theory) নামে খ্যাত। মহাবিক্ষেপণ ঘটার মুহূর্ত থেকে আজ পর্যন্ত সৃষ্টি সমগ্র মহাবিশ্বটি বিজ্ঞানীগণ ছয়টি পর্যায়কালে বিভাজন করেছেন। প্রত্যেকটি পর্যায়কালে কোনো না কোনো সৃষ্টি বিষয়ক চরিত্র প্রদর্শিত হয়েছে।

প্রথম পর্যায়কাল (10^{-30} সেকেন্ড থেকে 10^{-32} সে:)

মহাবিক্ষেপণের পূর্বে পদার্থ, শক্তি, স্থান এবং কাল কোনো কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। যেহেতু এই মহাবিক্ষেপণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কোনো সময় ছিল না এবং তা পরিমাপের কোনো পদ্ধতি ছিল না। বিজ্ঞানীরা এই মুহূর্তটিকে 10^{-32} সেকেন্ড হিসাবে পরিগণিত করেন অর্থাৎ এক সেকেন্ড সময়ের আগে দশমিক এবং তারপর ৪২টি শূন্য দিলে যা দাঁড়ায়। কণাবাদী পদার্থ বিদ্যার জনক প্র্যাকের নামানুসারে এই মুহূর্তটিকে নামকরণ করা হয়েছে (Planck time) 'প্লাঙ্ক টাইম' হিসাবে।

মহাবিক্ষেপণের মুহূর্ত থেকেই মহাবিশ্বের জন্ম যাত্রা শুরু হয়। পদার্থ বিদ্যাও এখান থেকেই শুরু। কণাবাদী তত্ত্বানুসারে (Quantum theory) মহাবিক্ষেপণের 10^{-32} সেকেন্ড সময়ে প্রকৃতির চারটি মৌলিক বল ১) মহাকর্ষ বল, ২) বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বল ৩) সবল কেন্দ্রিক বল এবং ৪) দুর্বল কেন্দ্রিক বল একত্রে মহাবল (Super Force) হিসাবে ছিল। প্রথমেই মহাকর্ষ বল (gravity) অন্য তিনটি একত্রিত বল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। 10^{-32} সেকেন্ড সময়ে যদিও পরমাণুর কেন্দ্রক (neucleus) সৃষ্টি হয়নি তথাপি কেন্দ্রককে আবঙ্গকারী সবল কেন্দ্রক বল (strong neucleus Force) পৃথক অস্তিত্ব লাভ করে। এ সময়ে অজ্ঞাত বা শূন্য উৎস থেকে শুধুমাত্র অকল্পনীয় তাপ

শক্তি ছিল। এ সময়ের তাপমাত্রা ছিল 10^{-2} ডিগ্রী কেলভিন, মহাবিশ্বের আকৃতি ছিল 10^{-26} সেন্টিমিটার (যা প্রায় শূন্য অবস্থার মতো) আর ঘনত্ব ছিল 3×10^{-22} গ্রাম/সি³।

দ্বিতীয় পর্যায়কাল : (10^{-2} সেকেন্ড থেকে 10^{-6} সেকেন্ড)

এই পর্যায়কে অতিক্ষীতকাল (inflationary epoch) বলা হয়। সবল কেন্দ্রিক বল বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে এক ধরনের ঋণাত্মক মহাকর্ষ বলের (negative gravity) উদ্ভব হয়। ফলে মহাবিশ্বটি এই মুহূর্তে বর্তমান কাল পর্যন্ত অর্থাৎ দেড় হাজার কোটি বছরে যে পরিমাণ সম্প্রসারিত হয় তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষীতি লাভ করে। এ সময় তাপমাত্রা নেমে আসে $10^{-11} K$ (কেলভিন ক্ষেত্রে)

এই অতিক্ষীতিকালের মুহূর্তেই আমাদের মহাবিশ্বের প্রয়োজনীয় সমস্ত পদার্থ ও শক্তির সৃষ্টি হয়। (সূত্র-National Geographic June '83 Page-741)

তৃতীয় পর্যায়কাল : (10^{-6} সেকেন্ড থেকে 10^{-4} সে.)

অতিক্ষীতিকালের শেষ পর্যায়ে সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বে বস্তুর আদি ভিত্তি কতকটা দালানের ইট স্বরূপ কোয়ার্ক (Quark) ও এর বিপরীত কণা (Anti-Quark) এবং লেপটনে (ইলেকট্রন ও অন্য উপপারমাণবিক কণা W^+ , W^- ও Z^0) পরিপূর্ণ হয়। কোয়ার্ক এবং বিপরীত কোয়ার্ক কণিকা জোড়া পরম্পর সংশ্পর্শ এসে ধ্রংস হয়। প্রতি একশত কোটি জোড়ায় উদ্ভৃত একটি কোয়ার্ক আত্মরক্ষা করে। এই উদ্ভৃত কোয়ার্কই পরিশেষে বর্তমান বিশ্বজগতের সকল বস্তু সৃষ্টি করে। এই ধ্রংস প্রক্রিয়ায় বিপুল পরিমাণ আলোক কণার (Photon)-এর সৃষ্টি হয়। এ সময়ের অতি উচ্চ তাপমাত্রা কোয়ার্ককে অন্য উপপারমাণবিক মৌল কণার সংঙ্গে সংযুক্ত হতে বাধার সৃষ্টি করে, ফলে নিজস্ব অস্তিত্ব বজায় রেখে পৃথকভাবে অবস্থান করে।

10^{-12} সেকেন্ড সময়ে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বল এবং দুর্বল কেন্দ্রিক বল বিচ্ছিন্ন হয়। আর এই মুহূর্ত থেকেই প্রাকৃতিক চারটি মৌলিক বল আলাদাভাবে প্রত্যেকের অস্তিত্ব প্রকাশ করে। শক্তি উপরোক্ত মৌলকণাগুলির মধ্যে জমাট বাঁধতে থাকে। তাপমাত্রা $10^{-10} K$ কেলভিনে নেমে আসায় ত্রিয়মাত্রায় (Trios) কোয়ার্ক সংযুক্ত হয়ে প্রটোন, নিউট্রন বা বেরিয়ন (Baryon) এবং কোয়ার্ক ও বিপরীত কোয়ার্ক কণা থেকে মেসন (meson) তৈরি হয়। এ সময় বিকিরণ এত বেশি ঘন থাকে যার ফলে কোনো আলো বের হয় না।

চতুর্থ পর্যায়কাল : (10^{-4} সেকেন্ড থেকে ৩ মিনিট)

সময় বেড়ে শিশু মহাবিশ্বের বয়স ৩ মিনিট কাল। তাপমাত্রা নেমে এসেছে $10^8 K$ অর্থাৎ একশত কোটি কেলভিনে। এই উভাপে সকল কেন্দ্রিক বলের আকর্ষণ থেকে মুক্তি পাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট শক্তি প্রোটন, নিউট্রনের থাকে না। তখন তারা মিলিত হয়ে পরমাণুর নিউক্লিয়াস তৈরি করতে থাকে। এ সময় মহাবিশ্বটি ছিল বর্ণহীন ধূমপুঞ্জের কণার (ionized plasma) সম্প্রসারিত

মেখমালায় পরিপূর্ণ। পদাৰ্থ সৃষ্টি এবং একই সঙ্গে শক্তিকে পদাৰ্থে ক্লপান্তৱের জন্য বাধা হিসেবে প্ৰোটনের আৱ কোনো শক্তি থাকে না। পদাৰ্থ ও বিকিৰণ ছিল অবিভাজ্য। ইলেকট্রন এই অবস্থাতেও অতিমাত্রায় শক্তিশালী থাকায় পৱনাগুৰু গঠনের জন্য সংযুক্ত না হয়ে আলাদা থাকে।

নিউট্ৰিনো (Neutrino) এবং বিপৰীত নিউট্ৰিনো (Anti-Neutrino) এৱে সাথে অপৰ বন্ধুকণার সংস্পর্শ (interaction) বন্ধ হয়ে যায়। প্ৰটোন ও নিউট্ৰিন ডিউটেরিয়াম নিউক্লিয়াস (Deuterium Nuclei) সৃষ্টি কৰে। মহাৰিষ্ফেৱণেৱ ১ থেকে ৫ মিনিট সময়েৱ মধ্যে সবল কেন্দ্ৰক বল তাৱ প্ৰাধান্য স্থাপন কৰে হিলিয়াম নিউক্লিয়াস (Hilium Nuclei) তৈৰি কৰে। এ সময় হাইড্ৰোজেন এবং হিলিয়ামেৱ আপেক্ষিক অণুপাত নিৰ্ধাৰিত হয়ে যায়। সম্প্ৰসাৱণেৱ পৱনবৰ্তী আৱ একটি গুৰুত্বপূৰ্ণ লগ্ন হচ্ছে বিষ্ফেৱণেৱ ত্ৰিশ মিনিট পৱন যখন ইলেকট্রন পজিট্ৰনেৱ জোড়া ধৰণেৱ মাধ্যমে বেশিমাত্রায় আলোক কণা (photon) তৈৰি হয়।

পঞ্চম পৰ্যায়কাল : (৩ মিনিট থেকে ৩ লক্ষ বছৱ)

এ সময়েৱ বৈশিষ্ট হ'ল বিকিৰণ শক্তি হতে পদাৰ্থ এবং পদাৰ্থ হতে বিকিৰণ শক্তি যুগপৎ তৈৰি হতো। আলো মহাশূন্যে চলতে আৱত্ত কৰে। ইলেকট্রন এসে নিউক্লিয়াসেৱ (কেন্দ্ৰক) চাৰিদিকে বৃত্ত রচনা কৰে পূৰ্ণাঙ্গ পৱনাগু গঠন কৰে। এই পৰ্যায়েই কেবল সৰ্ব প্ৰথম জ্ঞাত ও পৱিণ্ঠ বন্ধুৱ গোড়া পতন ঘটে। বিশ্বজগতেৱ তাপমাত্ৰা $3000k$ তে নেমে আসে। ফলে তড়িৎ চুম্বকীয় বল নিউক্লিয়াসকে ধৰতে সহায়তা কৰে। ফলে প্ৰথমবাৱেৱ মতো আলোক কণা (photon) কোনো বন্ধুৱ সাথে সংঘৰ্ষ ব্যৱীত দীৰ্ঘ পথ অতিক্ৰমে সক্ষম হয়। এটি মহাজাগতিক বিকিৰণেৱ (মাইক্ৰো তাৰঙ্গেৱ আকাৰে) জন্ম দেয়। যেহেতু এই বিকিৰণ চাপ বিশ্বজগতেৱ গঠন উপাদানসমূহ হতে আলাদা হয়ে পড়ে, সেহেতু পৱনাগু সমূহ মহাকৰ্ষীয় বলকে (gravity) অনুভব কৰে এবং একত্ৰিত হয়ে বিশ্বজগতেৱ উপাদানসমূহ সৃষ্টি কৰে, সমগ্ৰ মহাৰিষ্ফ জুড়ে উপৱোক্ত এই আলোক কণাৱ বিকিৰণ সৰ্বত্ৰ বিদ্যমান। অতিক্ষীতিকালে মহাৰিষ্ফেৱ কাঠামো গঠনেৱ বীজ হিসাবে আদি পদাৰ্থেৱ একত্ৰীকৰণেৱ মৃদু আলোড়ন প্ৰকাশ কৰে। ১৯৯২ সালে নাসাৱ প্ৰেৰিত স্যাটেলাইট COBE নামে অভিহিত পৱীক্ষায় এই বিকিৰণ ধৰা পড়ে।

সৰ্বপ্ৰথম এই পৰ্যায়কালে প্ৰটোন ও ইলেকট্রন মিলে হাইড্ৰোজেন পৱনাগু তৈৰি হতে থাকে। তাৱপৱ হিলিয়াম, লিথিয়াম ও অন্যান্য হাল্কা জাতেৱ মৌলিক পদাৰ্থেৱ পৱনাগু গড়পড়তা তাপমাত্ৰা যখন আৱো নেমে এল, ভাৱী মৌলিক পদাৰ্থেৱ পৱনাগুৱা তখনই সৃষ্টি লাভ কৰল। তবে সমস্ত পদাৰ্থ ছিল গ্যাসীয়কৰণে। এ সময় বেশিৱ ভাগ শক্তি পদাৰ্থে আটকা পড়ে ও কমভাগ শক্তি বিদ্যুৎ চুম্বক শক্তিৰ আকাৰে বিকিৰণ ঘটায়। তত্ত্বানুসাৱে এই সময়ে অদীষ্ট পদাৰ্থেৱ কণাৱ (dark matter) সৃষ্টি হয়। ধাৰণা কৰা হয় তাৱা সমস্ত পদাৰ্থেৱ শতকৰা ৯৯ ভাগ।

ষষ্ঠ পর্যায়কাল : (৩ লক্ষ বছর থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত)

বর্তমান গড় বস্তু ঘনত্ব মাত্রা 10^{-28} গ্রাম/সিসি এবং তাপমাত্রা ২.৭ ডিগ্রী কেলভিন। গঠিত পদার্থ মহাকর্ষবল যা জন্মলগ্নেই পৃথক হয়ে পড়ে তার শাসনে দানা বাঁধতে থাকে। এ পর্যায়ে দীর্ঘ তিনকোটি বছর ধরে বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থের ছুটে চলার মধ্য দিয়ে মহাবিশ্বের আয়তনও প্রসারিত হয়ে চলল। আভ্যন্তরীন সঞ্চিত তাপের মাত্রা যখন অনেকটা নেমে আসে তখন ভারী মৌলিক পদার্থের পরমাণুরা যারা ছিল গ্যাসীয়রূপে, ওরা এক জায়গায় জড়ে হয়ে কঠিন বস্তুর ধূলো কণাদের গড়ে চলল। বিশাল আকারের ধূলো আর গ্যাসের মেঘে ধীরে ধীরে ভরে উঠল মহাবিশ্ব। চারিদিকে ছিল শুধু সীমাহীন অঙ্ককার আর পরম শীতলতা। আলো ছিল না কোথাও, নক্ষত্রদের সৃষ্টি হয় নি তখনো। সেই অঙ্ককারের মধ্য দিয়ে ধূলো আর গ্যাসের বিরাট মেঘগুলো শুধু অবিশ্রান্ত ভাবে বাইরের দিকে চলেছিল ছুটে।

এরপর পঁচিশ কোটি বছর ধরে আর একটি ঘটনা ঘটতে লাগল। গ্যাসের মেঘগুলোর মধ্যে একদিন শুরু হলো নিজেদের অক্ষের চারপাশে চরকিবাজির মতো ঘূরপাক খাওয়ার কাজ। আর তারই ফাঁকে চারপাশে ছড়ানো ধূলোর মেঘগুলোকে যেন শুষে নিয়ে ওরা নিজেদের আয়তন বাড়িয়ে চলল।

যে বিশাল চেহারার আর গ্যাসের মেঘগুলো এভাবে গড়ে উঠল, ওরা আবার ভেঙে গিয়ে চক্রাকারে ঘূরতে থাকা ছোট ছোট বহু আবর্তের সৃষ্টি করে বসল। এ মেঘগুলোর এক একটির দৈর্ঘ্য ছিল কয়েক হাজার থেকে কয়েক লক্ষ আলোকবর্ষ।

ঘনত্ব ও চাপ বাড়তে বাড়তে একদিন ঐ সব ধূলো ও গ্যাসের চক্রের কেন্দ্রে তাপের পরিমাণ যখন দু'কোটি ডিগ্রী ফারেনহাইটে এসে পৌছল, তখন হঠাৎ জুলে উঠল তাপ-পারমাণবিক চুল্লীটা, ওরা পরিণত হলো নক্ষত্রে। অসংখ্য নক্ষত্রের সৃষ্টি যেমন এভাবে ঘটতে লাগল, তেমনি তৈরি হতে থাকা বহু নক্ষত্রকে নিয়ে ধূলো ও গ্যাসের এক একটি বিরাট মেঘ আলাদা আলাদা গ্যালাক্সিরূপে গড়ে উঠল। জন্মলগ্ন থেকে তারাজগতগুলোর ঐ যে বাইরের দিকে ছুটে চলা, তা আজও চলছে অবিচ্ছিন্নভাবে। চলছে নক্ষত্রের জীবনের সৃষ্টি চক্র। আর একই সঙ্গে গঠিত হতে থাকে নীহারিকা, গহ, জীবন ইত্যাদি।

বিগ ব্যাংগ (মহাবিশ্বেরণ) তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণ ও আল-কোরান

আধুনিক বিজ্ঞান প্রস্তরে মতো কোনো ধারাবাহিকতা বজায় না রেখে মানুষের জ্ঞাত-অজ্ঞাত বহুবিধি বিষয় আজ থেকে প্রায় ১৪৫০ বছর পূর্বে আল-কোরানে বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক আবিক্ষারগুলোর কথা নির্ধৃত সত্যতার সাথে অনেক পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। প্রাণ বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে মহাকাশ বিজ্ঞানী বিগ ব্যাংগ তত্ত্বের বিচার বিশ্লেষণ এবং আল-কোরানে তা কীভাবে এসেছে এবার তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করব।

ক) অসীম সূক্ষ্ম বিন্দুতে বিপুল শক্তির সমাবেশ, মহাবিশ্বেরণ ও সম্প্রসারণ তত্ত্ব
বিগ ব্যাংগ বা মহাবিশ্বেরণের মাধ্যমে মহাবিশ্বের জন্য সূচিত হওয়ার পূর্ব মূহূর্ত পর্যন্ত কোনো প্রকার পদাৰ্থ, শক্তি ও সময়ের কোনো অতিত্ব ছিল না। মহাজাগতিক বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা থেকে ধারণা করেন বিংগ ব্যাংগের পূর্বে সমগ্র স্থান (space) তথা সমগ্র মহাবিশ্বটি অসীম ঘনত্বের পরমাণুর চেয়ে অনেক অনেকগুণ ক্ষুদ্র কোনো এক মহাসূক্ষ্ম কণিকায় আবদ্ধ ছিল। বিজ্ঞানীদের গাণিতিক হিসাব অনুযায়ী এই মহাসূক্ষ্ম কণিকাটির তাপমাত্রা ছিল কোটি কোটি (মিলিয়ন, ট্রিলিয়ন, ট্রিলিয়ন) ডিগ্রী। এই অবস্থায় কোনো পদাৰ্থের অতিত্ব থাকতে পারে না। আমাদের পরিচিত পদাৰ্থ বিজ্ঞানের কোনো আইনের প্রয়োগও এই সময় সম্ভব ছিল না। এই মহাসূক্ষ্ম কণিকাটিতে ছিল শুধু অকল্পনীয় শক্তির ঘনায়ন। এর মধ্যেই লুকায়িত ছিল সমগ্র মহাবিশ্বের বীজ।

সম্পূর্ণ শূন্য হতে কোনো এক মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে কোনো এক অজানা উৎস থেকে অকল্পনীয় শক্তির সমাবেশ ঘটে। এই আদি শক্তি থেকেই সমগ্র মহাবিশ্বের অসংখ্য দীপ্তি এবং অদীপ্তি পদাৰ্থের বন্ধুগত অবস্থা প্রাপ্তি এবং সমগ্র মহাবিশ্বের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির সৃষ্টি হয়।

বিগ ব্যাংগ তত্ত্ব থেকে আমরা জানতে পারি সমস্ত সৃষ্টিরই গোড়াপন্থন ঘটেছে শক্তি হতে। মহাবিশ্বের আদি পদাৰ্থ সম্পূর্ণ শূন্য হতে একটি বন্ধুগত অবস্থাপ্রাপ্তি হয়েছে। আর এই পদাৰ্থের সৃষ্টি হয়েছে একটি আদি শক্তি থেকে। শক্তির এই উৎসটি যেহেতু সম্পূর্ণ অন্তরালে, বিজ্ঞান এই শক্তির ব্যাখ্যা করতে অক্ষম। অথচ আল-কোরানের প্রতি লক্ষ্য করলে এই উৎসটি আমরা খুজে পাই।

আল্লাহ মহাবিশ্বকে শক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা সম্প্রসারিত করছেন—তা আমরা পাই পবিত্র কোরানের সুরা যারিয়াত এর ৪৭ নং আয়াতে।

- আমি বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড (আকাশমণ্ডলী) সৃষ্টি কৰেছি শক্তি বলে এবং নিশ্চয় আমি তাকে সম্প্রসারিত কৰছি।— (৫১:৪৭)

অর্থাৎ গোটা সৃষ্টির গোড়া পতন ঘটেছে শক্তি হতে। সুতরাং একদম শূন্য থেকে বস্তু সৃষ্টি সম্ভব।
পবিত্র কোরানে আল্লাহ তার শক্তির (energy) কথা অনেক আয়াতে নানাভাবে প্রকাশ করেছেন।
ক) আল্লাহ মহাশক্তিশালী ও মহাক্ষমতাবান হিসেবে উল্লেখ করেছেন - ১১:৬৬, ১৩:১৩,
১৩:১৬, ২২:৭৪

২২:৭৪ নং আয়াতে আল্লাহর শক্তি বুঝাতে ব্যবহৃত ক্ষতি ও আজিজ শব্দ দুটি সমার্থক। একই
অর্থের দুটি শব্দকে পাশাপাশি ব্যবহার করলে মূলত তা “শক্তির উপরে শক্তি” এমনি কোনো ধারণা
দেয়। উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহর শক্তি আমাদের জ্ঞানের অগম্য, যার প্রকাশ নেই বা অসীম।

খ) আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান উল্লেখ আছে ২:২০, ২:১০৬, ২:১০৯, ২:১৪৮, ২:২৫৯,
২:২৮৪, ৩:২৬, ৩:২৯, ৩:১৬৫, ৫:১৯, ৯:৩৪, ১১:৪, ১৬:৭৭, ২৪:৮৫, ২৯:২০, ৩০:৫০,
৩০:২৭, ৩৫:১, ৪১:৩৯, ৪২:৯, ৪৬:৩৩, ৫৭:২, ৫৯:৬, ৬৪:১, ৬৬:৮ ইত্যাদি আয়াতে।

গ) আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান বা শুধু সর্বজ্ঞানী হিসেবে উল্লেখ আছে- ২:২২৮, ৩০:৫৪,
৩৫:৪৪, ৪২:৫০, ২:১৫৮, ২:১৮১, ২:২৮২, ১০:৬৫, ১৮:৪৫, ২:১১৫, ২০:৯৮, ২৯:৬২,
৩১:৩৪, ৩৩:৫১ ইত্যাদি আয়াতে।

উপরের আয়াতের (ক) এবং (খ) অংশ থেকে আমরা আল্লাহর মহাশক্তি, সর্বপ্রকার শক্তি,
সর্বকিছুর উপর শক্তি অর্থাৎ আল্লাহ আমাদের জ্ঞানের অগম্য শক্তির ধারক। আবার উপরের (গ)
অংশের আয়াতে আল্লাহর সর্বশক্তিমান গুণাগুণটি গুণাভিত হয়েছে তাঁর সর্ব চরম জ্ঞানের প্রশংসন্তা
দ্বারা। অর্থাৎ আল্লাহর জ্ঞান হলো চরম বিজ্ঞতাযুক্ত কিংবা বিজ্ঞানধর্মী। এক কথায় আল্লাহর রয়েছে
অসীম শক্তি এবং বিজ্ঞানজ্ঞাত জ্ঞান। আল্লাহ জ্ঞান ও শক্তিতে মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন।

খ) শক্তিকে পদার্থে রূপান্তর প্রক্রিয়া শুরু

সমগ্র মহাবিশ্বে যা কিছু আছে বিজ্ঞানীরা তা মূলত দুটি ভাগ করেছেন- পদার্থ ও শক্তি। বর্তমানে
পদার্থবিদরা বলছেন শক্তিকে পদার্থ এবং আবার পদার্থকে শক্তিতে রূপান্তর করা যায়। অর্থাৎ
পদার্থ ও শক্তির মধ্যে কোনো বিশেষ পার্থক্য নেই। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন
তাঁর বিখ্যাত সূত্র $E=mc^2$ দিয়ে এই বক্তব্য প্রমাণিত করেছেন। m বা কোনো পদার্থের ভরকে
যদি (দ্বিগুণ) আলোর গতি c দিয়ে গুণ করা যায় তাহলে পাওয়া যাবে E পরিমাণ শক্তি।

পদার্থকে শক্তিতে রূপান্তরের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হ'ল পারমাণবিক বোমা (Atom bomb)। এই
বোমার মধ্যে ইউরেনিয়াম ২৩৫ এবং পুটোনিয়াম ২৩৯ নামক পদার্থ রয়েছে। তাদের পরমাণুর
নিউক্লিয়াসের যখন বিভাজন (chain reaction) শুরু হয় তখন সে বিক্রিয়ায় সমষ্টি বস্তুর ভর
সামান্য কমে যায়। এই অদৃশ্য ভরই (পদার্থের) বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ
করে।

বর্তমানে বিজ্ঞানীরা শক্তিকে পদার্থে রূপান্তরও সম্ভব করেছেন। পরীক্ষাগারে পদার্থের সঙ্গে গামা-রশ্বির (এক ধরনের আলোক শক্তি এক্সের সমজাতীয়) সংঘাত ঘটিয়ে দেখা গেল যে, ঐ রশ্বির শক্তি বিলুপ্ত হয়েছে, আর একই সাথে ইলেকট্রন-পজিট্রনের জোড় জন্ম নিয়েছে। এই জোড়ের দুটি কণার যে মোট ভর, গামা রশ্বির ফোটনে (আলোর কণা) তার সমতুল্য শক্তির সমান শক্তি বা তার চেয়ে বেশি শক্তি থাকলেই এই বিপুল পরিমাণ শক্তি কোনো এক বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করে বস্তুগত পদার্থের রূপান্তর যেমন সম্ভব তেমনি আবার সামান্য একটু পদার্থকে সম্পূর্ণরূপে শক্তিতে রূপান্তর ঘটালে তাপশক্তির আকারে বিপুল পরিমাণ আলো বা নূর উৎপন্ন হবে। একই ভাবে সমগ্র মহাবিশ্বের দীপ্তি, অদীপ্তি পদার্থকে তাপশক্তির আকারে আলো বা নূরে পরিণত করা যেমন সম্ভব, বিপরীত ভাবে এই নূর বা আলোকে পদার্থে পরিণত করাও সম্ভব।

প্রফেসর পি.এন লেবেদেভ (PN Lebedev) পরীক্ষাগারে প্রমাণ করেছেন যে, আলোর বলক 'ভূর সম্পন্ন শক্তি' এবং বিজ্ঞানীরা এখান থেকে সিদ্ধান্ত পেলেন আলো চলমান বস্তুরই প্রতিরূপ মাত্র- 'Light is a form of matter in motion'.

বিগ ব্যাংগ তত্ত্বের তৃতীয় পর্যায়কাল পর্যন্ত শক্তি থেকে পদার্থ সৃষ্টির জন্য দালানের ইট স্তরপ পদার্থ গঠনের জন্য বিভিন্ন ধরনের উপ পারমাণবিক কণা (sub-atomic particles) কার্ক, ফোটন (আলোর কণা-পরমাণুর প্রটোন এবং ইলেকট্রনের মধ্যে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বল হিসেবে বৈদ্যুতিক চার্জ পরিবহন করে অদৃশ্য সংবাদ পরিবাহীরূপে) প্রটোন, ইলেকট্রন ইত্যাদির আবির্ভাব হয়। চতুর্থ পর্যায়কালে উপরোক্ত উপাদানগুলি নিয়ে পরমাণুর নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রীয় অংশ তৈরি হয় আর পঞ্চম পর্যায়কালে এসে পরিপূর্ণ পরমাণু (atom) সৃষ্টি হয়। এগুলি হ'ল পরবর্তীতে সমগ্র মহাবিশ্ব সৃষ্টির মস্ত্র বা মৌলিক উপাদান।

মহাবিশ্বের যে কোনো পদার্থই অগণিত পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত। পরমাণুগুলো আবার ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদিতে বিভক্ত। এ পরমাণুকে ভেঙে ফেললে তার আর পদার্থ হিসাবে অস্তিত্ব থাকে না। তখন সেই পদার্থ আলো বা যে কোনো প্রকার বিকিরণ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। মহাবিশ্বের যে কোনো পদার্থকেই সম্পূর্ণরূপে আলো বা নূরে রূপান্তরিত করা যেতে পারে।

মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর অসীম শক্তি ও জ্ঞান কীভাবে যাবতীয় পদার্থ এবং তথা সমগ্র মহাবিশ্ব সৃষ্টিতে কি ধরনের শক্তি দ্বারা আদিম শূন্যতা হতে এই সৃষ্টিকে সর্বপ্রথম অস্তিত্বে আনয়ন করেন তা কোরান ও হাদীসের আলোকে পর্যালোচনা করব।

কোরানের ২৪:৩৫ আয়াতে আমরা পাই - "আল্লাহ আকাশসমূহ ও পৃথিবীর আলো (মহাবিশ্ব)
... আলোর উপর আলো ...।

অর্থাৎ আল্লাহ সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের আলো বা জ্যোতি। আল্লাহর এই 'আলোর উপর আলো' ধারণাটি আলোকের ঘনায়ন প্রক্রিয়ার সমানুপাতিক। যেমনটি আমরা সৃষ্টি তত্ত্বের বিকিরণ পর্যায়কালে দেখতে পাই যে, আলোকের ঘনত্ব বস্তুর ঘনত্বের চাইতেও বেশি। আল্লাহ হয়তবা

তাঁর নূর বা আলো বা জ্যোতিকে তাঁর মহাপ্রশংসন্ত শক্তি দ্বারা বন্ধু জগতের গোড়া পতন করেছেন। হাদীসে কুদসী থেকে জানা যায়, হযরত মোহাম্মদ(স:) বলেছেন, “আমি আল্লাহর নূর এবং সমুদয় বন্ধু আমার নূর হতে সৃষ্টি।”

অনুরূপ অপর আর একটি হাদীস, “হে জাবের, তোমার নবীর নূরই আল্লাহ যাকে প্রথম সৃষ্টি করেছেন আর সেই নূর দ্বারাই আরশ, কুরসী, নভোমঙ্গল, ভূমণ্ডলের সবকিছু সৃষ্টি করা হয়েছে।” কোরানেও এর সমর্থন পাওয়া যায়—“আল্লাহর নিকট হতে এক জ্যোতি [হযরত মুহাম্মদ(স:)] ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট এসেছে।” (৫:১৫)

উপরের দু'টি হাদীস মোতাবেক বলা যায় যে, আল্লাহ নিজ নুরের একাংশ দ্বারা নূরে মহামূদী সৃষ্টি করেছিলেন। অর্থাৎ আল্লাহ প্রথমে এক বিপুল পরিমাণ আলো তাঁর নিজ থেকে আলাদা করেছিলেন। যদিও সে আলোর নাম ছিল ‘মুহাম্মদ’ তথাপি তা ছিল নূর বা আলো। হাদীস অনুযায়ী সেই আলো থেকেই মহাবিশ্বের সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে। এই আলো ছিল স্থান-কালের (space-time) বা ঘটনাদৃশ্যের অন্তরালে। পরে স্থান কালের (মহাশূন্য) একটা উচ্চতা ঘনবিদ্যুর বিক্ষেপণে তা পদার্থ ও শক্তি হিসাবে আমাদের চেনা জগতে আত্মপ্রকাশ করে। এই প্রাথমিক মহাসূক্ষ বিদ্যুটিতেই তৈরি হয়েছিল মহাবিশ্ব সৃষ্টির প্রয়োজনীয় কাঁচামাল। এহ, নক্ষত্রসমূহ এবং যাবতীয় আননক্তীয় পদার্থ এখান থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল।

গ) পদার্থ বিদ্যা বা প্রাকৃতিক আইনের গোড়াপতন

বিগ ব্যাংগের পর পরই একবারে সূক্ষ্ম সঠিক মাত্রায় কিছু বল (Force) আমরা যে মহাবিশ্বে বাস করছি তাকে সুসংগঠিত করে, অন্যথায় কোনো মহাবিশ্বের অস্তিত্ব থাকত না। আধুনিক পদার্থবিদদের মতে এই প্রাথমিক বলগুলি হলো চারটি। মহাবিশ্বের সবকিছু অর্থাৎ সমস্ত পদার্থের উপ পরমাণু থেকে শুরু করে গ্রহ, নক্ষত্র, গ্যালাক্সি তথা সম্পূর্ণ কাঠামো এবং গতি এই চারটি বলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই চারটি বল হ'ল— (ক) মহাকর্ষীয় বল (gravitational force), (খ) বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বল (electromagnetic force), (গ) সবল কেন্দ্রকীয় বল (strong nuclear force) এবং (ঘ) দুর্বল কেন্দ্রকীয় বল (Weak nuclear force).

মহাকর্ষণ এবং বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বল যথাক্রমে সঞ্চারণ এবং অষ্টদশ শতাব্দীতে এবং অপর ২টি বল আবিষ্ট হয় বিংশ শতাব্দীতে। সবল এবং দুর্বল কেন্দ্রকীয় বল দু'টি উপ পরমাণু পর্যায়ে ক্রিয়া করে আর মহাকর্ষীয় এবং বিদ্যুৎ চুম্বকীয় নয়। দু'টি পরমাণুকে সংগঠিত করে পদার্থ সৃষ্টি করে। নিম্নে এই চারটি বলের প্রধান বৈশিষ্ট্য অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হ'ল।

ক) মহাকর্ষীয় বল— সকল বস্তুর মধ্যকার পারম্পরিক আকর্ষণ বল। মহাবিশ্বের সবকিছুর উপর এই বল কাজ করে। গ্রহ, নক্ষত্র, চাঁদ, সূর্য ইত্যাদিকে কক্ষপথে বা সঠিক অবস্থানে রাখে। অন্য কথায় বিশ্বজগতের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে। আইনষ্টাইনের

আপেক্ষিকতাবাদের আসল কথাহ হচ্ছে এহ বল।

- খ) বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বল- এই বলের ফলে সমধৰ্মী ইলেকট্রিক চার্জের জন্য বিকর্ষণ এবং বিপরীত ধৰ্মী ইলেকট্রিক চার্জের জন্য আকর্ষণ ঘটে। এই বল পরমাণুর রাসায়নিক গুণাঙ্গণ ব্যাখ্যা করে এবং আলোর মতো অন্য কোন বস্তু যা তাকে শোষণ করতে পারে- এ রকম কিছুর বাধার সম্মুখীন না হওয়া পর্যন্ত আলোর বেগে চলতে থাকে। এই বল পরিবাহিত হয় আলোক কণা বা Photon দ্বারা। ইলেকট্রিক চার্জের জন্য দায়ী ইলেকট্রন-পরমাণুর নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে পরিক্রমণরত (সন্তুরণ) অবস্থায় থাকে।
- গ) সবল কেন্দ্রীয় বল- এই বল পরমাণুর প্রটোন এবং নিউট্রনকে নিউক্লিয়াসে একত্রে রাখার জন্য আঠার মতো কাজ করে। এই বল পরিবাহিত হয় গ্লুনসের (gluons) সাহায্যে আর গ্লুনস হচ্ছে এক ধরনের উপ-মৌলকণা (sub-atomic particles) যা ভরহীন এবং আলোর গতিতে চলে।
- ঘ) দুর্বল কেন্দ্রীয় বল- উপমৌলকণাগুলোর মধ্যে কাজ করে। অধিকাংশ তেজস্ক্রিয় মৃদুভাবে ভাঙ্গন বা দুর্বলীকরণ বিক্রিয়াগুলো (Radioactive β -decay) এই বলের কারণে ঘটে।

এবাবে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি কোরানের সুরা নাফিয়াত (৭৯) এর প্রথম ছোট পাঁচটি আয়াতের প্রতি। আল-কোরানের সমস্ত অনুবাদকারীগণ ও জ্ঞানী তফসীরকারীগণ এই আয়াতগুলির ব্যাখ্যা বিভিন্ন ভাবে দেয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। বেশিরভাগ অনুবাদকারীগণ ফেরেশতাদের উপস্থাপন করে প্রথম চারটি আয়াত অনুবাদ করেছেন। যদিও আরবি শব্দ মালাক আয়াতগুলিতে নেই, এর আভিধানিক অর্থ ফেরেশতা ছাড়াও ক্ষমতা, শক্তি বা বলকেও বোবায়। এই আয়াতগুলি নিতান্ত রূপক অর্থে অনুবাদকারীগণ প্রচলিত জ্ঞানে যাকে উপযোগী মনে করেছেন তার ধারণা ফুটিয়ে তুলেছেন। তবে মোটামুটিভাবে সব অনুবাদকারীগণ মূল শব্দের অর্থগুলি অনুবাদে রেখেছেন যা নিম্নরূপঃ প্রথম আয়াত- প্রবলভাবে আকর্ষণকারী, দ্বিতীয় আয়াত-মৃদুভাবে কাজ করা, তৃতীয় আয়াত- দ্রুত সন্তুরণ, চতুর্থ আয়াত- দ্রুততর কার্য সম্পাদন আর পঞ্চম আয়াতে এসে মেটামুটি ভাবে সবাই অনুবাদ করেছেন যারা সকল কর্ম বা সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে।
মহান সৃষ্টিকর্তা করণাময় আল্লাহর নিকট প্রকৃত জ্ঞান কামনা করে সুরা নাফিয়াতের প্রথম চারটি আয়াত ক্রমান্বয়ে (ক) মহাকর্ষীয় বল, (খ) দুর্বল কেন্দ্রীয় বল, (গ) বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বল, (ঘ) সবল কেন্দ্রীয় বল এবং পঞ্চম আয়াতে এসে এই বলগুলি সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে।

এখানে বলাই বাহ্যিক যে উপরোক্ত চারটি বলের আজকের বিজ্ঞানীরা যেভাবে নামকরণ করেছে আল কোরানে সেভাবে নেই সত্য কিন্তু বল চারটির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষিপ্ত কয়েকটি শব্দের মাধ্যমে তা তুলে ধরা হয়েছে। এই চারটি বলের নিয়ন্ত্রণ কর্তা মহান আল্লাহ'লা। তার সমর্থন

মিলে কোরানের আর একটি আয়াতে : "... নতোমগুল ও ভূমগুলের সমস্ত বলই (all forces) তাঁরই (আল্লাহর)। ..." (৪৮:৪)

ষ) মহাবিশ্বের উপাদান সৃষ্টি এবং সংগঠন

বিগ ব্যাংগের (মহাবিশ্বেরণের) মুহূর্তটিকে শূন্য সময় বলে এবং এই শূন্য সময়ে শক্তিপুঞ্জের সমাবেশ অধ্যয়িত সৃষ্টি বিন্দুর শক্তি পরবর্তীতে জটিল পদার্থবিদ্যার নিয়ম-নীতি অনুসারে দৃশ্য ও অদৃশ্য পদার্থ সৃষ্টি করেছিল। বর্তমান প্রযুক্তিতে সুপার কম্পিউটারের সহায়তায় মানুষ আজ এ ব্যাপারে নানা জটিল প্রশ্নের সৃষ্টি ও গ্রহণযোগ্য মীমাংসায় পৌছাতে সক্ষম হয়েছে।

বিগ ব্যাংগ তত্ত্বানুযায়ী চতুর্থ পর্যায়কাল পর্যন্ত মহাবিশ্ব সৃষ্টির জন্য কাঁচামাল বা উপাদান সৃষ্টির জন্য মৌলিক পদার্থের দালানের ইট স্বরূপ পরমাণু গঠিত হয়। তারপর পঞ্চম ও ষষ্ঠ পর্যায়কালে প্রথমত শুধুমাত্র হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম গ্যাসই উৎপন্ন হয়েছিল। এই গ্যাস মহাকর্ষ বলের আকর্ষণে বিভিন্ন স্থানে সংঘিত হয়। এই ধোঁয়ার মেঘগুলিতে প্রাথমিক পর্যায়ে শুধুমাত্র হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাসের সমন্বয়েই বড় বড় নক্ষত্র সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে এক একটি ধোঁয়ার মেঘ গুলামুরিত হল এক একটি নবীন গ্যালাক্সি। এই বড় বড় নক্ষত্রসমূহের জীবনচক্র দ্রুত শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং এই সকল নক্ষত্রের অভ্যন্তরে অন্যান্য কিছু ভারী পদার্থ সৃষ্টি হয়েছিল। নক্ষত্রগুলির বিক্ষেপণের ফলে এই সকল ভারী পদার্থ আন্তঃনক্ষত্রীয় মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। দ্বিতীয় প্রজন্মের দীর্ঘস্থায়ী নক্ষত্রগুলি সৃষ্টির সময় এই সকল ভারী পদার্থ যুক্ত হয়েছে। এখনো নক্ষত্রসমূহের অভ্যন্তরে ভারী পদার্থ সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলছে। মাধ্যকর্ষণের ফলে নক্ষত্রের অভ্যন্তরে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হয়। এই চাপ ও তাপের ফলে নক্ষত্রের অভ্যন্তরে পারমাণবিক বিভাজনের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে ভারী থেকে ভারীতর পদার্থের সৃষ্টি হয়। এভাবে লোহা, কার্বন, নিকেল, সিলিকন ইত্যাদি এ পর্যন্ত জ্ঞাত ১১৮টি মৌলিক পদার্থ নক্ষত্রের অভ্যন্তরে সৃষ্টি হয়।

এবার আমরা উপরের বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি আল-কোরানে কীভাবে আছে তা পর্যালোচনা করব। কোরানের ২১:৩০ আয়াতটির প্রচলিত অনুবাদ-সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা কি ভেবে দেখে না যে, আসমানসমূহ ও জমীন একত্রে জমাটবন্ধ ছিল। অতঃপর আমি উভয়টিকে পৃথক করে দিলাম। ...

প্রকৃতপক্ষে উপরোক্ত আয়াতের প্রধান দু'টি আরবি শব্দ 'রাতাক' ও 'ফাতাক' আদি মহাসৃষ্টি বিন্দুর পরিবেশ ও সৃষ্টি লগ্নে বিরাজমান পরিস্থিতিসমূহের ব্যাখ্যা করে। 'রাতাক' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হ'ল- পরিপূর্ণ করা, মেরামত করা, সেলাই করা, বয়ন করা, একত্রে জোড়ানো, ঝালাই করা, একত্রে জোড়া দেয়া, বিজড়িত থাকা ইত্যাদি। আর 'ফাতাক' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হ'ল খণ্ডিত হওয়া, বিদীর্ঘ করা, বিক্ষেপণ ঘটানো। ডঃ মরিস বুকাইলির বাইবেল, কোরান এবং বিজ্ঞান এছে "রাতকান ফাফাতাকনা"-এই শব্দগুলোর মধ্যে একটি একক পিণ্ডাকৃতির সংমিশ্রিত গলিত

উপাদানভূত অতি ঘন অস্তিত্বের ধারণা— যার রয়েছে একটি বিক্ষেপণের শর্ত। উপরোক্ত শব্দ দু'টির অভিধানিক অর্থ গ্রহণ করে ২১:৩০ আয়াতটির অনুবাদ হতে পারে—

গারি— “সত্য প্রত্যাখানকারীগণ কি প্রত্যক্ষ করে না যে পৃথিবী সমেত মহাবিশ্ব (নভোমঙ্গল) ও তথ্যতোভাবে জড়িত ছিল অতিশক্ত ঘনীভূত ও গলান্তো উপাদানে জমাটবন্ধ একটি পিণ্ডাকৃতির শক্ত অবস্থার— অতঃপর আমি তাকে খণ্ডায়িত করেছি এক বিক্ষেপণের দ্বারা।”

আলোচ্য বিগ ব্যাংগ তত্ত্বের— শেষ বা ষষ্ঠ পর্যায়কালের প্রথম দিকে অর্থাৎ সৃষ্টির প্রারম্ভে শুধুমাত্র হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাসের মিশ্রিত ধোয়াই উৎপন্ন হয়েছিল। অজানা কারণবশত এই ধোয়া বিভক্ত হয়ে বিশাল আকৃতির সব ধোয়ার মেঘে রূপান্তরিত হয়েছিল। পরবর্তীতে এক একটি ধোয়ার মেঘ রূপান্তরিত হয়েছে এক একটি গ্যালাক্সি। ধোয়া থেকেই সৃষ্টি হয়েছে এ মহাবিশ্বের সব গ্যালাক্সি বা আমাদের পরিচিত মহাবিশ্ব এবং আমাদের না জানা অর্থাৎ কোরানের ভাষায় দ্বিতীয় থেকে সগুম আকাশ পর্যন্ত বিশাল মহাবিশ্ব।

প্রাথমিক অবস্থায় হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম সংমিশ্রিত বিশাল ধোয়ার মেঘের এক একটি গ্যালাক্সিতে বড় বড় তারকার জন্ম হয়। তারকা সৃষ্টির উপাদান (হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস) জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করে বেশ কিছু আরও ভারী পদার্থের সৃষ্টি করে। প্রাথমিক অবস্থায় সৃষ্ট এ সমস্ত তারকাঙ্গলির আকৃতি অতি মাত্রায় বিশাল হওয়ায় বিক্ষেপণের মাধ্যমে এদের সংক্ষিপ্ত জীবনচক্রের অবসান ঘটে। তারকার অভ্যন্তরে সৃষ্ট ভারী পদার্থসমূহ মহাশূন্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। পরবর্তীতে এ সমস্ত ভারী পদার্থ এবং প্রাথমিক প্রধান দু'টি গ্যাসের সমন্বয়ে দ্বিতীয় প্রজন্মের দীর্ঘস্থায়ী তারকার সৃষ্টি করে। এই সমস্ত তারকার মাধ্যাকর্ষণ বলের চাপে ও তাপে কেন্দ্রীকীয় সংযোজন (nuclear fusion) প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ধরনের ভারী পদার্থ যেমন লোহা, কার্বন, নিকেল, সিলিকন সহ এ বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ (এ পর্যন্ত জ্ঞাত ১১৮টি) নক্ষত্রের অভ্যন্তরে সৃষ্টি করে।

বিগ ব্যাংগ বা মহাবিক্ষেপণে ছয়টি পর্যায়কালে সৃষ্ট হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাসের মিশ্রিত এই বিশাল মেঘ বিজ্ঞানীদের ধারণামতে সমস্ত মহাবিশ্বে সুষমভাবে ছড়িয়ে পড়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটে নি। প্রাথমিক (prototype) এবং পরবর্তীতে পূর্ণাঙ্গ কোটি কোটি তারকাখচিত অগণিত গ্যালাক্সি গঠনের জন্য বিপুল পরিমাণ পদার্থ (উপরোক্ত ধূলার মেঘ) মহাশূন্যের বিভিন্ন স্থানে কেন্দ্রীভূত হয়ে ঘনায়িত হয়। বিগ ব্যাংগের প্রারম্ভে কোনো কিছু আদি মহাসূক্ষ্ম বিন্দুটিতে কোনো নির্দেশ বা পরিকল্পনার ফলেই গ্যালাক্সি সংগঠনের জন্য প্রথম দশ লক্ষ বছরে এই আদি ধোয়ার মেঘের ব্যাপক ঘনত্বের তারতম্য ঘটিয়ে (density fluctuations) পিণ্ডাকৃতি ধ্বারণ করে। এটা কীভাবে ঘটেছিল বিজ্ঞানীরা তা জানেন না। তবে পরবর্তীতে কোটি কোটি তারকাখচিত গ্যালাক্সি গঠন সহজে অনুমেয়।

বর্তমান জগৎ বিজ্ঞানীদের নিকট প্রধান পাঁচটি মহাজাগতিক রহস্য (cosmic mysteries) হ'ল

- ক) অদীঁশ পদার্থ (dark matter) ৰ) অদীঁশ শক্তি (dark energy) গ) গ্যালাক্সির গঠন (Formation of galaxies) ঘ) পৃথিবীর বাহিরে জীবনের অস্তিত্ব (Life beyond earth) ঙ) অন্য বা সমান্তরাল মহাবিশ্বসমূহ (Other or parallel universes)। এই পাঁচটি মহাজাগতিক রহস্য সম্পর্কে বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের বেশ কিছু সংখ্যক তত্ত্ব (Theory) আছে এবং এখনও ব্যাপক গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ চলছে। এ সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা এ গ্রন্থের অন্যত্র পাবেন।

এ যাবৎকাল দৃশ্যমান মহাবিশ্বের গ্যালাক্সিসমূহ নক্ষত্রপুঁজি ও আননক্ষত্রীয় পদার্থের যাবতীয় পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা থেকে বিজ্ঞানীদের গাণিতিক হিসাব মতো পদার্থ ও শক্তির আনুপাতিক পরিমাণ নিম্নরূপ-

ভারী পদার্থ (Heavy element)	০.০৩%
ভৌতিক নিউট্রোনস (Ghostly neutrinos)	০.০৩%
তারকাপুঁজি (stars)	০.৫%
হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস	৮%
অর্থাৎ মাত্র প্রায় শতকরা ৫ ভাগ পদার্থ নিয়ে আমাদের দৃশ্যমান মহাবিশ্বের সমস্ত গ্যালাক্সি ও আননক্ষত্রীয় পদার্থ গঠিত।	
অদীঁশ পদার্থ (dark matter)	৩০%
অদীঁশ শক্তি (dark energy)	৬৫%

অদৃশ্যমান মহাবিশ্বের শতকরা ৯৫ ভাগ পদার্থ ও শক্তি সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা আজ পর্যন্ত তেমন একটা কিছু জানে না, তবে এদের অস্তিত্ব সম্পর্কে অনেক পরোক্ষ প্রমাণ রয়েছে। মহাজাগতিক বিজ্ঞানীরা এই অদীঁশ পদার্থ ও শক্তিকে 'missing mass' বা বিলুপ্ত ভর হিসাবেও অভিহিত করেছেন।

বিজ্ঞানীদের এই হারিয়ে যাওয়া ভরের সঙ্কান রয়েছে কোরানের ৪১:১১-১২ দু'টি আয়াতে।

- 'তারপর তিনি আসমানের প্রতি মনোনিবেশ করেন, তখন যা ছিল ধূমপুঁজি বিশেষ, পরে তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে বললেন, তোমরা উভয়ে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় আমার আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত হও। ওরা বলল, আমরা তো আনুগত্যের সাথেই প্রস্তুত আছি। অতঃপর তিনি দুইদিনে আকাশমণ্ডলিকে সঙ্গ আকাশে পরিণত করলেন এবং প্রত্যেক আকাশের নিকট তাঁর কর্তব্য ব্যক্ত করলেন এবং তিনি পৃথিবীর নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুশোভিত এবং সুরক্ষিত করলেন।' (৪১:১১-১২)। এই সঙ্গ আকাশ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা এ গ্রন্থের অন্যত্র পাবেন।

ঙ) ছয়টি পর্যায়কালে (দিনে) সৃষ্টি মহাবিশ্ব

আলোচ্য বিগ-ব্যাং তত্ত্বে সমগ্র মহাবিশ্ব সৃষ্টির সময় বা কালকে অতি সূক্ষ্ম, মধ্যম ও বিশাল সময়

ব্যবহার করে ছয়টি পর্যায়কালে বিভক্ত করা হয়েছে, অথচ কোরানের বিভিন্ন আয়াতে সমগ্র মহাবিশ্ব সৃষ্টির জন্য ছয়দিনের কথা উল্লেখ আছে। সময় বা কাল বলতে এ যাবৎকাল মানুষের যে ধারণা বিজ্ঞানীরা তা সম্পূর্ণ ভাস্ত বলে প্রমাণ করেছেন। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা সময় বা কালকে যে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছেন প্রায় সাড়ে চৌদশত বছর পূর্বে অবতীর্ণ কোরানের সময় সম্পর্কিত বিভিন্ন আয়াতে সে সম্পর্কেই বারবার ইঙ্গিত করেছে।

সময়ের ধারণা সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল আমাদের উপলক্ষ্মি এবং এর মধ্যে তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে। উদাহরণস্বরূপ এই মুহূর্তে আপনি এই বইটি পড়ছেন। মনে করুন এই বইটি পড়ার পূর্বে আপনি রান্না ঘরে কিছু পানাহার করছিলেন। এই মুহূর্ত এবং কিছুক্ষণ আগের রান্নাঘরে অবস্থানের মধ্যে 'সময়' নামে একটি পর্যায়কাল (Period) অতিক্রান্ত হয়েছে। বাস্তবে, আপনার রান্নাঘরে অবস্থানের মুহূর্তটি আপনার স্মৃতিতে (memory) সংরক্ষিত একটি তথ্য (information) এবং এর সঙ্গে বর্তমান মুহূর্তের তুলনাকেই আমরা সময় বলি। আপনি যদি এই তুলনাটি না করেন তখন আর সময়ের ধারণাটি থাকবে না, শুধুমাত্র বর্তমান মুহূর্তটির অস্তিত্ব থাকবে। মন্তিকের স্মৃতিতে সংরক্ষিত খণ্ড খণ্ড তথ্যের সমন্বয় সাধনই সময়ের ধারণা দেয়। মানুষের যদি স্মৃতিশক্তি না থাকত তবে সে শুধু বর্তমান মুহূর্তটিকে নিয়ে টিকে থাকত। বিভিন্ন মুহূর্তগুলির মধ্যে মন্তিক তুলনা বা সমন্বয় সাধন করতে পারত না ফলে তার সময়ের কোনোরূপ ধারণাই থাকত না।

অতি সম্প্রতি সময় সম্পর্কে উপরের বিজ্ঞানভিত্তিক এই ধারণাটি সাড়ে চৌদশত বছর পূর্বের কোরানে উল্লেখিত হয়েছে।

- যেদিন তিনি তোমাদের আহ্বান করবেন (পুনরুত্থান দিন) এবং তোমরা প্রশংসার সাথে তাঁর আহ্বানে সাড়া দেবে এবং তোমরা মনে করবে- তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে। (১৭:৫২)।

মৃত্যুর পর মানুষের যেহেতু স্মৃতিশক্তি থাকবে না, যদিও মানুষের মৃত্যু বা পৃথিবীর জীবন বিলুপ্তির পর থেকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত কোটি কোটি বছর অতিবাহিত হয় তবুও তার অল্প সময়ের অবস্থানের কথাই মনে হবে।

আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের আগে আমাদের ধারণা ছিল 'সময়' একটি পরম রাশি এবং তা বস্তুর উপর নির্ভর করে না। পরবর্তীতে এই ধারণা ভিত্তিহীন হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। মহাবিশ্বে কোনো বস্তুই স্থির নয়। সব কিছুই ঘূরছে। তাই সব গতিই হচ্ছে আপেক্ষিক। একের তুলনায় অন্যের গতিবেগই হচ্ছে আপেক্ষিক গতি। কোনো বস্তুর নিজস্ব গতি বলে কিছু নেই। ঐ থেকেই তত্ত্বটার নাম আপেক্ষিকতাবাদ। বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু বলে কিছু নেই। কোনো কিছুই গতিহীন হতে পারে না। স্থান ও কাল পরম্পর সম্পূর্ণ। প্রতিটি বস্তু এই অপরিবর্তনীয় আইন মেনে চলে। সময় ধ্রংস হলে স্থানের অস্তিত্ব লোপ পায়। স্থান ধ্রংস হলে সময়ের ধারণা আর থাকে না। কেন এটা

এমন হয় তা কেউ জানে না ।

স্যার জেমস্ জীনস তাঁর বিখ্যাত 'The New Background of Science' এন্টে বলছেন:

"সঠিক সময় নির্ধারণ করতে হলে কোনো স্থানে কোনো একটি স্থির বস্তু চাই, কিন্তু প্রকৃতিতে সেরূপ কোনো বস্তু নেই । এজন্যই আইনষ্টাইন মনে করেন যে, সমস্ত টাইমই লোকাল, বিশ্ব-ভূবনে যত গ্রহ-নক্ষত্র আছে, তত লোকাল টাইম আছে, তাদের কোনোটাই কোনোটা হতে অধিক মৌলিক নয় ।"

আবার জে ডগলার্ড এন সুল্যাইভান তাঁর Limitations of Science এন্টে উল্লেখ করেন- "আমরা স্থান ও কালের মধ্যে যে পার্থক্য করি, প্রকৃতি সে সম্বন্ধে কিছুই জানে না বলে মনে হয় । এই পার্থক্য আমাদের মনেরই এক অভুত খেয়াল বিশেষ । স্থান বা কাল সম্বন্ধে ক্রুব কিছুই নেই ।"

আইনষ্টাইনের মতে স্থান ও কালকে স্বতন্ত্র করে দেখা ভুল । প্রকৃতপক্ষে 'স্থান' ও 'কাল' বলে কোনো দুটি আলাদা জিনিস নেই; যদি থাকে তবে তা ঢালাই করা একটা অবিভাজ্য জিনিস যাকে আমরা একসঙ্গে স্থানকাল (Spacetime) বলতে পারি ।

আপেক্ষিক গতির বৃক্ষির সঙ্গে সময়ের ক্রমশ হ্রাস পাবে । এতদিন ধরে আমরা জানতাম 'কাল' যেন একটি প্রবাহমান নদী যার গতি অপরিবর্তনশীল । যে মুহূর্তটি অতিক্রান্ত তাকে আর কিছুতে ফিরিয়ে আনা যাবে না । আইনষ্টাইন এই ধারণাটার মূলেই কুঠারাঘাত করলেন । আর্দ্রা নক্ষত্র পৃথিবী থেকে প্রায় ৩০০ আলোকবর্ষ দূরে । [প্রতি সেকেন্ডে আলো ১ লাখ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে চলতে চলতে ১ বছরে (৩৬৫ দিন \times ২৪ \times ৬০ \times ৬০) যত দূর যাবে (50.88×10^{12} মাইল) ততটুকু দূরত্বকে ১ আলোকবর্ষ বলে]। সেখানে বসে যদি কোনো দর্শক আজ এই মুহূর্তে ঢাকা শহরকে দেখতে পায় তবে সে দেখতে পাবে নবাব শায়েস্তা খানকে । কারণ ঐ সময় পৃথিবী থেকে যে আলোকরশ্মি রওয়ানা হয়েছিল আজই তো তা আর্দ্রা নক্ষত্রে পৌছালো । আর্দ্রা নক্ষত্রের বদলে দর্শকটি যদি থাকে এন্ড্রোমিডা গ্যালাক্সিতে তাহলে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে সে কোনো 'মানুষ'কে দেখতে পাবে না-মানুষ তখনও আসেনি পৃথিবীতে । দেখতে পাবে ম্যামথ আর স্যাবর টুথেড খড়গ দন্ত বাঘদের ।

আধুনিক space science সময়ের আপেক্ষিকতাকে আরও সহজবোধ্য করে তুলেছে । দ্রুতগতিশীল রকেট আরোহীর সময়জ্ঞান এবং একজন পৃথিবীবাসীর সময়জ্ঞান এক নয় । কোনো রকেট আরোহী যদি আলোর গতির কাছাকাছি কোনো রকেটে পৃথিবী থেকে মহাশূন্যে রওয়ানা হয় এবং সর্বদা একই গতিবেগে চলে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে তবে মহাশূন্যে যাতায়াত-এই সময়টা যদি রকেট আরোহীর নিকট একমাস হয় তবে পৃথিবীবাসীর কাছে তা হবে প্রায় ৭০ বছর । যেহেতু রকেটের গতিবেগ ছিল আলোর গতির কাছাকাছি তাই নভোচারীর ঘড়ি পৃথিবীর ঘড়ির তুলনায় অনেক ধীর গতিতে চলেছে ।

অভিকর্ষ ক্ষেত্র যদি খুব শক্তিশালী হয় তাহলে অস্তুত সব ঘটনা ঘটতে থাকবে। কোনো তারকা ধ্রংস হয়ে গেলে পরে যখন ব্ল্যাকহোলে পরিণত হয় তখন এর ভিতর থেকে আলো পর্যন্ত বের হয়ে আসতে পারে না। স্থান-কাল (space time) কাঠামো থেকে কোনো পর্যবেক্ষকের নিকট যদি ব্ল্যাকহোলের উৎসের তারাটির কেন্দ্র থেকে দশ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের (critical radius) মধ্যে কোনো বস্তুকে পতিত হতে দেখে তবে তার কাছে এই সময়টি হবে অসীম, অর্ধাং মনে হবে, পতনটি থেমে আছে অপরদিকে পতনশীল বস্তুটির নিজের কাছে সময় লাগবে সামান্য মুহূর্ত মাত্র বা সসীম (হতে পারে এক সেকেন্ডের এক মিলিয়ন ভাগের ১০ থেকে ১০০ ভাগ মাত্র)

আজ বিজ্ঞানভিত্তিক সর্বসম্মতভাবে গৃহীত সময় হলো পরিবর্তনশীল গতির মধ্যে সুনির্দিষ্ট ধারাবাহিকতার ব্যবস্থাপনা। সুবিখ্যাত পদার্থবিদ জুলিয়ান বার বোরের মতে সময়ের অবাধ বা অসীম absolute ধারণাটিই মিথ্যা। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণা এটাকে সুনিশ্চিত করে।

মহাবিজ্ঞানী আলবার্ট আইনষ্টাইন General Theory of relativity এচ্ছে সময় একটি উপলক্ষ হিসাবে প্রমাণ করেছেন। আইনষ্টাইন অসীম স্থানের মতোই অসীম সময় অর্ধাং অবিচল, অপরবিত্তনীয়, অপ্রতিহত মহাজাগতিক সময়ের অসীম অতীত থেকে অসীম ভবিষ্যতে প্রবাহমান সময়ের ধারণাকে পরিত্যাগ করেন। আমরা সময়ের অনুভূতিকে রঙের অনুভূতির মতোই একই ধরনের উপলক্ষ তা স্বীকার করতে চাই না ফলে আপেক্ষিক তত্ত্বে যথেষ্ট অস্পষ্টতা সৃষ্টি হয়েছে। স্থান যেমন বস্তুগত পদাৰ্থে পরিপূর্ণ, সময় তেমনি কতকগুলি ঘটনায় পরিপূর্ণ। আইনষ্টাইনের নিজের ভাষায় সময় হলো— “একজন ব্যক্তির অভিজ্ঞতা কতকগুলি সুবিন্যস্ত ধারাবাহিক ঘটনাসমূহকে সামনে হাজির হয়। এই ঘনটাগুলির মধ্যে পর্যায়ক্রমে কোনো একটি আমাদের শৃতিতে জেগে উঠে ঘটনার ধারাবাহিকতায় আগে এবং পরে সূতরাং ব্যক্তির জন্য এটি একটি বিষয়ভিত্তিক সময়। এটা পরিমাপ করা যায় না। ঘটনাগুলিকে এক একটি সংখ্যার সঙ্গে সংযুক্ত করলে আগের ঘটনাটির তুলনায় পরের ঘটনাটি হবে বড় সংখ্যার সঙ্গে সম্পর্কিত।”

আইনষ্টাইনের উপরোক্ত কথা থেকে আমরা বুঝতে পারি সময়ের সামনের দিকে চলার ধারণাটি সম্পূর্ণ শর্ত সাপেক্ষ। আইনষ্টাইন সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বে বিজ্ঞানভিত্তিক দেখান যে, “সময় পরিবর্তনের হার বস্তুর গতি এবং মহাকর্ষ ভরের কেন্দ্র (center of gravity) থেকে এর দূরত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত। যদি গতি বৃদ্ধি পায়, সময় হ্রাস পায়, সংকোচিত হয়, ধীরে চলে এবং মনে হবে জড়তায় (point of inertia) ধারমান।”

সময়ের আপেক্ষিকতা নিয়তির (Fate) বাস্তবতা ব্যাখ্যা করে

উপরের আলোচনায় সময়ের আপেক্ষিকতায় আমরা জানতে পারলাম সময়ের কোনো সুনির্দিষ্ট ধারণা নেই, তবে এর বিভিন্নতা বা বৈসাদৃশ্য উপলক্ষির উপর নির্ভরশীল। উদাহরণস্বরূপ কোনো একটি কাল আমাদের কাছে কোটি কোটি বছর সুদীর্ঘ সময় বলে মনে হতে পারে অথচ সেই একই কাল সৃষ্টিকর্তার নিকট একটি মুহূর্ত মাত্র। কোরানের ভাষায় আমাদের ধারণার পদ্ধতি হাজার বছরের একটি পর্যায়কাল জিবরাইল (আ:) এবং ফেরশতাদের নিকট মাত্র একদিনের সমতুল্য। নিয়তি সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে এই বাস্তবতাটি অত্যন্ত জরুরি।

নিয়তি হচ্ছে এমন একটি লক্ষ্য যা আল্লাহ একটি মাত্র মুহূর্তে প্রত্যেকটি ঘটনা-অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত সৃষ্টি করেছেন। এর অর্থ হলো মহাবিশ্ব সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে মহাধ্বংস পর্যন্ত প্রত্যেকটি ঘটনা আল্লাহর দৃষ্টিতে ঘটে বিলুপ্ত হয়েছে। অধিকাংশ লোকই নিয়তির বাস্তবতা উপলক্ষি করতে পারে না। তারা বুঝতে পারে না কী করে আল্লাহ যা এখনও ঘটে নাই তা জানে অথবা কেমন করে আল্লাহর দৃষ্টিতে অতীত বা ভবিষ্যতে ঘটা ঘটনাগুলি ঘটে গেছে। আমাদের দৃষ্টিতে যা কিছু এখনও সংঘটিত হয়নি, সে সমস্ত ঘটনা আমাদের মনে উদিত হয় না। এর কারণ হলো আমাদের জীবন ব্যবস্থা আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্টি এক সময়ের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং আমাদের স্মৃতিতে তথ্য না থাকলে আমরা সে সম্পর্কে কোনো কিছুই জানতে পারব না। আমরা পৃথিবীতে এমন এক পরীক্ষামূলক স্থানে অবস্থান করছি যেখানে আল্লাহ আমাদের স্মৃতিতে ভবিষ্যত ঘটনাবলি ধারণ করার ক্ষমতা দেন নি। ফলে ভবিষ্যতে কী ঘটবে তা আমরা জানি না। কিন্তু আল্লাহ সময় অথবা স্থান থেকে মুক্ত। তিনিই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ— যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন একেবারে অস্তিত্বাত্মক থেকে। এ কারণেই আল্লাহর নিকট অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত সবকিছুই এক। তাঁর দৃষ্টিতে সবকিছুই ইতিমধ্যে ঘটে গেছে, ফলাফল দেখার জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। কোনো এক মুহূর্তেই তাঁর দৃষ্টিতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা ঘটে গেছে। অধিকন্তু আল্লাহর জন্য অতীতকে স্মরণ করার মতো কোনো কিছু নেই, অতীত এবং ভবিষ্যত সব সময় আল্লাহর কাছে সামনে উপস্থিত। সবকিছুর অস্তিত্ব তার কাছে একই মুহূর্তে বর্তমান।

আমরা যদি আমাদের জীবনটাকে একটা ফিলোর মতো মনে করি তবে তা স্বাভাবিক গতিতে ভিড়িও ক্যাসেটে পরিদর্শনের মতো মনে হবে। কিন্তু আল্লাহ তার দৃষ্টিতে সমস্ত ফিল্মটি এক মুহূর্তে একই সময়ে দেখে থাকেন। তিনিই এটি সৃষ্টি করেন এবং নির্ভুলভাবে সবকিছু নির্ধারণ করেন। আমরা যেমন দৈর্ঘ্যমাপক রুলারের (অর্ধমিটার) শুরু, মধ্যভাগ এবং শেষ অংশ একই মুহূর্তে দেখতে পারি। সুতরাং আল্লাহ আমাদের মহাবিশ্বটি যে সময়ের জন্য নির্ধারিত তার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবটাই এক মুহূর্তেই পরিবেষ্টন করে আছেন। আমরা অবশ্য আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্টি নিয়তির যখন কোনো ঘটনা ঘটার সময় আসে কেবলমাত্র তখনই তা জানতে পারি। এভাবেই পৃথিবীতে আমাদের তথ্য সবকিছুর নিয়তি নির্ধারিত।

পৃথিবীতে ইতিমধ্যেই সৃষ্টি প্রতিটি জীবন এবং ভবিষ্যতে যা সৃষ্টি হবে প্রত্যেকটির পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা আল্লাহর দৃষ্টিতে উপস্থিত। আল্লাহর অনন্ত অসীম শৃঙ্খিতে সমস্ত মানবজাতির নিয়তির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি জীব, জড়, গ্রহ, নক্ষত্র, উদ্ধিদ, প্রতিটি দৃশ্য ও অদৃশ্য বস্তুর নিয়তি লেখা আছে এবং তা থাকবে চিরদিন। নিয়তির বাস্তবতা আল্লাহর একটি অনন্ত মহত্ত্ব, ক্ষমতা ও শক্তির প্রকাশ মাত্র। এই জন্যই আল্লাহর অপর নাম সংরক্ষক (আল হাফিজ)।

-তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে, আমি তাদের জানি এবং তোমাদের পরে যারা আসবে তাদেরও জানি। (১৫:২৪)

মোটকথা এ যাবৎকাল সময় সম্বন্ধে আমরা যে ধারণা পোষণ করে এসেছি সেটাই ভাস্ত। 'কাল' কোনো একমুখ্য সমগ্রিতে নিরবিচ্ছিন্ন ধারা প্রবাহমান স্রোতের মতো নয়। 'কাল' হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একটি অঙ্গ, যার অপর অঙ্গ হচ্ছে 'স্থান'। স্থান ও কাল অঙ্গাঙ্গভাবে যুক্ত- একে অপরের উপর নির্ভরশীল, একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত। সময়ের এই বিচিত্র কাহিনী মানুষের মাত্র একশত বৎসর পূর্বেও জানা ছিল না। কিন্তু প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বের আল কোরানের বিভিন্ন আয়াতে এ ধরনের সময়ের কথা বলা হয়েছে যা আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বের (থিয়োরী) সমর্থক।

কোরআন অনুবাদকারীগণের প্রায় সকলেই কোরআনে ব্যবহৃত 'ইয়াওম' শব্দের অর্থ দিবস ধরে নিয়েছেন, কারণ আরবী রীতিতে এই শব্দটির 'দিন' অর্থটাই অধিকতর প্রচলিত, কিন্তু কোরআনে 'ইয়াওম' শব্দের ব্যবহার এক অতি সূক্ষ্ম সময়মান হতে মাধ্যম সময় কিংবা অতি বৃহৎ সময় ইত্যাদি সকল দৈর্ঘ্যের কাল পর্যায়কে প্রকাশ করতে দেখা যায়। নিম্নে তার কতকগুলি আয়াতের উদাহরণ দেখুন।

১০:৪৫ আয়াতে- (সমস্ত মানুষের জীবন) 'একদিনের মুহূর্ত ব্যতীত অবস্থান করে নি।'

১০:৯২ আয়াতে- 'অতএব, আমি আজ তোমার দেহকে রক্ষা করলাম.....'

২৩:১১৩ আয়াতে- 'আমরা একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছিলাম'

৫৫:২৯ আয়াতে 'তিনি (আল্লাহ) সর্বকাজে প্রত্যহ (সর্বদাই) রাত'। এখানে 'ইয়াওম' একটি অল্প (সূক্ষ্ম) এবং মধ্যম সময়ের ধারণা দেওয়া হয়েছে। সেখানে আবার নিম্নোক্ত আয়াতে একটি দীর্ঘ সময়ের ধারণা দেওয়া হয়েছে।

২২:৪৭ আয়াতে- 'তোমার প্রতিপালকের একদিন তোমাদের গণনার সহস্র বছরের সমান'।

৩২:৫ আয়াতে- 'অতঃপর একদিন সমস্ত কিছুই তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে যেদিনের দৈর্ঘ্য হবে তোমাদের হিসাবে সহস্র বছরের সমান।'

৭০:৪ আয়াতে- 'এমন একদিনে ফেরেশতা এবং রহ (জীবন) আল্লাহর দিকে উর্ধ্বগামী হয়, যা পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।'

উল্লিখিত আয়াতসমূহ থেকে আমরা জানতে পারি যে, ছয় দিনে সৃষ্টি সমগ্র মহাবিশ্বের জন্য কোরান হতে যে 'ইয়াওম' শব্দটি পাওয়া যায় তা কোরআনের পরিভাষায় নির্দিষ্ট ও স্থির কোনো অর্থ প্রকাশ করে না। অতি সূক্ষ্ম সময় হতে শুরু করে অতিশয় প্রশস্ত যে কোনো সময়কাল এই 'ইয়াওম' শব্দের কোরআনিক অর্থ পরিধির আওতাভুক্ত। আল কোরআনে ছয় দিবসে নভোমঙ্গল ও ভূমঙ্গল (মহাবিশ্ব) সৃষ্টির কথা উল্লেখ আছে। - ৭:৫৪, ১০:৩, ১১:৭, ২৫:৫৯, ৩২:৪, ৫০:৩৮ ইত্যাদি আয়াতে।

জগৎ বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জেনেছেন বিগ-ব্যাংগের মুহূর্ত থেকে মহাবিশ্ব সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান গঠন এবং পরবর্তীতে গ্যালাক্সি, গ্রহ, নক্ষত্রের গঠনের পূর্বে সময়ের যে ধারা ছিল, বর্তমানে আমরা যে নিয়মরীতি অনুসারে সময় গণনা করি তা সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ছিল। এ তথ্যটি বিজ্ঞানীরা অতিসম্প্রতি আবিষ্কার করেছেন।

সৃষ্টিলগ্নের পূর্বে যখন কোনো স্থানের অস্তিত্ব ছিল না তখন সময়েরও কোনো অস্তিত্ব ছিল না। সৃষ্টিলগ্নের মুহূর্ত থেকেই স্থান ও কালের (সময়ের) যুগপৎ জন্ম হয়। যেহেতু বিক্ষেপণের পর থেকে মহাবিশ্বের সূচনালগ্ন থেকেই স্থান-কাল (space time) অভিকর্ষ (gravity) বল এবং সম্প্রসারণের গতির (speed) মাত্রা বিভিন্নরূপ ছিল সেহেতু সময় বা কালের বিভিন্নতা হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে স্থান-কালের জালে (space time web) সৃষ্টিলগ্ন থেকেই মহাবিশ্বে সময়ের মাত্রাটি (time dimension) সঠিক ব্রহ্মপ একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই তালো জানেন।

সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি, আল কোরআনের সিন্তাতি আইয়াম বা ছয় দিবস মূলতঃ ছয়টি পর্যায়কালের ধারণাকে বুঝতে নির্দেশ দেয়- যার ব্যাপ্তিকাল অতি সূক্ষ্ম সময় হতে অতি বৃহৎ সময় পর্যন্ত যে কোনোটিই হতে পারে।

অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ যেমন বাইবেল, তওরাত, জরাস্টেরিয়ান, প্রাচীন মিসরীয় ধর্মগ্রন্থ 'বুক অব দেড' ইত্যাদিতেও মহাবিশ্ব সৃষ্টির জন্য ছয় দিনের উল্লেখ আছে।

চ) মহাবিক্ষেপণের ফলে সৃষ্টি মহাবিশ্বের সাম্যাবস্থা (EQUILIBRIUM) এবং পরিমাণমিতি

বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বে এ পর্যন্ত দশ হাজার কোটিরও বেশি গ্যালাক্সির সংক্ষান পেয়েছেন। আবার প্রত্যেকটি গ্যালাক্সি অনুরূপ সংখ্যক ছোট, বড় ও মাঝারি বিভিন্ন আকৃতির তারকা ধারণ করে। শামাদের সৌরজগতের সূর্য এমনি একটি তারকা যার নয়টি প্রধান গ্রহ (বিজ্ঞানীরা আরও ২টি থাহের অস্তিত্বের সম্ভাবনার কথা বলছেন যা কোরানের ১২:৪ আয়াতের সমর্থক) সূর্যের চারপাশে নিজ নিজ কক্ষে আবর্তন করছে। আমরা সূর্য থেকে তিন নাম্বার গ্রহে বাস করছি।

বিগ-ব্যাংগের বিক্ষেপণের ফলে সৃষ্টি বিভিন্ন পদাৰ্থ মহাবিশ্বে বিভিন্ন গ্যালাক্সিতে সূক্ষ্ম, নিপুণ এবং সুসংগঠিতভাবে সাজান আছে যা একজন সৃষ্টিকর্তার কারুকার্যতার নিপুণ দক্ষতার কথাই মনে করে দেয়। এর ফলে মহাবিশ্বে সৃষ্টি বিভিন্ন গ্যালাক্সি, তারকা, গ্রহ, উপগ্রহসহ অসংখ্য জানা-অজানা বস্তুর সমারোহ বিশ্বয়কর চিত্রের সংক্ষান দেয়। মহাবিশ্বে সৃষ্টি যাবতীয় বস্তুর মধ্যে বিশ্বয়কর

সাম্যাবস্থার বর্ণনা দেখলে সত্যই চমৎকৃত হতে হয়।

বিক্ষেপণের গতি (Acceleration)

যে মুহূর্তে বিক্ষেপণ সংঘটিত হয় তখন থেকে ভীষণ বেগে পদার্থ চারিদিকে ছুটে চলে। এখানে আর একটি দিক লক্ষণীয়— বিক্ষেপণের পূর্বক্ষণে সেখানে অবশ্যই একটা বিশাল আকর্ষণীয় শক্তি ছিল যা মহাবিশ্বকে একটি মাত্র বিন্দুতে ধরে রেখেছিল। এখানে দুটি বিপরীতমুখী শক্তি কাজ করে। বিক্ষেপণের শক্তি যা পদার্থকে বাহিরমুখী টেনে নিতে চায় অন্য দিকে আকর্ষণীয় শক্তি সবকিছুকে ধরে রাখতে চায় এক বিন্দুতে। মহাবিশ্বের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে এই দুই শক্তির সাম্যাবস্থার ফলে। যদি আকর্ষণীয় শক্তি বিক্ষেপণের শক্তির চেয়ে বেশি হতো তাহলে মহাবিশ্ব ধ্রংস হয়ে যেত। আর যদি বিপরীত শক্তি বেশি হতো তবে পদার্থবিভিন্ন দিকে এমনভাবে ছড়ায়ে-ছিটিয়ে যেত যা কোনোভাবেই একত্রিত হতো না।

এই দুই শক্তির সাম্যাবস্থা কতটা ছিল?

অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডেলাইড (Adelaide) বিশ্ববিদ্যালয়ের গাণিতিক পদার্থবিদ প্রফেসর পাওয়েল ডেভিস এক দীর্ঘ হিসাবের মাধ্যমে বিক্ষেপণের মুহূর্তে উপরোক্ত দুই শক্তির যে সাম্যাবস্থার ফলাফল দেখিয়েছেন তা সত্যই বিশ্বয়কর। এবার তাঁর ভাষায় এ ব্যাপারে মন্তব্যটি লক্ষ্য করুন :

“এই সম্প্রসারণের মাত্রা (rate of expansion) অতি সর্কর্তার সাথে একটা নির্দিষ্ট ক্রান্তীয়মান (critical value) নির্ধারণ করা ছিল। যার ফলে এই মহাবিশ্ব কেবলমাত্র নিজস্ব মাধ্যাকর্ষণ শক্তি থেকে মুক্ত হবে এবং চিরকাল সম্প্রসারিত হবে। সামান্য ধীর গতি মহাবিশ্বের ধ্রংস এবং সামান্য দ্রুত গতি সমস্ত কসমিক পদার্থ অনেক আগেই বিক্ষিণ্ণ হয়ে যেত। ভাবতে সত্যিই অবাক লাগে কত সূক্ষ্মভাবে এই দুই শক্তির বিভক্তিকরণ অংশে সম্প্রসারণের মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল। যদি এই সম্প্রসারণের মাত্রার সময় প্রকৃত মাত্রার (value) থেকে মাত্র 10^{-18} সেকেন্ড পার্থক্য হতো তবে তা যথেষ্ট হবে এই সূক্ষ্ম সমতা বিনষ্ট করতে। এই মহাবিশ্বের বৃহৎ বিক্ষেপণের আকর্ষণীয় (gravitating power) শক্তির সঙ্গে অবিশ্বাস্যরকম সঠিক মাত্রায় মিলে যায়। বিগ-ব্যাংগ কোনো সাধারণ ঘটনা নয় বরং এই বিক্ষেপণ বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে অতি সুন্দর পরিকল্পনায় আয়োজিত ঘটনা।”

বিলিম টেকনিক (Bilim teknik) (একটি তুকী বৈজ্ঞানিক সাময়িকী) এ- প্রকাশিত একটি বৈজ্ঞানিক রচনায় মহাবিশ্বের প্রাথমিক ধাপে সাম্যাবস্থার কথা উল্লেখ করে।

“যদি মহাবিশ্বের ঘনত্ব সামান্যতম বেশি হতো সে ক্ষেত্রে আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব অনুসারে মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হতো না। পারমাণবিক কণাগুলি আকর্ষণীয় শক্তির ফলে বরং তা সংকোচিত হয়ে শেষ পর্যন্ত একটি বিন্দুতে মিলিয়ে যেত। আবার পক্ষান্তরে যদি ঘনত্ব সামান্যতম কম হতো তবে মহাবিশ্ব খুব দ্রুত সম্প্রসারিত হতো এবং এক্ষেত্রে পারমাণবিক কণাগুলি পরস্পরকে আকর্ষণ করত না। ফলে কোনো তারকা বা গ্যালাক্সির সৃষ্টি হতো না। ফলশ্রুতিতে

আমাদের মতো মানুষ নামের কোনো জীব সৃষ্টি হতো না। হিসেব অনুসারে মহাবিশ্বের প্রাথমিক প্রকৃত ঘনত্বের পার্থক্য যদি এর ক্রান্তিক মানের চেয়ে 10^{-15} (quadrillion) ভাগের এক শতাংশ হতো তারপরও এই বিপন্নি দেখা যেত। এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে মহাবিশ্ব যেহেতু সম্প্রসারিত এই সমতা আরও সূক্ষ্ম (delicate) হতো।”

টিফেন হকিং তাঁর বিখ্যাত ‘কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস’ এছে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের হারের অস্বাভাবিক সাম্যাবস্থার কথা স্বীকার করেছেন।

“বিগ-ব্যাংগের এক সেকেন্ড পর থেকে সম্প্রসারণের হার যদি এক ভাগের একশত হাজার মিলিয়ন মিলিয়ন ভাগ কম হতো, তবে এই মহাবিশ্ব বর্তমান অবস্থায় আসার অনেক পূর্বেই ভেঙে (ধ্রংস) যেত।”

চারটি মৌলিক বল :

বিক্ষেপণের পরপরই একবারে সূক্ষ্ম সঠিক মাত্রায় চারটি মৌলিক বল আমরা যে মহাবিশ্বে বাস করছি তাকে সুসংগঠিত করে অন্যথায় কোনো মহাবিশ্বের অস্তিত্ব থাকত না। এই বলগুলি ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। এখন আমরা এই বল চারটির সাম্যাবস্থা ক্রিপ্ট তা দেখব।

চারটি বলের তুলনামূলক সংখ্যাত্ত্ব মাত্রা একটি অপরটি থেকে বিপ্লবিকরণপে আলাদা। নিম্নে তা ইন্টারন্যাশনাল স্টার্টার্ড ইউনিট (ISU) অনুসারে বর্ণিত হলো।

শক্তিশালী কেন্দ্রীয় বল	10^{-15}
দূর্বল কেন্দ্রীয় বল	9.03×10^{-3}
বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বল	3.05×10^{-12}
মহাকর্ষীয় বল	5.90×10^{-39}

লক্ষ্য করুন এই চারটি প্রাথমিক বলের একের অপর থেকে তাদের শক্তির মাত্রার পার্থক্য কত বিশাল। সবচেয়ে শক্তিশালী (শক্তিশালী কেন্দ্রীয় বল) এবং সবচেয়ে দূর্বল (মহাকর্ষীয় বল) এর মধ্যে পার্থক্য প্রায় 25 এর পরে 38 টি শূন্য। স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন জাগে এটা কেন এমন হবে?

এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এন্ড্রু স্কুজীবিদ (মলিকুল্যার বায়োলজিস্ট) মাইকেল ডেনটন তাঁর নেচার ডেসটেনী (Nature's Destiny) এছে।

“উদাহরণস্বরূপ যদি মহাকর্ষীয় বল ট্রিলিয়নগুণ (অর্থাৎ 10^{-12} গুণ) বেশি হতো তবে মহাবিশ্ব খুব ছোট এবং এর স্থায়ীত্ব হতো খুব অল্প। অধিকাংশ (গড়) তারকার ওজন হতো সূর্যের চেয়ে ট্রিলিয়ন গুণ কম। জীবনকাল থাকত মাত্র এক বৎসর। আবার বিপরীত পক্ষে মহাকর্ষীয় বল যদি কম শক্তিশালী হতো তবে কোনো তারকা অথবা গ্যালাক্সির জন্মাই হতো না। অন্যান্য বলের মান ও পারম্পরিক সম্পর্কগুলি কম ক্রান্তিক নয়। যদি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় বল সামান্যতম দূর্বল

হতো তবে কেবলমাত্র মৌলিক পদাৰ্থ হাইড্রোজেন স্থায়ী হতো। অন্য কোন মৌলিক পদাৰ্থের পৱনমাণুৰ অস্তিত্ব থাকত না। আবার এই বল যদি বিদ্যুৎ চূষকীয় বল অপেক্ষা সামান্যতম বেশি শক্তিশালী হতো তবে পৱনমাণুৰ কেন্দ্ৰক (nucleous) গঠিত হতো কেবলমাত্র ২টি প্ৰোটন দ্বাৰা যা মহাবিশ্বের সৃষ্টি হতো না। যদিও কোনো তাৰকাপুঁজ বা গ্যালাক্সিৰ উজ্জ্বল (সৃষ্টি) হলো তবে তা হতো সম্পূৰ্ণ অন্য রকম। যদি উপরোক্ত বলগুলি এবং ধ্রুবকেৱ (constant) মান সূক্ষ্ম সঠিক মাত্ৰায় না হতো তবে কোনো তাৰকাপুঁজ, সুপাৰনোভা, ইহ, পৱনমাণু বা জীবনেৰ সৃষ্টি হতো না।”

পাওয়েল ডেভিস মন্তব্য কৱেছেন পদাৰ্থবিজ্ঞানেৰ ধাৰা বা প্ৰাকৃতিক আইনগুলি কেমন সুন্দৰভাৱে মানব জীবন ধাৰণেৰ জন্য উপযোগী কৱা হয়েছে-

“যদি প্ৰকৃতি (Nature) সামান্যতম ভিন্নধৰনেৰ সংখ্যা নিৰ্ধাৰণ কৱত তবে এই পৃথিবী সম্পূৰ্ণ অন্য জায়গা হয়ে যেত। খুব সম্ভব আমোৱা তা দেখাৰ জন্য উপস্থিত থাকতাম না... সাম্পৰ্কিক মহাবিশ্বেৰ প্ৰাথমিক সৃষ্টিৰ আবিষ্কাৰ আমোৱা জানতে পাৰি সম্প্ৰসাৰণশীল মহাবিশ্বেৰ গতিকে বিশ্বয়কৰ সূক্ষ্মতায় এবং সঠিক মাত্ৰায় নিৰ্ধাৰণ কৱা হয়েছে।”

আৱনো পেনজিয়াস এবং রবার্ট উইলসন (মহাবিশ্বেৰ প্ৰথম কসমিক ৱাক গ্ৰাউন্ড রেডিয়েশন আবিষ্কাৰকাৰী এবং নোবেল পুৰস্কাৰ বিজয়ী) এই মহাবিশ্বেৰ সৃষ্টিৰ জন্য চমৎকাৰ পৱিকল্পনাৰ উপৰ নিম্নোক্ত মন্তব্য কৱেন।

“জ্যোতিৰ্বিজ্ঞান আমাদেৱকে এক অপূৰ্ব যোগসূত্ৰেৰ সন্ধান দেয়— এই মহাবিশ্বেৰ সৃষ্টি হয়েছে শূন্য থেকে যেখানে সূক্ষ্ম ভাৱসাম্যতাৰ ফলে জীবনধাৰণেৰ জন্য সঠিক প্ৰয়োজনীয় পৱিবেশেৰ সৃষ্টি হয় এবং যাৰ পেছনে একটা পৱিকল্পনা আছে।”

উপৰে বৰ্ণিত বিভিন্ন বিজ্ঞানীদেৱ মহাবিশ্ব সৃষ্টিৰ উপৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৱেন। মহাবিশ্ব সৃষ্টিতে যে অবিশ্বাস্য ভাৱসাম্য সুসংগঠন এবং সুনিপুণ পৱিকল্পনাৰ কথা গভীৰভাৱে চিন্তা এবং বিচাৰ বিশ্লেষণ কৱলৈ একজন সৃষ্টিকৰ্তাৰ কথা অবশ্যই মনে পড়বে। নিঃসন্দেহে সঠিক ভাৱসাম্য যা সাম্যাবস্থায় সুসংগঠিত, সুনিপুণ পৱিকল্পনায় সৃষ্টি মহাবিশ্বেৰ একমাত্ৰ কাৰিগৱ হচ্ছে সৃষ্টিকৰ্তা ‘আল্লাহ’— যিনি সবকিছু নিৰ্ভুলভাৱে সৃষ্টি কৱেছেন।

- “ওৱা কি নিজেদেৱ মধ্যে অনুধাৰণ কৱে না যে, আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এৱ মধ্যবতী বস্তুসমূহ সৃষ্টি কৱেছেন যথাযথ পৱিমাপে সঠিক অনুপাতে এক নিৰ্দিষ্ট সময়েৰ জন্য”।
(৩০:৮)

- “তিনি সুপৱিকল্পিতভাৱে আসমান ও জমিন সৃষ্টি কৱেছেন (মহাবিশ্ব)।” (৩৯:৫)
- “তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি কৱেছেন এবং প্ৰত্যেককে যথোচিত প্ৰকৃতি বা পৱিমাপ দান কৱেছেন।”
(২৫:২)
- “সেই সম্ভাবনাৰ মহাবিশ্ব (আকাশসমূহ) সৃষ্টি কৱেছেন সঠিক সমতায়।” (৬:৭৩)

- “যিনি সমস্ত কিছুকে করেছেন সুষম (সুসংহত)” (২৭:৮৮)
- “আল্লাহর বিধানে (তাঁর নিকট) প্রত্যেক বস্তুর জন্য নির্ধারিত রয়েছে একটি নির্দিষ্ট আনুপাতিক পরিমাণ।” (১৩:৮)

ছ) মহাবিশ্ব সৃষ্টির জন্য আদেশ প্রদান ও মহাপরিকল্পনা

ঞিফেন হকিং তাঁর বিখ্যাত ‘কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস’ গ্রন্থে মহাবিশ্বের উৎপত্তি ও পরিণতি অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন “অন্তত পক্ষে বৃহৎ বিক্ষেপণের এক সেকেন্ড পর পর্যন্ত আমাদের চিরাটি যে নির্ভুল সে বিষয়ে আমাদের মোটামুটি বিশ্বাস রয়েছে।”

শূন্য সময়ে মহাবিক্ষেপণের পর শূন্য আয়তন থেকে অসীম উভাপ নিয়ে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ হতে শুরু করে। মহাবিক্ষেপণের এক সেকেন্ড পর থেকে বর্তমান মহাবিশ্বের অবস্থা পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা মোটামুটিভাবে ভালোভাবেই জ্ঞাত। কিন্তু মহাবিক্ষেপণের পূর্ব মুহূর্ত অর্থাৎ শূন্য সময়ে শূন্য আয়তনে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির জন্য কোনো এক বিন্দুতে অসীম শক্তির সমাবেশ এবং পরবর্তীতে নির্মুক্তভাবে সৃষ্টি মহাবিশ্বের মহাপরিকল্পনা কিভাবে ঘটেছিল তা আজও বিজ্ঞানীরা জানে না। এই অধ্যায়ে আল-কোরানে এবং হাদীসে উপরের প্রশ্নগুলির উত্তর আছে কিনা তা যাচাই করে দেখব। তবে তার আগে আবার কিছু বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে ফিরে আসি।

এডুয়ার্ড ফ্রেডকিন একজন বিখ্যাত কম্পিউটার বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞ। তিনি digital physics -এ এক গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব (Theory) দেন। তাঁর মতে পরমাণু তার বিভিন্ন উপমৌলকণায় (sub-atomic particle) বিভাজন করলে যে সর্বশেষ মৌলিক অস্তিত্বের সঙ্কান জুটিবে তা হলো তথ্য কণা। এই তত্ত্বানুসারে একটি ইলেকট্রন একটি তথ্য-বিন্যাস (Pattern of information) ছাড়া অন্য কিছু নয়। ইনফরমেশন বিটগুলি যে কল্পিগারেশন বা বিন্যাসে নিয়োজিত রয়েছে কেবল তার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। অন্য কথায় বিট-বিন্যাস পদ্ধতিকে কখনো ইলেকট্রন বলি কিংবা কখনো বলি হাইড্রোজেন পরমাণু কিংবা অন্য সবকিছু যা নিয়ে সমগ্র মহাবিশ্ব গঠিত।

পদার্থবিদরা যেখানে বলছেন শক্তি পদার্থে এবং পদার্থ শক্তিতে ক্লপাস্তরিত হয়ে সমগ্র মহাবিশ্বের সবকিছু গঠিত, সেখানে ফ্রেডকিনের মতে প্রতিটি শক্তি বা পদার্থের পিছনে মৌলিক বা মূখ্য চালিকা হলো তথ্য (information)। অন্য কথায় আমরা যখন কোনো বস্তুকে দেখি তা মূলত অসংখ্য তথ্যের জমাটবন্ধ রপ ছাড়া আর অন্য কিছু নয়। এই তথ্যকণাগুলি পদার্থ বা শক্তিতে কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট ধারাবাহকভাবে কোনো এক সুনির্দিষ্ট ফলাফলের জন্য দেয়। এ সমস্ত কোনো এক অলৌকিক শক্তি বা যন্ত্রের মতো কোনো কিছু দিয়ে অদৃশ্য কোনো স্থান থেকে সৃষ্টিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। তবে বিজ্ঞানীরা এখনও জানে না এই অলৌকিক শক্তি বা যন্ত্রটি কোথা থেকে কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।

আধুনিক জগতে কম্পিউটারের ব্যবহার ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে। কম্পিউটারের যাবতীয় কার্যক্রম তথ্যকণার বিভিন্ন রূপ বিন্যাসের মাধ্যমেই ঘটে থাকে। আর এই তথ্যগুলিকে কার্যক্রম করতে প্রয়োজন হয় একটি ‘আদেশ’ (command)। এই অলঝনীয় আদেশের ফলেই

কম্পিউটারের যে কোনো সিটেম সচল হয়।

আজ থেকে দেড় দুই হাজার কোটি বছর পূর্বে মহাবিশ্বটি সৃষ্টির জন্য যে বিগ-ব্যাং সংগঠিত হয়েছিল তাতে দেখা যায় কোনো এক শূন্য সময়ে, শূন্য স্থানে অসীম শক্তির ঘনায়ন ঘটিয়ে এই মহাবিশ্বেরণটি ঘটান হয়। এই মহাবিশ্বটি একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পদার্থ, শক্তি, এর সম্প্রসারণের গতি, ঘনত্ব এবং এমনি অন্যান্য অসংখ্য উপাদান (factors) অতি সূক্ষ্মমাত্রায় নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য অবশ্যই প্রথমে একটি মহাপরিকল্পনা এবং একটি আদেশের প্রয়োজন হয়। এই মহাপরিকল্পনাটি অসীম বিজ্ঞার শক্তিময় তথ্য ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই মহাপরিকল্পনা এবং আদেশের প্রয়োজনীয়তার কথা বিজ্ঞান কোনোক্রমেই অঙ্গীকার করতে পারে না। সর্বশক্তিমান মহাবিজ্ঞানী, সর্বজ্ঞনী, প্রবল শক্তিশালী, মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাকুবুল আলামীনই যে এই মহাপরিকল্পনা এবং আদেশ প্রদানকারী তা আজ বিজ্ঞান কোনো ক্রমেই অঙ্গীকার করতে পারে না। ১৯৯৮ সালের ২৭শে জুলাই এর Newsweek সাময়িকীর প্রচ্ছদ বিবরণীতে (cover story) তাই প্রকাশিত হয়েছে 'SCIENCE FINDS GOD.'

বিগ ব্যাং সংগঠনের দ্বিতীয় পর্যায়কালে (10^{-35} সেকেন্ড থেকে 10^{-32} সে. পর্যন্ত) অর্থাৎ অতি ক্ষীতিকালে (inflationary epoch) এই অতিক্রম ক্ষণটিতে আমাদের মহাবিশ্বের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় সমস্ত পদার্থ ও শক্তির সৃষ্টি হয়।

উপরের এই তথ্যটি ১৯৮৩ সালের জুন মাসের National Geographic পত্রিকার ৭৪১ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে নিম্নলিখিত ভাষায়-

"Within those inflationary moments essentially all the matter and energy in our universe today was created."

সৃষ্টির প্রধান শর্ত 'আদেশ' (command) টি মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কোরানে কীভাবে বর্ণনা করেছেন তা এবার লক্ষ্য করুন।

- "সেই মহান সত্তাই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন সঠিক সূক্ষ্ম সমতায়। তিনি যখন আদেশ করেন 'হও'-অমনি তা হয়ে যায়।" (কুন-ফাইয়ারুনু) (৬:৭৩)

- "আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের উদ্ভাবক। যখন তিনি কোনো কার্য সম্পাদনের সিদ্ধান্ত মেন, তখন সেটিকে একথাই বলেন, 'হয়ে যাও' তৎক্ষণাত তা হয়ে যায়।" (২:১১৭)

পবিত্র কোরানে আমরা অনুরূপ আয়াতের আরো সন্ধান পাই ৩:৪৭, ১৬:৪০, ১৯:৩৫, ৩৬:৮২ এবং ৪০:৬৮ তে।

তথ্য সংরক্ষণ এবং সেই অনুসারে সৃষ্টিকে পরিচালনার জন্য কোরান ও হাদীসে সুম্পষ্ট কিতাব বা লওহে মাহফুজের উল্লেখ আছে। কোরানে ও হাদীসে বর্ণিত লওহে মাহফুজের সঙ্গে আমরা

এ যুগের কম্পিউটারের কিছুটা মিল খুঁজে পাই (যদিও কম্পিউটারের সঙ্গে আল্লাহর লওহে মাহফুজের তুলনা করা ঠিক হবে না কারণ তা আমাদের জ্ঞানের অগম্য, চরম উন্নত, অনুভূতিশীল, ক্ষমতাশীল যা সম্পর্কে আমাদের ধারণা করা সম্ভব নয়। শুধুমাত্র পাঠক সমাজের বোঝার জন্য এরকম প্রয়াস)

মনে করুন মহাশূন্যে বিভিন্ন মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের মিশ্রণের কোনো একটি পিও ছেড়ে দেওয়া হলো এবং আধুনিক শক্তিশালী কোনো কম্পিউটারকে এই মিশ্রণের মৌলিক পদার্থগুলির গুণাবলি, পরিমাণ এবং পিণ্ডিতের প্রাথমিক অবস্থা বলে দেওয়া হয় তবে কম্পিউটারটি সহস্র বছর পর পিণ্ডিতের পর্যায়ক্রমিক বিবর্তিত হয়ে কি অবস্থা হবে তা বের করতে পারবে। হয়তো বা Big Bang এর স্টো মহান আল্লাহতাআলা এই মহাবিশ্বের সমস্ত সৃষ্টি বস্তু, শক্তি ও আঘাতের প্রাথমিক অবস্থা, পরিমাণ ও গুণাবলি জানানোর পর 'লওহে মাহফুজ'কে ভবিষ্যৎ লেখার আদেশ দিয়েছিলেন। এবার কোরান ও হাদীসের আলোকে সৃষ্টিলগ্নের পূর্ব মুহূর্ত থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত লওহে মাহফুজে কীভাবে যাবতীয় তথ্য (information) রাখার কাজ করে এবার তা লক্ষ্য করুন।

হাদীস : [সূত্র : ওমার ইবনে হাফস, ইমরান ইবনে হসাইন (রাঃ)]

"সৃষ্টির প্রথম থেকেই মহান আল্লাহর অস্তিত্ব বিরাজমান ছিল। তিনি ছাড়া আর কোনো কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। তিনি সৃষ্টি জগতের সবকিছুই 'লওহে মাহফুজ' নির্ধারিত করলেন। অতঃপর সম্পূর্ণ আকাশ ও জমিন সবকিছুরই সৃষ্টি করলেন (মহাবিশ্ব)"

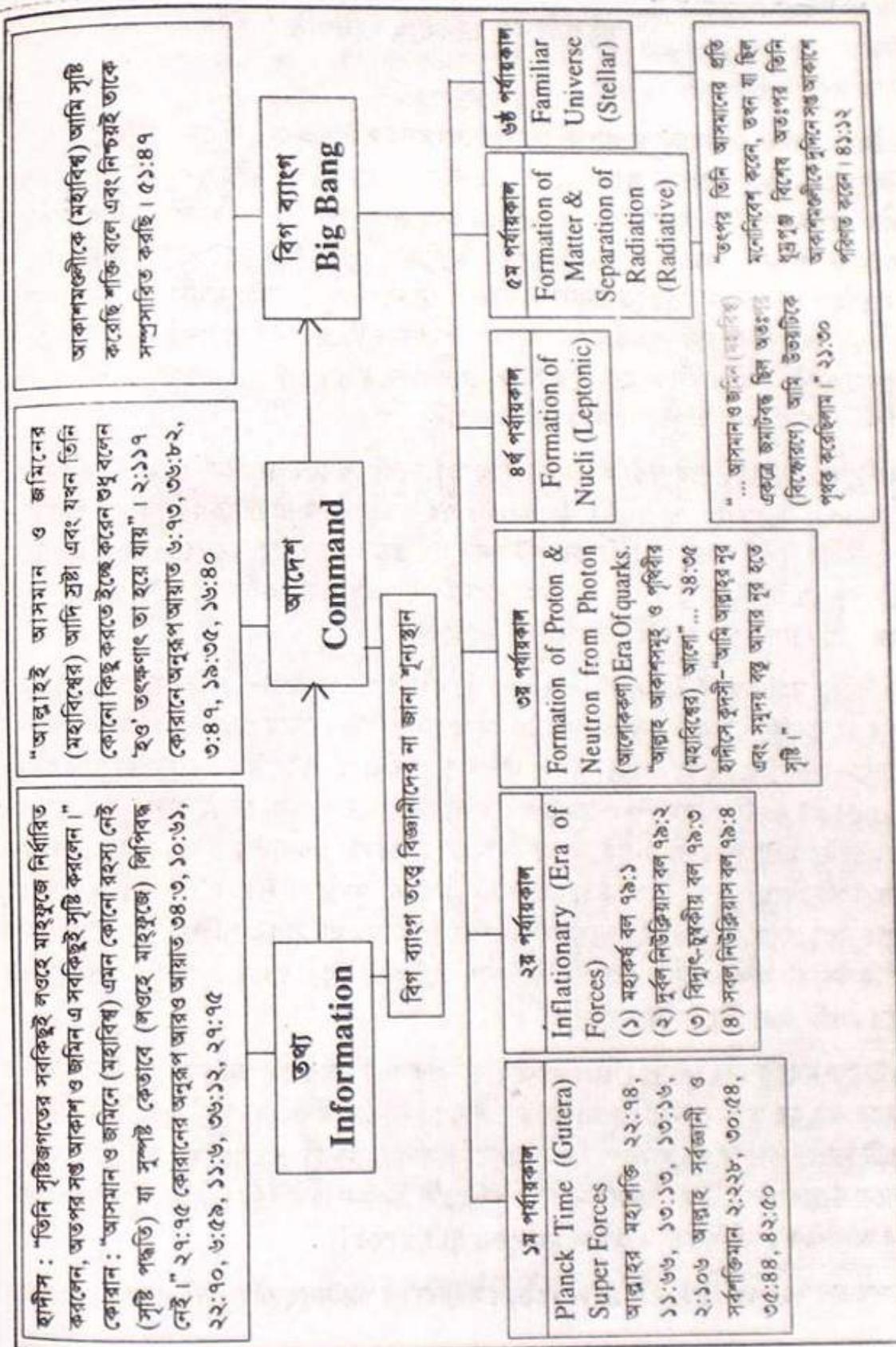
"...আসমান ও জমিনে কিছুই যার অগোচরে নয়, অনু-পরিমাণু কিছু কিংবা তা অপেক্ষা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ, ওর প্রত্যেকটি লিপিবদ্ধ আছে সুস্পষ্ট কেতাবে"। (৩৪:৩)

"আসমান ও জমিনে তার বিন্দু পরিমাণও অপ্রকাশিত থাকে না তোমার প্রতিপালকের নিকট এবং এর ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ বিষয় প্রকাশ্য এন্টের (লওহে মাহফুজের আল্লাহর জ্ঞান ভাণ্ডারের) অন্তর্গত ব্যূতীত নয়।" (১০:৬১)

"আসমান ও জমিনে এমন কোনো রহস্য নেই, (সৃষ্টি পদ্ধতি)- যা সুস্পষ্ট কেতাবে লিপিবদ্ধ নেই।" (২০:৭৫)

আল কোরানে সুস্পষ্ট কিতাবে বা লওহে মাহফুজে সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সমস্ত তথ্য বা information সংরক্ষণের কথা আছে অনুরূপভাবে নিম্নলিখিত আয়াতসমূহে- ২২:৭০, ৩৬:১২, ৬:৫৯, ১১:৬, ৪৩:৪।

মহাবিশ্ব সৃষ্টির জন্য মহাপরিকল্পনা গ্রহণ এবং এই পরিকল্পনাকে তথ্যাকারে লওহে মাহফুজে ধারণ, সৃষ্টির জন্য আদেশ প্রদান, বিগ-ব্যাংগের সংগঠনের উপরে বিজ্ঞানভিত্তিক ও কোরান হাদীস অনুসারে যাবতীয় তথ্যগুলি নিম্নের রেখচিত্রে এবং সারকথায় বর্ণিত হয়েছে।



মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ পরিণতি

বর্তমানে আমরা যে মহাবিশ্বে বাস করছি তার যেখানেই দৃষ্টিপাত করি না কেন সবকিছু প্রাকৃতিক কিছু আইন-কানুন এবং ধর্ম মেনে চলছে। বিজ্ঞানীরা এই মহাবিশ্বের সৃষ্টির সূচনা কীভাবে হয়েছিল তার অনেক কিছুই আজ জানতে পেরেছেন। সেই সঙ্গে গত তিনশ বছরে স্বাভাবিক অবস্থায় পদার্থকে শাসন করার বৈজ্ঞানিক বিধিগুলি আবিষ্কার করেছেন, কিন্তু অত্যন্ত চরম অবস্থায় পদার্থের নির্ভুল শাসন বিধি বিজ্ঞানীরা এখনও জানে না। এছাড়া সমগ্র মহাবিশ্বের গঠন, ঘনত্ব, আয়তন, প্রাকৃতিক চার বলের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের সঠিক গতিবেগ, কালের প্রকৃতি প্রভৃতি যদি আমরা আজ সঠিকভাবে জানতে পারতাম তবে এই মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ পরিণতি কি হবে তা অনুধাবন করা সহজ হতো।

মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ পরিণতি কী রকম হবে তা নির্ভর করবে ক্রান্তিক ঘনত্ব বা ভর-ঘনত্ব (Critical density or mass density) এর উপর অর্থাৎ মহাবিশ্বের প্রতি এক আয়তনে কি পরিমাণ পদার্থ আছে। মহাবিশ্বের এই ঘনত্ব ক্রান্তিক মূল্যাঙ্ক ধরা হয় (Critical value) প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে 2×10^{-29} গ্রাম। মহাবিশ্বের এই ক্রান্তিক ঘনত্বের উপর নির্ভর করে বিজ্ঞানীরা তিনটি সম্ভাব্য পরিণতির ধারণা দিয়েছেন।

ক) সীমিত মহাবিশ্ব (Closed Universe): মহাবিশ্বের ঘনত্ব যদি ক্রান্তিক মূল্যাঙ্কের চাইতে বেশি হয় তাহলে মহাকর্ষীয় আকর্ষণ পরিণামে সম্প্রসারণকে থামিয়ে দেবে এবং মহাবিশ্ব আবার সংকোচন শুরু করবে এবং একটা বৃহৎ সংকোচনে চুপসে যাবে। বৃহৎ বিস্ফোরণের মাধ্যমে (Big Bang) এই মহাবিশ্ব যেমন শুরু হয়েছিল এই সংকোচন হবে অনেকটা সেই রকম। সংকোচনের শেষ পর্যায়ে মহাবিশ্বের সমস্ত গ্রহ, নক্ষত্র তথা মহাবিশ্বের সমস্ত পদার্থ মহাবিশ্বের কেন্দ্রে একত্রিত হয়ে একটি পিণ্ডে পরিণত হবে। মহাবিশ্বের এই একত্রিত অবস্থাকে Big Crunch বা একত্রিত ভূগর্ভ বলা যেতে পারে। বৃহৎ সংকোচনের ফলে আমাদের বর্তমান মহাবিশ্ব শেষ হয়ে গেলেও অসীম ঘনত্বের কারণে পুনরায় আবার বিস্ফোরণ ঘটে অন্য একটি পৃথক মহাবিশ্বের সূচনা ঘটতে পারে। এটি অনেকটা পুনর্জন্মের মতো।

খ) উন্নত মহাবিশ্ব (Open Universe): আবার মহাবিশ্বের গড় ঘনত্ব যদি ক্রান্তিক ঘনত্বের চাইতে অল্প হয় তাহলে মহাবিশ্ব আবার চুপসে যাবে না এবং চিরকাল প্রসারিত হতেই থাকবে। একটি বিশেষ কালের পর ঘনত্ব এত কম হবে যে প্রসারণ হাস করার উপরে মহাকর্ষীয় আকর্ষণের কোনো উল্লেখযোগ্য ক্রিয়া থাকবে না। গ্যালাক্সিগুলি চিরদিন একটি স্থির গতিতে পরস্পর থেকে দূরে অপসরণ হতে থাকবে। অসীম মহাশূন্যে ছুটে চলবে।

গ) সমতল মহাবিশ্ব (Flat Universe): মহাবিশ্বের গড় ঘনত্ব যদি ক্রান্তিক মূল্যাঙ্কের সমান

বা প্রায় কাছাকাছি থাকে তবে মহাবিশ্ব উপরোক্ত দুই অবস্থার মধ্যে সূক্ষ্মভাবে ভারসাম্য ধরে রাখবে। এই অবস্থায় মহাবিশ্বকে বলা হবে সমতল। সূচনালগ্নে মহাবিশ্ব সমতলের খুব কাছাকাছি ছিল এবং এখনও তা খুব কাছাকাছি। বর্তমান কাল থেকে মহাবিশ্বের গড় ঘনত্ব ক্রান্তিক মানের চেয়ে ক্ষুদ্রাংশে কমের দিকে যাচ্ছে।

বিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মহাবিশ্বের গড় ঘনত্ব হিসাব করার প্রয়াস পেয়েছেন। দৃশ্যমান সমস্ত তারকা এবং মহাবিশ্বের দৃশ্যমান সমস্ত বায়বীয় পদার্থের ভরণলি যোগ করে ক্রান্তিক ঘনত্বের শতকরা এক ভাগের চাইতেও কম পাওয়া যায়।

অদীগ্ন পদার্থ (DARK MATTER)

জোতিপদার্থবিদ ও মহাশূন্য বিজ্ঞানীদের নিকট এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হচ্ছে। অদীগ্ন পদার্থ (Dark Matter)। এই অদীগ্ন পদার্থ সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে জানতে পেরেছেন। মহাবিশ্বে এই অদীগ্ন পদার্থের পরিমাণ প্রচুর যা আমরা পর্যবেক্ষণ করতে পারি না সত্য, কিন্তু তার অস্তিত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা জানি এক একটি গ্যালাক্সি অসংখ্য তারকা এবং আন্তঃনক্ষত্রীয় পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত যা ভীষণবেগে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে। শুধুমাত্র তারকা এবং আন্তঃনক্ষত্রীয় পদার্থ দ্বারা গ্যালাক্সিগুলি গঠিত হলে সেগুলি টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে পড়তো। নিশ্চয়ই এমন কিছু অদৃশ্য ধরনের পদার্থ আছে, যার মহাকর্ষীয় আকর্ষণ ঘূর্ণায়মান গ্যালাক্সিগুলিকে ধরে রাখার মতো যথেষ্ট বেশি।

অদীগ্ন পদার্থ সম্পর্কে আর একটি সাক্ষ্য পাওয়া যায়— গ্যালাক্সিগুলি সমস্ত স্থানে সমভাবে বণ্টিত নয়। তারা পুঁজে পুঁজে সংগৃহীত। কোনোও পুঁজে আছে কয়েকটি মাত্র গ্যালাক্সি আবার কোনোও পুঁজে আছে নিযুত নিযুত গ্যালাক্সি। সম্ভবত গ্যালাক্সিগুলি পরস্পরকে আকর্ষণ করে গোঠিবন্ধ হয় বলে এই পুঁজগুলি গঠিত হয়। তবে এই পুঁজগুলির ভেতরে একক গ্যালাক্সিগুলির দ্রুতি (speed) এত বেশি যে কোনো মহাকর্ষীয় আকর্ষণ দ্বারা সংযুক্ত না হলে তারা ভেঙে ছিটকে বেরিয়ে যেত (fly apart)। তার জন্য যে মহাকর্ষীয় ভরের প্রয়োজন তা সমস্ত গ্যালাক্সিগুলির ভরের চাইতে অনেকগুণ বেশি। এ থেকে বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন, যে গ্যালাক্সিগুলিকে আমরা দেখতে পাই তার বাইরে অদৃশ্য কমপক্ষে দশগুণ অতিরিক্ত অদীগ্ন পদার্থ রয়েছে।

উপরোক্তে অদীগ্ন পদার্থ ছাড়া অতিরিক্ত অন্যরকম অদীগ্ন পদার্থ থাকার সম্ভাবনা আছে। এই অতিরিক্ত অদীগ্ন পদার্থগুলি মহাবিশ্বের গড় ঘনত্ব ক্রান্তিক ঘনত্বে নিয়ে যেতে পারে কিংবা তার চাইতেও বেশি করে দিতে পারে। তবে এই পদার্থগুলির অবস্থান হতে হবে গ্যালাক্সিগুলির বাইরে। না হলে গ্যালাক্সিগুলির আবর্তনে কিংবা গ্যালাক্সিপুঁজের গতিতে তার ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা যেত।

বৃহৎ বিক্ষেপণের প্রথম তিন মিনিটের ভিতরে মহাবিশ্বের উঙ্গ আদিম স্তরে নানারকম হাত্তা

মৌলিক পদার্থের সৃষ্টি হয়। মহাবিশ্বের আদিম স্তর থেকে পড়ে থাকা বিভিন্ন মৌল কণার অস্তিত্ব থাকতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞানীরা এখনও সবগুলি সঠিক সনাক্ত করতে পারেন নি। তবে যে কণিকা সম্পর্কে ইতিমধ্যে সাক্ষ্য প্রমাণ আছে সেটির নাম নিউট্রিনো। পূর্বে ধারণা ছিল এর নিজের কোনো ভর নেই কিন্তু আধুনিক পর্যবেক্ষণে পাওয়া যায় নিউট্রিনোর একটি ক্ষুদ্র ভর থাকতে পারে। এ তথ্য যদি সঠিক বলে প্রমাণিত হয় এবং দেখা যায় তার মূল্যাঙ্ক সঠিক তাহলে মহাবিশ্বের ঘনত্ব ক্রান্তিক ঘনত্বে নিয়ে আসবার মতো পর্যাপ্ত ভর নিউট্রিনো থেকে পাওয়া যাবে। এছাড়া আরও দুটি মৌল পরমাণুর উপকণিকা (sub-atomic particles) আক্সিওন্স (Oxions) এবং ফোটিন্স (photinos) বৃহৎ বিস্কোরণের আদিম স্তর থেকে থাকতে পারে।

নক্ষত্রের জুলানি হাইড্রোজেন পুড়ে ক্রমাগ্রামে ব্রাউন ডোয়ার্ফ (Brown Dwarf) হোয়াইট ডোয়ার্ফ, নিউট্রন স্টার এবং শেষ পর্যায়ে ব্যাপক সংকোচনে অসীম ঘনত্বের কৃষ্ণগহবর (Black Hole) ইত্যাদিও অদীপ্ত পদার্থ হিসেবে গণ্য হতে পারে।

মহাবিশ্বের সূচনালগ্নে ঘনত্ব ক্রান্তিক মূল্যাঙ্কের কাছাকাছি ছিল তা অতি সম্প্রসারণশীল তত্ত্বানুসারে ব্যাখ্যা করা যায় এবং এ-সময় মহাবিশ্ব সমতলের (Flat) খুব কাছাকাছি ছিল এবং এখনও তা খুব কাছাকাছি। এটাই যদি সত্য হয় তবে মহাবিশ্বের মোট ভরের ৯০% ভাগ হচ্ছে অদীপ্ত পদার্থ। অদীপ্ত পদার্থকে ভর এবং গতির উপর নির্ভর করে মোটামুটি দুটি ভাগে ভাগ করা যায়।

অদীপ্ত পদার্থ (DARK MATTER)

বারোনিক

(BARYONIC)

নন-বারোনিক

(NON-BARYONIC)

উত্পন্ন অদীপ্ত পদার্থ

(HOT DARK MATTER)

শীতল অদীপ্ত পদার্থ

(COLD DARK MATTER)

শীতল অদীপ্ত পদার্থ সাধারণত অপেক্ষাকৃত বেশি ভরের হয় এবং কম গতিতে চলে আবার উত্পন্ন অদীপ্ত পদার্থ গতি দ্রুত ও আকৃতিতে ছোট।

অদীগ্র শক্তি (DARK ENERGY)

১৯৯৫ সালে অস্ট্রেলিয়ায় এক নবীন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ব্রেইন স্মিথ ও তাঁর কয়েকজন সহকর্মী এবং আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার লেনেস বারকেলী ল্যাবরেটরীর সাউল প্যারালমুটারের দল মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের মাত্রা কি হারে কমছে তা নির্ণয়ের জন্য সচেষ্ট হন। এ জন্য তারা দূরের এবং কাছের টাইপ I-a সুপারনোভার (অতিপুরাতন তারকা বিশাল থার্মোনিউক্লিয়াস বিস্ফোরণের মাধ্যমে ঝংসপ্রাণ হওয়া) উজ্জ্বলতা ও দ্রুতি নির্ণয় করেন।

মহাবিশ্বের যে কোনো অংশের সম্প্রসারণের মাত্রা নির্ভর করবে সেখানে কি পরিমাণ পদাৰ্থ আছে তার উপর। এর প্রভাব দূরের সুপারনোভার উপর অবশ্যই থাকবে। ১৯৯৮ সালে উপরোক্তে উভয় দলই বিশ্বিত হন দূরের সুপারনোভাগুলি নিকটতম সুপারনোভার চেয়ে কম উজ্জ্বলতা দেখে। দূরে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ দ্রুততর হচ্ছে এটাই তার কারণ। সম্প্রসারণের মাত্রা দ্রুততর হওয়ায় ধারণা করা যায় মহাকর্ষ বলের (gravity) বিপরীত কোনো শক্তিশালী বল (Anti-gravity) কাজ করছে যা দূরের গ্যালাক্সিগুলিকে দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটাচ্ছে যদিও সাধারণ মহাকর্ষ বল তাদেরকে একত্রে পেছনে ধরে রাখার চেষ্টা করছে।

সর্বপ্রথম বিপরীত মহাকর্ষ বলের ধারণা (anti-gravity) আইনষ্টাইন ১৯১৬ সালে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বের সমীকরণে দেখান। এই তথ্যানুসারে মহাবিশ্ব হয় সম্প্রসারিত অথবা সংকোচিত হচ্ছে। অথচ তখন স্থির মহাবিশ্ব সম্পর্কে ধারণা এত প্রবল ছিল যার জন্য সমীকরণে সমতা আনার জন্য একটা অতিরিক্ত ধ্রুবক সংযোজন করেন যা মহাজাগতিক ধ্রুবক (Cosmological constant) নামে পরিচিত ছিল। এই ধ্রুবকের মান মহাবিশ্বকে স্থির রাখার জন্য মহাকর্ষ বলের বিপরীত বলের সমান। পরবর্তীতে হ্যাবেল কর্তৃক সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্ব প্রমাণিত হলে আইনষ্টাইন সমীকরণ থেকে ধ্রুবকটি উঠিয়ে দেওয়াকে তার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল বলে আখ্যায়িত করেন।

বর্তমানে কণাবাদী পদাৰ্থবিদ্যার (Quantum Physics) সমীকরণে আইনষ্টাইনের পরিত্যাগত ধ্রুবকের মতো একটি ধ্রুবকের কথা বলছেন। মহাবিশ্বের ব্যাপক শূন্যস্থানে মহাকর্ষ বলের বিপরীতে এক ধরনের শক্তি কাজ করছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যদি মহাবিশ্ব সৃষ্টির সূচনালগ্নে এই বল থাকত তবে পরমাণু সৃষ্টির অনেক আগেই মহাবিশ্ব ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতো। এজন্য ধারণা করা হয় মহাবিশ্ব সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে শূন্যস্থান বৃদ্ধি পাওয়ায় অদীগ্র শক্তি (dark energy) বা বিপরীত মহাকর্ষ বল (anti-gravity) বৃদ্ধি পেয়ে সাধারণ মহাকর্ষ বলের উপর প্রাধান্য বিস্তার করছে।

সাম্প্রতিককালে যে ভাবে পর্যবেক্ষণ চলছে তাতে জ্যোতির্পদাৰ্থবিদরা নিশ্চিত যে মহাবিশ্ব ৫% ভাগ সাধারণ পদাৰ্থ, ৩৫% ভাগ অদীগ্র পদাৰ্থ এবং ৬০% ভাগ অদীগ্র শক্তির সমন্বয়ে গঠিত।

এ থেকে মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্পর্কেও তাদের সুন্দর ধারণা হয়েছে। সমস্ত পদার্থ একত্রিত করলেও মহাবিশ্বের সম্প্রসারণকে বক্ষ করার জন্য প্রয়োজনীয় মহাকর্ষ বল সৃষ্টি হবে না। অদীগ্ন বলের প্রভাবে সৃষ্টি বিপরীত মহাকর্ষ বল প্রকৃতপক্ষে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণকে দ্রুততর করছে। মহাবিশ্বে স্থান (space) বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অদীগ্ন শক্তির পরিমাণ এবং তার প্রভাবও বৃদ্ধি পাবে।

মহাবিশ্বের সাধারণ পদার্থ, অদীগ্ন পদার্থ, অদীগ্ন শক্তি, স্থান ও কালের প্রকৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে আরও সঠিক তথ্য জানার পর আমরা যে মহাবিশ্বে বাস করছি তা প্রকৃত কতটা বিপদজনক তা জানা যাবে। সাম্প্রতিককালে আবিস্কৃত অদীগ্ন শক্তি নীতিগতভাবে কোনো সময় ভিন্নরূপ নিয়ে বিশ্বয়কর কোনো কিছু ঘটাতে পারে। এমনকি কোনো দিন হ্যাত এর দিক পরিবর্তন হয়ে মহাকর্ষ শক্তিকে আরও শক্তিশালী করে মহাবিশ্ব দ্রুত সংকোচন করতে পারে।

আমাদের স্থানীয় গ্যালাক্সি মিহি ওয়ে এবং প্রতিবেশী আরও হাজার হাজার গ্যালাক্সি প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৬০০ কিলোমিটার বেগে বিপুল ঘনত্বের নক্ষত্রমণ্ডলির পদার্থ GREAT ATTRACTOR- এর দিকে ধাবমান। এর সঙ্গে সংযুক্তকারীদের থেকে ধারণা করা হয় এর ভর হবে কমপক্ষে ২০,০০০ ট্রিলিয়ন সূর্যের সমান। অতি সম্প্রতি আবিষ্কার হয়েছে এই GREAT ATTRACTOR টি পর্যন্ত গতিশীল। সম্ভবত এর চেয়ে কম পক্ষে দশগুণ বেশি ভর সম্পন্ন কোনো কিছুর দিকে ধাবমান। আমরা যেন কোনো এক ভেলায় মহাজাগতিক সাগরে অজানা এক গন্তব্যে ছুটে চলেছি। উপরের তথ্যটুকু National Geographic পত্রিকার জানুয়ারি ১৯৯৪ সংখ্যায় ৩৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত।

সৌর জগত ও মহাবিশ্বের ধ্রংস

আমাদের সৌরজগৎসহ অন্যান্য গ্যালাক্সিগুলির মহাধ্রংসের চিত্র ষিফেন হকিং ‘মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ’ প্রবন্ধে যেভাবে তুলে ধরেছেন-

কম বেশি পাঁচশত কোটি বছর পর সূর্যের পারমাণবিক জ্বালানি শেষ হয়ে যাবে, তখন সেটি ফুলে, লোহিত দৈত্যে (Red Giant) পরিণত হবে। যতদিন না এই সূর্যটি পৃথিবী এবং অন্যান্য নিকটবর্তী গ্রহগুলিকে গ্রাস করে, ততদিন এভাবেই থাকবে। তারপরে সেটি কয়েক হাজার মাইল দৈর্ঘ্যের একটি শ্বেতবামন (White Dwarf) তারকাকাপে স্থিতিলাভ করবে।

প্রায় এক হাজার কোটি বছর পরে মহাবিশ্বের অধিকাংশ তারকাই পুড়ে শেষ হয়ে যাবে। সূর্যের মতো ভরের তারকাগুলি হয় শ্বেতবামন নয়তো নিউট্রন তারকায় পরিণত হবে। নিউট্রন তারকাগুলি শ্বেতবামনের চাইতে ক্ষুদ্র এবং ঘন। আরও বেশি ভরযুক্ত তারকাগুলি ক্ষণগহ্বর হতে পারে। সেগুলি আরও ক্ষুদ্র। সেগুলির মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র খুবই শক্তিশালী। কোনো আলোক সেখান

থেকে পলায়ন করতে পারে না। তবে, এই অবশিষ্টাংশগুলি তখনও আমাদের গ্যালাক্সির কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করতে থাকবে। প্রদক্ষিণ করবে প্রায় দশ কোটি বছরে একবার। অবশিষ্ট অংশগুলির সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মুখোমুখি হওয়ার দরকান কয়েকটি নীহারিকা থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাবে। অবশিষ্ট অংশ কেন্দ্রে সর্বদিকে ঘনিষ্ঠতর কক্ষে সুস্থির হয়ে থাকবে এবং পরিণামে একত্রিত হয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্রে একটি বিশাল কৃষ্ণগহবর সৃষ্টি করবে। গ্যালাক্সি এবং গ্যালাক্সিপুঞ্জের ভেতরকার অদীক্ষ পদার্থ যাইহোক না কেন, সেগুলি ও ঐ অতি বিশাল কৃষ্ণগহবরগুলির ভেতর পতিত হবে বলে আশা করা যায়।

আমেরিকার বৈজ্ঞানিক ফ্রিম্যান ডাইসন মহাধ্বংসের চিত্র এঁকেছেন নিম্নরূপ :

বিরাট ধ্বংসের একশত কোটি বৎসর পূর্বে একত্রে অপসারণশীল ছায়াপথ ত্বকগুলোর ভেতরের খালি জায়গা ভরাট হয়ে আসতে থাকবে। ঐ ধ্বংসের ১০ কোটি বছর আগে পৃথক পৃথক ছায়াপথের ভেতরের জায়গা কমে গিয়ে সমস্ত ছায়াপথ একীভূত হয়ে যাবে। সারা বিশ্ব তখন তারায় তারায় খচিত, রাত্রি দিনের কোনো পার্থক্য থাকবে না। মহাকর্ষ বল বেড়ে যাবে। তারাসমূহ পরম্পরের কাছে চলে আসবে।

বিরাট ধ্বংসের ১ লাখ বছর আগে সারা আকাশ প্রচঙ্গ গরম হয়ে উঠবে। বিশ্বের কোনো ঘরে প্রাণের অস্তিত্ব থাকবে না। সমুদ্রের পানি বাঞ্চ হয়ে যাবে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তারাদের তাপে সমস্ত কঠিন শিলা গলে ফুটে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বিরাট ধ্বংসে বিশ্ব বিলুপ্ত হওয়ার এক হাজার বছর আগে তারাদের ভেতর প্রচঙ্গ সংঘর্ষ ঘটবে এবং ঝ্যাকহোল সৃষ্টি করবে। বিরাট ধ্বংসের শেষ অক্ষে ঝ্যাকহোলগুলি সব একত্রিত হয়ে একটাতে পরিণত হবে। আর এই একটার ভেতরে একদা বিশাল বিশ্বের সমস্ত পদার্থ ও তেজ একটা অতি ক্ষুদ্র, অতি ঘন, অতি উন্নত অগ্নিপিণ্ডে পরিণত হবে।

বিরাট ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই আবার একটি বিরাট বিক্ষেপণও ঘটবে এবং নতুন একটা বিশ্ব সৃষ্টির সূচনা করবে। বিরাট এ ধ্বংস ঘটবে এক লক্ষ কোটি বছর পরে। আরও এক লক্ষ কোটি বছর পরে নতুন ঘটনার সূচনা হবে।

কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক মনে করেন, এমন কিছু ঘটতে পারে, যাতে ঘড়ির স্প্রিংকে ধাক্কা দিয়ে চালিয়ে দেয়া যেতে পারে এবং সেই বিন্দু হচ্ছে ঝ্যাকহোলের কেন্দ্রে অবস্থিত “এককত্ত” (Singularity)। ঝ্যাকহোলের বিক্ষেপণের পর এই সমস্ত ‘এককত্ত’ বিশ্বে নগ্ন অবস্থায় ঘূরতে থাকবে। এরা একেবারে শূন্য থেকে তেজ, আলো, তাপ সৃষ্টি করতে পারে। এরা বিজ্ঞানের বিধি মানে না, আপনা আপনি বস্তু গঠন করতে পারে। বিশ্ব হয়তো একটা নতুন অস্তিত্বের নতুন ত্বরে উপনীত হবে।

উপরের আলোচনা হতে আমরা ধ্বংসের দুটি চিত্র পাই। প্রথমত আমাদের সৌরজগতের নিয়ন্ত্রণকারী সূর্য তার পারমাণবিক জুলানি শেষ হলে সমস্ত সৌরজগৎ অর্ধাংসূর্য, চন্দ্র, গ্রহ ধ্বংস

কৃষ্ণ কৃষ্ণগহরে পরিণত হবে। আর দ্বিতীয়টি হলো সমগ্র মহাবিশ্বের গ্যালাক্সি, ক্লাস্টার, সুপার নোডা, কোয়াসার, অদীশ্ব পদার্থ ইত্যাদি সবকিছু ধ্রংস এবং একটি বৃহৎ কৃষ্ণগহরে সৃষ্টি হবে (কৃষ্ণগহরের সম্পর্কে বিজ্ঞানিত আলোচনা অন্য অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।)

ওজোন স্তর

সাম্প্রতিক বিজ্ঞানীরা আমাদের পৃথিবী ধ্রংসের জন্য উপরোক্ত সূর্যের পারমাণবিক জ্বালানি শেষ হওয়ার পূর্বেও অনেক পদ্ধতিতে ধ্রংস হতে পারে বলে অনুমান করছেন। সেই পদ্ধতিগুলির কিছু নিম্নে বর্ণনা করছি।

আপনারা নিচয়ই অবগত রয়েছেন যে, বর্তমানে সারা বিশ্বে অপরিকল্পিতভাবে ব্যবহৃত রাসায়নিক শিল্প কারখানা গড়ে ওঠায় এবং বিভিন্নভাবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্টের জন্য তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বিজ্ঞানীরা শ্রীণ হাউস এ্যাফেস্টের কথা বলছেন। ফলে ‘ওজোন স্তরটি’ ভীষণ ক্ষতি হচ্ছে। এই ক্ষতি রোধের জন্য বর্তমানে বিজ্ঞানীরা নানা ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থার কথা বলছেন। আর এই ওজোন স্তরটি যদি একটি মুহূর্তের জন্যও কোনোভাবে অপসারিত হয়, তবে অতিক্রুদ্ধ সময়ের পরিসরে পৃথিবীর সমস্ত জীবন-ব্যবস্থা পুড়ে ভেস্ত হয়ে যাবে। সূর্যের নানা ধরনের বিকিরিত রশ্মির ছোবলে শেষ পর্যন্ত জীবনের আর কোনো স্পন্দন এখানে অবশিষ্ট থাকবে না।

পৃথিবী সন্নিকট বস্তু (NEAR EARTH OBJECTS) বা NEO

পৃথিবী সন্নিকট বস্তু বা NEO হচ্ছে আমাদের সৌর জগতের (Solar System)। কক্ষপথে বিভিন্ন ধরনের বস্তুসমূহ গ্রহাণু, স্বল্পস্থায়ী ধূমকেতুসমূহ, মিটওরাইট ইত্যাদি নিয়মিতভাবে পৃথিবীর খুব কাছাকাছি চলে আসে, ফলে তারা হয়ত কোনো সময় পৃথিবীকে আঘাত হানতে পারে। পৃথিবীর কক্ষপথকে অতিক্রম করে এমন সব ধরনের ধূমকেতু (শুধুমাত্র স্বল্পস্থায়ী ধূমকেতু নয়) অবশ্য NEO এর অন্তর্ভুক্ত। এ সমস্ত বস্তুসমূহের মধ্যে যাদের কক্ষপথ প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর কক্ষপথসমূহকে প্রতিচ্ছেদ (intersect) করে তাদেরকে পৃথিবী অতিক্রান্ত বস্তু (Earth Crossing Objects) বা ECO বলে।

চারশত কোটি বছর আগে আমাদের সৌরজগৎ গঠনের সময় সম্বৃত গ্রহাণু (Asteroids) এবং ধূমকেতু (comets) অতি পুরাতন অবশিষ্টাংশ হিসাবে থাকে। পৃথিবীর বুকে জীবনের শুরু থেকে অতি সম্প্রতি বৃহস্পতি গ্রহে (Jupiter) আঘাতকারী ধূমকেতু সুমেকার লেভী-৯ এর মতো আরও

অসংখ্য বন্ধু আমাদের প্রতিবেশী গ্রহসমূহের আকৃতি গঠনে অনেক প্রাথমিক প্রক্রিয়ার মধ্যে একটি প্রধান ভূমিকা পালন করে।

ধূমকেতুগুলি সাধারণত বরফ, পাথর এবং জৈবযৌগিক পদার্থ দ্বারা গঠিত এবং এর ব্যাস হতে পারে ক্ষেত্রিক মাইল। ধারণা করা হয় ধূমকেতুর উৎসস্থল হলো সবচেয়ে দূরের গ্রহের কক্ষপথ থেকে অনেক দূরের কোনো অঞ্চলে। বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন পর্যায়কালে মহাকর্ষ বলের অস্ত্রিতার জন্য ধূমকেতুদের এই আবাসস্থল থেকে পথচয়ত কোনো ধূমকেতু নির্দিষ্ট কক্ষপথে সূর্যের কাছাকাছি চলে আসে। সূর্যের খুব নিকট প্রথর তাপের কাছাকাছি চলে আসলে ধূমকেতু কেন্দ্রের বরফ গলতে শুরু করে এবং বাস্পে পরিণত হয়ে পিছনে পড়ে থাকে। নির্গত বাস্পের গ্যাস ধূমকেতুর কেন্দ্রের চারিদিকে একটা পাতলা আবরণ গঠন করে শুচ্ছ (coma) সৃষ্টি করে। ধূমকেতুর ভিতরের ধূলিকণা দীর্ঘ লেজের মতো দেখায় এবং এটি কয়েক হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত দীর্ঘ হতে পারে। কোনো কোনো সময় পৃথিবী থেকে দৃষ্টিগোচর করা সম্ভব। কোটি কোটি বছর পূর্বে এই ধূমকেতুর আঘাতের ফলেই পৃথিবীর প্রাচীন সমূদ্র, বায়ুমণ্ডল এবং আবহাওয়ার আমূল পরিবর্তন ঘটে থাকতে পারে। পৃথিবীতে জীবন (Life) সৃষ্টির জন্য কার্বন সমৃদ্ধ জৈব অণুর অনুপ্রবেশও এই ধূমকেতুর মাধ্যমেই ঘটে।

অধিকাংশ গ্রহাণুই পাথর দ্বারা গঠিত। তবে কিছু কিছু ধাতব পদার্থ বিশেষ করে নিকেল ও লৌহ দ্বারা গঠিত। অন্ন কিছু গ্রহাণু ধূমকেতুর কেন্দ্রের বরফ গলে যাওয়ার পর কেন্দ্র থেকে মহাশূন্যে নিষ্কিণ্ড হয়। তবে অধিকাংশ গ্রহাণুই মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের কক্ষপথের বিস্তীর্ণ এলাকার প্রধান গ্রহাণু বলের এলাকার অন্তর্ভুক্ত। এগুলির আকৃতি ছোট ছোট শিলাখণ্ড থেকে শুরু করে শত শত কিলোমিটার ব্যাপী ব্যাসের হতে পারে।

ছোট আকৃতির NEO এর সংখ্যা বড় আকৃতির চেয়ে অনেকগুণ বেশি। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের হিসাব মতো এক কিলোমিটার ব্যাসের অধিক পৃথিবী সন্নিকটবর্তী গ্রহাণুর সংখ্যা হতে পারে এক হাজার আর ৫০ মিটার ব্যাস সম্পন্ন গ্রহাণুর (পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে সম্ভাবনাময় অনুপ্রবেশকারী) সেখানে হতে পারে দশ লক্ষের উপরে। সর্ববৃহৎ পৃথিবীর সন্নিকটবর্তী গ্রহাণুর ব্যাস প্রায় ২৫ কিলোমিটার। আর ধূমকেতুর সংখ্যা গ্রহাণুর চেয়ে অনেকগুণ বেশি। তবে তারা অধিকাংশই আমাদের সৌরজগৎ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে থাকে। ফলে পৃথিবীকে সম্ভাবনাময় আঘাতকারী বন্ধুর মধ্যে শতকরা মাত্র দশভাগ হলো ধূমকেতু। ২০০১ সালের শেষ পর্যন্ত বিপুল পরিমাণ পৃথিবীর সন্নিকটবর্তী গ্রহাণুর আবিষ্কার হলেও এখন পর্যন্ত বিপুল সংখ্যক অজানা রয়েছে।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল আমাদেরকে সাধারণ পরিমিত অফিস বিভিন্নের আকৃতির (৫০ মিটার ব্যাস বা পাঁচ মেগাটন শক্তি সম্পন্ন) চেয়ে ছোট NEO-এর আঘাত থেকে রক্ষা করে। এই আকৃতি থেকে এক কিলোমিটার ব্যাস পর্যন্ত আঘাতকারী NEO স্থানীয়ভাবে বিপুল ক্ষতিসাধন করতে পারে। দশ লক্ষ মেগাটন শক্তি সম্পন্ন (প্রায় দুই কিলোমিটার ব্যাস সম্পন্ন) আঘাতকারী NEO

সমগ্র পৃথিবীব্যাপী পরিবেশগত ব্যাপক ক্ষতিসাধন করতে পারে। সংজ্ঞা পরিণতিতে তীব্রশীলতার ফলে পৃথিবীব্যাপী শস্যহানী ঘটিয়ে দুর্ভিক্ষ ও বিভিন্ন রোগের (disease) সৃষ্টি করতে পারে। আরও বড় ধরনের আঘাতকারী বস্তু অকল্পনীয় ধর্মস ঘটাতে পারে। কেবলমাত্র দশ মিটার প্রশস্ত একটি বস্তুর গতিশক্তি (Kinetic energy) হতে পারে হিরোশিমায় নিক্ষিপ্ত প্রায় পাঁচটি বোমার সমতুল্য। এর ফলে কম্পন তরঙ্গের যে সামান্য অংশটুকু পৃথিবীর মাটিতে আসবে তাও ব্যাপক ক্ষতি সাধন করতে পারে।

কিছু কিছু গ্রহাণু সূর্যের চারিদিকে আমাদের পৃথিবীর কক্ষপথের খুব নিকটে চলে আসে। বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যে প্রমাণ পেয়েছেন অতীতে অনেকবার আমাদের পৃথিবীকে গ্রহাণু আঘাত হেনেছে। সাধারণত খুব ছোট আকৃতির গ্রহাণু এবং উর্কাপিণ্ড (meteor) আমাদের পৃথিবীকে রক্ষাকারী বায়ুমণ্ডলের আবরণে আঘাতকা করতে পারে। ফলে পৃথিবীর ভূমি পর্যন্ত পৌছায় না। এগুলি উর্ধ্বাকাশে দশ্ম হয়ে সূন্দর উজ্জ্বল আলোর ছাঁটা সৃষ্টি করে। বড় আকৃতির গ্রহাণু পৃথিবীর ভূমিকে আঘাত করে গর্তের সৃষ্টি করে। আমেরিকার অ্যারিজোনাতে এক মাইল প্রশস্ত গ্রহাণু কর্তৃক সৃষ্টি বিশাল গর্ত রয়েছে। অপর একটি গ্রহাণুর আঘাত পরিলক্ষিত হয় মেক্সিকোর ইউকাতান উপনিষদের উপকূলে। এটি সমুদ্রের তলদেশে ঢাকা পড়েছে। এটিই আজ থেকে ছয় কোটি পঞ্চাশ লক্ষ বছর পূর্বে সেই সময়কার সমস্ত প্রজাতির (species) ডাইনাসোরসহ প্রায় শতকরা সম্পূর্ণ ভাগ প্রাণী অতি অল্প সময়ে বিলুপ্তি ঘটেছে। ক্রমাগতে সে সময়কার সমস্ত ডাইনাসোর প্রজাতি বিলুপ্তি হয়েছে। ১৯০৮ সালে সাইবেরিয়ার তুনগুসকাতে বিশাল গ্রহাণুর পতনে জনবসতি শূন্য এলাকায় এক কম্পন তরঙ্গ শত শত কিলোমিটার ব্যাপী এলাকায় বৃক্ষের পতন ঘটিয়েছে।

পৃথিবী, সৌরজগতের অন্যান্য এহ এবং চন্দ্র ইত্যাদি গঠনের পর থেকেই অবিরত গ্রহাণু এবং ধূমকেতু আঘাত হানতে থাকে। সাধারণ ছোট দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে চন্দ্র পৃষ্ঠে এ ধরনের আঘাতজনিত বিভিন্ন গর্ত সহজে দৃষ্টিগোচর হয়। ১৯৯৪ সালে এ ধরনের ২০টি NEO বস্তু বৃহস্পতি গ্রহকে আঘাত করার ফলে সমস্ত গ্রহের আকৃতিরই পরিবর্তন হয়ে গেছে। পতনে বিক্ষেপণের বিশাল কালো মেঘ বৃহস্পতির উপর ভেসে ওঠে।

যে গ্রহাণুটি পৃথিবী থেকে ডাইনাসোরের বিলুপ্তি ঘটিয়েছে তা খুব সম্ভবত একটি পর্বত সমতুল্য লৌহ পিণ্ড। এটির গতি ছিল প্রায় প্রতি সেকেন্ডে ৪৮ কিলোমিটার। বিপুল পরিমাণ সৃষ্টি তাপ আঘাতকারী বস্তু এবং সম্পরিমাণ ভূমিকে বাস্পীভূত করেছে। এর প্রভাব কতকটা নিউক্লিয়ার বিক্ষেপণের মতো কিন্তু এর চেয়ে অনেকগুণ বেশি। ভূত্বকে প্রায় ১৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ গর্তের সৃষ্টি করে। ঐ ধরনের গ্রহাণুর আঘাতের ফলে বিশাল এলাকাব্যাপী অগ্নিপিণ্ড সবকিছুকে পুড়িয়ে ফেলবে। বিক্ষেপণ তরঙ্গ (blast waves) বায়ুমণ্ডলে এবং মাটির কম্পন ভূমিতে বেশ কয়েকবার পৃথিবীতে প্রদক্ষিণ করবে। যদি প্রথম ধাক্কায় কেউ জীবিত থাকে তবে সে অনেকবার পৃথিবীতে আঘাতের প্রতিক্রিণি শুনবে এবং অনুভব করবে। পরবর্তী প্রভাব ঘটবে প্রচণ্ড সমৃদ্ধ তরঙ্গ, দমকা বাতাস, আকাশ প্রচণ্ড ধূলিকণায় অঙ্ককারাচ্ছন্ন এবং প্রবল বৃষ্টিপাত (কিছু সমুদ্র

বাল্পীভূত হতে পারে) বায়ুমণ্ডলে প্রচুর ধূলিকণা এবং আগ্নেয়গিরি গ্যাসের ফলে শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়বে। আবহাওয়া অনেক বছর পর্যন্ত খুব শীতল হবে। প্রচণ্ড আঘাতের বিষ্ণোরণের ফলে কোটি কোটি টন বিভিন্ন পদার্থ উৎক্ষিণ হয়ে আকাশকে রক্তিম উত্তঙ্গ করে তুলবে এবং পরবর্তীতে তা পৃথিবীতে ফিরে এসে আর এক মৃত্যু ফাঁদ তৈরি করবে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে পঞ্চাশ মিটার ব্যাসের পৃথিবীর সন্নিকটবর্তী বস্তু (NEO) প্রতি একশত থেকে তিনশত বছরের মধ্যে পৃথিবীকে একবার, এক কিলোমিটার ব্যাসের বস্তু দুই/তিন লাখ বছর আর এক বা একাধিক দুই কিলোমিটার বা তার অধিক ব্যাস সম্পন্ন NEO পৃথিবীকে আঘাত করতে পারে দশ লক্ষ বছর পর পর। তবে এটা নিশ্চিত করে বলা যায় না কখন পৃথিবীতে এ ধরনের আঘাত আসতে পারে। হতে পারে আগামী বছর, আবার হতে পারে এখন থেকে দশ লক্ষ বছর পর।

প্রতি বছর বেশ কিছু সংখ্যক গ্রহাণু (যেমন ২০০৩ Q Q 47) পৃথিবীর খুব বিপদজনক দূরত্বে চলে আসে। প্রত্যেকটি পৃথিবীতে বিপুল সংখ্যক প্রাণীর জীবন নাশ ঘটাতে পারে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অতি সতর্কতার সঙ্গে নিরীক্ষণ করার পর মনে করছেন ২০১৪ সালের ২১ শে মার্চ তারিখে প্রায় এক কিলোমিটার প্রশস্ত গ্রহাণু পৃথিবীকে আঘাত করতে পারে। এটি যদি পৃথিবীকে আঘাত করে তবে তার শক্তি হবে হিরোশিমায় নিষ্ক্রিণ পারমাণবিক বোমার চেয়ে আশি লক্ষ গুণ শক্তিশালী। অনুরূপভাবে পর্যবেক্ষণ এবং গাণিতিক হিসাব করে দেখার পর বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন ২০২৭ সালে এক কিলোমিটার ব্যাসের একটি গ্রহাণু (1999 ANO) প্রতি সেকেন্ডে আশি কিলোমিটার বেগে পৃথিবীর ৩২০,০০০ কিলোমিটার কাছে চলে আসবে। তবে এখনও পরিষ্কার নয় এটি পৃথিবীর কক্ষ পথের কত কাছাকাছি চলে আসতে পারে। এই গতিবেগসহ এই আকৃতির কোনো গ্রহাণু পৃথিবীকে আঘাত হান্তে পৃথিবীর অধিকাংশ প্রাণী ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। আমেরিকার অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাশূন্য পর্যবেক্ষক ডঃ টম গিহরিলস (Tom Gehrels) এখন প্রতিমাসে দুই থেকে তিনটি করে পৃথিবীর নিকটবর্তী গ্রহাণুর (Near Earth Asteroids) সন্ধান পাচ্ছেন।

জ্যোতি পর্দার্থবিজ্ঞানীরা নিয়মিত মহাশূন্য পর্যবেক্ষণ করে যে সমস্ত বিশ্বয়কর তথ্য নিত্য-নতুন পাচ্ছেন তাতে বিজ্ঞানীদের মধ্যে ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এজন্য সম্প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন। NASA ২০০৬ সালের মধ্যে এক কিলোমিটার বা তার অধিক ব্যাসের গ্রহাণুগুলির চলার পথ নিরূপণ করার পরিকল্পনা নিয়েছে। পরবর্তী দশ বছরে (২০০০ সালের পর) NASA আশা করে ১০০ কোটি ডলার ব্যয়ে গ্রহাণু ও ধূমকেতু সম্পর্কে আরও অধিক জ্ঞানলাভ করবে। এর সিংহভাগ অর্থই ব্যয় হবে ভবিষ্যতে পৃথিবীকে আঘাতকারী সংঘাবনাময় পৃথিবীর সন্নিকটবর্তী বস্তুর (NEO) অনুসন্ধান এবং অনুসরণের গবেষণা। জাপানও মহাশূন্য পর্যবেক্ষণে গ্রহাণুর গতিবিধির জন্য পরিকল্পনা করতে যাচ্ছে। ছেট বৃটেন আড়াইকোটি

পাউন্ড ব্যয়ে একটি টেলিস্কোপ স্থাপন করতে যাচ্ছে, যা NEO কে অনেক দূর থেকে চিহ্নিত করতে পারবে বলে আশা করছে।

ইউরোপীয়ান স্পেস এজেন্সী (ESA) দীর্ঘদিন থেকে NEO এর উপর সতর্ক দৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণ করে আসছে। একটি প্রাইভেট সংস্থা ইউরোপীয়ান স্পেস রিসার্চ ইনসিটিউট সমগ্র পৃথিবীব্যাপী NEO গবেষণার জন্য পৃষ্ঠপোষণ ও সমর্থন রক্ষা করে চলছে।

অতি সম্প্রতি মঙ্গল গ্রহ থেকে প্রাণু বিভিন্ন ছবি এবং অন্যান্য তথ্য থেকে মহাশূণ্য বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন কোনো এক সময় সেখানে পানি ও জীবন ছিল। মঙ্গল গ্রহে পানি ও জীবনের অস্তিত্ব যে কোনো এক সময় ছিল এ বিষয়ে বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই অনেকটা নিশ্চিত তবে আরও তথ্য ও প্রমাণের জন্য গবেষণা চলছে। এটিও হয়ত অসম্ভব নয় যে কোনো গ্রহাগু বা ধূমকেতুর আঘাতে সেখান থেকে জীবনের বিলুপ্তি ঘটিয়েছে। মঙ্গলগ্রহ থেকে প্রাণু ছবিতে একটি শুক্র জীবনশূন্য মরম্ভন্মির চিত্র ফুটে ওঠে।

সারকথা

মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ পরিণতি নির্ভর করছে দৃশ্য ও অদৃশ্য পদার্থ (অদীগ্ন পদার্থ) এবং মহাকর্ষ বলের বিপরীত অদীগ্ন শক্তি (Dark Energy) বা বিপরীত মহাকর্ষের (Anti-gravity) ভবিষ্যৎ ভূমিকার উপর। অদীগ্ন বা অদৃশ্য পদার্থ এবং অদীগ্ন শক্তির অস্তিত্ব সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের নিকট অনেক পরোক্ষ তথ্য প্রমাণ থাকলেও এ পর্যন্ত এ সম্পর্কে কোনো সঠিক ধারণা নেই।

আমাদের সৌরজগতের সূর্য একটি তারকা এবং এর পারমাণবিক জ্বালানি শেষ হলে সমস্ত গ্রহকে ফ্রাস করবে এবং সবকিছু মিলে ঝ্যাকহোলে পতিত হবে। মিস্কিওয়ে (ছায়াপথ) গ্যালাক্সি মহাবিশ্বের অন্যান্য সমস্ত গ্যালাক্সির তারকাদের পারমাণবিক জ্বালানি শেষ হলে একই রকম পরিণতি হবে।

আমাদের পৃথিবী সূর্যের প্রারম্ভিক জ্বালানি শেষ হওয়ার অনেক পূর্বে যে কোনো সময় পৃথিবীর সন্নিকটবর্তী বস্তুর (NEO) আঘাতে সমস্ত জীবন ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে মঙ্গলগ্রহের মতো শুক্র প্রাণী-উদ্ভিদ শূন্য মাটিতে পরিণত হতে পারে।

কোরানে মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ পরিণতি

অদৃশ্য বস্তু/বল/বিষয়

সাম্প্রতিক বিজ্ঞানীরা নিশ্চিতভাবে অনুমান করছেন মহাবিশ্বের সমস্ত দৃশ্য ও অদৃশ্য বস্তুর ভবিষ্যৎ গতি-প্রকৃতির উপর নির্ভর করছে আমরা যে মহাবিশ্বে বাস করছি তা প্রকৃতপক্ষে কটটা বিপদজনক হতে পারে। অতি সম্প্রতি আবিষ্ট অদীঙ্গ শক্তি (অদৃশ্য বিষয়) নীতিগতভাবে কোনো সময় ভিন্নরূপ নিয়ে বিশ্বয়কর কোনো কিছু ঘটাতে পারে। এমনকি কোনো দিন হয়তো-এর দিক পরিবর্তিত হয়ে মহাকর্ষ শক্তিকে (gravity) আরও শক্তিশালী করে মহাবিশ্বের দ্রুত সংকোচন করতে পারে।

বিজ্ঞানীরা যেমন মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ পরিণতিতে অদৃশ্য বস্তুর একটা বিরাট ভূমিকার কথা অনুমান করছেন, পবিত্র কোরানে বেশ কিছু আয়াতে এর সূষ্পট ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

- অবিশ্বাসীরা বলে আমরা কিয়ামতের (মহাপ্রলয়) সম্মুখীন হবো না। বল কেন হবে না, নিশ্চয়ই তোমাদের ওর সম্মুখীন হতে হবে; শপথ আমার প্রতিপালকের, যিনি অদৃশ্য সমস্কে সম্যক পরিজ্ঞাত, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে কিছুই যার অগোচর নয় ... (৩৪:৩)

- তিনিই যথাযথভাবে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। যেদিন তিনি বলবেন: হয়ে যা, অতঃপর হয়ে যাবে। তাঁর কথা সত্য, যেদিন শিঙায় ফুৎকার করা হবে। সেদিন তাঁরই আধিপত্য হবে। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞাত। তিনিই বিজ্ঞানময়, সর্বজ্ঞ। (৬:৭৩)

- তুমি (মুহাম্মাদ) বল, তোমরা যা সত্ত্বের চাইছো, তা যদি আমার নিকট থাকত, তবে নিশ্চয় আমার ও তোমাদের মধ্যে মীমাংসা হয়ে যেত এবং আল্লাহ সীমালজ্ঞনকারীদের সমস্কে পরিজ্ঞাত আছেন। আর তাঁরই নিকট অদৃশ্য বিষয়ের চাবিসমূহ (কুজিকা/ভাণ্ডার) আছে তিনি ব্যতীত কেউই তা অবগত নয়। (৬:৫৮-৫৯)

- নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের গোপন রহস্য (অদৃশ্য বিষয়) আল্লাহর কাছেই রয়েছে, এবং সেই মুহূর্তের (কিয়ামতের) ব্যাপার তো চক্ষুর পলকের ন্যায় বরং তা অপেক্ষাও সত্ত্বে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (১৬:৭৭)

অতিসম্প্রতি বিজ্ঞানীরা মহাজাগতিক বিভিন্ন দৃশ্যমান বস্তুর (যেমন তারকা, গ্যালাক্সি, ফ্লাস্টার ইত্যাদির) গতিবিধি থেকে আমাদের মহাবিশ্বে প্রচুর অদৃশ্য বস্তুর (অদীঙ্গ পদার্থ ও বল) অস্তিত্বের কথা নিশ্চিতভাবে অনুমান করছেন। মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ পরিণতি কি হবে তা নির্ভর করবে এ সমস্ত অদৃশ্য বস্তুর প্রকৃতি ও গতিবিধির উপর।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যখন মুঠিমেয় কিছু জ্যোতির্বিজ্ঞানী প্রথম মহাজাগতিক অদৃশ্য বস্তুর অস্তিত্বের কথা বলতে শুরু করেন তখন অন্য সমস্ত বিজ্ঞানীর কাছে এদের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিরাট

বির্তকের সৃষ্টি করে। কিন্তু আজ সব বিজ্ঞানীই মহাবিশ্বের শতকরা নববই ভাগই অদৃশ্য বস্তু বলে নিশ্চিত অনুমান করছেন। অথচ আজ থেকে প্রায় সাড়ে চৌদশত বছর আগে নিরক্ষর নবী হয়রত মুহাম্মদ (স:) এর নিকট অবর্তীর্ণ কোরানে বিভিন্ন আয়াতে নানাভাবে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে।

- আমি শপথ করছি, তার যা তোমরা দেখতে পাও এবং যা তোমরা দেখতে পাও না। (৬৯:৩৮)
- তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারও নিকট প্রকাশ করেন না। (৭২:২৬)
- আপনি বলে দিন আল্লাহ ব্যতীত নভোমগুল ও ভূমগুলের কেউই অদৃশ্যের কোনো জ্ঞান রাখে না। (২৭:৬৫)

উপরে উল্লেখিত অনুরূপ আয়াতের আমরা আরও সঞ্চান পাই- ২৭:৭৫, ৩৫:৩৮, ৩৯:৪৬, ৪৯:১৮, ৩৪:৮৮, ৬২:৮, ৬৪:১৮, ৮৭:৭, ২:৩৩ ইত্যাদি।

কোরানে বেশ কিছু রহস্যময় আয়াতের মধ্যে সপ্ত আসমান সংক্রান্ত আয়াতগুলি অন্যতম। ইসলামী আলেম সমাজ ও চিন্তাবিদদের মধ্যে এই সপ্ত আসমান সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের মতভেদ রয়েছে। মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ পরিণতিতে এই সপ্ত আসমানের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সুতরাং এই সপ্ত আসমান সম্পর্কে একটা ধারণা থাকা প্রয়োজন। আল্লাহর অসীম বিশাল সৃষ্টি মানুষের সীমিত জ্ঞানের নাগালের বাইরে। তবু কোরানের বিভিন্ন স্থানে আকাশ সম্পর্কিত আয়াত থেকে সপ্ত-আকাশ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করার চেষ্টা করছি। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহতা'লার কাছে প্রকৃত জ্ঞান, করুণা ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

আকাশের সংখ্যা সাতটি এবং তা স্তরে স্তরে বিন্যস্ত। নিম্নলিখিত আয়াতগুলি থেকে তা প্রতীয়মান হয়।

- তিনি স্তরে স্তরে সপ্ত-আকাশ সৃষ্টি করেছেন। (৬৭:৩)
 - তিনি আকাশের দিকে মনোসংযোগ করেন এবং তা সপ্ত আকাশে বিন্যস্ত করেন। (২:২৯)
- অনুরূপ আয়াতের সংখান মেলে ১৭:৪৪, ২৩:৮৬, ৪১:১২, ৬৫:১২, ৭১:১৫ ইত্যাদিতে।
- সপ্ত-আকাশের মধ্যে নিকটবর্তী আকাশ বা প্রথম আকাশ সম্পর্কে কোরানে বেশ কয়েকটি সুম্পত্তি আয়াত রয়েছে। এবার আমরা এই ধরনের আয়াতের মাধ্যমে নিকটবর্তী আকাশ সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা পেতে পারি।
- অতঃপর সে ধোঁয়াগুলি দু'দিনে সাত-আসমানে রূপান্তর করেদিলেন এবং প্রত্যেক আসমানকে তার কর্তব্য ব্যক্ত করলেন। নিকটবর্তী আসমানকে দীপমালা দ্বারা সুসজ্জিত করলেন এবং সুরক্ষিত করলেন। (৪১:১২)
 - নিশ্চয়ই আমি নিকটবর্তী আসমানকে তারকারাজি সৌন্দর্য দ্বারা সুশোভিত করেছি। (৩৭:৬)
- অনুরূপ আয়াত রয়েছে ৫০:৬ এবং ৬৭:৫ তে।

এছাড়া ১৫:১৬, ২৫:৬১ এবং ৮৫:১ নং আয়াতে আকাশে 'বরঞ্জ' স্থাপন বা তার শপথের কথা বলা হয়েছে। অধিকাংশ কোরানের অনুবাদকগণ বরঞ্জ শব্দটির অনুবাদ করেছেন রাশিচক্র, কক্ষপথ ইত্যাদি। মাওলানা ফতে মোহাম্মদ সাহেব কোরানের উর্দু অনুবাদের ইংরেজি অনুবাদ করেছেন পিকথ্যাল (Pickthall)। যেখানে 'বরঞ্জ' শব্দের অর্থ করা হয়েছে mansions of the stars নক্ষত্ররাজির বিশালবাড়ি যা প্রকারাত্তে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ভাষায় গ্যালাক্সিকেই বোঝায়। 'বরঞ্জ' শব্দের অর্থ যে গ্যালাক্সি হওয়া উচিত এ সম্পর্কে বিস্তৃত জানতে হলে কাজী জাহান মিয়ার আল কোরআন দ্য চ্যালেঞ্জ মহাকাশ পর্ব-১ গ্রন্থটির ১৭৪ থেকে ১৮৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত

পড়ে দেখার জন্য অনুরোধ করছি। 'বরঞ্জ' শব্দের অর্থ গ্যালাঞ্জি ধরে নিলে ১৫:১৬ ও ২৫:৬১ নং আয়াতে আকাশে গ্যালাঞ্জি স্থাপন এবং ৮৫:১ নং আয়াতে গ্যালাঞ্জির আকাশের শপথ বা নির্দশনের কথা বলা হয়েছে। (৮৫ নং সুরাটির নাম সুরা আল-বরঞ্জ)

আমাদের নিকটবর্তী বা প্রথম আকাশে, তারকারাজি বা প্রদীপমালা এবং গ্যালাঞ্জিসমূহ স্থাপনের কথা বলা হয়েছে এবং এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে ৪১:১২, ৩৭:৬, ৫০:৬, ৬৭:৫, ১৫:১৬, ২৫:৬১, ৮৫:১ আয়াতগুলিতে এবং অন্য যে কোনো আয়াতে তারকারাজি, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, গ্যালাঞ্জি এবং অন্যান্য মহাজাগতিক বস্তুর কথা এসেছে সেখানেই 'আকাশ' শব্দটি এক বচনে উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ সামায়ি! কোরানের কোথাও চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, গ্যালাঞ্জিখচিত আকাশের কথা বহুবচনে আসেনি। তাই এখান থেকে সুস্পষ্টভাবে বলা যায় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আজ পর্যন্ত দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যে মহাবিশ্ব দেখছে তা কোরানে উল্লেখিত নিকটবর্তী বা প্রথম আকাশ অন্য কথায় বিজ্ঞানীদের পরিচিত মহাবিশ্ব এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র প্রথম বা নিকটবর্তী আকাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত দ্বিতীয় আকাশ থেকে সগু আকাশের সক্ষান পাননি। তবে বেশ কিছু জ্যোতির্বিজ্ঞানীর তত্ত্ব (theory) মতে আমরা যে মহাবিশ্ব অবলোকন করছি তার বাইরে অন্য মহাবিশ্বের অঙ্গিত্বের কথা বলছেন। যদিও বিজ্ঞানীদের কাছে এখন পর্যন্ত কোনো গ্রহণযোগ্য প্রমাণ নেই তবুও অবলোকিত মহাবিশ্বের বেশ কিছু তথ্যের উপর ভিত্তি করেই অন্য ধরনের মহাবিশ্বের অঙ্গিত্বের কথা বলছেন। এ বিষয়ে এই গ্রন্থের অন্য অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা পাবেন।

উপরের আলোচনা হতে নিকটবর্তী আকাশ বা প্রথম আকাশ সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। এবার অন্যান্য আকাশ সম্পর্কে ধারণা করার জন্য কোরানের আরও কিছু আয়াত পর্যালোচনা করতে চাই।

প্রথমেই পূর্বোল্লেখিত ৪১:১২ আয়াতটি থেকে প্রতীয়মান হয় যে শুধুমাত্র প্রথম বা নিকটবর্তী আকাশই তারকারাজি দ্বারা গঠিত বাকি আকাশগুলি যদি তারকা বা গ্যালাঞ্জি সমূহ থাকত তবে আলাদাভাবে নিকটবর্তী আকাশের কথা বলার প্রয়োজন হতো না এবং এখানে আরও উল্লেখ্য যে নিকটবর্তী আকাশকে এক বচনে বলা হয়েছে অর্থাৎ শুধুমাত্র একটি আকাশই গ্যালাঞ্জি বা তারকারাজি এবং সৌরজগৎ দ্বারা গঠিত। অন্য কথায় আমাদের জানা মহাবিশ্ব।

উপরের আয়াতে (৪১:১২) আর একটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে সমস্ত আকাশ সৃষ্টিতে একই মস্লা অর্থাৎ প্রথম সৃষ্টির আদি ধোঁয়া (হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস) ব্যবহৃত হয়েছে। নিকটবর্তী আকাশে আল্লাহ আদি ধোঁয়া থেকে কোটি কোটি গ্যালাঞ্জি, গ্রহ, চন্দ্র, সূর্য, প্রচুর পরিমাণ অদীগু পদার্থ এবং এখন পর্যন্ত আমাদের না জানা অনেক কিছু সৃষ্টি করেছেন। নিকটবর্তী আকাশ ছাড়া অন্যান্য আকাশগুলি (দ্বিতীয় থেকে সগু) সৃষ্টিতে আল্লাহতাল্লা একই উপাদান (আদি ধোঁয়া) ব্যবহার করলেও তাদের গঠন প্রকৃতি ভিন্নরূপ হতে পারে। এবার নিম্নলিখিত

আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করুন।

- “আর তোমাদের রবের ক্ষমা ও জান্মাতের জন্য দ্রুত অগ্রসর হও, যার প্রশংস্ততা ই'ল আসমান
ও জমিন সমতুল্য (জুড়ে) (৩:১৩৩)

এখানে স্বভাবতই একটা প্রশ্ন আসে জান্মাত এই সঙ্গে আকাশের একটি আকাশ কিনা? এবার আমরা
কোরানের বিভিন্ন আয়াত থেকে এ প্রশ্নের উত্তর খোজার চেষ্টা করব।

কোরানের বিভিন্ন আয়াত থেকে জান্মাত বা বেহেশ্ত সম্পর্কে আমরা যে চিত্র পাই তা নিম্নরূপ-

- নদীসমূহ প্রবাহ (৩:১৫, ৩:১৩৬, ৩:১৯৮, ৪:১২২, ৫:৮৫, ৫:১১৯, ৭:৮২-৮৩, ২২:১৪
২০:৭৬ ইত্যাদি আয়াতে।)

- প্রসবন (১৫:৮৫, ৭৬:৬, ৭৭:৮১, ৫১:১৫, ৪৪:৫২, ৮৮:১২ ইত্যাদি আয়াত)

- সুশীতল (বৃক্ষ) ছায়া (৩৬:৫৬, ৫৬:৩০, ৭৬:১৮, ৭৭:৮১)

- স্বর্গীয় উদ্যান (৫৬:১২, ৫৬:২৮, ৭৬:১২, ৭৮:৩২)

- সুপেয় পানীয় (৩৮:৫১, ৪৩:৮১, ৫৬:১৮, ৭৬:১৭, ২১, ৭৭:৮৩, ৭৮:১৪, ৮৮:১৪)

- স্বর্ণ (১৮:৩১, ২২:২৪, ৩৫:৩৩, ৪৩:৭১, ৫৬:১৫)

- রৌপ্য (৭৬:১৫, ৭৬:২১)

- মুক্তা (২২:২৪, ৩৫:৩৩)

- রেশমী বস্ত্র (পোষাক) (১৮:৩১, ৩৫:৩৩, ৪৪:৫৩, ৭৬:১২,২১)

- সুউচ্চ প্রাসাদ দান (২৯:৫৮)

- শয়্যা উপাদান, বিছানা, গালিচা (৭৮:১৩, ১৫-১৬)

- প্রচুর ফলমূল (১৩:৩৫, ৩৬:৫৭, ৩৮:৫১, ৪৩:৭৩, ৫৬:২০, ৪৪:৫৫ ইত্যাদি)

- কুল বৃক্ষ, কাদি ভরা কলা (৫৬:২৮-২৯)

- ঈলিত পক্ষী মাংস (৫৬:২১)

- অপরিমিত জীবনে উপকরণ (৪০:৮০)

অর্থাৎ আমাদের পার্থিব জীবনের অনেক উপকরণই আল্লাহতা'লা জান্মাতবাসীদের জন্য প্রতিশ্রুতি
দিয়েছেন। আমাদের পৃথিবীর জমিন বা ভূমির সঙ্গে জান্মাত বা বেহেশ্তের একটা সাদৃশ্য রয়েছে
এ সম্পর্কেও আমরা তথ্য পাই নিম্নলিখিত কোরানের আয়াতে।

- তারা (জান্মাতে প্রবেশকালে) বলবে- সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের প্রতি তার
প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং আমাদের এই ভূমির (জমিনের) অধিকারী করেছেন। আমরা
জান্মাতে যেখানে খুশি বসবাস করবো। (৩৯:৭৪)

এছাড়া আমরা একটা হাদিস থেকে জানতে পারি সবচাইতে কম মর্যাদার ব্যক্তিকে যে জান্নাত দেওয়া হবে তার পরিমাণ পৃথিবীর দশগুণ। সুতরাং আমাদের জানা মহাবিশ্ব যেমন কোটি কোটি নক্ষত্র গ্রহ-উপগ্রহের সমন্বয়ে গঠিত জান্নাত তেমনি কোটি কোটি গ্রহ সাদৃশ্য জমিন বা ভূমির সমন্বয়ে গঠিত। অর্থাৎ জান্নাত তৈরি করতে নিকটবর্তী আকাশের মতো (আমাদের জানা মহাবিশ্ব) উপাদানের (আদি ধোঁয়া) প্রয়োজনীয়তা এখান থেকে উপলব্ধি করা যায়।

উপরের আলোচনা থেকে 'জান্নাত' যে কোরানে বর্ণিত সগু আসমানেরই একটা অংশ তা বুঝতে কষ্ট হয় না। আর এই যুক্তির সপক্ষে কোরানে আরও একটি সুস্পষ্ট আয়াত রয়েছে, এবার তা লক্ষ্য করুন।

- আকাশে রয়েছে তোমাদের জীবনোপকরণের উৎস ও প্রতিশ্রুত সব কিছু। (৫১:২২)

উপরোক্ত আয়াতের প্রথম অংশের বিস্তৃত আলোচনা এই গ্রন্থের অন্য অধ্যায়ে পাবেন আর দ্বিতীয় অংশটি অর্থাৎ প্রতিশ্রুত সবকিছু বলতে আল্লাহতা'লা আমাদের পার্থিব জীবন সমাপ্তির পর বেহেশত বা জান্নাত ও জাহান্নাম বা নরকের যে প্রতিশ্রুতি কোরানের বিভিন্ন আয়াতে করেছেন তাকেই বোঝানো হয়েছে।

জান্নাত সগু আকাশের একটি আকাশ হলে এবার ব্রহ্মাবতই মনে প্রশ্ন জাগে এই জান্নাতের অবস্থান কোন আকাশে? এটা বোঝার জন্য নিম্নলিখিত হাদিসটি লক্ষ্য করুন।

- 'জান্নাতসমূহের একটিই মাত্র ছাদ থাকবে তা আরশে ইলাহীরই ছাদ।'

অর্থাৎ জান্নাত সগুম আকাশে উপস্থিত বলে প্রতীয়মান হয়।

সগুম এবং প্রথম বা নিকটবর্তী আকাশের অবস্থান সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা পেলাম। অন্যান্য আকাশসমূহের আলোচনার পূর্বে আমরা আল-কোরান থেকে এই সগু আকাশের বিস্তৃতি কতদূর তা বোঝার চেষ্টা করবো। এটা বোঝার জন্য কোরানে আল্লাহ 'আরশ' সম্পর্কে কিছু আয়াতে উল্লেখ করেছেন-

- যিনি নভোমগুল ও ভূমগুল এবং উভয়ের মধ্যস্থিত বস্তুসমূহকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি আরশের দিকে মনোনিবেশ করেছেন। (২৫:৫৯)

অনুরূপ আয়াত রয়েছে ৭:৫৪, ১০:৩ এবং ৩২:৪ এ।

উপরের আয়াতগুলি থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে আল্লাহর আরশ সগু আসমানের বাইরে উপস্থিত এবং তা সমস্ত নভোমগুল ও ভূমগুলকে পরিবেষ্টন করে আছে তা বোঝা যায় নিম্নলিখিত আয়াত থেকে।

- তাঁর সিংহাসন (কুরসী) নভোমগুল ও ভূমগুল পরিবেষ্টন করে আছে। (২:২৫৫)

'কুরসী'- হচ্ছে আল্লাহর সম্মানিত আসন।

রসূলুল্লাহর (স:) হাদিস থেকে জানতে পারি কুরসীর তুলনায় সম্পূর্ণ দুনিয়া মরুভূমিতে ছুড়ে ফেলা

একটি আংটির মতো ক্ষুদ্র । অনুরূপভাবে আরশের তুলনায় কুরসী মরম্ভিতে ছুড়ে ফেলা আংটির মতো ক্ষুদ্র । তাবারী, তফসীর ৩-৭৭ । অতএব আরশের বিস্তৃতি সবচেয়ে বিশাল । আল্লাহর এই আরশ কোরানে বর্ণিত মহাবিশ্ব অর্থাৎ সগু আকাশ এবং এর মধ্যবর্তী যা কিছু আছে সবকিছু চারিদিক থেকে পরিবেষ্টন করে আছে । এটা কতকটা একটা ডিমের মধ্যভাগ হলুদ অংশটুকু যদি সগু আকাশ হয়, সাদা অংশটুকু আল্লাহর আরশ সমতূল্য ।

এ পর্যন্ত উপরের আলোচনায় প্রথম এবং সগুম আকাশ সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায় । বাকি দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ আকাশের আলাদাভাবে বিস্তৃত কোনো কোরানে পরিলক্ষিত হয় না । তবে নিম্নলিখিত আয়াতগুলি থেকে পরোক্ষভাবে আরও আকাশের সম্বন্ধ পাওয়া যায় ।

- উভয়ের (স্বর্গ ও নরক) মধ্যে পর্দা থাকবে এবং আরাফের (স্বর্গ ও নরকের মধ্যে উচ্চস্থান বা প্রাচীর) উপরিস্থিত লোকেরা তাদের প্রত্যেককে লক্ষণ দ্বারা চিনবে । এবং স্বর্গবাসীদের সম্মোধন করে বলবে- তোমাদের শান্তি হোক । তারা যখনও জাহানে প্রবেশ করে নি, কিন্তু আশা করে ।
(৭:৪৬)

- আরাফবাসীগণ যাদের লক্ষণ দ্বারা চিনবে, তাদের সম্মোধন করে বলবে- তোমাদের দল ও তোমাদের অহঙ্কার (নরকবাসীদের) কোনো কাজে আসল না । (৭:৪৮)

উপরের ৭:৪৬ নং আয়াতে স্বর্গ ও নরকের মধ্যে একটা পর্দার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং ৭:৪৬ ও ৭:৪৮ নং আয়াতে 'আরাফ' যার আভিধানিক অর্থ উচ্চস্থান বা প্রাচীর করা হয়েছে । হতে পারে স্বর্গ ও নরকের মধ্যে এই পর্দা এবং 'আরাফ' সগু আকাশের আরও দু'টি আকাশ । শেষ বিচার দিন সংলগ্ন কোনো সময়ে ৮১:১১ আয়াতে আকাশের আর একটি আবরণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ।

- যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হবে । (৮১:১১)
- এবং যখন জাহানামে আগুন উদ্বীপিত হবে । (৮১:১২)
- এবং যখন জাহানাত নিকটবর্তী হবে । (৮১:১৩)

আকাশের আবরণ অপসারণ করে জাহানকে নিকটবর্তী অর্থাৎ প্রথম আকাশের কাছাকাছি আনা হবে । এই আবরণটি হয়ত আমাদের জানা মহাবিশ্বকে (নিকটবর্তী আকাশ) জাহান থেকে পৃথক্কারী কোনো আবরণ এবং একই সঙ্গে কোরানে বর্ণিত সগু আকাশের কোনো একটি আকাশ ।

কোরান ও হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি আল্লাহতা'লার আদেশে বিভিন্ন ফেরেশতাগণ সমগ্র সৃষ্টি ব্যবস্থার যাবতীয় কার্য সমাধা করে থাকেন । আরশ যেমন আল্লাহর ক্ষমতায় সিংহাসন বা সদর দফতর । সেখান থেকে আল্লাহ লওহে মাহফুজ, সিদরাতুল মুনতাহা ইত্যাদির মাধ্যমে ফেরেশতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে তাঁর আদেশ দিয়ে থাকেন । তেমনি সগু আকাশের এক বা একাধিক আকাশ হতে পারে ফেরেশতাদের সদর দফতর । আকাশ মন্তব্য অনেক ফেরেশতার কথা উল্লেখ আছে ৫৩:২৬ আয়াতে । হাদিসে মিরাজের বিবরণ থেকে আমরা হ্যাত মুহাম্মাদ

(সঃ) এর সঙ্গ আকাশ পরিভ্রমণের কথা জানতে পারি। প্রথম থেকে বিভিন্ন আসমানে বিভিন্ন নবীর সঙ্গে সাক্ষাতের বর্ণনা পাওয়া যায়।

ছই মুসলিম শরীফের কিতাবুল ঈমান (প্রথম গ্রন্থের ৩২ নং হাদীস) গ্রন্থের আবদুল্লাহ বিন ওমর বর্ণিত একটি হাদীস থেকে ষষ্ঠ আসমানে সিদরাতুল মুনতাহার অবস্থানের কথা জানা যায়। হাদীসটি নিম্নরূপ :

‘আল্লাহর রসূলকে (সঃ) মেরাজের রাত্রিতে সিদরাতুল মুনতাহাতে নেওয়া হয়েছিল। এটি ষষ্ঠ আসমানে উপস্থিত। পৃথিবী থেকে যা কিছু আরোহণ করে এটিই তার প্রান্তসীমা এবং এখানেই তা রক্ষিত থাকে। এবং উপর থেকে যা কিছু আসে সবকিছুর প্রান্ত সীমাও এটা এবং সেখানেই তা রক্ষিত থাকে।

নিকটবর্তী আকাশ সম্পর্কে কোরানে বেশ কিছু সূষ্পষ্ট আয়াত আছে। মহাপ্রলয় বা কেয়ামত দিবস সম্পর্কে সমস্ত কোরানে বেশ কিছু আয়াত আছে। সমগ্র কোরানে মহাপ্রলয় দিবসে যেখানেই আকাশ শব্দটি এসেছে সবক্ষেত্রেই শব্দটি এক বচনে প্রকাশ করা হয়েছে। এর দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে মহাপ্রলয় শুধুমাত্র একটি আকাশে সংঘটিত হবে তা হলো নিকটবর্তী আকাশ বা আমাদের জানা মহাবিশ্ব। আর শেষ বিচার দিন সংলগ্ন কোনো সময়ে বিভিন্ন আকাশের মধ্যে একটা পরিবর্তন করা হবে। এখানে আকাশ শব্দটি বহুবচনে প্রকাশ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা এই অধ্যায়ে পাবেন।

৭:১৮৭ আয়াতেও মহাপ্রলয়ের দিনকে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের মধ্যে কঠিন দিন বলা হয়েছে। এখানেও আসমান শব্দটি বহুবচনের অর্থ হতে পারে বিভিন্ন আকাশের মধ্যে পরিবর্তনের ফলে (আয়াত ১৪:৪৮) তাদের মধ্যে যে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হবে তার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে।

এতক্ষণ আলোচিত সঙ্গ-আকাশ সম্পর্কিত কোরানের সব কয়েকটি আয়াতে (২:২৯, ১৭:৪৮, ২৩:৮৬, ৪১:১২, ৬৫:১২, ৬৭:৩ এবং ৭১:১৫) সঙ্গ-আকাশ স্তরে স্তরে বিন্যাস এবং আরবী শব্দ ‘সাবআ সামাওয়াতিন’ শব্দ দুটি ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যদিকে ৭৮:১২-১৩ আয়াত দুটির অনুবাদ মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করুন।

- আমি তোমাদের উর্ধ্বদেশে সুদৃঢ় সঙ্গ (আসমান) গঠন করেছি। এবং একটি প্রদীপ্তি দীপ (সূর্য) সৃষ্টি করেছি। ৭৮:১২-১৩।

এখানে ৭৮:১২ আয়াতে ‘আসমান’ শব্দটির কোনো আরবী শব্দ বা প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয় নাই। এবারে আমাদের পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে সূর্য অভিযুক্তি বায়ুমণ্ডলীয় বিভিন্ন স্তর বা এলাকাকে বিজ্ঞানীরা কিভাবে বিভক্ত করেছেন তা লক্ষ্য করুন।

(১) ট্রোপোস্ফিয়ার (Troposphere) : পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে (শূন্য কিলোমিটার) মেরু অঞ্চলে ৭ কিলোমিটার এবং নিরক্ষবৃত্তে ১৭ কিলোমিটার পর্যন্ত এই বায়ুস্তর বিস্তৃত। উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রাহাস পায়।

(২) স্ট্রাটোস্ফিয়ার (Stratosphere) : ৭/১৭ কিলোমিটার থেকে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত

এলাকা। উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলেও মোটামোটি ছির থাকে। তবে ৪০ কিলোমিটার থেকে ৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত উচ্চতা এলাকা। এই তরকে ওজোন তর বলা হয়। ওজোন অক্সিজেনের চেয়ে ভারী। ফলে সূর্য এবং মহাশূন্য থেকে বিকিরিত অসংখ্য স্লং-দৈর্ঘ্যের তরঙ্গমালার রশ্মিসমূহ (অতি বেগনী রশ্মিসহ) এবং অন্যান্য ক্ষতিকারক রশ্মিকে শোষণ করে এবং ছোট আকৃতির গ্রহানুর (asteroid) আঘাত থেকে পৃথিবীর জীবন-ব্যবস্থাকে রক্ষা করে।

(৩) মেসোক্ষিয়ার (Mesosphere) : ৫০ কিলোমিটার থেকে ৮০/৮৫ কিলোমিটার পর্যন্ত^১ বিস্তৃত এলাকা। ওজোনস্তরের পর থেকেই আবার তাপমাত্রা হ্রাস পেয়ে -৫০°C নেমে আসে।

(৪) ধারমোক্ষিয়ার (Thermosphere) : ৮০/৮৫ কিলোমিটার থেকে ৬৪০ কিলোমিটার বা কিছু অধিক পর্যন্ত এলাকা। এই এলাকায় তাপমাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে কয়েক হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত পৌছায়। উচ্চ তাপমাত্রার ফলে বাতাসের অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেনের অনুভেগে পরমাণুতে পরিণত হয়। এছাড়া সূর্য এবং ব্ল্যাকহোল থেকে বিকিরিত বিভিন্ন রশ্মি এবং বৈদ্যুতিক চার্জযুক্ত কণা এই এলাকার পরমাণুকে তীব্রবেগে আঘাত হেনে স্থলাণুতে (ions) পরিণত করে। এ জন্য এই ত্রুটকে আইনোক্ষিয়ারও (Ionosphere) বলে।

(৫) এক্সওক্ষিয়ার (Exosphere) : আইনোক্ষিয়ারের উপর থেকে এই এলাকা বিস্তৃত। এখান থেকে বায়ু খুব পাতলা হয়ে মহাশূন্যে উঠে।

(৬) ম্যাগনেটোক্ষিয়ার (Magnetosphere) এটি সূর্যের দিকে কয়েক হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। এই এলাকার পৃথিবীর চূম্বকক্ষেত্র সৌর প্রবাহের (Solar wind) সঙ্গে মিথ্যেক্ষিয়া করে।

(৭) ভ্যান এইলিআন বিকিরণ বলয় (Van Allen Radiation Belts) : এই এলাকায় সূর্য থেকে বিকিরিত বিভিন্ন কণা কেন্দ্রীভূত হয়।

সুতরাং ৭৮:১২ আয়াতে উর্ধ্বদেশে সুদৃঢ় সঙ্গ স্থাপন বলতে উপরোক্ত বায়ুমণ্ডলীয় সঙ্গ তর যা ভূ-পৃষ্ঠ থেকে সূর্য অভিযুক্ত বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত তাকেই বুঝানো হয়েছে। ৭৮:১৩ আয়াতে এসে-সূর্যের উল্লেখ, এটাকে আরও সুনিশ্চিত করে। পূর্বে উল্লেখিত সঙ্গ-আসমানের সঙ্গে ৭৮:১২ আয়াতের সঙ্গ (আসমানের) যাতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি না হয়, এ জন্যই হয়ত ৭৮:১২ আয়াতে আসমান শব্দটি ব্যবহৃত হয় নাই।

ট্র্যাটক্ষিয়ার ওজোন তর সূর্য এবং মহাশূন্য থেকে বিভিন্ন ক্ষতিকারক রশ্মিকে শোষণ এবং ছোট ছোট গ্রহানুর আঘাত থেকে পৃথিবীর জীবন-ব্যবস্থাকে রক্ষাকারী ছাদস্বরূপ কাজ করছে। আর এই রক্ষাকারী ছাদ সম্পর্কিত কোরানের আয়াতগুলি নিম্নরূপ :

-আর আমিই তো আসমানকে সুরক্ষিত ছাদ করে দিয়েছি অথচ তারা আসমানের নির্দশনসমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। : (২১:৩২)

এছাড়া আসমানকে 'ছাদ' বা 'সুরক্ষিত ছাদ' হিসাবে উল্লেখ রয়েছে। - ২:২২, ৪০:৬৪, ৪১:১২ আয়াতে।

শিংগাধৰনি এবং মহানাদ

আমাদের জানা মহাবিশ্ব অর্থাৎ কোরানের ভাষায় নিকটবর্তী আকাশ বা প্রথম আকাশের মহাধ্বংস বা কিয়ামত সম্পর্কে কোরানে অনেক আয়াত আছে। এই মহাধ্বংসের প্রারম্ভে এবং বিচার দিন বা পুনরুত্থান দিন সংলগ্ন সময়ে শিংগাধৰনি এবং মহানাদের (বিকট শব্দ) কথা বলা হয়েছে। আল কোরানের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অনেক আয়াতের ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণের জন্য সমার্থক অন্য আয়াতের সাহায্য নিতে হয়। কিয়ামতের ফলে আমাদের জানা সমস্ত মহাবিশ্বের ধ্বংস এবং শেষ বিচার দিন সংলগ্ন সময়ে তা আবার নতুন করে সৃষ্টি সংক্রান্ত কোরানের বিভিন্ন আয়াত সম্পর্কে একটা মোটামুটি পরিকার ধারণার জন্য শিংগাধৰনি এবং মহানাদ সংক্রান্ত আয়াতগুলি বিশেষভাবে সহায়ক হবে।

এ সংক্রান্ত কোরানের বিভিন্ন আয়াতে ব্যবহৃত আরবি শব্দগুলির মধ্যে ‘ছুরুন’ (ছুর) ও ‘নাহু-রি’ শব্দ দু’টি ব্যাপকভাবে অনুদিত হয়েছে শিংগাধৰনি (Trumpet) অর্থে। ‘ছাইহাতুন’ শব্দটির অনুবাদে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মহানাদ বা বিকট শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিংগাধৰনি অনুবাদ করা হয়েছে। কিছু আয়াতে ‘জায়রাহ’ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অধিকাংশ অনুবাদে শব্দটির অর্থ হৃষকি বা মহানাদ উল্লেখ করলেও এটি প্রথম শিংগাধৰনির ইঙ্গিত করা হয়েছে। এবারে উপরোক্ত আরবি শব্দ সম্মিলিত আয়াতগুলির ব্যাখ্যা লক্ষ্য করুন।

বিভিন্ন আয়াতে ব্যবহৃত ‘ছুরুন (ছুর)’ আরবি শব্দের অর্থ শিংগা (trumpet) ছাড়া আরও অনেক অর্থ আছে যেমন- রূপ দেওয়া, আকৃতি প্রদান করা, গঠন করা (form, structure), হেলে যাওয়া (inclination), আকর্ষণ করা ইত্যাদি। সূতরাং শিংগায় ফুৎকারের অর্থ হতে পারে সূরা ‘নাজেয়াতের’ (৭৯ নং) প্রথম আয়াতে বর্ণিত মহাকর্ষ বল (gravitational force) যা সমগ্র মহাবিশ্বের কাঠামো ধরে রাখতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে তার পরিবর্তন করে কোরানে বর্ণিত- সেই কিয়ামত (মহাপ্রলয়) ঘটানোর সভাবনা রয়েছে। যা বিজ্ঞানীদের যুক্তি তর্কের সঙ্গে মিলে যায়। আবার বিচার দিন সংলগ্ন সময়ে এই বলের পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন জমিন গঠন এবং আকাশসমূহের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করা হবে (সূরা ১৪:৪৮)। মহাপ্রলয় এবং পুনঃসৃষ্টির দু’টি প্রক্রিয়াই ‘ছুর’ শব্দের সব ধরনের আভিধানিক অর্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মহাপ্রলয় এবং পুনঃসৃষ্টির সময় বিকট শব্দের সৃষ্টি হওয়াটাও অত্যন্ত স্বাভাবিক।

বিজ্ঞানীদের ধারণামত মহাবিশ্বের সৃষ্টির সূচনা যেমন হয়েছে মহাবিক্ষেপণের (বিগ-ব্যাং) মাধ্যমে তেমনি তা আবার মহাকাশের সমেত তারকার জ্বালানি শেষে ভারসাম্য হারিয়ে গ্রহ, নক্ষত্র এবং বিভিন্ন আন্তঃনক্ষত্রীয় পদার্থ ঝ্যাকহোলে পতিত হয়ে মহাবিশ্বের মহাধ্বংস ঘটবে। একেই বিজ্ঞানীরা বলছেন Big Crunch। আবার দ্বিতীয় বার মহাবিক্ষেপণ (Big Bang-2) এর মাধ্যমে মহাবিশ্বের পুনর্সৃষ্টি হবে।

- আমাদের অধিকাংশ লোকের ধারণা সমস্ত পৃথিবীর জীবন ব্যবস্থার ধ্বংস এবং সমগ্র মহাবিশ্বের (নিম্নতম আকাশের) ধ্বংস বা কিয়ামত একই সঙ্গে ঘটবে, তবে কোরানে এ সংক্রান্ত বেশ কিছু

আয়াত গভীর মনোযোগের সঙ্গে বিচার-বিশ্লেষণ করলে জানা যাবে পৃথিবীর জীবন ব্যবস্থা কিয়ামত বা মহাধ্বংসের অনেক পূর্বেই ঘটবে। এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে পাবেন। প্রথমে আমরা বিভিন্ন আয়াতে মহানাদ বা বিকট শব্দ সম্বলিত আয়াতগুলির আলোচনা করব।

পৃথিবীর জীবন ব্যবস্থা ধ্বংসের জন্য মহানাদ বা বিকট শব্দ ঘটবে (খুব সম্ভব বৃহৎ কোনো গ্রহাণুর পতনের ফলে) তার স্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে নিম্নলিখিত আয়াতগুলিতে। এখানে ‘ছাইহাতুন’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, ‘ছুর’ শব্দটি ব্যবহার করা হয় নি।

- এরা তো এক মহানাদের অপেক্ষায় আছে, যা এদের বাক-বিতঙ্গাকালে আঘাত করবে।
(৩৬:৪৯)

- এরা তো এক মহানাদের জন্য অপেক্ষা করছে যাতে দম ফেল্বার অবকাশ থাকবে না।
(৩৮:১৫)

পৃথিবীর জীবন ব্যবস্থা ধ্বংসের আরও দুটি স্পষ্ট আয়াত বিশেষভাবে লক্ষণীয় সুরা নাজেয়াতের (৭৯:৬-৭) আয়াতে। এ দুটি আয়াত বিভিন্ন অনুবাদকারী বিভিন্ন রকম অনুবাদ করেছেন। অনেক অনুবাদকারী ৬ নং আয়াতে প্রথম শিংগাধৰনি এবং পরবর্তী আয়াতে দ্বিতীয় শিংগাধৰনির কথা উল্লেখ করেছেন। তবে ইউসুফ আলী সাহেবের কোরানের ইংরেজি অনুবাদটি সঠিক বলে মনে হয়। ৭৯:৬ আয়াতে ব্যবহৃত আরবি শব্দ ‘রাজিফাত’ শব্দের অভিধানিক অর্থ হচ্ছে কম্পিত, কম্পমান, কম্পনযুক্ত ইত্যাদি। ইউসুফ আলী সাহেবের উপরোক্ত শব্দটির ইংরেজি অনুবাদ করেছেন commotion যার অর্থ হলো প্রচণ্ড গতি বা আন্দোলন, প্রচণ্ড আলোড়ন, বিক্ষোভ ইত্যাদি। আর ৭৯:৭ নং আয়াতের দুটি শব্দের অর্থই সমার্থবোধক। ইউসুফ আলী সাহেব অনুবাদ করেছেন followed by of repeated (commotion) অর্থাৎ পদানুসারণে পুনরাবৃত্তি। আকাশ থেকে যদি কোনো বৃহৎ গ্রহাণুর প্রচণ্ড গতিতে পৃথিবীতে পতন ঘটে, তার ফলে যে কম্পন বা প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হবে তার শব্দ বারবার প্রতিধ্বনিত হতে থাকবে। এ সময় যদি কেউ জীবিত থাকে (যার সম্ভাবনা খুবই কম) তবে সে এ প্রতিধ্বনি অনেক বার শুনতে পাবে। আজ থেকে সাড়ে ছয় কোটি বৎসর পূর্বে পৃথিবীতে একটা গ্রহাণুর পতনের ফলে ডাইনাসোরসহ প্রায় সমস্ত প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটেছিল তেমনি যদি ভবিষ্যতে আরও বড় কোনো এক বা একাধিক গ্রহাণুর পতন পৃথিবীতে ঘটে তবে তার দ্বারা সৃষ্টির যে ধ্বংসক্রিয়া ঘটবে তা উপরের আয়াত দুটিতে ফুটে উঠেছে। এছাড়া আরও বেশ কয়েকটি আয়াতে পৃথিবীর জীবন ব্যবস্থা ধ্বংসের জন্য প্রস্তরবর্ষী বৃষ্টি (৬৭:১৭), আসমান থেকে কোনো টুকরার পতন ঘটান (৩৪:৯) আঘাতকারী প্রজ্জলমান বস্তুর কথা (৮৬:১-৩) উল্লেখ আছে।

বিচারদিন সংলগ্ন সময়ে যে বিকট শব্দ বা মহানাদ ঘটবে-আরবি ‘ছাইহাতুন’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে নিম্নলিখিত দুটি আয়াতে।

- যেদিন মানুষ নিশ্চিত সেই ভয়াবহ আওয়াজ (মহানাদ) শুনতে পাবে, সেদিনই পুনরুত্থানের দিন। (৫০:৪২)

- এ হবে এক মহানাদ, তখনই ওদের সকলকে আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হবে। (৩৬:৫৩)

বিচারদিন সংলগ্ন সময়ে আরও দুটি আয়াতে ৭৯:১৩ এবং ৩৭:১৯ তে উল্লেখিত আরবি শব্দ 'জায়রাহ'-এর অভিধানিক অর্থ হ'ল তিরকার করা, ধমক দেওয়া, তাড়িয়ে দেওয়া, বিতাড়ন করা। বিভিন্ন অনুবাদে উপরোক্ত অর্থগুলির মোটামুটি সবগুলির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়, তবে অনেকে 'জায়রাহ' শব্দটির অর্থ মহানাদ বা ভয়ঙ্কর শব্দ হিসাবেও উল্লেখ করেছেন। আরও একটি আয়াতে এ সময় কণ্ঠবিদারী ধ্বনির ('চ্ছাখ্খাতু') কথা উল্লেখ আছে।

- অতঃপর যখন কণ্ঠবিদারী মহানিনাদ উপস্থিত হবে। (৮০:৩৩)

এছাড়া কোরানের আরও বিভিন্ন আয়াতে বিকট ধ্বনির (ছাইহাতুন) মাধ্যমে ইতিপূর্বের অনেক অবিশ্বাসী জাতিকে (স্থানীয়ভাবে) ধ্বংসের কথা আছে। সে সমস্ত জায়গায় কোথাও 'ছুর' শব্দটি ব্যবহার করা হয় নি, এবার কোরানে 'ছুর' শব্দ ব্যবহৃত আয়াতগুলি লক্ষ্য করুন।

সমগ্র মহাবিশ্বের (আমাদের জানা) কিয়ামত বা মহাপ্রলয় এবং বিচারদিন সংলগ্ন সময়ে পুনরায় সৃষ্টি সংক্রান্ত কোরানে অনেক সংখ্যক আয়াত এবং বিভিন্ন হাদীসের বর্ণনা থেকে যে চিত্র পাওয়া যায় বর্তমান বিজ্ঞানীদের ধারণার সঙ্গে তার অকল্পনীয় সাদৃশ্য রয়েছে। এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা এই প্রচ্ছের অন্য অধ্যায়ে পাবেন। কোরান ও হাদীসের তথ্য থেকে জানা যায় 'ছুর' বা শিংগার হবে দুটি-প্রথমটির মাধ্যমে সমগ্র মহাবিশ্বের মহাধ্বংস ঘটবে আর দ্বিতীয়টির মাধ্যমে পুনরুত্থান (সৃষ্টি) বা বিচারদিন সংলগ্ন সময়ের পুনর্গঠন ঘটবে। মহাধ্বংস এবং পুনঃসৃষ্টি প্রক্রিয়াটিই কিয়ামত।

- আর সেইদিন শিংগায় ফুক দেয়া হবে, আর তারা সবাই মরে যাবে, যারা নভোমগুল ও ভূমগুলে আছে, সেই লোকদের ছাড়া যাদেরকে আল্লাহ জীবন্ত রাখতে চান। পরে আর একবার শিংগায় ফুক দেওয়া হবে এবং সহসা সকলেই উঠে দেখতে শুরু করবে। (৩৯:৬৮)

উপরের আয়াতটিতে দুটি শিংগাধ্বনির (ছুর) কথাই উল্লেখ আছে। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে প্রথম শিংগাধ্বনির ফলে পৃথিবীর জমিন ছাড়া প্রথম আকাশের অন্যান্য অসংখ্য জমিন [কোরানের অনেক সুরায় মহাবিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অন্যান্য জীব ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়ার কথা উল্লেখ আছে-৪২:২৯, ৫৫:৩৩ এবং জমিন শব্দটি অনেক আয়াতে বহুবচন (আরদি) ব্যবহার করে অসংখ্য জমিনের অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে। বিজ্ঞানীরাও অতি সম্প্রতি মহাবিশ্বের অসংখ্য গ্রহে জীবের অস্তিত্বের উজ্জ্বল সম্ভাবনা এবং তা অনুসন্ধানের কাজে ব্যাপক অগ্রগতির কথা বলছেন] ও আসমানের (ফেরেশ্তারা) সবকিছুর জ্ঞান লোপ বা মৃত্যু ঘটবে। (আয়াতে ব্যবহৃত 'ছাইকা' শব্দটির অর্থ সংজ্ঞাহীন এবং মৃত্যু দুটিই বোঝায়) এখানে আরও উল্লেখ্য আসমান শব্দটি ও এখানে বহুবচনে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম আসমান ছাড়া অন্যান্য আসমানে উপস্থিত খুব সম্ভব সমস্ত ফেরেশ্তারা বয়ানুল কোরআন মনসুরের রেওয়ায়েত অনুযায়ী চার ফেরেশতা জিবরাইল (আ:) মিকাইল (আ:) ইসরাফিল (আ:) ও আযরাইল (আ:) এবং কোনো কোনো রেওয়ায়েত অনুযায়ী আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ ছাড়া সবার মৃত্যু হবে। তাদের ব্যতিক্রমের অর্থ এই যে, শিংগার ধ্বনির প্রভাবে তাদের মৃত্যু হবে না। কিন্তু পরে তারাও মারা যাবে। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকবে না। আর দ্বিতীয় শিংগাধ্বনির মাধ্যমে সবকিছু জীবিত বা পুনঃসৃষ্টি হবে।

কোরানের অনেক আয়াতের বেশ কিছু শব্দের আভিধানিক অর্থ ব্যবহার না করে আগের আয়াতের সঙ্গে অর্থ মিল রাখার জন্য বা অনেক সময় সাধারণ মানুষের প্রচলিত জ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অন্য অর্থ ব্যবহার করা হয়েছে। কোরানের নিম্ন আয়াতটির বহুল প্রচলিত অনুবাদ নিম্নরূপ—
—আমি সেদিন তাদেরকে দলে দলে তরঙ্গের আকারে ছেড়ে দেবো এবং শিংগা ফুৎকার দেয়া হবে। অতঃপর আমি সবাইকে একত্রিত করে আনবো। (১৮:৯৯)

উপরের আয়াতে প্রচলিত অনুবাদে ধারণা হয় ১৮:৯৭ আয়াতে উল্লেখিত ইয়াজুজ ও মাজুজকে দলে দলে ছেড়ে দেওয়া হবে যারা ফুলকারনাইন নির্মিত লৌহ ও তামার প্রাচীরকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করবে। এতে করে পাঠকের ইয়াজুজ ও মাজুজ সম্পর্কে যেমন ভুল ধারণার সৃষ্টি হয় তেমনি সম্পূর্ণ আয়াতের অর্থও ভুল ধারণার জন্ম দেয়। একথা সত্য চারশত বৎসর পূর্বে মানুষের মহাকর্ষ (gravity) সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না। সমগ্র মহাবিশ্বের ভারসাম্য রক্ষাকারী মহাকর্ষ বল (gravitational force)-এর ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়ে মহাবিশ্বের ধ্বংস ঘটিতে পারে। এই মহাকর্ষ বল সর্বত্র মহাকর্ষ তরঙ্গের (gravitational waves) ন্যায় সর্বত্র প্রবাহিত হয়। একমাত্র মহাপ্রাকৃতমশালী সবকিছুর উপর অসীম ক্ষমতাবান আল্লাহতা'লাই পারেন এই মহাকর্ষ বলের ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করে, প্রথমত সমস্ত মহাবিশ্বের ধ্বংস এবং পরবর্তীতে আবার সৃষ্টি করে সবাইকে একত্রিত করতে।

উপরের ১৮:৯৯ আয়াতটিতে দুটি শব্দ বিশেষভাবে লক্ষণীয় 'বাস্ত'-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কতক, কিছু, কতিপয় কোনো অংশ আর ইয়ামুজু এর আভিধানিক অর্থ উত্তাল তরঙ্গ (surge) আকস্মিক দোল, ক্ষীতি, আলোড়ন, সমুদ্রের তরঙ্গ ইত্যাদি। এবার আয়াতটির আভিধানিক অর্থ ঠিক রেখে অনুবাদ লক্ষ্য করুন—

- আমি সেদিন কিছুকে ছেড়ে দিব যা সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের ন্যায় (এটি সম্ভবত প্রথম শিংগার বা ছুর যা সবকিছুকে ধ্বংস করবে) এবং শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে (ছিতীয় শিংগার বা ছুর যা গঠন করবে) অতঃপর আমি সবাইকে একত্রিত করে আনবো। (১৮:৯৯)

উপরের অর্থটির গ্রহণযোগ্যতা আরও স্পষ্টতর হবে এর পূর্বের আয়াতটি (১৮:৯৮) থেকে।
— ফুলকারনাইন বললো— এ আমার প্রতিপালকের রহমত, কিন্তু যখন আমার রবের প্রতিশ্রূতির নির্দিষ্ট সময় আসবে (কিয়ামতের) তখন তিনি তাকে (লৌহ ও তাম্র নির্মিত প্রাচীর) ধূলিশ্বার করে দেবেন। আর আমার রবের প্রতিশ্রূতি সত্য। (১৮:৯৮)

কোরানের ৬৯:১৩-১৪ আয়াতেও অনুরূপ উল্লেখ আছে।

- যখন শিংগায় একটি মাত্র ফুৎকার দেওয়া হবে পর্বতমালা সমেত পৃথিবী উৎক্ষণ হবে, একই ধাক্কায় ওরা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। (৬৯:১৩-১৪)

উপরোক্ত আয়াতগুলি ছাড়া সমগ্র কোরানে 'ছুর' শব্দযুক্ত অন্য সমস্ত আয়াতগুলি এবার লক্ষ্য করুন।

- তিনিই যথাবিধি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। যখন তিনি বলেন 'হও' তখনই হয়ে যায়। তাঁর কথাই সত্য, যেদিন শিংগায় (ছুর) ফুৎকার করা হবে সেদিন তারই আধিপত্য, তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্য সর্ববিষয়ে পরিজ্ঞাতা। ৬:৭৩ এটি সম্ভবত প্রথম শিংগার।

বিচারদিন বা পুনরুত্থান দিন সংলগ্ন সময়ের শিংগার (ছুর) পরিলক্ষিত হয় নিম্নে উল্লেখিত আয়াতগুলিতে-

- বিচারদিন নির্ধারিত আছে, সেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে এবং তোমরা দলে দলে সমবেত হবে। (৭৮:১৭-১৮)

- একদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে, সেটাই শাস্তির দিন। (৫০:২০)

- যখন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে, তখনই মানুষ কবর হতে তাদের প্রতিপালকের দিকে ছুটে আসবে। (৩৬:৫১)

- যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে সেদিন আমি অপরাধীদের নীলচক্র বিশেষ (ভীত বিহুল) অবস্থায় সমবেত করবো। (২০:১০২)

- যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে সেদিন পরম্পরের মধ্যে আত্মায়তার বক্ষন থাকবে না এবং একে অপরের খৌজও নেবে না। (২৩:১০১)

কোরানের ৭৪:৮ আয়াতটিতে 'ছুর' শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি।

- যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে, সেদিন হবে এক সক্ষটের দিন। (৭৪:৮)

উপরের আয়াতটিতে ব্যবহৃত শব্দ 'নুকিরা'র- আভিধানিক অর্থ টোকা মারা, খোদাই করা, বাজানো, ঠোকরানো ইত্যাদি। আর 'ন্নাকুওরি' শব্দের আভিধানিক অর্থ শিংগা বা বিউগল। উপরের প্রথম শব্দটি যেমন 'ছুর' এর প্রতিশব্দ বা সমার্থের মতো তেমনি বিভিন্ন আয়াতে ব্যবহৃত 'ছাইহাতুন' বা মহানাদ সৃষ্টির জন্য শিংগা বা বিউগল বোঝান হয়েছে দ্বিতীয় শব্দটি দ্বারা।

কোরানে দুটি শিংগাধৰনির মধ্যে অর্থাৎ মহাধৰণ এবং পুনরুত্থান দিনের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কর হবে এ সম্পর্কে সুম্পষ্ট কোনো ইঙ্গিত নেই। কিন্তু একজন সাহাবা এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স:) কে দুই ফুৎকারের মধ্যবর্তী সময় কতটা দীর্ঘ জিজ্ঞাসা করেছিলেন। হযরত মুহাম্মাদ (স:) বললেন, দুই ফুৎকারের মধ্যবর্তী সময় "চল্লিশ" সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, "এটা কি চল্লিশ দিন?" রাসূলুল্লাহ (স:) বললেন, "আমি মানি না"। সাহাবাগণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'চল্লিশ বছর কিনা?' রাসূলুল্লাহ (স:) বললেন 'আমি মানি না' সাহাবাগণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, "চল্লিশ মাস কিনা?" রাসূলুল্লাহ (স:) বললেন, "আমি মানি না।" বুখারী শরীফ।

রাসূলুল্লাহ (স:) তিনবারই বলেছেন, "আমি মানি না"। কিন্তু নিজ থেকে বলেননি সময়টি কত? সময়টি একটি সুদীর্ঘ সময় হবে, যা চল্লিশের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং চৌদশত বছর পূর্বের এই সুদীর্ঘ সময় সম্পর্কে মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না বলেই হয়তো তিনি তা উল্লেখ করেন নি এবং সময় যত দীর্ঘই হোক না কেন দ্বিতীয় শিংগাধৰনিতে মানুষ যখন বিচার দিনের সম্মুখীন হবে তখন তার কাছে মনে হবে যে দুনিয়াতে অল্প কিছু মুহূর্ত ছিলো! তার ইঙ্গিত মেলে কোরানের নিম্নলিখিত আয়াতে-

- যেদিন তাদের একত্রিত করবেন, সেদিন (তাদের মনে হবে দুনিয়াতে) যেন তারা একদিনের মুহূর্ত ব্যতীত অবস্থান করেনি। (১০:৪৫); অনুরূপ আয়াত ২০:১০৮, ২৩:১১৩, ৩০:৫৫। আর মৃত্যু অবস্থায় অতিবাহিত সময় অল্প মনে হাওয়া কথা উল্লেখ আছে ১৭:৫২ আয়াতে।

কোরান পৃথিবী, সৌরজগৎ ও মহাবিশ্বের ধ্রংস

আল কোরানের বৈশিষ্ট্যানুসারে কোনো ঘটনাই যেমন পর্যায়ক্রমিক অনুসারে সাজানো নেই, তেমনি আমাদের পৃথিবী, সৌরজগৎ এবং তথা সমগ্র মহাবিশ্বের (নিকটবর্তী আকাশ) মহাপ্রলয় বা কিয়ামত সম্পর্কেও সেই ক্রমধারা রাখা হয় নি। বিভিন্ন সময় থেকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত আমাদের পৃথিবীসহ সমগ্র গ্রহ-উপগ্রহ, অসংখ্য নক্ষত্ররাজি খচিত কোটি কোটি গ্যালাক্সি অন্য কথায় আমাদের জানা সমগ্র মহাবিশ্বের ধ্রংসও সম্পূর্ণ আকাশের মধ্যে যে পরিবর্তন সাধন হবে এ সম্পর্কে সমগ্র কোরানে বেশ কিছু আয়ত রয়েছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই 'কিয়ামত' শব্দের অভিধানিক অর্থ একই সঙ্গে মহাধ্রংস এবং পুনরুদ্ধান বোঝায়।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শতাব্দীতে মানুষের মহান আল্লাহতা'লার প্রতি অবিশ্বাস এবং নানারকম হীন কৃতকর্মের জন্য এবং আল্লাহর প্রেরিত প্রতিনিধিকে (রসূল/নবী) অমান্য করায় আল্লাহ অনেক সংখ্যক জনবসতিকে স্থানীয়ভাবে সম্পূর্ণ ধ্রংস করেছেন। প্রত্নতাত্ত্বিকবিদরা সারা বিশ্বে এ ধরনের প্রচুর ধ্রংসস্তূপের সংক্ষান পেয়েছেন এবং আরো নতুন নতুন ধ্রংসস্তূপ প্রাপ্তির প্রচুর সংজ্ঞাবনার কথা বলছেন। সমগ্র পৃথিবীর জীবন-ব্যবস্থা চিরতরে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত ঘটানোর পূর্বেও স্থানীয়ভাবে মানুষ তথা সবধরনের জীবের উপর বিপর্যয় ঘটতে পারে।

- মানুষের কৃতকর্মের জন্য জলে-স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে ওদেরকে কোনো কোনো কর্মের শাস্তির-আস্থাদন করানো হয়, যাতে ওরা সৎপথে ফিরে আসে। (৩০:৪১)

মানুষ আধুনিক সভ্যতার নামে নানাভাবেই জলে ও স্থলে প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে নষ্ট করে বিপর্যয় সৃষ্টি করছে। এর মধ্যে জলে-স্থলে পারমাণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিক্ষেপণ একটি। আমরা জানি বর্তমানে বিশ্বের অনেক দেশের কাছেই পারমাণবিক বোমা মজুত আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের নাগাসাকি ও হিরোশিমায় পারমাণবিক বোমার বিশাল ধোয়ার আমন্ত্রেলা মানবজাতিকে যে রকম গ্রাস করেছিল বর্তমানেও তার চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী বোমা অদূর ভবিষ্যতে যে কোনো সময় বিক্ষেপণ হতে পারে এবং তা মানব সমাজের বিরাট অংশকে গ্রাস করতে পারে।

- অতএব, আপনি সে দিনের অপেক্ষায় থাকুন, যে দিন আকাশ সুম্পট ধূমাচ্ছন্ন প্রতিপন্ন হবে এবং তা মানবজাতিকে গ্রাস করে ফেলবে। এটা হলো যত্ন গাদায়ক শাস্তি। হে আমাদের পালনকর্তা আমাদের থেকে শাস্তি প্রত্যাহার করুন, নিশ্চয়ই আমরা বিশ্বাস স্থাপন করবো। (৪৪:১০-১২)

- আমি তোমাদের শাস্তি কিছুকালের জন্য প্রত্যাহার করবো। নিশ্চয়ই তোমরা পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে। যেদিন আমি তোমাদের প্রবলভাবে আক্রমণ করবো, সেদিন আমি তোমাদের শাস্তি দেবোই। (৪৪:১৫-১৬)

উপরের সুরা দোখানের (৪৪) কয়েকটি আয়ত সম্পর্কে যদিও অনেক ইসলামী আলেম

সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ আছে, তবে অনেকে মনে করেন এটি হযরত মুহাম্মাদ (স:) এর সময়ে আরবে যে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল সে সময়ের কথা। তবে কোরানে অনেক ঘটনারই উল্লেখ আছে যা নির্দিষ্ট কোনো স্থান কালে সংঘটিত হলেও অনুরূপ ঘটনা ভিন্ন স্থান কাল ও পাত্রভেদে পুনরাবৃত্তি হতে পারে। এ প্রসঙ্গে আমি মুসলিম শরীফের ৪১ নং গ্রন্থের আবু হরাইরা (রা:) বর্ণিত ৭০৪০ নং হাদিসটি উল্লেখ করতে চাই।

- আল্লাহর রসূল (স:) বলেছেন, “তৃরিত ভালো কাজগুলি (এর পূর্বে) ছয়টি জিনিস (ঘটার পূর্বে) : (আবির্ভাব) দজ্জালের জাতি, ধূম, ভূমির জন্ম, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যের উদয়, সর্বজনিন আলোড়ন (যা ব্যাপক নির্বিচার হত্যায় রূপ নিবে) এবং জনসাধারণের ও ব্যক্তি বিশেষের মৃত্যু।”

পৃথিবীর সমস্ত জীবন-ব্যবস্থা চিরতরে ধ্রংস হওয়ার পূর্বে ঘটনাগুলি ঘটবে। তবে সবগুলি একই সময়ে ঘটবে এমন কোনো কথা বলাহয়নি। এগুলি হয়তো বিরাট সময়ের ব্যবধানে সংঘটিত হতে পারে। সুতরাং মহাধ্বংসের পূর্বে আবার আকাশ ধূমাচ্ছন্ন হবে একথা উপরের হাদীসটি থেকে প্রতীয়মান হয়। মানুষের অবাধ্যতার জন্য নানাভাবে আল্লাহ শান্তি প্রেরণ করতে পারেন।

- আপনি বলুন : তিনিই শক্তিমান যিনি তোমাদের উপর কোনো শান্তি উপর দিক থেকে অথবা নিচদিক থেকে প্রেরণ করবেন অথবা তোমাদেরকে দলে উপদলে বিভক্ত করে সবাইকে মুখোমুখী করে দিবেন এবং এককে অন্যের উপর আক্রমণের স্বাদ আস্বাদন করাবেন। (৬:৬৫)

উপরের আয়াতের শেষ অংশে বিভিন্ন জাতি উপজাতির মধ্যে যুদ্ধকেই বোঝান হয়েছে।

পৃথিবীর মানবজাতিসহ সমস্ত জীবন-ব্যবস্থা চিরতরে কীভাবে ধ্রংস হবে, এ সম্পর্কিত কিছু আয়াত নিম্নে উক্ত হলো।

- তোমরা কি নিশ্চিত হয়ে গেছ যে, আকাশে যিনি আছেন তিনি তোমাদের উপর প্রস্তরবর্ষী বৃষ্টি বর্ষণ করবেন না? (৬৭:১৭)

- আমি ইচ্ছা করলে, তাদেরসহ জমিন ধ্বনিয়ে দেব অথবা আসমান থেকে কোনো টুকরার পতন ঘটাব। (৩৪:৯)

- শপথ আকাশের এবং সহসা আঘাতকারীর। (৮৬:১)

- তুমি কি জান এই সহসা আঘাতকারী বস্তুটি কি? (৮৬:২)

- এটা একটি প্রজ্ঞলমান জ্যোতিশ। (৮৬:৩)

সুরা ত্বারিক (৮৬)-এর প্রথম দুই আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ ‘ত্বারিক্তি’ এর ক্রিয়াপদ ‘তারাকা’ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো কড়া নাড়া, শব্দ করা, সহসা আঘাত করা (Blow, strike, fall upon at surprise), রাতে আগমন করা। প্রচলিত অনুবাদে শেষ অর্থটি গ্রহণ করে অনুবাদ করা হয়েছে। তৃতীয় আয়াতে ‘নাজমু’ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো তারকা, ঘাস, টুকরা জ্যোতিশ। এখানে উল্লেখ্য যে প্রচণ্ড বেগে পতনশীল কোনো গ্রহাণু (asteroid) পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আঘাত

করার সঙ্গে সঙ্গে প্রজ্ঞালিত হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে ।

উপরের আয়াতগুলি পর্যালোচনা করলে আমরা পাই কোনো মহাজাগতিক বস্তু বা এহ সদৃশ বস্তু (কাওকাব) । পৃথিবীকে আঘাত করার কারণে পৃথিবীর উপর প্রচণ্ড কম্পন, বিকট শব্দ, আলোকচ্ছটা, উভাপ, পারমাণবিক ধূলিকণার মেঘ, জলোচ্ছাস, চাঁদ, সূর্য ও নক্ষত্রের আলো নিস্পত্ত হবার মতো তথ্যগুলি যে কোনো বিজ্ঞান সচেতন মানুষকে আকৃষ্ট করে । যদি কখনও এই পৃথিবীকে কোনো এহ সদৃশ বস্তু বা কাওকাব আঘাত করে তবে এই আঘাতের প্রচণ্ড ধার্কায় বিশাল আকারের ধূলিকণার মেঘ উৎক্ষিণ হবে । এই ধূলির কারণে চাঁদ-সূর্যের আলো ও তেজ পৃথিবী হতে আড়াল হয়ে যাবে । নক্ষত্র আর কোনো জ্যোতি প্রেরণ করতে সক্ষম হবে না । পৃথিবীতে কোনো সূর্যের আলো পৌছাবে না, আবার সেই সঙ্গে পৃথিবীকে সূর্যের ক্ষতিকারক রশ্মি থেকে রক্ষাকারী ওজোন স্তর বিনষ্ট হয়ে সমস্ত গাছ-পালা নিজস্ব খাদ্য তৈরি প্রক্রিয়া সালোকসংশ্লেষন বন্ধ হয়ে যাবে, ফলে সমস্ত উদ্ভিদ পৃথিবীর বুক থেকে লোপ পাবে, সেই সঙ্গে সমস্ত প্রাণীজগৎ ।

- নিশ্চয় জমিনের উপর যা কিছু আছে তা নিশ্চিহ্ন করে উদ্ভিদ শূন্য শুক মৃত্তিকায় পরিণত করবো ।

(১৮:৮)

- যখন নক্ষত্রাজির আলো মলিন হবে । যখন আকাশ ফাঁক (ছিদ্র) হয়ে যাবে । ৭৭:৮-৯

পৃথিবীর জীবন-ব্যবস্থাকে রক্ষাকারী ছাদ যা আল কোরানের ভাষায় - 'আর আমিই তো আসমানকে সু-রক্ষিত ছাদ করে দিয়েছি । ২১:৩২ আয়াতে উল্লেখ আছে । এছাড়া আকাশকে 'ছাদস্বরূপ' বা সুরক্ষিত করার কথা আছে ২:২২, ৪০:৬৪ এবং ৪১:১২ আয়াতে । উপরের ৭৭:৯ আয়াতে আকাশ ফাঁক বা ছিদ্রযুক্ত হওয়ার অর্থ হতে পারে বর্তমানে আমরা যা 'ওজোন স্তর' হিসাবে জানি যা পৃথিবীর সমস্ত জীবন ব্যবস্থাকে মহাজাগতিক বিভিন্ন রকম ক্ষতিকারক রশ্মি, ছোট ছোট গ্রহণ এবং মিটওরাইট থেকে রক্ষা করছে । এই স্তরটি ছিদ্রযুক্ত বা বিনষ্ট হয়ে পৃথিবীর সমস্ত জীবন ব্যবস্থার চিরতরে বিলুপ্তি ঘটাবে । বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যে ওজোন স্তরে বিরাট ছিদ্রের সংক্রান্ত পেয়েছেন ।

- চাঁদ আলোহীন হয়ে যাবে । (৭৫:৮)

উপরের আয়াতগুলি থেকে আমরা বৃহৎ আকারের কোনো গ্রহাণুর পতনের ফলে প্রচণ্ড শব্দ, বিশাল

ধূলিকণার মেঘ সৃষ্টির মাধ্যমে সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রের আলো মলিন হওয়া এবং ওজোন ত্ত্বর ছিঁড়ি যুক্ত হয়ে সব ধরনের উত্তিদসহ জীব-শূন্য একটি শুক মরুভূমির মতো পৃথিবীর চিত্র পাই। যা অধুনা মঙ্গল গ্রহ থেকে প্রাণু দৃশ্যের অনুরূপ। ইতিমধ্যে বিজ্ঞানীরা মঙ্গল গ্রহে কোনো এক সময় পানি ও জীবের অস্তিত্ব ছিল এমন অনেক লক্ষণ পেয়েছেন। এ বিষয়ে বর্তমানে ব্যাপক গবেষণা চলছে। এ প্রসঙ্গে সুরা রাফ (১৩) এর নিম্নলিখিত দু'টি আয়াতের উল্লেখ করছি।

- ওদের যে (শাস্তির) কথা বলি, তার কিছু যদি দেখিয়ে দেই (আপনার জীবিত অবস্থায়) অথবা যদি (এর পূর্বে) মৃত্যু ঘটাই, আপনার কর্তব্য শুধু প্রচার করা, হিসাব-নিকাশ তো আমার কাজ। ওরা কি দেখে না যে আমি জমিনের প্রান্তসমূহ হতে সংকুচিত করে আনছি, আল্লাহ আদেশ করেন, তাঁর আদেশ রদ করাবার কেউ নেই এবং তিনি হিসাব গ্রহণে তৎপর। (১৩:৮০-৮১)

কোরানে ব্যবহৃত ‘জমিন’ শব্দটি আসমান শব্দের মতো ব্যাপক অর্থ প্রকাশ করে। জমিনকে আসমানের মতই অনেক আয়াতে একবচন এবং অনেক জায়গায় বহু বচনে ব্যবহৃত হয়েছে। জমিন বলতে আমরা অনেকে শুধুমাত্র পৃথিবীর জমিনকেই বুঝিয়ে থাকি অথচ কোরানে অনেক আয়াতে জমিন বলতে শুধু পৃথিবীর ভূমিকে নির্দেশ করলেও অন্য অনেক আয়াতে বিশাল মহাবিশ্বের অসংখ্য গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণু, মিটওরাইট, ধূমকেতু, বিশাল আকৃতির ধূলিকণার মেঘ ইত্যাদিকেও বোঝানো হয়েছে। মহাবিশ্বের বিভিন্ন জমিনে (গ্রহে) ছড়ানো-ছিটানো বিভিন্ন জীবের অস্তিত্বের কথা কোরানে আছে (যেমন ৪২:২৯ আয়াতে)। হতে পারে অনেক জমিনে জীবনের বিলুপ্তি ইতিমধ্যে ঘটেছে এবং তা অপেক্ষা করছে সেই মহাপ্রলয় বা কিয়ামতের জন্য। অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীরও এমনি সম্ভাবনা রয়েছে। মঙ্গল গ্রহে যদি সত্যি সত্যি জীবের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় তবে এ হবে আমাদের সামনে একটি জুলন্ত উদাহরণ। কারণ আল্লাহ মহাবিশ্বের কোনো কিছুই বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেন নি। (যেমন উল্লেখ আছে ১৫:৮৫, ২১:১৬, ৩৮:২৭, ৪৪:৩৮, ৪৪:৩৯ ইত্যাদি আয়াতে)। উপরের ১৩:৮১ আয়াতের অর্থটি হয়ত তাই নির্দেশ করে।

কোরানে সেই ‘কিয়ামত’- যার অর্থ মহাপ্রলয় (সমস্ত মহাবিশ্বের ধ্বংস) এবং পুনরুত্থান এর অনেক পূর্বেই যে সমস্ত জীবের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে তা সুম্পষ্ট হয়ে ওঠে নিম্নলিখিত আয়াতে।

- এমন কোনো জনপদ নেই, যা আমি কিয়ামত দিনের পূর্বে ধ্বংস করব না অথবা যাকে কঠোর শাস্তি দেব না। এ তো কেতাবে লিপিবদ্ধ আছে। (১৭:৫৮)

মহাবিশ্বের সৃষ্টি এবং ধ্বংস ও পুনরুত্থান (অর্থাৎ কিয়ামত) ইত্যাদি তথ্য যে মানুষ একদিন জানতে পারবে তা সুম্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে নিম্নের আয়াতগুলিতে।

- প্রত্যেক বার্তার (সংবাদ/তথ্য) জন্য নির্ধারিত কাল আছে এবং শীঘ্ৰই তোমরা অবহিত হবে। (৬:৬৭)

- বিশ্ব মানবের জন্য এ তো (কোরআন) উপদেশ মাত্র। আর অল্পকাল অতিবাহিত হতেই এর সত্যতা তোমরা অবশ্যই জানবে। (৩৮: ৮৭ -৮৮)

প্রথম শিংগার বা মহাকর্ষ বলের পরিবর্তনের ফলে যে মহাপ্রলয় ওরু হবে তার অনেক অনেক বছর পূর্বেই পৃথিবীর সম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা শেষ হয়ে যাবে। তারপর এই মহাপ্রলয়ের প্রভাব সমগ্র মহাবিশ্বের কোটি কোটি গ্যালাক্সি, কোয়াসার, গ্রহ, উপগ্রহ, অদৃশ্য বস্তু ইত্যাদির উপর পড়বে। আমাদের জানা মহাবিশ্ব বা আল কোরানের ভাষায় নিকটবর্তী আকাশ এই মহাপ্রলয়ে সম্পূর্ণ ধ্বংস হবে। এই মহাপ্রলয়ে আমাদের জানা মহাবিশ্ব সম্পূর্ণ ধ্বংস হতে কি পরিমাণ সময় লাগবে কোরানে তার কোনো উল্লেখ না থাকলেও, এ সময়ে আমাদের পৃথিবী এবং সৌরজগৎ (চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-উপগ্রহ) ইত্যাদির শেষ পরিণতি কেমন হবে তার একটা পরিকার চিত্র বিভিন্ন আয়াতে আলাদাভাবে পাওয়া যায়।

- যখন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে— একটি মাত্র ফুৎকার। পর্বতমালাসমেত পৃথিবী উৎক্ষিণ্ঠ হবে, একই ধাক্কায় ওরা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। সেদিন মহাপ্রলয় সংঘটিত হবে। (৬৯:১৩-১৫)
- যখন পৃথিবী প্রবল প্রকল্পনে প্রকল্পিত হবে এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়বে ফলে তা উৎক্ষিণ্ঠ ধূলিকণায় পর্যবসিত হবে। (৫৬:৪-৬)
- পৃথিবী ও পর্বতমালা ঐ (শান্তির) দিন কাঁপবে এবং পর্বতসমূহ বহমান বালুকারাশিতে পরিণত হবে। (৭৩:১৪)
- পাহাড়সমূহ (বালুকণায় পরিণত হবে) চালিত হবে। তখন তা মরীচিকায় পরিণত হবে। (৭৮:২০)
- আর পাহাড়গুলো হবে রঙিন পশ্চমের মতো। ৭০:৯ অনুরূপ আয়াত ১০১:৫
- যখন পর্বতমালা অপসারিত হবে। (৮১:৩)
- যখন সমুদ্রগুলোকে উত্তুণ্ড করা হবে। (৮১:৬)
- যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে (burst forth) তোলা হবে। (৮২:৩)
- চাঁদ ও সূরজ একত্রিত হবে। (৭৫:৯)
- যখন সূর্যকে নিষ্কণ্ঠ করা হবে। (৮১:১)
- যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে। যখন গ্রহসমূহ বিক্ষিণ্ঠ হবে। (৮২:১-২)

উপরের আয়াতগুলিতে আমাদের পৃথিবী এবং সৌরজগৎ সম্পূর্ণ ধ্বংসের একটি পরিকার চিত্র ফুটে ওঠে। পৃথিবী পর্বতমালাসহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ধূলিকণায় পরিণত হবে। সমুদ্র উত্তুণ্ড হয়ে উড়ে যাবে। চাঁদ, সূর্য, গ্রহ-উপগ্রহ সবকিছু সমগ্র মহাবিশ্বের মহাপ্রলয়ের সঙ্গে মিলিত হবে। ৮২:১-২ নং আয়াতে সমস্ত গ্রহের ধ্বংসের কথা উল্লেখ আছে। যদিও কোরানের অধিকাংশ অনুবাদকারীগণ ‘কাওয়াকিব’ শব্দটিও তারকারাজি বা নক্ষত্ররাজি হিসেবে অনুবাদ করেছেন তবে তাছাড়া গ্রহপুঁজি, দল, ক্ষেয়াত্রন ইত্যাদি অর্থও বুঝায়। সুতরাং গ্রহ, নক্ষত্র এবং আন্ত- নক্ষত্রীয় সবকিছুই যা মহাকাশে উপস্থিত তাই নির্দেশ করে।

এবার আমাদের জানা সমগ্র মহাবিশ্ব অর্থাৎ কোরানের ভাষায় নিকটবর্তী আকাশ ধ্বংসের চির
বিভিন্ন আয়াতে যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে তা লক্ষ্য করুন। যখন নক্ষত্র রাজির আলো নিবাপিত
হবে। ৭৭:৮

- যখন নক্ষত্ররাজি ঝরে পড়বে। ৮১:২

- শপথ ধ্বংসপ্রাণ তারকারাজির। ৫৩:১

৫৩:১ আয়াতের ‘হাওয়া’ শব্দটির অর্থ ধ্বংসপ্রাণ, বিক্ষেপিত, অদৃশ্য (destroyed, blown off, disappear etc.)

- অনন্তর আকাশ যখন বিদীর্ণ হবে, তখন তা রঞ্জিত চর্মের রূপ লোহিত বর্ণ ধারণ করবে।
(৫৫:৩৭)

- সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে ও বিক্ষিপ্ত হবে এবং ফেরেশতাগণ আকাশের প্রান্তদেশে থাকবে।
(৬৯:১৬-১৭)

আমাদের জানা মহাবিশ্বের দৃশ্যমান কোটি কোটি গ্যালাক্সি প্রত্যেকটি গ্যালাক্সি আবার কোটি
কোটি নক্ষত্ররাজি নিয়ে গঠিত-যা ধ্বংসপ্রাণ হয়ে ঝ্লাকহোলে পতিত হবে। এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত
মেলে কোরানের নিম্নলিখিত দু'টি আয়াতে।

- শপথ সে পতন স্থানের, যেখানে নক্ষত্রসমূহ ধ্বংসপ্রাণ হয়। যদি তোমরা জানতে এটা অবশ্যই
এক মহাগুরুত্বপূর্ণ শপথ। (৫৬:৭৫-৭৬)

উপরের আয়াতে ‘মাওয়াকিয়ি’ শব্দটি কোরানের অধিকাংশ অনুবাদকারী ও তফসিরকারীগণ অর্থ
অন্তাচল বা অন্ত যাওয়ার সময় বলে ধরে নিয়ে বিভিন্ন অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেছেন। অথচ আমরা
সবাই জানি মহাবিশ্বের কোথাও নক্ষত্রসমূহের অন্তগমনের সম্ভাবনা নেই। এখানে উল্লেখ্য যে
'ওয়াকায়া' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো ধ্বংস হওয়া, ধ্বংসের টানে পতিত হওয়া, বিক্ষেপিত
হওয়া (collapse to run into mishap, calamity to blow, to fall) ওয়াকায়া এর
অর্থ অভিধানে কোথাও অন্তগমন বা অন্তাচল নেই। মহাবিশ্বের বিশাল সংগঠনে নক্ষত্রের ধ্বংসের
স্থান ঝ্লাকহোলের সঙ্গে আমরা পরিচিত। সুতরাং 'মাওয়াকিয়ি'-এর শুধুমাত্র একটি অর্থই
ঐহগযোগ্য যা হলো ধ্বংসের স্থান। এ বিষয়ে বিস্তৃত জানতে জনাব কাজী জাহান মিয়া 'আল-
কোরআন দ্য চ্যালেঞ্জ' (মহাকাশ পর্ব-১) গ্রন্থের ২২১-২৩২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়ে দেখার অনুরোধ
করছি।

মহাধ্বংসের পর বিচারদিন বা তার সংলগ্ন কোনো সময়ে দ্বিতীয় শিংগার ফুৎকার বা মহাকর্ষবলের
পরিবর্তনের ফলে আমাদের জানা মহাবিশ্ব বা কোরানের ভাষায় নিকটবর্তী আকাশ ও জমিনের
যে পরিবর্তন ঘটবে তারও একটি পরিষ্কার চির আল কোরানের পাতায় তুলে ধরা হয়েছে।

- সেদিন আকাশকে গুটিয়ে ফেলবো। যেভাবে গুটানো হয় লিখিত দণ্ডে। যেভাবে আমি প্রথম

সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। (২১:১০৮)। এই আয়াতিতেও আকাশকে এক বচনে প্রকাশ অর্থাৎ নিকটবর্তী আকাশ (প্রথম আকাশ) ধ্রংস এবং পুন সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে।

- সেদিন আসমান গলিত তামার মতো হবে। ৭০:৮
- সেদিন আসমান ফেটে (বিদীর্ঘ হবে) যাবে। ৭৩:১৮ অনুরূপ আয়াত আছে ৮২:১, ৮৪:১।
উপরের সমন্ত আয়াতে এবং কোরানের অন্যান্য আকাশ ধ্রংস সংক্রান্ত আয়াতে নিকটবর্তী আকাশ বা প্রথম আকাশ ধ্রংসের কথাই বলা হচ্ছে। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, কোরানের যেখানেই আকাশ ধ্রংসের কথা বলা হয়েছে সবখানেই 'আকাশ' শব্দটি একবচনে (সসামা-উ) ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে আকাশ বিদীর্ঘ বা ধ্রংসের সঙ্গে আকাশে উপস্থিত সমন্ত গ্যালাক্সি, কোয়াসার, ধূমকেতু, অদৃশ্যবস্তু সব কিছুর কথাই বোঝানো হয়েছে।

মহাপ্রলয় বা কিয়ামতের ফলে আমাদের জানা সমন্ত মহাবিশ্বের গ্রহ-নন্দন ও অন্যান্য সমন্ত পদাৰ্থ যেমন মুক্ত গ্যাস, ধূলিকণা, ধূমকেতু, অদৃশ্যবস্তু ইত্যাদি ধ্রংস হবে। প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জন্য ধ্রংসপ্রাণ সমন্ত পদাৰ্থ কেন্দ্ৰস্থ একটি গাণিতিক বিন্দুৱ দিকে পৱিচালিত হতে থাকবে। অন্য কথায় আমাদের জানা মহাবিশ্বের সবকিছু ধ্রংসপ্রাণ হয়ে ঝ্লাকহোলে নিষ্কণ্ঠ হবে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা এ গ্রন্থের অন্য অধ্যায়ে পাবেন।

এবার সুধী পাঠকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আইনষ্টাইনের পর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদাৰ্থ বিজ্ঞানী হিসাবে স্বীকৃত টিফেন হকিং এর 'Black holes and baby Universe and other essays' গ্রন্থের একটি প্রবন্ধ 'মহাবিশ্বের উৎপত্তি' দু'টি লাইনের প্রতি। অদৃষ্টবাদের একনিষ্ঠ বিশ্বাসী হকিং উপরোক্ত প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন "গুড়ির মতো মহাবিশ্বকে গুটিয়ে নিয়ে তাঁর যেমন খুশি সেভাবে মহাবিশ্বকে আবার গুরু করা ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন।"

ঈশ্বরের প্রতি অল্পবিশ্বাসী হকিং চৌদশত বৎসর পূর্বে নিরক্ষর মুহাম্মদ (স:) এর উপর অবতীর্ণকৃত কোরানের উপরের আয়াতটি (২১:১০৮) সম্পর্কে জানার কোনো সুযোগ আসে নি। কিন্তু ১৯৮৭ সালে কেমব্ৰিজে মহাকর্ষের তিন শতাব্দী সভায় উপরোক্ত প্রবন্ধ পাঠে তাঁর অজান্তেই কোরানের বাণীটির প্রতিধ্বনিত হয়।

- শেষ বিচারদিন সংলগ্ন সময়ে মহাবিশ্বের আরও যে পরিবর্তন হবে তার আরও কিছু আয়াত-
- সেদিন আসমান খুলে যাবে। তখন তা অনেক দরজায় পরিণত হবে। (৭৮:১৯)
 - নিশ্চয়ই জাহান্নাম ওৎ পেতে রয়েছে। (৭৮:২১)
 - আর যখন জমিনকে সম্প্রসারিত করা হবে এবং জমিনে তার গর্ভস্থিত সবকিছু বাহিরে নিক্ষেপ করবে ও শূন্যগর্ত হয়ে যাবে। (৮৪:৩-৪)
 - যখন জমিন তার কম্পনে প্রকাশিত হবে। আর জমিন তার বোৰা বেৰ করে

দেবে । (৯৯:১-২)

- যেদিন ভূমগ্ল বিদীর্ঘ হয়ে মানুষ ছোটাছুটি করে বের হয়ে আসবে । এটিই সমবেত করাৰ দিন এবং আমাৰ জন্য সমবেত কৰা সহজ । (৫০:৪৪)

- যখন আকাশেৱ আবৱণ অপসাৱিত হবে এবং যখন জাহান্নামে আগুন উদ্বীপিত হবে এবং যখন জান্নাত নিকটবৰ্তী হবে । (৮১:১১-১৩)

এখানে উপৱেৱ তিনটি আয়াত (৮১:১১-১৩) বিশেষভাৱে লক্ষণীয় । এখানে আকাশেৱ আবৱণ অপসাৱণেৱ কথা বলা হয়েছে । হতে পাৱে এই 'আবৱণটি' কোৱানে বৰ্ণিত সগু-আকাশেৱ একটি আকাশ যা আমাদেৱ জানা মহাবিশ্বকে অন্য মহাবিশ্ব থেকে আলাদা করে রেখেছে । নিকটবৰ্তী আকাশ ধৰণেৱ ফলে সমস্ত কিছু নিষ্ক্ৰিপ্ত হবে ব্ল্যাকহোলে । আমাদেৱ জানা মহাবিশ্বেৱ বিপুল পদাৰ্থেৱ একত্ৰে কেন্দ্ৰীভূত হয়ে প্ৰচণ্ড মাধ্যাকৰ্ষণ শক্তিৰ ফলে চাপ ও তাপ বৃদ্ধি পেয়ে আগুন উদ্বীপিত হবে জাহান্নামে । আমাদেৱ জানা মহাবিশ্ব বা কোৱানেৱ ভাষায় নিকটবৰ্তী আকাশই যে জাহান্নামে পৱিণ্ট হবে তাৰ ইঙ্গিত পাওয়া যায় আৱ একটি আয়াতে । -এবং সকলেৱ নিকট জাহান্নাম প্ৰকাশ কৰা হবে । ৭৯:৩৬ সকলেই অৰ্থাৎ জান্নাত, জাহান্নাম এবং আৱাফবাসী জাহান্নামেৱ আগুন উদ্বীপিত হতে দেখবে । সগু আকাশেৱ সৰ্বশেষ আকাশেৱ জান্নাতকে নিকটবৰ্তী কৰা হবে । এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা এ গ্ৰন্থেৱ অন্য অধ্যায়ে পাবেন ।

শেষ বিচাৰদিন বা তাৰ সংলগ্ন কোনো সময়ে সগু আকাশেৱ মধ্যে একটা বিৱাট পৱিবৰ্তন ঘটবে । এই পৱিবৰ্তনেৱ ধাৰাটি যেমন উপৱেৱ ৮১:১১-১৩ এই তিনটি আয়াতে ফুটে উঠছে তেমনিভাৱে নিম্নেৱ ২টি পৃথক আয়াতে আৱও সুম্পষ্ট হয়ে ওঠে ।

- যেদিন পৱিবৰ্তন কৰা হবে এ ভূমগ্লকে অন্য ভূমগ্লে এবং পৱিবৰ্তন কৰা হবে আকাশসমূহকে । (১৪:৪৮) (সেদিন পৃথিবীৱ জমিন অন্য অনেক জমিনেৱ সঙ্গে একত্ৰিত হয়ে অন্যকূপ ধাৱণ কৱবে)

- নভোমগ্ল ও ভূমগ্লেৱ জন্য সেটি অতি কঠিন বিষয় । (৭:১৮৭)

উপৱেৱ দু'টি আয়াতে 'আকাশ' শব্দটি বহুবচনে ব্যবহাৰ কৰা হয়েছে । অৰ্থাৎ পৱিবৰ্তনগুলি আকাশসমূহেৱ মধ্যে ঘটবে বলে ।

মহাক্ষেত্ৰ এবং বিচাৰদিন সংলগ্ন নতুন মহাবিশ্বেৱ যে চিত্ৰ আল-কোৱান প্ৰদান কৰে তা পৃথকভাৱে আয়াতগুলিকে বিশ্লেষণ কৱলে একটি খণ্ডিত চিত্ৰ প্ৰকাশ পায় । আবাৱ সামগ্ৰিকভাৱে চিন্তা কৱলে এক একটি আয়াত বা খণ্ডিত চিত্ৰ পৱিষ্ঠৰেৱ পৱিপূৰক হয়ে কিংবা সামগ্ৰিকভাৱে একটি মূলচিত্ৰেৱ বিভিন্ন অংশ হয়ে আমাদেৱ সামনে হাজিৰ হয় । ফলত: দেখতে পাই যে, প্ৰত্যেকটি আয়াত যেন একটি একক প্ৰস্তাৱ, চিত্ৰেৱ এক একটি অপৱিহাৰ্য উপাদান মাত্ৰ ।

মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ পরিণতি

সারকথা

বিজ্ঞান	কোরান
<p>১. মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ পরিণতি নির্ভর করছে দৃশ্য, অদৃশ্য পদার্থ (অদীগ্ন পদার্থ) এবং মহাকর্ষ বল ও তার বিপরীত অদীগ্ন বলের পরিমাণ এবং গতি-প্রকৃতির ভূমিকার উপর। সাম্প্রতিককালের জ্যোতি-পদার্থবিদদের ধারণামতে মহাবিশ্বে ৫% ভাগ সাধারণ পদার্থ (দৃশ্যমান), ৩৫% ভাগ অদীগ্ন পদার্থ (অদৃশ্যমান) এবং ৬০% ভাগ অদীগ্ন শক্তি (অদৃশ্যমান) সমন্বয়ে গঠিত। অন্য কথায় শতকরা ৯৫ ভাগ অদৃশ্যমান পদার্থ ও শক্তির পরিমাণ ও গতি-প্রকৃতির উপর নির্ভর করছে মহাবিশ্ব ভবিষ্যতে সম্প্রসারণ থামিয়ে বৃহৎ সংকোচনের ফলে সবকিছু ধ্রংসপ্রাণ হয়ে মহাবিশ্বের কেন্দ্রে একত্রিত হয়ে একটি পিণ্ডে পরিণত হবে অথবা চিরদিন অসীম মহাশূন্যে সম্প্রসারিত হতে থাকবে অথবা সূক্ষ্মভাবে সংকোচন-সম্প্রসারণের মধ্যে ভারসাম্য ধরে রেখে চিরদিন টিকে থাকবে।</p> <p>২. আজকের বিজ্ঞানীরা এই ভেবে ভীষণ সংক্ষিপ্ত যে, আমাদের পৃথিবীর সম্পূর্ণ জীবন-ব্যবস্থা বিভিন্ন ভাবে ধ্রংস হয়ে যেতে পারে-</p> <p>ক) মনুষ্য তৈরি শক্তিশালী পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্টি বিশাল ধোঁয়ার অ্যামব্রেলা উদ্ভিদ ও মানবজীবন তথা সমগ্র প্রাণীজগৎ আংশিক বা সম্পূর্ণ ধ্রংস হয়ে যেতে পারে।</p> <p>খ) বর্তমানে সারা পৃথিবীতে অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠা যান্ত্রিক সভ্যতা এবং প্রাকৃতিক</p>	<p>- “তিনিই যথাযথভাবে নভোমঙ্গল ও ভূমঙ্গল সৃষ্টি করেছেন। যেদিন তিনি বলবেন: হয়ে যা ও অতঃপর হয়ে যাবে। তাঁর কথা সত্য। যেদিন শিঙায় ফুর্তকার করা হবে। সেদিন তাঁরই আধিপত্য হবে। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞাত। তিনিই বিজ্ঞানময়, সর্বজ্ঞ।” (৬:৭৩)</p> <p>(বিঃদ্র: আরবি ‘ছুর’-শব্দের অনুবাদ করা হয়েছে শিঙা। ‘ছুর’ শব্দের অর্থ আকার, আকৃতি অথবা আকর্ষণও হতে পারে।)</p> <p>- “আর তাঁরই নিকট অদৃশ্য বিষয়ের চাবিসমূহ (কুঞ্জিকা/ভাণ্ডার) আছে, তিনি ব্যতীত কেউই তা অবগত নয়।” (৬:৫৯)</p> <p>- “নভোমঙ্গল ও ভূমঙ্গলের রহস্য (অদৃশ্য বিষয়) আল্লাহর কাছেই রয়েছে।” (১৬:৭৭)</p> <p>- অবিশ্বাসীয়া বলে- আমরা কিয়ামতের সম্মুখীন হব না। বল- কেন হবে না, নিশ্চয়ই তোমাদের ওর সম্মুখীন হতে হবে, শপথ আমার প্রতিপালকের, যিনি অদৃশ্য সমস্কে সম্যক পরিজ্ঞাত।” ৩৪:৩</p> <p>অনুকূল আয়াত: ৬৯:৩৮, ৭২:২৬, ২৭:৬৫, ৭৫, ৩৫:৩৮, ৩৯:৪৬, ৪৯:১৮, ৩৪:৪৮ ইত্যাদি।</p> <p>- “মানুষের কৃতকর্মের জন্য জলে-স্তলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে ওদের কে কোনো কোনো কর্মের শান্তির আঙ্গাদন করানো হয়, যাতে ওরা সৎপথে ফেরে আসে।” (৩০:৪১)</p> <p>- অতএব, আপনি সে দিনের অপেক্ষায় থাকুন, যেদিন আকাশে সুস্পষ্ট ধূম্রাঙ্গন প্রতিপন্ন হবে এবং তা মানবজাতিকে গ্রাস করে ফেলবে। এটা হলো যন্ত্রণাদায়ক শান্তি। হে আমাদের</p>
	৭৫

বিজ্ঞান	কোরান
<p>ভারসাম্য বিনটের ফলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সেই সঙ্গে বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় পৃথিবীর জীবন-ব্যবস্থা রক্ষাকারী ছাদ ওজোন স্তরের ক্ষতি হচ্ছে। এই ওজোন স্তরটি যদি একটি মুহূর্তের জন্য কোনোভাবে অপসারিত হয়, তবে অতি ক্ষুদ্র সময়ের পরিসরে পৃথিবীর সমস্ত জীবন-স্পন্দন সূর্যের নানা ধরনের বিকিরিত রশ্বির ছোবলে ভঙ্গীভূত হবে।</p> <p>গ) বৃহস্পতি ও মঙ্গল গ্রহের সুবিস্তৃত এলাকায় আম্য়মাণ অসংখ্য গ্রহাণু (asteroid) মিটিওরাইট বা ধূমকেতু নানা কারণে কঢ়চ্ছত হয়ে পৃথিবীকে আঘাত করে সমস্ত জীবন-ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে পারে।</p> <p>- আনুমানিক ছক্কোটি পঞ্চাশ লক্ষ বছর পূর্বে বৃহৎ আকৃতির কোনো গ্রহানুর আঘাতে পৃথিবীর ডাইনোসোর প্রজাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। এই আঘাতের ফলে অসীম-বিস্তার পারমাণবিক মিহি ধূলিরাশির বিশাল মেঘ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বলয় ঘিরে এক আচ্ছাদন তৈরি করে। দীর্ঘদিন সূর্যরশ্বি মেঘে ঢাকা থাকে ফলে উদ্ভিদ প্রজাতিরও বিলুপ্তি ঘটে।</p> <p>- ১৯০৮ সালের ৩০ জুন ১৫০ ফুট দৈর্ঘ্য একটি মিটিওরাইট সাইবেরিয়ার বনাঞ্চলে আঘাত হানায় লক্ষ লক্ষ বৃক্ষ ও ৪০ মাইল ব্যাস সম্পন্ন ধ্বংসস্থান এলাকায় কোথাও কোনো আকৃতি (structure) অস্তিত্ব ছিল না।</p> <p>বৃহস্পতি ও মঙ্গলের মাঝখানে আমাদের অলক্ষ্মে সম্ভরণরত লক্ষাধিক গ্রহাণুদের মধ্যে দশ</p>	<p>পালনকর্তা আমাদের থেকে শান্তি প্রত্যাহার করুন। নিশ্চয়ই আমরা বিশ্বাস স্থাপন করবো। (৪৮:১০-১২)</p> <p>- আমি তোমাদের শান্তি কিছুকালের জন্য প্রত্যাহার করবো। নিশ্চয় তোমরা পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে। যেদিন আমি তোমাদের প্রবলভাবে আক্রমণ করবো, সেদিন আমি তোমাদের শান্তি দেবোই। (৪৪:১৫-১৬)</p> <p>পৃথিবীর জীবন ব্যবস্থাকে রক্ষাকারী ছাদ বা 'ওজোন স্তর'টি কোরানের ভাষায় - "আর আমিই তো আসমানকে সুরক্ষিত ছাদ করে দিয়েছি।" (২১:৩২) অনুরূপভাবে নিকটবর্তী আকাশকে ছাদ বা সুরক্ষিত ছাদ হিসেবে উল্লেখ আছে কোরানের ২:২২, ৪০:৬৪, ৪১:১২ আয়াতে। আবার এই ছাদ বা আকাশটি ছিদ্রযুক্ত বা ফাঁক হয়ে বিনষ্ট হওয়ার কথা আছে-</p> <p>- "যখন আকাশ ফাঁক হয়ে যাবে।" (৭৭:৯)</p> <p>গ্রহাণু, ধূমকেতু বা মিটিওরাইটের আঘাতের ফলে পৃথিবীর জীবন ব্যবস্থা ধ্বংসের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে কোরানের নিম্নলিখিত আয়াতে - - তোমরা কি নিশ্চিত হয়ে গেছ যে, আকাশে যিনি আছেন তিনি তোমাদের উপর প্রস্তরবর্ষী বৃষ্টি বর্ষণ করবেন না? (৬৭:১৭)</p> <p>- আমি ইচ্ছা করলে, তাদের সহ জমিন ধ্বসিয়ে দেবো অথবা আসমান থেকে কোনো টুকরার পতন ঘটাবো। ৩৪:৯</p> <p>- শপথ আকাশের এবং সহস্রা আঘাতকারীর, তুমি কি জানো এই সহস্রা আঘাতকারী বস্তুটি কি? এটা একটি প্রজ্জলমান জ্যোতিক্ষ। (৮৬:১-৩)।</p> <p>ওপরে বর্ণিত ক) ও খ) পদ্ধতিতে যেমন পৃথিবীর জীবন-ব্যবস্থার আংশিক বা সম্পূর্ণ</p>

বিজ্ঞান	কোরান
কিলোমিটার বা তার চেয়ে বেশি ব্যাস সম্পন্ন কোনো গ্রহাণু পৃথিবীকে আঘাত করে তবে তা মহাধ্বংসের হমকি নয় কি?	ধ্রংস হতে পারে আবার গ) পদ্ধতিতে পৃথিবীর সমস্ত জীবন-ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটতে পারে। আর এই ধ্রংসপ্রাণ পৃথিবীর চিরও আল কোরানে উল্লেখ আছে-
৩. যখন সূর্যের পারমাণবিক জ্বালানি শেষ হয়ে যাবে, তখন সেটি ফুলে, যাকে লোহিত দৈত্য (red giant) বলা হয়, তাতে পরিণত হবে। তারপর ক্রমান্বয়ে নিকটবর্তী অন্যান্য গ্রহগুলি চন্দ্রসহ গ্রাস করবে। তারপর আরও দীর্ঘ পরবর্তী কোনো সময়ে মহাবিশ্বের প্রায় সমস্ত তারকাই পুড়ে শেষ হয়ে যাবে তখন আমাদের সৌরজগতের সূর্যসহ অন্যান্য সবকিছু তারকারাজি মহাবিশ্বের কোনো এক কেন্দ্রবিন্দুতে ঝরে পড়ে বিশাল ঝ্যাকহোল সৃষ্টি করবে।	- যখন নক্ষত্ররাজি বিলুপ্ত হবে। - যখন আকাশ ফাঁক হয়ে যাবে। যখন পাহাড় সমূহ উড়তে থাকবে। (৭৭:৮-১০) - চাঁদ আলোহীন হয়ে যাবে। ৭৫:৮ - নিশ্চয় জমিনের উপর যা কিছু আছে তা নিশ্চিহ্ন করে উত্তিদ শূন্য শুক মৃত্তিকায় পরিণত করবো। (১৮:৮) মহাপ্রলয় সংঘটিত হওয়ার প্রাক্তালে পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ ও নক্ষত্রসমূহের অবস্থা কেমন হবে এবার কোরানে যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে তা নিম্নে বর্ণিত হলো।
৪. আমেরিকান বৈজ্ঞানিক ফ্রিম্যান ডাইসন আমাদের জানা মহাবিশ্বের অর্থাৎ কোরানের ভাষায় নিকটবর্তী আকাশের যে মহাধ্বংসের চিত্র এঁকেছেন তা নিম্নরূপ:	- যখন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে- একটি মাত্র ফুৎকার। পর্বতমালাসমূহে পৃথিবী উৎক্ষিণি হবে, একই ধাক্কায় ওরা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। সেদিন মহাপ্রলয় সংঘটিত হবে। (৬৯:১৩- ১৬)
- মহাধ্বংসের দশ কোটি বছর পূর্বে সারা বিশ্ব তারায় তারায় খচিত রাত্রি দিনের কোনো পার্থক্য থাকবে না। মহাকর্ষ বল বেড়ে যাবে। তারাসমূহ পরম্পরের কাছে চলে আসবে। মহাধ্বংসের একলক্ষ বছর আগে সারা আকাশ প্রচঙ্গ গরম হয়ে উঠবে-	- চাঁদ ও সুরুজ একত্রিত হবে। (৭৫:৯) - যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে। যখন গ্রহসমূহ বিক্ষিণি হবে। (৮২:১-২) - যখন সূর্যকে নিক্ষিণি করা হবে। (৮১:১) - যখন নক্ষত্ররাজি ঝরে পড়বে। (৮১:২) - শপথ সে পতন স্থানের, যেখানে নক্ষত্রসমূহ ধ্রংসপ্রাণ হয়। যদি তোমরা জানতে এটা অবশ্যই এক মহাগুরুত্ব পূর্ণ শপথ। (৫৬:৭৫-৭৬)
- বিশ্বের কোনো গ্রহে প্রাণের অতিকৃত থাকবে না।	মহাধ্বংসের প্রাক্তালে পৃথিবী, পাহাড়, সমুদ্র, নক্ষত্ররাজি, নিকটবর্তী আকাশ প্রভৃতি মহাজাগতিক বস্তুর অবস্থা কেমন হবে তার বর্ণনা পরিত্র কোরানের বিভিন্ন আয়াতে বর্ণিত
- সমুদ্রের পানি বাঞ্চ হয়ে যাবে-	
- তারাদের তাপে সমস্ত কঠিন শিলা	

বিজ্ঞান	কোরান
<p>(পর্বতসমূহ) গলে ফুটে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।</p> <ul style="list-style-type: none"> - মহাধ্রংসের এক হাজার বছর পূর্বে তারাদের ভিতর প্রচও সংঘর্ষ ঘটবে এবং ব্ল্যাকহোল সৃষ্টি করবে। - বিরাট ধ্রংসের শেষ অঙ্কে কালোগহর সব একত্রিত হয়ে একটাতে পরিণত হয়ে অতি ক্ষুদ্র, অতি ঘন, অতি উষ্ণ, অগ্নি পিণ্ডে পরিণত হবে। - বিরাট ধ্রংসের সঙ্গে সঙ্গে আবার একটি বিরাট বিক্ষেপণ ঘটবে এবং নতুন একটা বিশ্বের সূচনা করবে। 	<p>হয়েছে।</p> <ul style="list-style-type: none"> - অনন্তর আকাশ যখন বিদীর্ঘ হবে, তখন তা রঙিত চর্মের রূপ (লোহিত বর্ণ ধারণ করবে) (৫৫:৩৭) - সেদিন আসমান গলিত তামার মতো হবে। (৭০:৮) - নিশ্চয় জমিনের উপর যা কিছু আছে তা নিশ্চিহ্ন করে উডিদ শূন্য শুষ্ক মৃত্তিকায় পরিণত করবো। (১৮:৮) - যখন গ্রহ-সমূহ বিক্ষিণ্ণ হবে। (৮২:২) - যখন সমুদ্রগুলোকে উষ্ণ করা হবে। (৮১:৬) - যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে (burstforth) তোলা হবে। (৮২:৩) - আর পাহাড়গুলো হবে রঙিন পশ্চমের মতো। (৭০:৯) অনুরূপ আয়াত (১০১:৫) পাহাড়সমূহ (বালুকণায় পরিণত হবে) চালিত হবে। (৭৮:২০) - চাঁদ ও সুরংজ একত্রিত হবে। (৭৫:৯) - যখন নক্ষত্রাজি ঝরে পড়বে। (৮১:২) - শপথ সে পতন স্থানের, যেখানে নক্ষত্র সমূহ ধ্রংসপ্রাণ হয়। যদি তোমরা জানতে এটা অবশ্যই এক মহাগুরুত্বপূর্ণ শপথ। (৫৬:৭৫-৭৬) (কৃষ্ণগহর) - যখন জাহান্নামে আগুন উদ্বীপিত হবে। (৮১:১২) - সেদিন আকাশকে গুটিয়ে ফেলবো। - যেভাবে গুটানো হয় লিখিত দণ্ডর। যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করবো। (২১:১০৮) - যেদিন পরিবর্তিত করা হবে এ ভূমগুলকে অন্য ভূমগুলে এবং পরিবর্তিত করা হবে আকাশসমূহকে। (১৪:৮৮)

মহাবিশ্বের বিশালতা এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য

আমাদের পৃথিবীর নিরক্ষরেখা বরাবর ব্যাস হল ১২,৭৫৬ কিলোমিটার। আর আমাদের সৌরজগতের মূল সূর্যের ব্যাস হল পৃথিবীর চেয়ে ১০৯ গুণ। সূর্যের আয়তন (volume) আমাদের পৃথিবীর চেয়ে তের লক্ষ ত্রিশ হাজার গুণ এবং ভর হচ্ছে ৩,৩৩,০০০ গুণ বেশী। সূর্য একটি মাঝারি আকৃতির তারকা। সূর্যের ছোট এবং তিন থেকে চার হাজার গুণ বড় তারকাও রয়েছে। অসংখ্য তারকা এবং অন্য অনেক মহাজাগতিক বস্তু (আননক্ষত্রীয় গ্যাস, গ্রহ, কমেট, ধূলিকণা ইত্যাদি) নিয়ে এক একটি গ্যালাক্সি গঠিত। আমাদের সৌরজগৎ যে গ্যালাক্সিতে অবস্থান করছে তার নাম মিহি ওয়ে (ছায়াপথ)। এই গ্যালাক্সিতে দশ হাজার কোটি (১০০ বিলিয়ন) তারকা রয়েছে (10^{11} তারকা)। ছায়াপথের মত আরও গ্যালাক্সির সংখ্যা হচ্ছে কম পক্ষে দশ হাজার কোটি। অন্য কথায় মহাবিশ্বের শুধুমাত্র তারকার সংখ্যাই এক শত কোটি কোটি (10^{22})। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯৯৯ সালে Hubble Space Telescope (HST) নিরীক্ষণে মহাবিশ্বে ১২৫ বিলিয়ন গ্যালাক্সির কথা বলা হয়, কিন্তু অতি সম্প্রতি HST এর অত্যাধুনিক ক্যামেরায় মাত্র ০.০৪ ডিগ্রীতে তিন হাজার দৃশ্যমান গ্যালাক্সি ধরা পড়ে, যে সংখ্যা ইতিপূর্বে পুরাতন ক্যামেরার চেয়ে দ্বিগুণ। এর থেকে ধারণা করা হয় প্রকৃত গ্যালাক্সির সংখ্যা বর্তমান জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধারণার চেয়ে অনেক বেশী। দুরবীক্ষণ যত্রের সাহায্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যে দৃশ্যমান মহাবিশ্ব অবলোকন করছেন তার বিস্তৃতি হতে পারে দেড় থেকে তিন লক্ষ কোটি আলোকবর্ষ ব্যাপী (এক আলোক বর্ষ প্রায় দশ লক্ষ কোটি কিলোমিটার)। দৃশ্যমান মহাবিশ্বের প্রান্ত সীমার বাইরে উপস্থিত কোন বস্তু ডপলার অভিক্রিয়ায় (Doppler effect) লাল-বিচুতি (Red-Shift) অসীমে যায়, ফলে অদৃশ্যমান থাকে। কোন অবস্থাতেই তা আমাদের মহাবিশ্ব থেকে দৃশ্যমান হবে না।

বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে প্রকাশিত বিভিন্ন মহাজাগতিক তত্ত্বানুসারে আমাদের দৃশ্যমান মহাবিশ্বটি বৃহত্তর অতিস্ফীতিত্ত্বের বুদবুদের (Post Inflationary Bubble) একটি অতি ক্ষুদ্র কণিকা। অতিস্ফীতিত্ত্বের বুদবুদটি প্রসার লাভ করেছিল 10^{30} বা তার চেয়েও অধিক আলোকবর্ষ ব্যাপী। সূতরাং দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান মহাবিশ্বের বিশাল অসীমতা মানুষের কোন ধরনের কল্পনা ও বোধগম্যের বাইরে।

জীবনের জন্য মহাবিশ্ব না মহাবিশ্বের জন্য জীবন এই চিরন্তন দার্শনিক প্রশ্নটি যুগ-যুগান্তর ধরে মানুষের মনে রহস্যময় রয়ে গেছে। জগৎবিদ্যাত কিছু বিজ্ঞানী এই প্রশ্নের উত্তরটি কিভাবে বিচার বিশ্লেষণ করেন তা এবার লক্ষ্য করুন।

জন এ হইলার একজন বিজ্ঞানী-দার্শনিক, মহাজাগতিক বিজ্ঞানের শিক্ষক এবং ব্ল্যাকহোলের জনক। তিনি প্রায় গত পঞ্চাশ বছর যাবৎ পদার্থ বিজ্ঞানের একজন অগ্রগামী

বিজ্ঞানী। ছইলার মহাবিজ্ঞানী আইনষ্টাইন এবং নেইল বোর সঙ্গেও কাজ করেন। জন ছইলার এবং তাঁর একজন প্রিস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের (যুক্তরাষ্ট্র) সহকর্মী রবার্টি ডিকের মতে মহাবিশ্বে যা কিছু আছে তা ছাড়া ‘জীবন’ অসম্ভব। জীবন বলতে আমরা যা বুঝি এমনকি অতি ক্ষুদ্র যে কোন ধরণের জীবনের অস্তিত্বের জন্যও এই বোধগম্য মহাবিশ্ব সৃষ্টির প্রয়োজন রয়েছে।

মহাবিশ্বটি কত সুন্দর বা কত বৃহৎ তা উপলক্ষ্মি করার জন্য এতে দর্শকের প্রয়োজন। এই দর্শক চাইলে প্রয়োজন জীবনের। জীবনের জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন ধরনের ভারী মৌলের (Heavy element)। হাইড্রোজেন থেকে ভারী মৌল তৈয়ারীর জন্য প্রয়োজন তাপ কেন্দ্রকীয় দহন (Thermo Nuclear Combustion)। এই কেন্দ্রকীয় দহনের জন্য তারকার মধ্যে সুদীর্ঘ সময় (কোটি কোটি বছর) ধরে তা রক্ষণ (দাহ্য) করা প্রয়োজন। [বিঃদ্রঃ: কেন্দ্রকীয় সংযোজন (Nuclear Fusion) প্রক্রিয়ায় তারকার মধ্যে হাইড্রোজেনকে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করে অন্য কথায় দাহ্য করে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ভারী মৌল হিলিয়াম, কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, সিলিকন, লোহ ইত্যাদি তৈয়ারী হয়।] এই সুদীর্ঘ সময়ের (কোটি কোটি বছর) জন্য স্থান-কালের (Space-Time) মাত্রায় (Dimensions) মহাবিশ্বটিকে বিস্তৃত বা প্রসারিত রাখতে হবে।

সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ অনুসারে সমগ্র মহাবিশ্বের ভর কমাতে প্রতিটি গ্যালাক্সি থেকে কেবলমাত্র একটি করে তারকাহাস করা যায়, অন্য কথায় ভর যদি দশ হাজার কোটি (১০০ বিলিয়ন) উৎপাদক (Factor) কমানো যায় তবে মহাবিশ্বের আকৃতি ও ঠিক একই পরিমাণ কমে যাবে অর্থাৎ শুধুমাত্র একটি গ্যালাক্সি। আর এর অর্থ হ'ল মহাবিশ্বের সৃষ্টি মহাবিফোরণ (বিগ ব্যাংগ) থেকে মহাধ্বংস বা বৃহৎ সংকোচন (Big crunch) পর্যন্ত সময় যদি দশ হাজার কোটি বৎসর হয় তা থেকে মাত্র এক বৎসর কম হবে ফলে কোন একটি তারকারও বিবর্তন (evolution) সম্ভব হবে না। ফলে জীবনের বিবর্তনও নয়।

মহাবিফোরণের (বিগ ব্যাংগ) মাধ্যমে মহাবিশ্বের সৃষ্টির জন্মালগ্ন থেকে একটি নির্দিষ্ট গতিতে সম্প্রসারিত হচ্ছে। মহাবিশ্বের এই সম্প্রসারণের হারের এক অস্বাভাবিক সাম্যাবস্থার (Equilibrium) কথা আর এক জগৎ বিখ্যাত বিজ্ঞানী ষিফেন হকিং তাঁর বিখ্যাত ‘কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, গ্রন্থে লিখেন- “বিগ ব্যাংগের এক সেকেন্ড পর থেকে সম্প্রসারণের হার যদি এক ভাগের একশত হাজার মিলিয়ন মিলিয়ন ভাগ কম হতো তবে এই মহাবিশ্ব বর্তমান অবস্থায় আসার অনেক পূর্বেই ভেঙ্গে (ধ্বংস) যেত।”

বিজ্ঞানী পাওয়েল ডেভিস মন্তব্য করেছেন পদাৰ্থ বিজ্ঞানের ধারা বা প্রাকৃতিক আইনগুলি (Law of Nature) কেমন সুন্দরভাবে মানবজীবন ধারনের জন্য উপযোগী করা হয়েছে।

“যদি প্রকৃতি (Nature) সামান্যতম ভিন্নধরণের সংখ্যা নির্ধারণ করত তবে এই পৃথিবী সম্পূর্ণ অন্য জায়গা হয়ে যেত। খুব সম্ভব আমরা তা দেখার জন্য উপস্থিত থাকতাম না। সাম্প্রতিক মহাবিশ্বের প্রাথমিক সৃষ্টির আবিষ্কারে আমরা জানতে পারি সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বের গতিকে বিশ্লেষকর সূক্ষ্মতায় এবং সঠিক মাত্রায় নির্ধারণ করা হয়েছে”।

একটি তুকী বিজ্ঞান সাময়িকী, “বিলিম টেকনিক” এ প্রকাশিত মহাবিশ্ব সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থায় এর ঘনত্ব (density) সম্পর্কিত নিম্নলিখিত তথ্য পরিবেশিত হয় -

“যদি মহাবিশ্বের ঘনত্ব সামান্যতম বেশী হ'ত সে ক্ষেত্রে আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব অনুসারে পারমাণবিক কণাগুলির আকর্ষণীয় বলের ফলে মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হ'ত না বরং তা সংকুচিত হয়ে শেষ পর্যন্ত একটি বিন্দুতে মিলিয়ে যেত। আবার পক্ষান্তরে যদি ঘনত্ব সামান্যতম কম হ'ত তবে মহাবিশ্ব খুব দ্রুত সম্প্রসারিত হ'ত এবং এ ক্ষেত্রে পারমাণবিক কণাগুলি পরস্পরকে আকর্ষণ করত না ফলে কোন তারকা বা গ্যালাক্সি সৃষ্টি হ'ত না। পরিণামে আমাদের মত মানুষ নামের কোন জীব সৃষ্টি হ'ত না। হিসাব অনুসারে মহাবিশ্বের প্রাথমিক প্রকৃত ঘনত্বের পার্থক্য যদি এর ক্রান্তিক ঘনত্বের (Critical value) চেয়ে এক 10^{-15} (quadrillion) ভাগের এক শতাংশ কম হ'ত তবেও এ বিপন্নি দেখা যেত। এখানে আরও উল্লেখ্য যে, মহাবিশ্ব যেহেতু সম্প্রসারিত এই সাম্যাবস্থা আরও সূক্ষ্ম (delicate) হ'ত”।

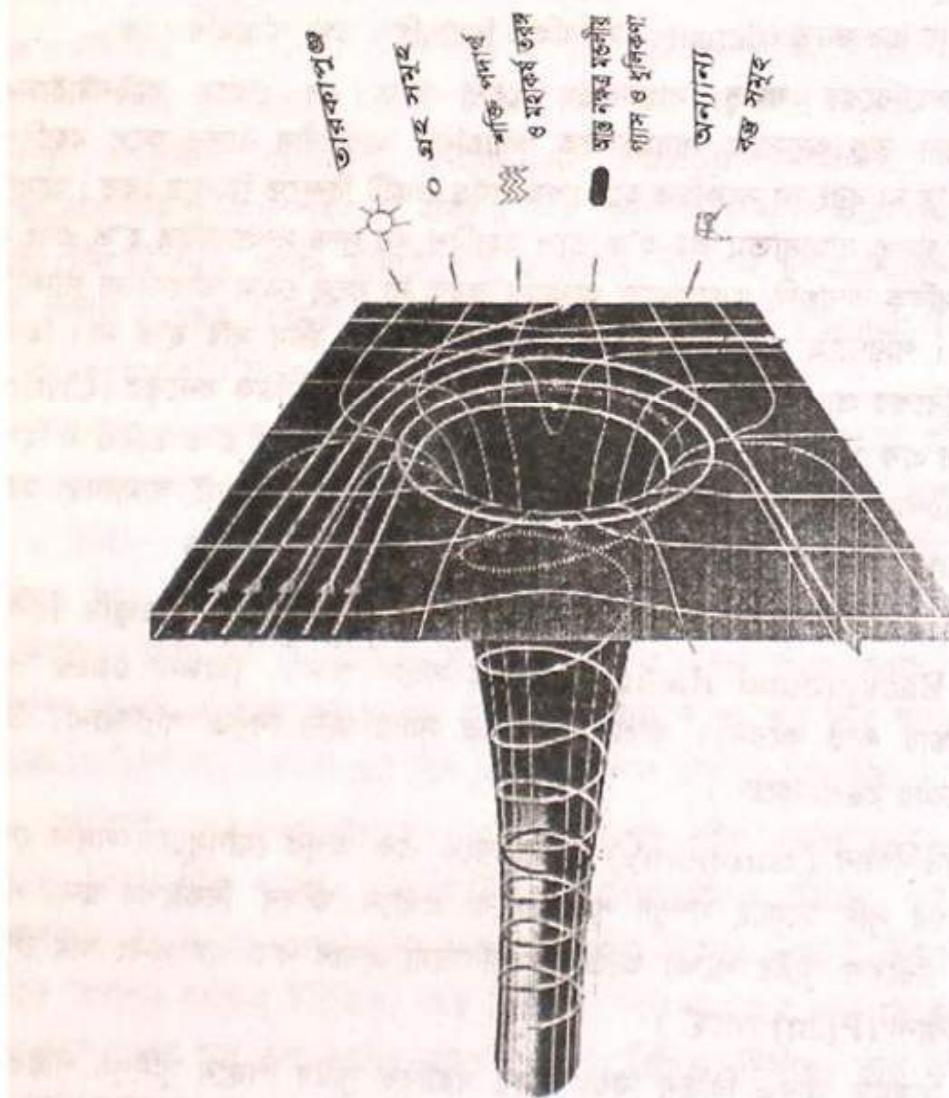
আরনো পেনজিয়ার্স এবং রবার্ট উইলসন প্রথম মহাজাগতিক পশ্চাত্ত্বমি বিকিরণ (Cosmic Background Radiation) এর সন্ধান পান। (এজন্য ১৯৬৫ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন)। তারা মহাবিশ্বের সৃষ্টির জন্য নির্খুত পরিকল্পনার উপর নিম্নোক্ত চমৎকার মন্তব্য করেন।

“জ্যোতির্বিজ্ঞান (astronomy) আমাদেরকে এক অপূর্ব যোগসূত্রের সন্ধান দেয়। এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে সম্পূর্ণ শূন্য থেকে এখানে ‘জীবন’ বিকাশের জন্য সঠিক প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে অতিসূক্ষ্ম ভারসাম্য প্রদান করা হয় এবং যার পিছনে একটা পরিকল্পনা (Plan) আছে”।

জগৎ বিখ্যাত আরও বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের মহাবিশ্ব সৃষ্টির পিছনে সুনিপুণ পরিকল্পনা, ভারসাম্যতা বা সাম্যাবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন। সবকিছুর পিছনে একজন সৃষ্টি কর্তার কথা কেউ সরাসরি স্বীকার করেছেন আবার কেউ এ বিষয়ে নীরব রয়েছেন।

ବ୍ୟାକହୋଲ (କୃଷି ଗର୍ଭର)

କୃଷି ଗର୍ଭର ବା ବ୍ୟାକହୋଲ ମହାବିଶ୍ୱେର ସବଚେଯେ ଶକ୍ତିଶାଲୀ, ରହସ୍ୟମୟ, ବିଶ୍ୱଯକର ଏକ ବନ୍ଧୁ । ମହାକାଶେର ଗୋପନ ହ୍ରାନେ ଲୁକ୍କାଯିତ ବିଶାଳ ଆକୃତିର ଏହି ସର୍ବଭୂକ ବ୍ୟାକହୋଲ ଭିତ୍ତିପ୍ରଦାନ ବଟେ । ଏହୁଲି ନତୁନ ଗ୍ୟାଲକ୍ୟାର ଜନ୍ମ ଦିତେ ପାରେ । ଆବାର ସମୟ ମହାବିଶ୍ୱେର ଭାଗ୍ୟ, ପରିଣତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାତେ ପାରେ । ବ୍ୟାକହୋଲଙ୍କୁ ଆମରା ଯେ ମହାବିଶ୍ୱେ ବାସ କରାଛି ତାର ଚେଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନଧର୍ମୀ ଅନ୍ୟ କେନ ମହାବିଶ୍ୱେର ପ୍ରାବେଶ ଦ୍ୱାରା ହତେ ପାରେ । ଏତ ବିଶ୍ୱଯକର ଏବଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥା ସତ୍ରେ ଓ ଆଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ତା ଦେଖେନି । ତବେ ବର୍ତ୍ତମାନେ ବ୍ୟାକହୋଲ ଆର ବୈଜ୍ଞାନିକ କଲ୍ପ କାହିନୀର ବନ୍ଧୁ ନୟ । ଯଦିଓ ତାରା ଅନ୍ତର୍ମାତ୍ରରେ ଜ୍ୟୋତିରିଜ୍ଞାନୀଦେର ନିକଟ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ତାରକାର ମତରେ ବାସିବ ।



ବ୍ୟାକହୋଲେର ପ୍ରବଳ ମହାକର୍ଷ ବଳ ଚାରିଦିକେର ସବକିଛୁକେ ଶାସ କରାଛେ ।

ব্ল্যাকহোল এমন একটা এলাকা যেখানে পদার্থ ধ্বংস প্রাণ হয়ে অসীম ঘনত্বে পরিণত হয়, ফলে সময়-কালের (Time -Space) বক্রতা (Curvature) চরণে উপলব্ধি হয়। এছাড়া ব্ল্যাকহোলের প্রবল মহাকর্ষ বল আলো অথবা অন্য বিদ্যুৎ-চূম্বকীয় বিকিরণ মুক্ত হতে বাধা দেয়। আমাদের সূর্যের ব্যাস হল তের লক্ষ নববই হাজার কিলোমিটার। এমনি ব্যাসের দশ কোটি সূর্য যদি একটি ব্ল্যাকহোলে পরিণত হয় তবে তার ব্যাস হবে মাত্র ষাট লক্ষ কিলোমিটার অর্থাৎ পাঁচটি সূর্যের ব্যাসের চেয়েও কম। এটাই ব্ল্যাকহোলের বাস্তব চিত্র।

ব্ল্যাকহোলের আকৃতি

ব্ল্যাকহোলের আকৃতি বর্ণনা করতে প্রথমে এর ভর (জন) এবং পরে তা কতটুকু স্থান বা এলাকাব্যাপী বিস্তৃত তা দেখব।

একটি ব্ল্যাকহোলের ভর কত বৃহৎ বা ক্ষুদ্র হতে পারে এ সম্পর্কে প্রকৃতপক্ষে কোন সীমা নেই। নীতিগতভাবে প্রবল চাপে পর্যাপ্ত উচ্চ ঘনত্বের যে কোন ভরের ব্ল্যাকহোল গঠিত হতে পারে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে ব্ল্যাকহোলের সৃষ্টি যদি কোন অতিবৃহৎ তারকার ধ্বংসের ফলে সৃষ্টি হয় তাবে ব্ল্যাকহোলের ভর ধ্বংসপ্রাণ তারকার ভরের সমান হবে।

ব্ল্যাকহোলের মহাকর্ষ বল সহযোগী নক্ষত্রকে (দৈত তারকা পদ্ধতি) তার কক্ষপথে চারিদিকে আবর্তন করায়। মহাকর্ষ বল (ব্ল্যাকহোলের) যত শক্তিশালী আবর্তনশীল কক্ষপথে তত দ্রুত হয়। ঘূর্ণায়মান নক্ষত্রের আলো বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত করে ব্ল্যাকহোলের ভর নির্ণয় করা হয়। ডপলার বিচ্ছিন্নতা (Doppler Shift) পদ্ধতিতে আলোর গমন প্রতিগমনের পরিমাণ বের করে কক্ষপথের গতি নির্ণয় করা হয় এবং তা থেকেই ব্ল্যাকহোলের ভর পাওয়া যায়। সাধরণত আমাদের সূর্যের ভরকে একক (Unit) [সূর্যের ভর 1.989×10^{30} কিলোগ্রাম] ধরে ব্ল্যাকহোলের ভরের তুলনা করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ একটি ব্ল্যাকহোলের ভর এক লক্ষ সৌরভর বলতে আমরা বুঝি এক লক্ষ সূর্যের ভরের সমান।

ব্ল্যাকহোল যত বৃহৎ হবে এটি স্থানও তত বেশী দখল করবে। শোয়ার্জশীল (Schwarschild) ব্যাসার্ধ (যার অর্থ হল ঘটনা দিগন্তের ব্যাসার্ধ) এবং ভর সরাসরি সমানুপাতিক। যদি কোন ব্ল্যাকহোলের ভর অন্য একটির চেয়ে দশগুণ হয় তবে তার ব্যাসার্ধও দশ গুণ হবে। সূর্যের ভরের সমপরিমাণ ব্ল্যাকহোলের ব্যাসার্ধ হবে তিনি কিলোমিটার। সুতরাং সাধারণ দশ সৌরভরের কোন ব্ল্যাকহোলের ব্যাসার্ধ হবে ৩০ কিলোমিটার। গ্যালাক্সির কেন্দ্রে দশ লক্ষ সৌরভর সম্পূর্ণ ব্ল্যাকহোলের ব্যাসার্ধ হবে ৩০ লক্ষ কিলোমিটার।

ভারগো (Virgo) নক্ষত্রপুঁজের ওচ্চ (Constellation) এলাকার NGC4486 = 87 সন্ধান প্রাণ ব্ল্যাকহোলটি ৫ কোটি আলোক বর্ষ দূরে অবস্থিত (এক আলোক বর্ষ প্রায় দশ লক্ষ কোটি কিলোমিটার) এবং তার ভর হচ্ছে ৩০০ কোটি সৌর ভরের সমান। সুতরাং ব্ল্যাকহোলটির ব্যাসার্ধ হবে ৯০০ কোটি কিলোমিটার।

ব্ল্যাকহোলের আবিষ্কার

আঠারো শতকের শেষ ভাগে ফরাসি বিজ্ঞানী লা প্লাস (La Place) সর্বপ্রথম ধারণা দেন মহাকাশের কোন স্থানে প্রবল মহাকর্ষ বলের প্রভাবে বস্তুসমূহ প্রচন্ড চাপে এবং তাপে কেন্দ্রীভূত হয়ে এক বিন্দুতে অকল্পনীয় ঘনত্বে নিয়ে আসতে পারে। সেখানে সবচেয়ে দ্রুতগামী আলোক রশ্মি পর্যন্ত বন্দী হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞান জগতে তাঁর এই ধারণা ১৯০৫ সালে আইনষ্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব (Special theory of relativity) এবং পরবর্তীতে ১৯১৬ সালে সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব (General theory of relativity) প্রকাশ না করা পর্যন্ত স্থান পায়নি। আইনষ্টাইনই প্রথম স্থান-কালের (Space-time) বক্রতার ধারণা দেন। প্রায় একই সময় জার্মান বিজ্ঞানী কার্ল শোয়ার্জশৈল (Karl Schwarzschild) আইনষ্টাইনের তত্ত্বের সমীকরণের গাণিতিক সমাধানে ব্ল্যাকহোলের অস্তিত্বের প্রস্তাব সুদৃঢ় করেন। আরও কিছু পরে ১৯৩০ সালের দিকে কিছু গবেষক যেমন ওপেন হেইমার (Oppen Heimer), ভোলকভ (Volkoff) ও স্ন্যডার (Snyder) এর প্রচেষ্টায় এবং ১৯৩৫ সালে ভারতীয় বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর মহাবিশ্বে ব্ল্যাকহোলের অস্তিত্বের ধারণাকে বিশ্ববাসীর কাছে জোরালো করে তোলেন।

১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে আমেরিকান বিজ্ঞানীরা মহাকাশের কক্ষপথে উহুরু (Uhuru) নামে একটি উপগ্রহ (স্যাটেলাইট) প্রেরণ করেন। এটির প্রধান কাজ ছিল মহাশূন্যে প্রবল শক্তিশালী রঞ্জন রশ্মি (X-ray) নির্গমনের উৎসসমূহ খুঁজে বের করা। শক্তিশালী রঞ্জন রশ্মির বিকিরণ নিঃসন্দেহে এক মহাজাগতিক উগ্র ক্রিয়াকলাপ। উহুরু ১৬০টি নতুন রঞ্জন-রশ্মির উৎসের সন্ধান পায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই উৎস ছিল সংকুচিত নিউট্রন তারকার সহযোগী তারকার অবাধে ধাবনশীল গ্যাস থেকে ক্ষণ্ট সিইগনাস এক্স -১ (cygnus X-1) ক্ষেত্রেটি ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। একই অবস্থানে এই রঞ্জন-রশ্মির উৎসটি ছিল সূর্যের চেয়ে প্রায় ৩০ গুণ বেশী ভর সম্পন্ন বিশাল উত্তপ্ত নীল তারকা। এই তারকাটিকে দীরে দীরে গ্রাস করছে দশ সৌর ভরের সমান একটি অদৃশ্য বস্তু এবং বস্তুটি নিউট্রন তারকার সীমার অনেক উর্দ্ধে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মত প্রকাশ করেন এই অদৃশ্য বস্তুটিই 'ব্ল্যাকহোল'। ইতিমধ্যে বিজ্ঞানীরা মহাকাশে আরও অনেক ব্ল্যাকহোলের সন্ধান পেয়েছেন।

জন আরচিবাল্ড হুইলার (John Archibald Wheeler) সর্বপ্রথম ব্ল্যাকহোল নামকরণটি করেন। এর পূর্বে ব্ল্যাকহোলকে বলা হ'ত ফ্রোজেন স্টার (frozen stars) বা স্থিতিশীল তারকা। এর কারণ হচ্ছে ব্ল্যাকহোলে প্রবেশকারী যে কোন বস্তুর প্রতিমূর্তি মনে হয় ব্ল্যাকহোলের প্রান্তে (ঘটনা দিগন্ত -event horizon) স্থির (freeze) হয়ে আছে। যদিও প্রকৃতপক্ষে বস্তুটি সম্পূর্ণ ব্ল্যাকহোলের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

ব্ল্যাকহোলের অস্তিত্বের প্রমাণ

মহাবিশ্বে ব্ল্যাকহোলের অস্তিত্ব সম্পর্কে ইতিমধ্যে অনেক জোরালো প্রমাণ রয়েছে। প্রবল মহাকর্ষ বলের প্রভাবে ব্ল্যাকহোল থেকে আলো পর্যন্ত মুক্ত হতে পারে না, তাই আমরা তা সরাসরি দেখতে পারি না। তবে, অনেক পরোক্ষ প্রমাণ ব্ল্যাকহোলের অস্তিত্বের সাফল্য দেয়।

ক) যুগা-নক্ষত্র প্রণালী (Binary-Star System)

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা উন্নতমানের এক্সের দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে মহাকাশে বেশ কিছু শক্তিশালী রঞ্জন-রশ্মির (X-ray) উৎসের সন্ধান পান। এই সমস্ত বেশ কিছু উৎসে নিজ কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান নক্ষত্রের দৃশ্যমান অন্য কোন প্রতিপক্ষ থাকে না। অন্য কথায় যার মহাকর্ষ বলের প্রভাবে নক্ষত্রটি ঘূর্ণায়মান হয়। ব্ল্যাকহোলের পাশে যদি কোন নক্ষত্র আপন কক্ষে আবর্তিত হতে থাকে, তখন তার আকর্ষণে অতিদ্রুত সেই নক্ষত্র থেকে পদার্থ ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে ব্ল্যাকহোলের চারিপাশে পুঁজিত চাকতির (accretion disk) আকারে ঘূর্ণিবার্তার সৃষ্টি করে। নক্ষত্র থেকে পতনশীল এই পদার্থ সমৃহ ব্ল্যাকহোলের ঘটনা দিগন্তে (event horizon) কেন্দ্রাভিমূখী গতির ধারা তাড়িত ও চাপে নিষ্পেষিত হয়ে বস্তু কণা দ্রুত উত্পন্ন হয়। প্রথমে বিদ্যুৎ-চূম্বকীয় শক্তির আকারে আলোক (Photon) কণার বিচ্ছুরণ ঘটায় এবং পরবর্তীতে ব্ল্যাকহোলে অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত আরো শক্তিশালী রঞ্জন-রশ্মির (X-ray) বিমুক্ত করে।

যেইমাত্র বিজ্ঞানীরা শক্তিশালী রঞ্জন-রশ্মির উৎস চিহ্নিত করেন তখন তারা নির্ধারণ করতে সচেষ্ট হন উৎসটি যুগা-নক্ষত্র প্রণালী কিনা। রঞ্জন-রশ্মির উৎসটি যদি যুগা-নক্ষত্র প্রণালীর হয় তখন বিজ্ঞানীরা অদৃশ্য সঙ্গীটির ভর (ওজন) নির্ণয় করেন। দৃশ্যমান সঙ্গী নক্ষত্রটির বর্ণালী (Spectral) এবং দৃষ্টিলক্ষ অবস্থান বিশ্লেষণ করে এর ভর নির্ণয় করেন। রঞ্জন রশ্মির উৎস থেকে যদি অদৃশ্যমান সঙ্গীটির ওজন বিজ্ঞানীরা কমপক্ষে তিন সৌরভরের সমান পান তবে তা একটি ব্ল্যাকহোল বলে নিশ্চিত হন। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি এ ধরণের ব্ল্যাকহোলের সন্ধান পেয়েছেন। যেমন-সাইগনাস এক্স-১ (cygnus X-1); LMC X-3 ইত্যাদি।

খ) গ্যালাক্সির কেন্দ্রস্থলঃ

সাম্প্রতিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণ করে বিভিন্ন গ্যালাক্সির কেন্দ্রে সংকুচিত, গুরুত্বার, এবং অক্ষকারময় বস্তুর সন্ধান পেয়েছেন। গ্যালাক্সি সমূহের কেন্দ্রের এই ভর দশলক্ষ (মিলিয়ন) থেকে কয়েক শত কোটি (বিলিয়ন) সৌর-ভরের সমান। গ্যালাক্সির কেন্দ্রকে অক্ষাংশ ক'রে চারিদিকে আবর্তনশীল নক্ষত্রসমূহ এবং আন্ত-নক্ষত্রীয় পদার্থসমূহের গ্যাসের গতি পর্যবেক্ষণ করে এই ভর নির্ণয় করা হয়। অক্ষাংশের গতি যত দ্রুত হবে নক্ষত্র সমূহ এবং অন্যান্য পদার্থসমূহকে তার অক্ষাংশে ধরে রাখতে তত বেশী শক্তিশালী মহাকর্ষ বলের (Gravitational force) প্রয়োজন হবে। বিজ্ঞানীরা আরও দেখেছেন কেন্দ্রের এই অদৃশ্য বস্তুর ভর সাধারণত গ্যালাক্সির ভরের সমানুপাতিক। অর্থাৎ বৃহৎ গ্যালাক্সির কেন্দ্রের অদৃশ্য বস্তুর ভর বেশী এবং ক্ষুদ্র গ্যালাক্সির কম।

গ্যালাক্সির কেন্দ্রের এই অদৃশ্য গুরুত্বার বক্তুকে ব্ল্যাকহোল হিসাবে ধারণা করার পিছনে দু'টি কারণ রয়েছে। প্রথমতঃ আমাদের জ্ঞানামত নক্ষত্র সমূহ বা আন্তঃনক্ষত্রীয় পদার্থসমূহ এত অকল্পনীয় ঘনত্বের ও অঙ্ককারণময় হতে পারে না। সুতরাং ব্ল্যাকহোল ছাড়া অন্য কোন কিছু চিন্তা করা খুব কঠিন। দ্বিতীয়ত গ্যালাক্সির কেন্দ্রের এই গুরুত্বের বক্তুক হেয়ালীপূর্ণ কোয়াসারকে জুলানীর জন্য যে বিপুল পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন তা সরবরাহ করে থাকে। সক্রিয় গ্যালাক্সি সমূহের একমাত্র আশাথীদ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা স্বতঃসিদ্ধ বলে স্বীকৃত যে গ্যালাক্সি সমূহের কেন্দ্রে অতিগুরু ভার সম্পন্ন ব্ল্যাকহোল রয়েছে। এছাড়া সম্পূর্ণ গ্যালাক্সি কোনও বক্তুকে কেন্দ্র করে চারিদিকে আবর্তনশীল হওয়ার জন্য যে পরিমাণ শক্তিশালী মহাকর্ষ বলের প্রয়োজন তা কেবলমাত্র ব্ল্যাকহোলেরই আছে।

গ) কোয়াসার (Quasars)

কোয়াসার (Quasars) শব্দটি এসেছে Quasi অর্থাৎ Stellar বা প্রায়ই নক্ষত্র থেকে। মহাবিশ্বের সবচেয়ে পুরাতন অঞ্চল সুদূরে অতিমাত্রায় উজ্জ্বল তারকার ন্যায় এই কোয়াসারের সন্ধান পাওয়া যায়। এর উজ্জ্বলতা প্রায় এক হাজার কোটি (দশ বিলিয়ন) গড় গ্যালাক্সির তেজক্রিয়তার সমান এবং আলো ছড়ায় প্রায় একশত গড় গ্যালাক্সির আলোর সমান। মহাবিশ্বের প্রাস্তুসীমায় এত উজ্জ্বল বক্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মনে দারুণ শহরণ জাগায়। কোয়াসারের আর একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধর্ম হলো অস্বাভাবিক রকমের অস্থিরতা এবং এর ব্যাস (diameter) খুব দ্রুত পরিবর্তন হয়। কোয়াসারের অতিমাত্রার উজ্জ্বলতা প্রমাণ করে তার বিশালতা। আবার অতি দ্রুত তরঙ্গায়িত (Fluctuate) হওয়া থেকে মনে হয় এখানে পদার্থ আলোর চেয়ে বেশী গতিসম্পন্ন (যা আইষ্টাইনের তত্ত্বানুসাবে সম্ভব নয়)।

ব্ল্যাকহোলের পুঁজিত চাকতি থেকে যেমন অকল্পনীয় পরিমাণ শক্তি নিষ্কেপ করে, কোয়াসারের তেমনি এই ধরনের রহস্যময় বৈশিষ্ট্যের জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা একে ব্ল্যাকহোল হিসাবে গণ্য করেন। কক্ষপথের নক্ষত্র বা গ্যাসের গতি নির্ণয় করে কোয়াসারের ব্ল্যাকহোলের ওজন নির্ণয় করা যায়। এ পর্যন্ত প্রাণ সর্বোচ্চ এধরণের ব্ল্যাকহোলের ওজন দশ হাজার কোটি (১০০ বিলিয়ন)সৌর ভরের সমান। এই ভর সম্পূর্ণ মিলিওয়ে (ছায়া পথের) গ্যালাক্সির ওজনের সমান।

ঘ) মহাকর্ষ তরঙ্গ (Gravitational Waves)

মহাকর্ষ বল অতিসংক্ষেপে এবং সহজ ভাষায় বলতে গেলে আমরা বুঝি বেগমান বক্তুসমূহ যেমন যুগ্ম-নক্ষত্র প্রণালীতে (binary star system) মহাকর্ষ তরঙ্গের আকারে শক্তির বিকিরণ ঘটায়। যুগ্ম-সদস্যরা অবস্থান শক্তি (Potential energy) হারায়। অন্য ভাষায় যুগ্ম নক্ষত্র যখন একে অন্যের নিকটবর্তী হয় তখন মহাকর্ষ তরঙ্গ নিঃসৃত হয়। এই তরঙ্গমালা নিজেই স্থান-কালের (Space-time) মধ্যে ধাবিত হয় (আলোর রশ্মির মত নয়)। তারা আলোর গতিতে বিস্তার লাভ করে এবং পদার্থের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করার সময় কোন পরিবর্তন ঘটে না। অথচ যে পদার্থের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় তাকে অতি ধীরে পর্যায়ক্রমে চাপে পাতলা করে।

যদি কোথাও মহাকর্ষ তরঙ্গমালার সন্ধান পাওয়া যায় তবে যুগ্ম-নক্ষত্র প্রণালী এবং এমন কি সম্ভবত একক ব্ল্যাকহোলের অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে নির্ণয় করা যায়। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা মহাকর্ষ তরঙ্গের সন্ধানের জন্য বিভিন্ন রকম যন্ত্র উদ্ভাবনের চেষ্টা করছেন।

ঝ্যাকহোলের সৃষ্টি

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত মহাকাশে বেশ কয়েক ধরণের ঝ্যাকহোলের অস্তিত্বের কথা বলেছেন। এগুলি সৃষ্টি হয় বিভিন্ন প্রক্রিয়ায়। তবে অধিকাংশ ঝ্যাকহোল সৃষ্টি হয় সুপারনোভা (Supernova) বিস্ফোরণের মাধ্যমে। আর সুপারনোভা বিস্ফোরণটি ঘটে একটি তারকার জীবনাবসানের ক্ষতিলক্ষণে।

প্রতিটি নক্ষত্রই ধার করা কালের উপর বেঁচে থাকে। নক্ষত্রের জন্য হয় মহাকর্ষ (Gravity) থেকে আবার সময়ের বিবর্তনে মহাকর্ষই তাদেরকে ধ্বংস করে।

নক্ষত্রের জন্য

নক্ষত্রের জন্য হয় মহাশূন্যে (Space) ব্যাপক এলাকাব্যাপী বিস্তৃত পাতলা ঘূর্ণায়মান ধূলিকণা ও গ্যাস (হাইড্রোজেন) এর পরমাণু থেকে। কোটি কোটি বছর ধরে এই পরমাণুগুলি ক্রমান্বয়ে ঘনায়িত হয়ে মেঘের সৃষ্টি করে (বড়ের মেঘে পানির কণার মত)। মহাকর্ষ বল এই মেঘপুঁজি গুলিকে সংকুচিত করতে থাকে ফলে ক্রমান্বয়ে উত্তাপ বৃদ্ধি পায়। কেন্দ্র কণার উত্তাপ বৃদ্ধি পেয়ে যখন তাপমাত্রা কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে পৌছায় তখন পারমাণবিক চূল্পীর মত জলে উঠে। কেন্দ্রীয় একীভবন (Nuclear Fusion) প্রক্রিয়ায় হাইড্রোজেন পুড়ে হিলিয়ামে পরিণত হয় এবং আলো ও তাপশক্তির বিকিরণ ঘটায়। এভাবেই উজ্জ্বল আলো বিকিরণের মাধ্যমে একটি নক্ষত্রের জন্য যাত্রা শুরু হয়। মহাকর্ষ বল নক্ষত্রকে বাহির দিক থেকে কেন্দ্রের দিকে চাপ সৃষ্টি করে সংকুচিত করতে চায়, অন্যদিকে কেন্দ্রে উৎপন্ন প্রচন্ড তাপশক্তি বিকিরণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বর্হিমূখী চাপ সৃষ্টি করে। ফলে নক্ষত্রটি ভারসাম্য ধরে রাখে। এই ভারসাম্যের ফলে একটি নক্ষত্র জ্বালানী নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত কোটি কোটি বছর প্রজুলিত থাকে।

রেড জারেন্ট (RED GIANT) নক্ষত্রের গঠন

নক্ষত্রের যখন সব জ্বালানি হাইড্রোজেন পুড়িয়ে ফেলে, তখন কেন্দ্রে হিলিয়াম কোর (Core) গঠন করে এবং বিক্রিয়াজনিত বিকিরণ চাপ করে যেতে থাকে। ফলে মহাকর্ষ ও বিকিরণ বলের পার্থক্য বাড়তে থাকে। অন্য কথায় আভ্যন্তরীণ বর্হিমূখী চাপ (বিকিরণ বল) যতই হ্রাস পায় অর্তমূখী মহাকর্ষ বল ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। মহাকর্ষ বলের মাত্রা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় কেন্দ্রের পদার্থ আরো সংকুচিত হয়। এক পর্যায়ে এই সংকোচনের মাত্রা অত্যধিক হওয়ায় কেন্দ্রে তাপমাত্রা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়ে হিলিয়ামের নিউক্লিয়াসগুলি অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করায় ঘাত-প্রতিঘাতে আবার একীভবন (Fusion) প্রক্রিয়া শুরু হয়। নক্ষত্রের নতুন জীবনচক্র শুরু হয়। হিলিয়ামের পরমাণুগুলি তখন অধিকতর ভারী

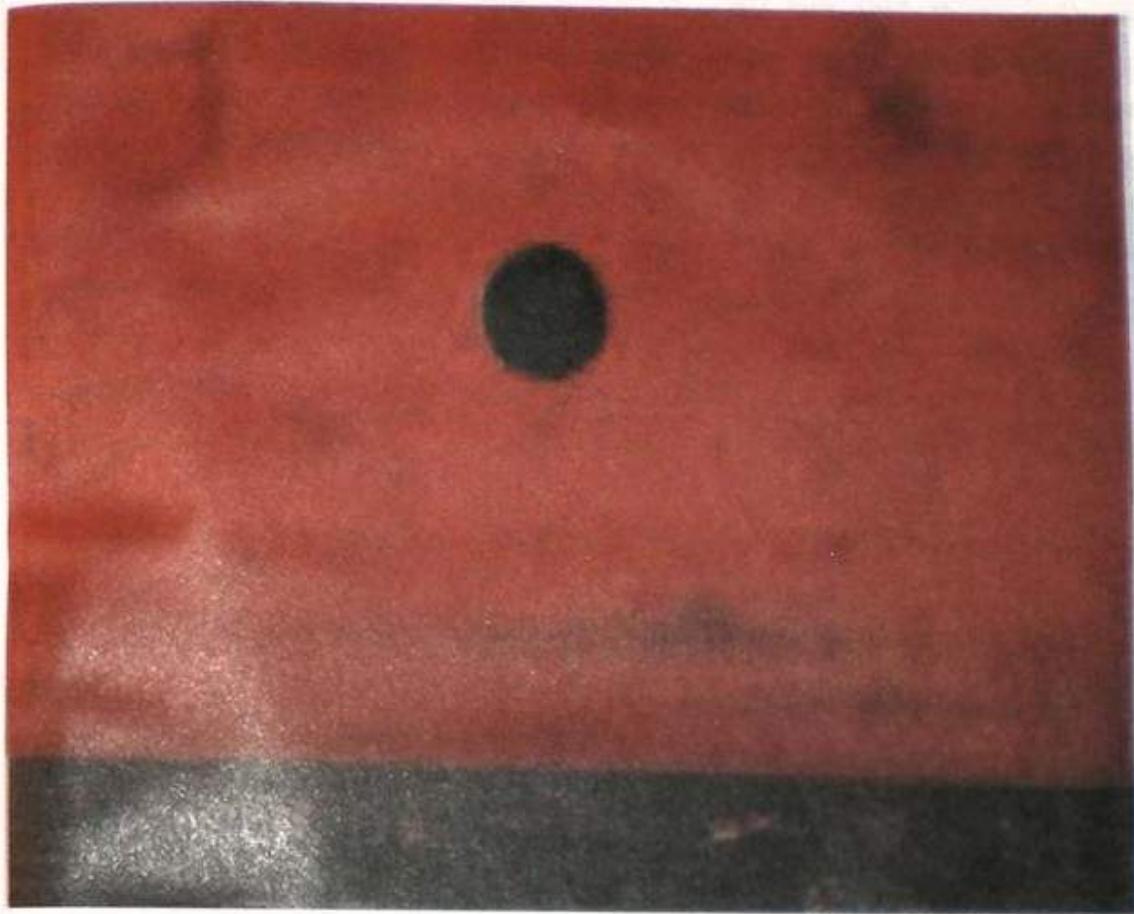
পরমাণু যেমন কার্বনে অতি দ্রুত হারে রূপান্তরিত হয়। কেন্দ্রের কার্বন আবার প্রজলনের মাধ্যমে সৃষ্টি বিকিরণ বল নক্ষত্রের মহাকর্ষ বলের বিপরীতমুখী চাপ সৃষ্টি করে পুনরায় নক্ষত্রের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত করে।

নক্ষত্রের কেন্দ্রে নতুন করে প্রজলনের ফলে সৃষ্টি প্রচন্ড তাপ শক্তি বা বিকিরণ বল নক্ষত্রের বাইরের গ্যাসের আবরণকে দ্রুত মহাশূন্যে সম্প্রসারিত করে এবং শীতল হতে থাকে। নক্ষত্রের ভিতরের অংশ ভীষণ উগ্রতা আর বাইরের অংশটুকু শতগুণ সম্প্রসারিত হওয়ায় অপেক্ষাকৃত শীতল, তাই নক্ষত্রটি তখন লোহিত বর্ণের দেখা যায়। নক্ষত্রের জীবনের এই পর্যায়কে রেড জায়েন্ট (Red Giant) বলে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে আমাদের সূর্য এখন মাঝা বয়স। কিন্তু কোন একদিন এটি একটি রেড জায়েন্টে পরিণত হবে। যখন কেন্দ্রের সমস্ত হাইড্রোজেন নিঃশেষ হবে তখন সূর্য সম্প্রসারিত হয়ে বুধ (mercury) ও শুক্র (venus) এবং সম্মুখত পৃথিবীকে তাপদণ্ড গ্যাস ঢেকে ফেলবে। ভিতরের গ্রহগুলি সূর্যের কেন্দ্রের দিকে অপেক্ষাকৃত গরম গ্যাসের দিকে চক্রাকারে পেঁচানো অবস্থায় ধাবিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে।

নক্ষত্র যখন রেড জায়েন্টে পরিণত হয়, প্রকৃত নক্ষত্রটি তখনও আসল নক্ষত্রের আকৃতির সমান থাকে। নক্ষত্রের প্রায় সম্পূর্ণ ভরই রেড জায়েন্টের কেন্দ্রে অবস্থান করে। বিশাল বায়ুবীয় দীপ্তি লোহিত গ্যাস চারিদিকে ফুলে ফেঁপে উঠে। বায়ুমভলটি হবে অসচ্ছ (অদ্বিতীয়)। দীপ্তি লাল গ্যাসের ফলে নিকটবর্তী কোন দর্শক প্রকৃত নক্ষত্রের কেন্দ্রের আকৃতি দেখতে পাবে না পরিবর্তে তার মনে হবে সম্পূর্ণ নক্ষত্রটি একটি বিশাল লোহিত বন্ধ।

নিম্নের ছবিটি কোন নক্ষত্র রেড জায়েন্ট পরিণত হলে পৃথিবীর মত কোন গ্রহের জীবনাবসান কিভাবে ঘটবে তাৱই একটি চিত্র।



চিত্রে গ্রহের সম্পূর্ণ আকাশ রেড জায়েন্ট তারকা ক্ষীত হয়ে পরিপূর্ণ করে ফেলেছে। অধিকতর উজ্জ্বল তারকা গ্রহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করায় পৃথিবীর মত পূর্বের জলবায়ুকে খংস করে দিয়েছে। সমস্ত পানি বাঞ্চীভূত হয়ে ডু-ডুক শক্ত লাভায় পরিণত হয়েছে। সমস্ত ধ্বংসগ্রাণ ও বাঞ্চীভূত পদার্থ ধূয়ার সৃষ্টি করেছে। এই সমস্ত ধূয়া এবং বাঞ্চা সাময়িকভাবে বায়ুমণ্ডলে সংযোজিত হয়েছে। পরিশেষে গ্রহের এই বায়ুমণ্ডল ক্ষীত জায়েন্ট দ্বারা বিকিৰণের মধ্যে অপসারিত হবে। আৱ গ্ৰহটি রেড-জায়েন্ট আকাশের মধ্যে অনুসন্ধিক্রস কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত ছায়াবৎ নকশার মত মনে হবে।

শ্বেতবামন বা হোয়াইট ডোয়ার্ফ (White Dwarf) নক্ষত্রের গঠন

রেড জায়েন্ট নক্ষত্রের বিবর্তন চলতে থাকেই, ক্রমশঃ বাইরের বায়ুমণ্ডলের দীপ্তি লাল অংশটুকু পাতলা ঠাভা হয়ে মহাশূন্যে হারিয়ে যায়। মূল নক্ষত্রের অধিকাংশ ভর রেড জায়েন্টের ভিতরের কেন্দ্রে থাকে। কিন্তু তা ক্রমশঃ সংকুচিত এবং উত্পন্ন হতে থাকে। নক্ষত্রের কেন্দ্রে সঞ্চিত হিলিয়ামের কেন্দ্রে আরও ভারী পদার্থ সৃষ্টি ও সঞ্চিত হতে থাকে। পরবর্তীতে এই নতুন কোরের অভ্যন্তরেও একইভাবে কেন্দ্রকীয় একীভবন (Nuclear Fusion) বিক্রিয়া শুরু হয়। ফলে আরও অধিক ভারী পদার্থ সৃষ্টি হতে থাকে। হিলিয়াম পুড়ে কার্বন ও অক্সিজেন সৃষ্টি হয়। কার্বন ও অক্সিজেন পুড়ে সিলিকন সৃষ্টি হয় সিলিকন পুড়ে লৌহ সৃষ্টি হয়। দীর্ঘ সময়ের বিবর্তনে সর্বশেষ পর্যায়ে নক্ষত্রের কেন্দ্রে এই লৌহ মৌলে পরিপূর্ণ হয়। নক্ষত্রের অভ্যন্তরে বিভিন্ন মৌল সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় শক্তি নির্গত হয় (বিকিরন তাপ বা শক্তি) কিন্তু কেন্দ্র যখন লৌহ মৌলে পরিণত হয় তখন শক্তি নির্গত না করে তাপকে শোষণ করে অর্থাৎ কোন প্রকার শক্তিকে বিকিরণ (Radiation) হতে দেয় না। শক্তি লৌহ মৌলে আবদ্ধ করে।

এই অবস্থায় নক্ষত্রটির অভ্যন্তরে দাহ্য ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় এবং মহাকর্ষ বল অপেক্ষাকৃত নিয়ন্ত্রিত থাকে ফলে নক্ষত্রটি আর খুব একটা সঙ্কুচিত হয় না। নক্ষত্র গঠনের সময় পরমাণু থেকে যে সমস্ত ইলেক্ট্রন মুক্ত হয়েছিল তা এখন ইলেক্ট্রনস সুপ তৈরী করে এবং এর উপর সমস্ত নিউক্লিয়াসগুলি ভাসতে থাকে। যদিও মহাকর্ষ বল ভিতরের দিকে টানে তবু এ ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রনসগুলি শক্তভাবে একত্রিত হতে পারেনা, ফলে নক্ষত্রটি পরবর্তী ধ্রংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। নক্ষত্রের এটি বয়সকাল; আকারে বিশ্বয়করভাবে ক্ষুদ্র। এই অবস্থায় নক্ষত্রটি সাদাটে অথবা নীলাভ-সাদা রঙের এবং আকারে খুবই ছোট থাকার জন্য নাম দেওয়া হয়েছে শ্বেতবামন বা হোয়াইট ডোয়ার্ফ (White Dwarf)। শ্বেতবামন নক্ষত্রের আবরণ সূর্যের চেয়েও অনেক অনেক গুণ উত্পন্ন থাকে। অধিকাংশ নক্ষত্রের এই অবস্থান শেষ বিবর্তন। শ্বেতবামন নক্ষত্রের পদার্থের ঘনত্ব খুব বেশী থাকে।

সুপারনোভা বিফ্ফোরণ

সাধারণ আকৃতির তারকাগুলি লৌহ মৌল সৃষ্টির পর আর নতুন কোন পদার্থ সৃষ্টি করে না। তবে কোন কোন অতিবৃহৎ তারকার অভ্যন্তরে লৌহ সৃষ্টির পরও ইউরেনিয়াম জাতীয় নতুন পদার্থ সৃষ্টি হতে পারে। তারকা যত বৃহৎ হয় এর ভিতরের অংশ তত বেশী উত্পন্ন থাকে ফলে এর জ্বালানীও দাহ্য হয় দ্রুত। ফলে বৃহৎ আকৃতির তারকার বিবর্তন ধারার পরিসমাপ্তি ঘটে প্রচন্ড বিফ্ফোরণের মাধ্যমে। হাইড্রোজেন নিঃশোষিত হওয়ার পর অন্যান্য মেঘাদীর জ্বালানীগুলি যখন পরিসমাপ্তি ঘটে তখন প্রকৃতপক্ষে তারকার একেবারে কেন্দ্রে আগনের প্রচন্ড তাপশক্তির বিফ্ফোরণের ফলে বাইরের আবরণকে ছিন্ন ভিন্ন করে ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র টুকরায় পরিণত করে। তারকার বাইরের আবরণ বিক্ষিণু অবস্থায় আন্তঃনক্ষত্রীয় মহাশূন্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। ফলে তারকায় উৎপন্ন বিভিন্ন পদাৰ্থ যেমন লৌহ, ইউরেনিয়াম, সোনা, রূপা ইত্যাদিৰ মৌলিক ও যৌগিক বস্তুকণ মহাশূন্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে এবং কিছু উৰ্কা বৃষ্টিৰ (meteor Showers) আকারে পৃথিবীতে আসে। এই বিস্ফোরণকেই সুপারনোভা বলে। এই বিস্ফোরণেৰ পৰ নক্ষত্ৰেৰ আকৃতি অস্থাভাৱিক হাস পেয়ে অবশিষ্টাংশ অসীম ঘনত্বেৰ ঝ্লাকহোল সৃষ্টি কৰতে পাৰে।



সুপারনোভা বিস্ফোরণ মহাবিশ্বে সবচেয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণকাৰী একটি ঘটনা। কোটি কোটি তারকার অবস্থানেৰ ফলে একটি গ্যালাক্সিৰ যে উজ্জ্বলতা থাকে একটি সুপারনোভা বিস্ফোরণেৰ ফলে তাৰ উজ্জ্বলতা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায় এবং কয়েক সপ্তাহ পৰ্যন্ত বিদ্যমান থাকে।

পৃথিবীতে প্ৰতি ঘন্টায় একটন কৰে অতিক্ষুদ্র উৰ্কাৰণা (micrometeorites) এসে থাকে। এছাড়া সারা বছৰ বিভিন্ন সময় বৃহৎ আকারেৰ উৰ্কা পিণ্ড পৃথিবীতে এসে থাকে।

নিউট্ৰন নক্ষত্ৰেৰ (Neutron star) গঠন

সুপারনোভা বিস্ফোরণেৰ পৰ নক্ষত্ৰেৰ বাইরেৰ অংশ চাৰিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাওয়াৰ পৰ অবশিষ্ট থাকে ভীষণ ঘনত্বেৰ ও অস্থাভাৱিক গুণাগুণ সম্পন্ন ছোট কেন্দ্ৰটি। পৱিত্যাক্ত কেন্দ্ৰেৰ পদাৰ্থেৰ ভৰ যদি 1.4 সৌৰ ভৱেৰ কম হয় তখন তা একটি শ্ৰেতবামন নক্ষত্ৰে পৱিণত হয়। সুপারনোভা বিস্ফোরণেৰ পৱিত্যাক্ত নক্ষত্ৰেৰ কেন্দ্ৰ বা কোন শ্ৰেতবামন

তারকার ভর যদি ১.৪ সৌরভরের চেয়ে বেশী হয় তখন ইলেক্ট্রনস নিয়ন্ত্রিত শ্বেতবামন তারকার গঠন মহাকর্ষ বলের প্রভাব যথেষ্ট হওয়ায় তা আর ধরে রাখতে পারে না। এটি তখন আরও পতন ঘটিয়ে সংকুচিত হতে থাকে। এই অবস্থায় প্রটোন ও ইলেক্ট্রন একত্রিত হয় এবং মৌল কার্ক কণা সংযোজিত হয়ে নিউট্রন গঠন করে। উপরের স্তরে ইলেক্ট্রন, প্রটোন, নিউট্রন ও অন্যান্য উপপরমার সুপের একটি নিউট্রনের গোলক তৈরী করে। এভাবে তা একটি নিউট্রন নক্ষত্রে পরিণত হয়। নিউট্রন নক্ষত্রের নিউট্রনসমূহ খুব কাছাকাছি থেকে একে অপরের উপর একটা নির্দিষ্ট চাপ প্রয়োগ করে। এই চাপের ফলে নিউট্রন তারকাটি পরবর্তী ধ্বনি প্রাপ্ত হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করে।

এই অবস্থায় তারকা যেহেতু সমস্ত জ্বালানী নিঃশেষ করে ফেলে এবং ঘনত্ব খুবই বেশী থাকে। ফলে, এখানে কোন গ্যাসীয় পদার্থ থাকে না। অধিকাংশ নিউট্রন তারকাই দ্রুত ঘূর্ণায়মান।

নিউট্রন তারকা তার শক্তিশালী মহাকর্ষ বলের ফলে নিকটস্থ মহাশূন্যের পদার্থ শোষণ করতে থাকে। ফলে এর ভর এবং মহাকর্ষ বল ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে নক্ষত্র পুনরায় সংকুচিত হতে থাকে।

আন্তঃনক্ষত্রীয় কোন গ্যাস বা পদার্থের মেঘপুঁজি নিউট্রন তারকায় প্রচন্ড বেগে পতিত হয়ে আলো ও তাপ নির্গত করতে পারে।

দুই সৌর ভর সম্পূর্ণ কোন নিউট্রন তরকার আকৃতির সংকুচিত হয়ে একটা (Asteroid) গ্রহাগুর আকার ধারণ করে। ফলে, এখানে পদার্থ বিপুল ঘনত্ব লাভ করে।

সুপারনোভা বিস্ফোরণের পর নক্ষত্রের কেন্দ্রে পরিত্যাকৃ পদার্থ অথবা সৃষ্টি নিউট্রন তারকা যদি পার্শ্ববর্তী পদার্থ শোষণ করে তিন সৌর ভরের চেয়ে বেশী হয় তখন তা একটি ব্ল্যাকহোলে (Black Hole) পরিণত হয়। একটি তারকা ব্ল্যাকহোলে পরিণত হতে একটা নির্ধারিত ব্যাসের (শোয়ার্জশীল ব্যাস) সমান হতে হবে।

পালসার

কিছু কিছু নিউট্রন তারকার বাইরের স্তরে শক্তিশালী চুম্বকীয় ক্ষেত্র (Magnetic Fields) থাকে। এই শক্তিশালী চুম্বকক্ষেত্রে যে কোন পতনশীল গ্যাস বৈদ্যুতিক চার্জসম্পন্ন কণিকা (Ions) প্রচন্ড দ্রুতি (Acceleration) প্রাপ্ত হয় ফলে, আলোকছটা (beam of light) বিচ্ছুরণ ঘটায়। আলোক নির্গত হয় নির্দিষ্ট কোন দিকে। নিউট্রন তারকাটি প্রবল গতিসহ ঘূর্ণায়মান হওয়ায় আলোক ছটা মহাশূন্যে অঙ্ককারে মনে হয় আলোকের ঝলক (Flash light) সবেগে নিক্ষেপ করছে। এই ধরনের আলোর সক্ষেতকেই পালসার (Pulsars) বলা হয়। অন্য কথায় নিউট্রন তারকার আলোর ঝলকও বলা যেতে পারে। পালসার সৃষ্টিকারী নিউট্রন তারকাগুলির ঘনত্ব হয় অপরিসীম।

নক্ষত্র বহির্ভূত (Nonstellar) উৎস থেকে সৃষ্টি ব্ল্যাকহোল

বেশ কিছু ব্ল্যাকহোল নক্ষত্র বহির্ভূত উৎস থেকে সৃষ্টি হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন গবেষণা থেকে ধারণা করেন, প্রচুর পরিমাণ নক্ষত্রমন্ডলীয় (Instellar) গ্যাস সংগঠিত এবং সংকুচিত হয়ে মহাকর্ষ বলের প্রভাবে গ্যালাক্সি এবং কোয়াসারের কেন্দ্রে অতিবৃহৎ আকৃতির দৈত্যের মত ব্ল্যাকহোল গঠন করে। হিসাব করে দেখা যায় কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাস কেন্দ্রীয় একীভবন (Nuclear fusion) এর মাধ্যমে যে পরিমাণ শক্তি নির্গত করে ঠিক একই পরিমাণ গ্যাস কোন ব্ল্যাকহোলে দ্রুত পতনশীল অবস্থায় একশত গুণেরও বেশী শক্তি নির্গত করে। অনুরূপভাবে বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন মহাকর্ষ বলের ফলে ব্ল্যাকহোলে পতনশীল লক্ষ লক্ষ, কোটি-কোটি সৌর ভরের নক্ষত্রমন্ডলীর গ্যাস কোয়াসার এবং গ্যালাক্সি পদ্ধতির অকল্পনীয় প্রচুর শক্তির প্রধান উৎস।

আদিম (Primordial) ব্ল্যাকহোল

বৃটিশ জ্যোতিপদার্থবিদ স্টিফেন হকিং নক্ষত্র বহির্ভূত অন্য এক ধরণের ব্ল্যাকহোলের অস্তিত্বের কথা বলেন। এক থেকে দেড় হাজার কোটি বছর পূর্বে বিগ-ব্যাংগের (মহাবিস্ফোরণ) মাধ্যমে মহাবিশ্বের জন্মালগ্নে চরম তাপ ও ঘনত্ব বিদ্যমান ছিল। এ সময় বিপুল পদার্থ অকল্পনীয় ঘনত্বে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে একত্রিত হয়। যার ভর হতে পারে একশত কোটি টন অথচ তা স্থান দখল করে মাত্র একটি উপ পরমাণু প্রটোনের সমান। এভাবে অসংখ্য আদিম (Primordial) ক্ষুদ্রে (Microscopic) ব্ল্যাকহোলের সৃষ্টি হয়। এ ধরণের আদিম ক্ষুদ্র ব্ল্যাকহোল পর্যাপ্ত পরিমাণ পদার্থ শোষণ করে বিশাল ওজন বহন করে।

ব্ল্যাকহোলের শ্রেণী বিন্যাস

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত বিভিন্ন ধরণের ব্ল্যাকহোলের সংক্ষান পেরেছেন। ব্ল্যাকহোলের গঠন প্রণালী আকৃতি এবং ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ ধরনের বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে শ্রেণী বিন্যাস করা হয়েছে।

(১) শোয়ারজশীল বা স্থির (Schwarschild/ Static) ব্ল্যাকহোলঃ এ ধরনের ব্ল্যাকহোল আবর্তনশীল নয়। কোন বৈদ্যুতিক চার্জ নেই। এটি সাধারণত আদর্শমানের ব্ল্যাকহোল।

(২) রেইজনার-নর্ডস্ট্রোম (Ressner-Nordstrom) ব্ল্যাকহোলঃ এ ধরনের ব্ল্যাকহোলও আবর্তনশীল নয় তবে বৈদ্যুতিক চার্জ আছে।

(৩) কের (Kerr) ব্ল্যাকহোলঃ এটি আবর্তনশীল কিন্তু কোন বৈদ্যুতিক চার্জ নেই। এ ব্ল্যাকহোল আবর্তনশীল ব্ল্যাকহোল (Rotating Blackhole) নামেও পরিচিত।

(৪) কের-নিউম্যান (Kerr-Newman) ব্ল্যাকহোলঃ এ ধরণের ব্ল্যাকহোল আবর্তনশীল এবং বৈদ্যুতিক চার্জ সম্পন্ন

(৫) আদিম (primordial) অগুরীক্ষণিক (Microscopic) ব্ল্যাকহোলঃ বিগ-ব্যাংগ (মহা-বিস্ফোরণ) মাধ্যমে মহাবিশ্বের সৃষ্টির জন্ম লগ্নে উপপরমাণু প্রটোন আকৃতির ব্ল্যাকহোল অথচ যার ভর হতে পারে একশত কোটি টন আর এর তাপমাত্রা বার হাজার কোটি কেলভিন।

(৬) পালসার বা নিউটন তারকাঃ অতিবৃহৎ আকৃতির তারকা জন্ম-বিবর্তনের শেষ পর্যায়ে ধ্বন্স প্রাপ্ত অবস্থা অতি শক্তিশালী চুম্বক ক্ষেত্র (Magnetic fields) থাকে। প্রবল মহাকর্ষ বল নিকটস্থ সমস্ত পদার্থ শোষণ করে নেয়।

(৭) কোয়াসার (Quasars) : মহাবিশ্বের সবচেয়ে পুরাতন অঞ্চল সুন্দরে অতিমাত্রায় উজ্জ্বল তারকার ন্যায় এই কোয়াসারের সকান পাওয়া যায়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত প্রাপ্ত এ ধরণের ব্ল্যাকহোলের সর্বোচ্চ ওজন নির্ণয় করেছেন দশ হাজার কোটি সৌর ভরের সমান। এটা সম্পূর্ণ মিহি ওয়ে (ছায়াপথ) গ্যালাক্সির ওজনের সমান।

ব্ল্যাকহোলের জ্যামিতি

রেইজনার নর্ডস্ট্রোম ব্ল্যাকহোলের জ্যামিতি বৈদ্যুতিক চার্জ সম্পন্ন ব্ল্যাকহোলের বর্ণনা করে। স্থির এবং বৈদ্যুতিক চার্জ সম্পন্ন ব্ল্যাকহোল যেহেতু গোলাকার সুসমঙ্গস্য শোয়ার্জশীল এবং রেইজনার নর্ডস্ট্রোম ব্ল্যাকহোলের জ্যামিতি দ্বি-মাত্রায় (Two dimensions) অক্ষবর্তী স্থানাক্ষে (Polar coordinate) এবং ত্রিমাত্রায় গোলীয় সক্রান্ত ও ত্রিকোণমিতি স্থানাক্ষের মাধ্যমে যথাযথ বর্ণনা করা যায়। কেবল ব্ল্যাকহোলের জন্য কমলা আকৃতির উপগোলাকার স্থানাক্ষের (Oblate Spheroidal Coordinate) জ্যামিতি ব্যবহার করা হয়। এটা অক্ষবর্তী স্থানাক্ষের মতই তবে ওধু ব্যতিক্রম অবিরাম দূরত্বের লাইনগুলি উপবৃত্তাকার (ellipses) এবং কৌণিক লাইনগুলি পরাবৃত্তাকার (hyperbola).

ব্ল্যাকহোলের গঠন কাঠামো

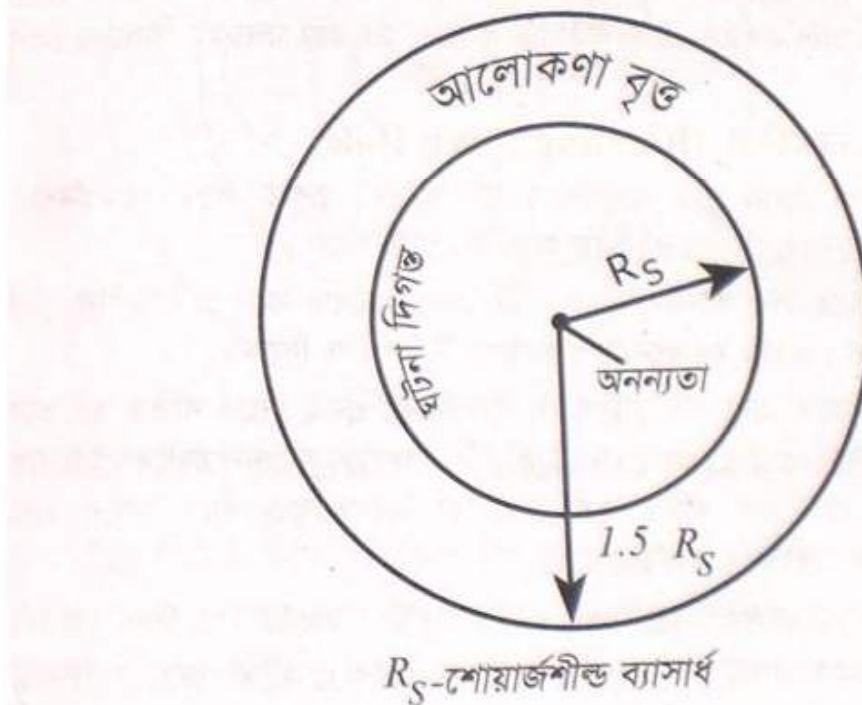
সামগ্রিককালে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ব্ল্যাকহোল সম্পর্কে যথেষ্ট গবেষণা করেছেন। যদিও আমরা ব্ল্যাকহোলের অভ্যন্তরটি দেখতে পাব না, প্রকৃতপক্ষে অভ্যন্তরে কি ঘটে এবং কোন বস্তু পতিত হলে কি করে তা অস্তিত্বাত্মক বা নিঃশেষ হয়ে যায় তা জানা খুব কঠিন। সাধারণত বৃহৎ ভরের নক্ষত্রগুলির জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটায় আবর্তনশীল ব্ল্যাকহোলে। ব্ল্যাকহোলের চারিপাশে ঘূর্ণ্যমান গ্যাসের একটি উত্পন্ন পুঞ্জিত চাকতি (accretion disk) থাকে। বিজ্ঞানীরা আইনষ্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব ব্যবহার করে ব্ল্যাকহোলের গঠন কাঠামো এবং অভ্যন্তরে কি ঘটতে পারে তার বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। বিভিন্ন অঞ্চল অনুশ্য সীমানা দ্বারা পৃথক- স্থির সীমা, ভিতর- বাহির ঘটনা দিগন্ত, অনন্যতা ইত্যাদি। ব্ল্যাকহোলকে কেন্দ্র করে চারিপাশের পুঞ্জিত চাকতি আবার এই চাকতিকে কেন্দ্র করে বিশাল ডিম্বাকৃতির এলাকা (TORUS) থাকে। বাইরের এ দু'টি এলাকা শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা সম্ভব। তবে এ দু'টি এলাকা ব্ল্যাকহোলের অংশ নয়।

আলোকণা বৃত্ত (Photon Sphere)

(ক) স্থির ব্ল্যাকহোল (Static Blackhole)

আলোক বৃত্তের দূরত্বের বিস্তৃতি হচ্ছে ঘটনা দিগন্ত থেকে শোয়ার্জশীল ব্যাসার্ধের ১.৫ গুণ পর্যন্ত এলাকা। [শোয়ার্জশীল ব্যাসার্ধ হল ঘটনা দিগন্ত থেকে অনন্যতা (Singularity) পর্যন্ত দূরত্ব] মহাকর্ষ বল বেশী শক্তিশালী না হওয়ায় আলোকণা বৃত্ত এলাকা থেকে আলো টেনে ঘটনা দিগন্তে নিতে পারে না। তবে এখান থেকে মুক্তও হতে পারে না। আলোকণা এই এলাকায় ব্ল্যাকহোলের কক্ষ পথে ধার্য হয়ে যায়। আলোকণা ব্ল্যাকহোলের কক্ষ পথকে গোলাকার ভাবে পরিক্রমন করে বলেই এই এলাকাকে আলোক বৃত্ত (Photon Sphere) বলা হয়।

আলোকণা বৃত্তে কোন বস্তুকে কক্ষপথে থাকার জন্য আলোর গতিতে পরিক্রমণ করতে হয়। (আলোর গতি 3×10^8 মিটার / সেঁ) এটাই একমাত্র এলাকা যেখানে আলোক রশ্মি ব্ল্যাকহোলের কক্ষপথের চারিদিকে খুবই অস্থির।



এই এলাকার আলো কক্ষপথে সাময়িকভাবে থাকে। কারণ, প্রথমতঃ আলোকণা বৃত্ত এলাকাটি ক্ষুদ্র। একটি আলোক রশ্মির সঠিক আবক্ষপথে (trajectory) আঘাত করার শুধুমাত্র একটিই সুযোগ থাকে। দ্বিতীয়তঃ মহাবিশ্বের সবকিছুর খুব সূক্ষ্ম নয়। এখানে অন্যান্য আলোক রশ্মি সবেগে নিষ্ক্রিয় হয়ে ফিরে যায়, ফলে সমস্ত কিছুর স্থিতিশীলতা নষ্ট

করে। তবে ঘটনাক্রমে অপ্রত্যাশিতভাবে অন্য কোন আলোক রশ্মির সম্মুখীন হয়ে নিয়মিত কক্ষপথের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে আলোর রশ্মি দীর্ঘ সময় আলোকণা বৃত্তের কক্ষপথে থাকতে পারে। হাজার বছর পরে এটা মহাশূন্যে বিকুঠি হতে পারে অথবা ব্ল্যাকহোলে নিমজ্জিত হতে পারে। কণাবাদী তত্ত্বে (Quantum theory) অসংখ্য সম্ভবনার একটি হিসেবে আলোক রশ্মির কক্ষপথে চিরদিন থাকার কথা বলে।

কোন স্বেচ্ছাসেবী মহাশূন্যচারী যদি এই এলাকা অতিক্রম করে প্রথমে সে তাঁর আলোর বন্যায় পতিত হবে। যখন সে উজ্জল এলাকাটি পরিত্যাগ করবে তখন সে চরম অঙ্ককারে নিমজ্জিত হবে এবং অকল্পনীয় মাত্রায় তার গতিবেগ বৃদ্ধি পাবে।

(খ) বৈদ্যুতিক চার্জ সম্পন্ন ব্ল্যাকহোল (Charged Black Hole)

এ ধরণের ব্ল্যাকহোলের আলোকণা বৃত্ত স্থির ব্ল্যাকহোলের অনুরূপ। সংক্ষেপে আলোকণা বৃত্তের ব্যাসার্ধ শোয়ার্জশীল ব্যাসার্ধের 1.5 গুণ। এখানে ব্ল্যাকহোলের অস্থিতিশীল কক্ষপথে আলোক রশ্মি ধরে রাখে। এটাই শেষ সম্ভাব্য কক্ষপথের ব্যাসার্ধ কারণ এর চেয়ে কম ব্যাসার্ধ কক্ষপথে থাকতে আলোর চেয়ে বেশী গতিসম্পন্ন হতে হবে। ধারণা করা হয় (hypothetical) এখানে কেউ দৃষ্টিপাত করলে, সে তার মন্তকের পিছনের অংশ দেখতে পাবে।

(গ) আবর্তনশীল ব্ল্যাকহোল (Rotating Black Hole)

আবর্তনশীল ব্ল্যাকহোলের দুটি আলোকণা বৃত্ত থাকে। প্রকৃত পক্ষে আবর্তনশীল ব্ল্যাকহোল চারিপাশের স্থানকে (Space) নিয়ে আবর্তিত হতে থাকে।

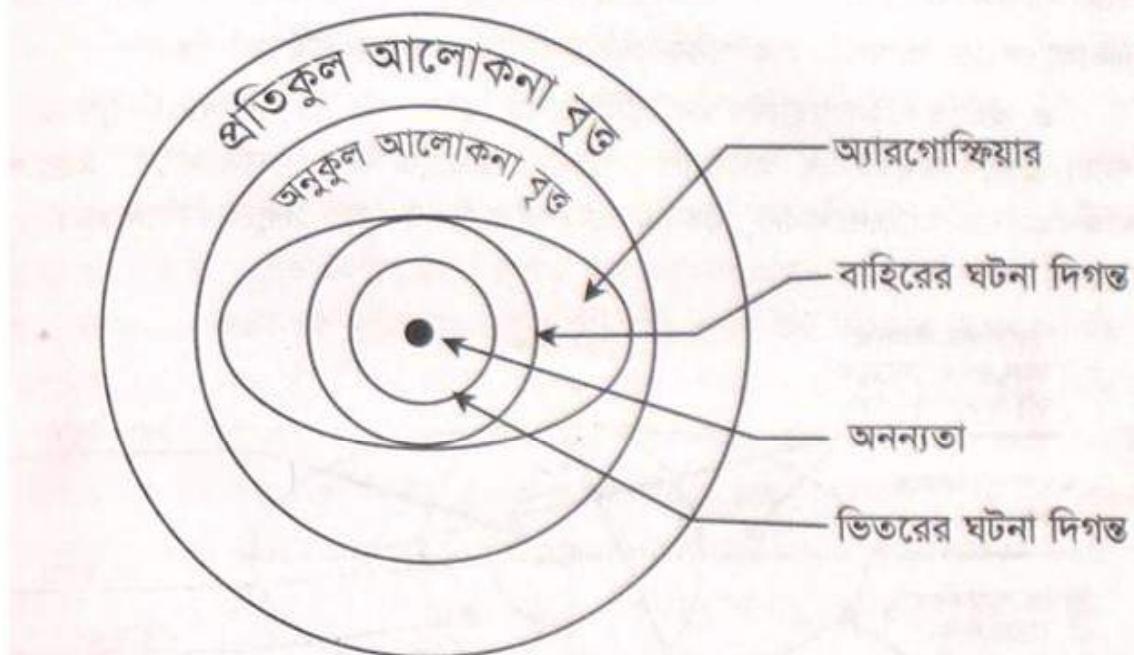
আবর্তনশীল ব্ল্যাকহোলের ব্যাসার্ধ থাকে দু'টি এবং আলোর কণা অস্থিতিশীল দু'টি কক্ষপথে পরিক্রমন করে। একটি ঘূর্ণায়নের দিকে অপরটি বিপরীত দিকে।

এখানে কোন আলোক রশ্মি যদি ব্ল্যাকহোল আবর্তনের একই দিকে পতিত হয় তবে তা অপেক্ষাকৃত দ্রুত চলবে এবং ব্ল্যাকহোলের নিকটবর্তী কক্ষপথে অবস্থান করবে। আলোক রশ্মি যদি আবর্তনের বিপরীতে পতিত হয় তবে তা অপেক্ষাকৃত ধীরে চলবে এবং ব্ল্যাকহোলের দূরের কক্ষপথে অবস্থান করবে।

আবর্তনশীল ব্ল্যাকহোলের আলোকণা বৃত্ত দু'টি কথাটি আংশিক সত্য। আবর্তনশীল ব্ল্যাকহোলের একটি ঘূর্ণায়নের অক্ষরেখা থাকে। এটার গঠন সুসমঝোসা (symmetric) গোলাকৃতির নয়। নিরক্ষরেখা (equator) বরাবর অগ্রসর হলে মনে হবে দুটি আলোকণা বৃত্ত। আর নিরক্ষরেখার সঙ্গে কৌণিকভাবে অগ্রসর হলে মনে হবে একটি আলোকণা বৃত্ত। কারণ উপর থেকে লক্ষ্য করলে ঘূর্ণায়নের অনুকূল বা প্রতিকূল বলে কিছু থাকে না। দু'টি আলোকণা বৃত্তের অবস্থান নির্ভর করবে ব্ল্যাকহোলের আবর্তনের গতির উপর। খুব ধীর গতিশীল ব্ল্যাকহোলের দু'টি আলোকণা বৃত্ত এত

কাছাকাছি থাকে তা প্রায় স্থির ব্ল্যাকহোলের আলোকণা বৃত্তের অনুকূল। ব্ল্যাকহোল দ্রুত আবর্তন হলে দু'টি আলোকণা বৃত্তের দূরত্ব বৃদ্ধি পায়।

যদি কোন নভোচারী ব্ল্যাকহোলের নিরক্ষ রেখা বরাবর অগ্রসর হয় তবে সে আলোক বৃত্তের প্রতিকূল ঘূর্ণায়নে কোন একটি স্থানের সম্মুখীন হবে এবং ব্ল্যাকহোলের ঘূর্ণায়নের বিপরীত মুখী অস্থিতিশীল কক্ষপথে পরিভ্রমণ করবে। কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর একই দিক ঘূর্ণায়ণশীল আলোকণা বৃত্তের সন্দান পাবে এবং ঘূর্ণায়নের অনুকূলে অস্থিতিশীল কক্ষপথে থাকবে।



স্থির সীমা (Static / Stationary Limit) অ্যারগোফ্রিয়ার

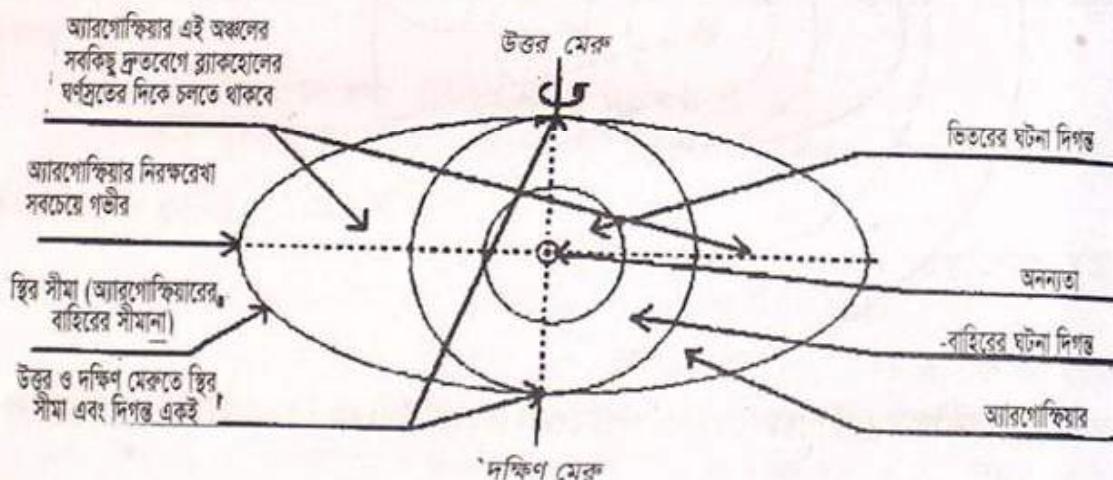
স্থির সীমা :- প্রত্যেক আবর্তনশীল ব্ল্যাকহোলের স্থির সীমা নামে একটি অদৃশ্য সীমানা আছে। আলোর গতির চেয়ে কম সব কিছু এই সীমা এলাকায় ব্ল্যাকহোলের চারিপাশে টেনে নেয়। আলোর গতিতে চলে এই এলাকায় স্থির থেকে ব্ল্যাকহোলের টেনে নেওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। স্থির সীমার বাইরে দূরের নক্ষত্রের সাপেক্ষে কোন কিছু তার স্থির অবস্থান রক্ষা করতে পারে।

স্থির ব্ল্যাকহোলের স্থির সীমা হলো ঘটনা দিগন্ত (event horizon) সুতরাং এটা অতিক্রম করলে আলোর গতিতে চললেও অনন্যতা (Singularity) টেনে নিবে।

অ্যারগোফিয়ার (Ergosphere)

আবর্তনশীল ব্ল্যাকহোলের বিশেষ একটি অঞ্চল। এটি দেখতে ত্রিমাত্রিক উপবৃত্তাকারের (Ellipsoid) মত। এটা ব্ল্যাকহোল থেকে মহাতরদায়িত হয়ে বাইরের ঘটনা দিগন্তের উপরিভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত। ব্ল্যাকহোলের ঘূর্ণায়মান গতি যত বেশী হয় এই অঞ্চলটিও তত বেশী এলাকাব্যাপী মহাতরদায়িত হয়। এই অঞ্চলটি ব্যাসার্ধ দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। তবে ঘূর্ণায়মান অক্ষাংশ বরাবর এর ব্যাসার্ধ যখন $1.5 R_s$ (শোয়ার্জশীল্ড ব্যাসার্ধ) তখন এটা সর্বোচ্চ মহাতরদায়িত হতে পারে। ব্ল্যাকহোলের স্থান-কালের এটি এমন একটা এলাকা যেখানে আকস্মিক গতি পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রবেশ এবং বর্হিগমন সম্ভব।

এ অঞ্চলে প্রবল মহাজাগতিক ঘূর্ণিশোতুর (Cosmic Whirlpool) সৃষ্টি হয়। পদার্থ এখানে ভীষণ বেগে আবর্তনশীল অবস্থায় ভিতরের দিকে টানতে থাকে। উত্তর ও দক্ষিণ মেরঝতে অ্যারগোফিয়ার, স্থিরসীমা এবং ঘটনা দিগন্ত একই বিন্দুতে মিলিত হয়।



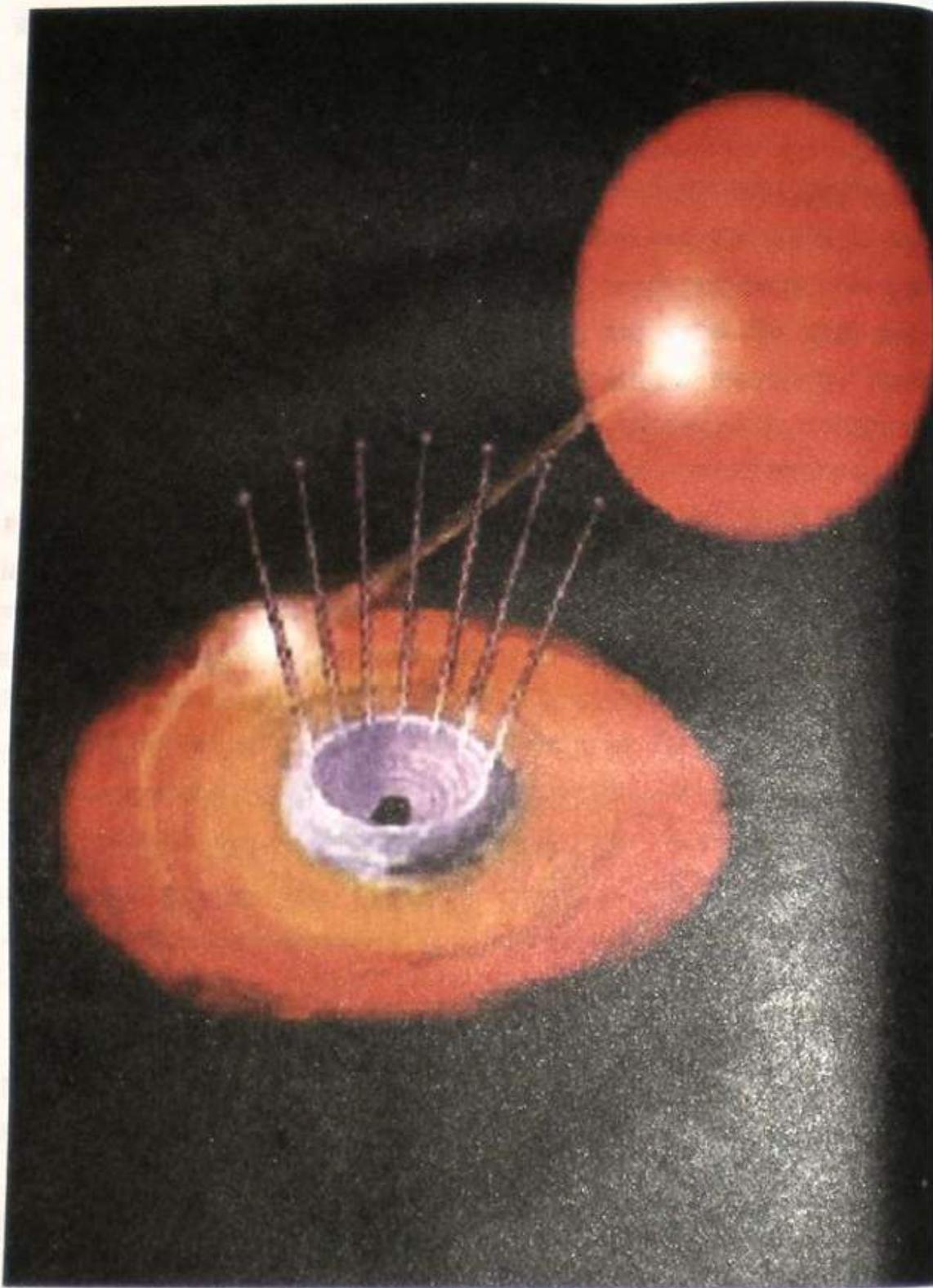
পুঞ্জিত চাকতি (Accretion Disks)

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে ব্ল্যাকহোল দেখা যায় না, কিন্তু এটাকে ঘিরে বিভিন্ন ধরণের পদার্থের হেয়ালীপূর্ণ আচরণ ব্ল্যাকহোলের অস্তিত্বের প্রমাণ করে। অসংখ্য গ্রহ, নক্ষত্র, পর্যাণ পরিমাণ আন্তঃ নক্ষত্রীয় পদার্থ অতি ক্ষুদ্র স্থানে একত্রিত হয়ে ব্ল্যাকহোলের সৃষ্টি হয়।

মহাকাশে নক্ষত্রসমূহ ও অন্যান্য অনেক কিছু যা আমরা দেখতে পাইনা সব কিছুই গ্যাস এবং ধূলিকণায় গঠিত। থাটীন বৃহৎ ব্ল্যাকহোল সৃষ্টির সময় ধ্বংস গ্রহ, নক্ষত্র-

রাজির বাইরের আবরণে যথেষ্ট পরিমাণ ভাসমান পদার্থ থাকে। ব্ল্যাকহোল গঠনে যথেষ্ট পরিমাণ পদার্থের প্রয়োজন হয় সত্য অথচ এর অর্থ এই নয় যে তা সমস্ত পদার্থই ব্যবহার করে ফেলে। ব্ল্যাকহোলের চারপাশে পর্যাপ্ত পরিমাণ গ্যাস ও ধূলিকণা থাকে ফলে তা ব্ল্যাকহোল দ্বারা আন্দোলিত হতে পারে। এই গ্যাস ও ধূলিকণার চাকতি মহাকর্ষ শক্তির প্রভাবে ব্ল্যাকহোলের চারিপাশে ভয়ঙ্কর গতিতে আবর্তিত হতে থাকে। মহাকর্ষ শক্তি যত বেশী থাকে মহাকর্ষ ক্ষেত্রও তত বেশী বৃদ্ধি পায়। আবর্তনশীল ধূলির চাকতি থেকে যখন কিছু পদার্থ ব্ল্যাকহোলে পড়তে শুরু করে, তখন মহাকর্ষের ক্ষেত্র ও শক্তি কমতে থাকে অবশ্য কিছুটা শক্তি গতি শক্তিতে (kinetic energy) পরিণত হয়। ভিতরের দিকে চাপ কিছুটা কমে যাওয়ায় বাইরের চাকতির পদার্থের গতি আরও বৃদ্ধি পায় ফলে চাকতির পদার্থের এক ধরনের সংকুচিত অস্থির গতির উপবৃত্তীয় কক্ষপথে সৃষ্টি করে। কিছু শক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। উত্তম বস্তু থেকে আলোর বিক্রিয়া ঘটায়। ব্ল্যাকহোলের চার পাশে প্রচল বেগে আবর্তনশীল ধূলিকণাসমূহ একে অপরের সঙ্গে ঘাত প্রতিঘাতে অতিমাত্রায় উত্তম হতে থাকে এবং আরও বেশী আলো নির্গত করে। কোন এক সময় এগুলি ভূলতে দেখা যায়, ধূলিকণার পতন যত বৃদ্ধি পায় উভাপ তত বৃদ্ধি পেয়ে উচ্চ আলোক তরঙ্গমালা রঞ্জন রশ্মি (X-ray) এবং গামা রশ্মি নির্গত করতে থাকে। গ্যাস ও ধূলিকণা ব্ল্যাকহোলে পতিত হওয়ার সময় ক্রমান্বয়ে সংকুচিত হতে থাকে এবং উত্তম হয়ে তাপমাত্রা কোটি কোটি ডিগ্রীতে উপনীত হয় এবং বিভিন্ন রঙের আলো নির্গত করে। আলোর বিভিন্ন রং বিভিন্ন তাপমাত্রার সঙ্গে সম্পর্কিত। সর্বোচ্চ তাপমাত্রার পদার্থসমূহ থাকে ব্ল্যাকহোলের সবচেয়ে নিকটে এবং তা অতিবেগুনী (Ultraviolet) ও রঞ্জন রশ্মি (X-ray) নির্গত করে।

আবর্তনশীল ব্ল্যাকহোলের চারপাশে ত্রিমাত্রিক উপবৃত্তীয় এলাকাকে অ্যারগোফ্রিয়ার বলে এবং এটা ব্ল্যাকহোলের বাইরের ঘটনা দিগন্তকে ঘূর্ণ্যমান অক্ষাংশের মেরুতে সংযোগ ঘটায়। যে এলাকায় পুঁজিত চাকতি গঠন করে সেখানেই পূর্ণমাত্রায় অ্যারগোফ্রিয়ার বিদ্যমান। মেরুতে কোন আরগোফ্রিয়ার থাকে না সেখানে শুধুমাত্র বাহিরের ঘটনা দিগন্ত। আরগোফ্রিয়ারের সমস্ত কিছুই চলতে শুরু করে ব্ল্যাকহোলের ঘূর্ণ্যমানের সঙ্গে সঙ্গে। সুতরাং এই অঞ্চলের সব কিছু মেরুর সব কিছুর চেয়ে দ্রুত চলতে থাকে। এর অর্থ হ'ল অ্যারগোফ্রিয়ার থেকে ঘটনা দিগন্ত অতিক্রম করতে নিরক্ষরেখার চেয়ে বেশী সময় লাগে। মেরুর পদার্থ সমূহের ঘটনা দিগন্ত অতিক্রম করতে অল্পসময় লাগে। এভাবেই ব্ল্যাকহোলের চারপাশে পুঁজিত চাকতি গঠিত হয়।



অতিরুহৎ তারকার গ্যাসীয় পদাৰ্থ ব্ল্যাকহোলের শক্তিশালী মহাকর্ষের টানে পুঁজিত চাকতিতে পতিত হচ্ছে।

পুঁজিত চাক্তিতে সংকীর্ণ দু'টি জেট (Two Jets in Accretion Disks)

ব্ল্যাকহোলে দ্রুত বেগমান পতনশীল ধূলিকণা ব্ল্যাকহোলের চারপাশে স্থির বিদ্যুত সৃষ্টি করে। বৈদ্যুতিক ফ্রেত্র চলমান হলে চুম্বক ফ্রেত্রের সৃষ্টি হয়। ব্ল্যাকহোল ভৌষণ শক্তিশালী এবং সৃষ্টি ক্ষেত্রও তাই খুবই শক্তিশালী, এখানে পতনশীল ইলেক্ট্রনস এইফ্রেত্রে আটকা পড়ে। যখন কোন বৈদ্যুতিক ফ্রেত্র চুম্বক ফ্রেত্র সৃষ্টি করে তখন চুম্বক ফ্রেত্রের বল বৈদ্যুতিক বলের দিকে লম্ব (Perpendicular) সৃষ্টি করে চলে।

চুম্বক ফ্রেত্রে এই সমস্ত ইলেক্ট্রনস ঘূর্ণায়নের অঙ্কাংশ বরাবর একটি গতিপথ সৃষ্টি করে এবং চুম্বক ফ্রেত্র দ্বারা অকল্পনীয় গতি ও শক্তিতে তাড়িত হয়। ইলেক্ট্রনসমূহ এত অধিক মাত্রায় শক্তি আহরণ করে যে, তা রঞ্জন রশ্মি এবং কোন কোন সময় গামা রশ্মিতে (আলো থেকে সর্বোচ্চ শক্তিশালী রশ্মির বিকিরণ) পরিণত হয়। এইভাবে সৃষ্টি পুঁজিত চাক্তি থেকে নিষ্কিণ্ড দু'টি জেট ব্ল্যাকহোলের চারপাশে এবং সুদূরে অকল্পনীয় আলোর বন্যা ক্ষিপ্র বেগে চালিত হতে থাকে। এই দু'টি জেট প্রায় আলোর গতিতে (প্রায় ৬৫০ মিলিয়ন মাইল/ঘণ্টা) নির্গত হয়। জেট নিষ্কেপের পর চাক্তির কেন্দ্রের দিকে আরও গ্যাস আকর্ষণ করতে থাকে। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি অর্ধঘণ্টা পর পর পুনরাবৃত্তি ঘটে। দূর থেকে দেখে তাই মনে হয় দু'টি সংকীর্ণমূর্খী জেট গঠন করেছে।

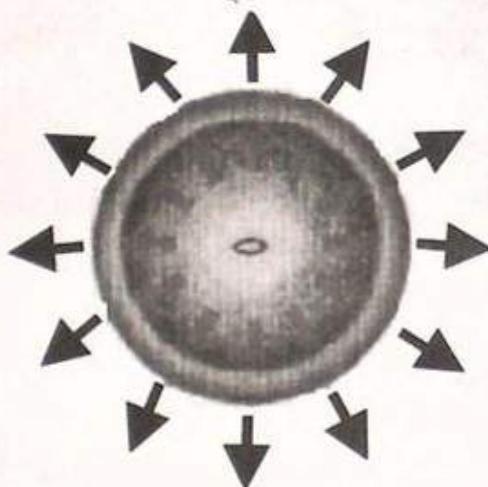
প্রতিচক্রে যে পরিমাণ গ্যাস নির্গত হয় তার ওজন প্রায় (একশত ট্রিলিয়ন) এক কোটি কোটি টন। আর এই বিপুল পরিমাণ গ্যাস এত উচ্চ গতিতে নিষ্কেপ করতে যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয় তা প্রায় সমস্ত আমেরিকার এক বৎসরে যে পরিমাণ শক্তি (energy) ব্যবহার করে তার ছয় লক্ষ কোটি (৬ ট্রিলিয়ন) গুণ বেশী।

ঘটনা দিগন্ত (Event Horizons)

সংজ্ঞানসারে ব্ল্যাকহোল এমন একটা এলাকা যেখানে পদার্থ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে অসীম ঘনত্বে পরিণত হয়, ফলে স্থান-কালের বক্রতা চরমে উপনীত হয়। এছাড়া ব্ল্যাকহোলের প্রবল মহাকর্ষ বলের ফলে কোন আলো অথবা অন্য সব ধরনের বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বিকিরণ পর্যন্ত মুক্ত হতে পারে না। অর্থাৎ যে কোন পদার্থ বা শক্তি বিলুপ্ত হয়ে আমাদের দৃশ্যমান মহাবিশ্ব থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। অন্য কথায় কোন ঘটনাই (events) ব্ল্যাকহোলের এই অঞ্চলের পর থেকে আর আমরা কোন কিছু জানতে পারি না। এ জন্যই এই এলাকাকে ঘটনা দিগন্ত (event horizons) বলে।

ঘটনা দিগন্তের শূমুক্ষু (Event Horizon Growing)

ধরা যাক একটা নক্ষত্র ধ্বংস প্রাণু হয়ে পরিশেষে ঝ্যাকহোলে পরিণত হবে। প্রাথমিক অবস্থায় নক্ষত্রটি যখন ধ্বংস প্রাণু হতে শুরু করে তখন আলোক রশ্মি খুব সামান্যই মহাকর্ষ বল দ্বারা প্রভাবিত হয়। ধ্বংস প্রক্রিয়া চলতে থাকলে ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়, ফলে ঘটনা দিগন্ত গঠন করতে শুরু করে। ঘটনা দিগন্ত এমন একটি বিশেষ ক্ষেত্র যেখান থেকে আলো রশ্মি কখনই নক্ষত্র থেকে অসীমে হারিয়ে যাবে না আবার কখনই প্রত্যাবর্তনও করবে না। কিন্তু একটি নক্ষত্রের চলমান ধ্বংস প্রক্রিয়ায় ঘটনা দিগন্ত সচরাচর প্রসারিত হতে থাকে। ক্রমান্বয়ে আরও অধিক পদার্থ পতিত হওয়ায় ভিতরের ওজন বৃদ্ধি পায়, ফলে ঘটনা দিগন্তের প্রসারণ মন্তব্য হয়ে আসে। আলোক রশ্মির উপর মহাকর্ষের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। ভিতরের সমস্ত পদার্থের পতন সম্পূর্ণ হলে ঘটনা দিগন্তের প্রসারণ বন্ধ হয়ে যায়।



প্রতীয়মান দিগন্ত এবং ঘটনা দিগন্তের মধ্যে পার্থক্য খুবই সূক্ষ্ম বা অস্পষ্ট এমনকি দুর্বোধ্য।

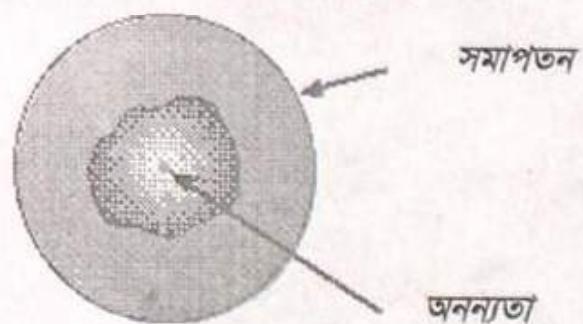
প্রতীয়মান (Apparent) দিগন্তের গঠন

নক্ষত্র ধ্বংস প্রক্রিয়ার প্রাকালে কোন এক সময় ভিতরের মহাকর্ষের আকর্ষণে আর প্রসারণ ঘটে না, ফলে আলোর রশ্মি একটি বহির্গমন ক্ষেত্রের (অর্থাৎ আলোক রশ্মি নক্ষত্র থেকে প্রত্যাগমন নক্ষত্রের দিকে আগমন নয়) সৃষ্টি করে। এমন কি ক্ষেত্রটির আবার সঙ্কোচন শুরু হতে পারে। এটিকে ফাঁদ ক্ষেত্র (trapped surface) বলে। যদি এই ক্ষেত্রটির আর প্রসারণ অথবা সঙ্কোচন না ঘটিয়ে (অর্থাৎ শূন্য প্রসারণ) শুধুমাত্র মহাকর্ষের আকর্ষণের ভারসাম্য রক্ষা করে চলে তখন এ ক্ষেত্রকে প্রতীয়মান দিগন্ত (apparent horizon) বলে। ক্ষেত্রটি ঘটনা দিগন্তের বাইরে হতে পারে না।



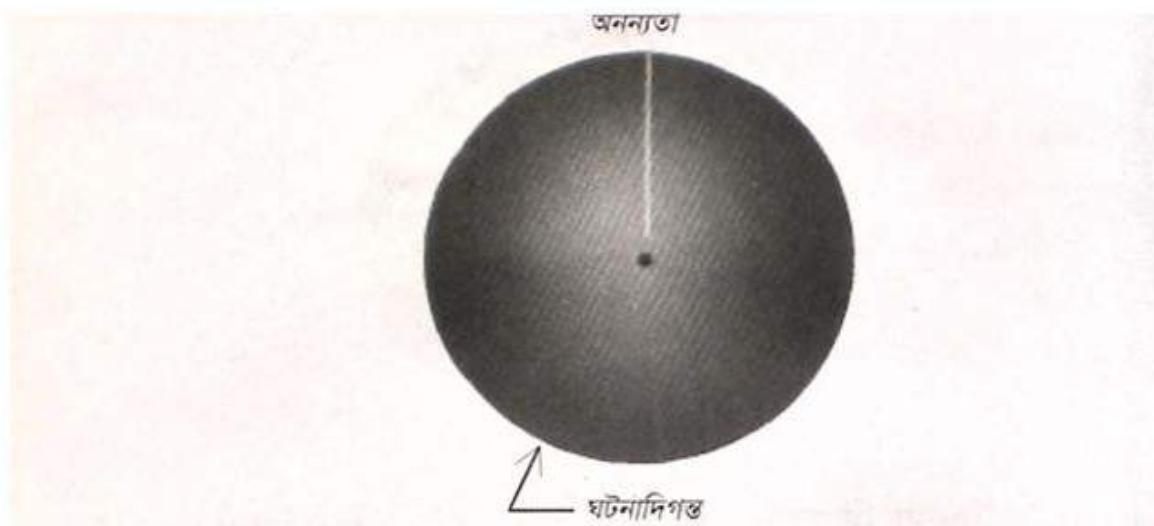
উভয় দিগন্তের সমাপত্তি (Coincide)

প্রতীয়মান দিগন্তের সংখ্যাতাত্ত্বিক আপেক্ষিকতা অধিক সুবিধেজনক, কারণ এখানে শুধু পর্যবেক্ষণ করতে হবে কোন মূহূর্তে ক্ষেত্রটির আর সম্প্রসারণ ঘটছে না। অন্য দিকে ঘটনা দিগন্তটি সাধারণ সম্প্রসারণশীল। এর সম্প্রসারণ বন্ধ হবে গতিশীল প্রক্রিয়ার একে বারে শেষ মুহূর্তে এই অবস্থায় ঘটনা দিগন্ত এবং প্রতীয়মান ঘটনা দিগন্ত সমাপত্তি ঘটবে অর্থাৎ একত্রিত হয়ে যাবে।



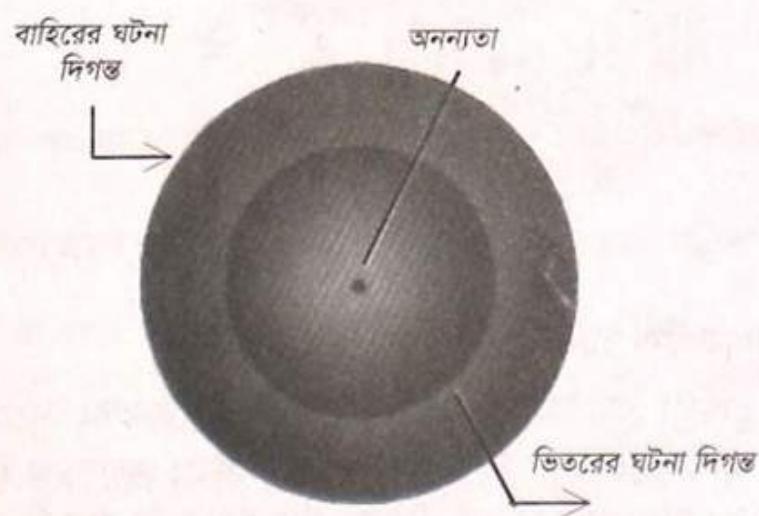
(ক) শোয়ার্জশীল ব্ল্যাকহোলের ঘটনা দিগন্ত :

সবচেয়ে সাধারণ ব্ল্যাকহোল। কোন রকম ঘূর্ণিয়ন গতি এবং বৈদ্যুতিক চার্জ থাকে না। ত্রিমাত্রার গোলকের ক্ষেত্রকে ঘটনা দিগন্ত বলে। কেন্দ্রে অনন্যতার (Singularity) চারপাশে ঘটনা দিগন্তের অবস্থান। এই দিগন্তের পরে মহাকর্ষের আকর্ষণ অকল্পনীয়। ফলে কোন কিছু ঘটনা দিগন্তকে অতিক্রম করলে প্রবল বেগে কেন্দ্রের অনন্যতা তাকে টেনে নিবে এবং আমাদের জানা মহাবিশ্বে কোন তথ্য আর কখনও পৌছাবে না।



(খ) রেইজনার-নর্ডস্ট্রোম (Reissner-Nordstrom) ব্ল্যাকহোলের ঘটনা দিগন্ত :

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে রেইজনার-নর্ডস্ট্রোম ব্ল্যাকহোলের বৈদ্যুতিক চার্জ থাকে কিন্তু কোন ঘূর্ণায়ন গতি থাকে না। এ ধরনের ব্ল্যাকহোলের দু'টি ঘটনা দিগন্ত থাকে। দুই দিগন্তের মধ্যবর্তী এলাকা থেকে পদার্থ শুধুমাত্র একমূখ্য ভিতরের দিগন্তের দিকে আকর্ষিত হতে থাকে। যেই মাত্র পদার্থ ভিতরের ঘটনা দিগন্তে পৌঁছায় তারপর তা আরও ভিতরে শোষিত হয় না।



বৈদ্যুতিক চার্জের মাত্রা যত বেশী হবে, বাইরের ঘটনা দিগন্ত তত ক্ষুদ্র হবে এবং ভিতরের ঘটনা দিগন্ত বৃহৎ হবে। যদি এ জাতীয় কোন ব্ল্যাকহোলের বৈদ্যুতিক চার্জের পরিমাণ এর ভরের সমকক্ষ হয় তখন বাইরের এবং ভিতরের ঘটনা দিগন্তের সমাপ্তন বা একত্রীকরণ ঘটে। আবার যদি এই চার্জের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেয়ে ব্ল্যাকহোলের ভরের চেয়ে বেশী হয় তখন উভয় ঘটনা দিগন্তের বিলুপ্তি ঘটিয়ে উন্মুক্ত অনন্যতা (naked singularity) গঠন করে। আমরা উভয় ঘটনা দিগন্ত থেকে পরিত্রাণ পাব। এর অর্থ হ'ল আমরা বৈদ্যুতিক চার্জসম্পন্ন ব্ল্যাকহোলের অনন্যতার নিকট অতি স্বচন্দে বিচরণ করা সম্ভব এবং আলোর গতিতে চলারও কোন প্রয়োজন নেই। বাস্তবে উন্মুক্ত অনন্যতা ঘটার মত পরিস্থিতি ঘটে না। রেইজনার-নর্ডস্ট্রোম ব্ল্যাকহোলের পুঞ্জিত প্রটোন সৃষ্টি বৈদ্যুতিক চার্জের একটা উর্ধ্বতর সীমা রয়েছে।

(গ) কের (Kerr) ব্ল্যাকহোলের ঘটনাদিগন্ত :

কের ব্ল্যাকহোল আবর্তনশীল। বলয় অনন্যতাকে (Ring Singularity) ধরে বৈদ্যুতিক চার্জসম্পন্ন ব্ল্যাকহোলের ন্যায় কের ব্ল্যাকহোলেরও দুটি ঘটনা দিগন্ত থাকে। বাইরের ঘটনা দিগন্তের পরিসীমার বাইরে থাকে ইতিপূর্বে আলোচিত অ্যারগোফিয়ার।



শোয়ার্জশীল বা ছির ব্ল্যাকহোলের ঘটনা দিগন্ত অতিক্রম করার পর আত্মক্ষণ করা প্রায় অসম্ভব। আবার বৈদ্যুতিক চার্জসম্পন্ন এবং আবর্তনশীল ব্ল্যাকহোলের দুটি ঘটনা দিগন্তের চির সম্পূর্ণ আলাদা। উভয় ক্ষেত্রেই বাইরের ঘটনা দিগন্তে স্থান-কালের চারাটি মাত্রা (dimension- 3-space & 1 time) এক দিকে পরিবর্তিত হয়। আবার ভিতরের দিগন্তে তা আমাদের বাস্তব পৃথিবীর মত তিনি স্থান (Space) মাত্রা এবং ১টি সময় মাত্রায় ফিরে আসে। এখানে অনন্যতাকেও পরিহার করা সম্ভব।

আবর্তনশীল ব্ল্যাকহোলের কৌণিক গতি যত বেশী হবে ঘটনা দিগন্ত দু'টি তত কাছাকাছি অবস্থান করে ঘূর্ণায়মান হবে। ব্ল্যাকহোলের আবর্তনশীল কৌণিক গতি বৃদ্ধি পেয়ে যদি এর ভরের সমান হয় তখন দু'টি ঘটনা দিগন্ত একত্রীকরণের ফলে একটিতে পরিণত হয়। এই গতি যদি আরও বৃদ্ধি পায় তখন উভয় দিগন্তের বিলুপ্তি ঘটবে। অনন্যতাটি এই ক্ষেত্রে উন্মুক্ত বলয়াকারে (Naked Ring Singularity) বিরাজমান থাকবে।

ভিতরের ঘটনাদিগন্তে ব্ল্যাকহোলের ঘূর্ণায়নের জন্য মহাকর্ষ বলের বিপরীত মুখী একটি বলের উদ্ভাবন হয়। ফলে অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক অপ্তলের সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ বস্তুই কেন্দ্রের দিকে চক্রাকারে ধাবিত হতে থাকবে, কিন্তু শক্তিশালী ইঞ্জিনসহ কোন রকেট এই অপ্তলে পরিচালন করে অবস্থান করা যেতে পারে, যদিও এখান থেকে বাইরে যাওয়া কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়।

অনন্যতা (Singularity)

ব্ল্যাকহোলের অনন্যতা (Singularity) হলো যা কিছু (anything), সবকিছু (everything), কিছু না (nothing), স্থান-কালের অসীম বক্রতার এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে এর সবগুলিই সঠিকভাবে প্রযোজ্য হতে পারে। এখানে কি ঘটে তা বুঝতে চাইলে আইনষ্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ এবং কণাবাদী বলবিদ্যা (quantum mechanics) এর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আমাদের সাধারণ জ্ঞানের মানুষের এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীরা যে সমস্ত তথ্য তুলে ধরেছেন তা দিয়েই বুঝতে চেষ্টা করা উচিত।

সর্বপ্রথম এই অনন্যতাকে বলা যায় 'অসীম সম্ভাবনার ফেনায়িত শয্যা'। এর অর্থ হলো এর মধ্যে যেমন থাকতে পারে বিশাল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির যুগপৎ মহাবিশ্ব, বা কেলাসিত ভগ্নাকৃতির গাছ (crystallized fractal shaped) অথবা আবার ছোট গোলাপী রঙের বিড়াল ছানাটি। বেশ বিভ্রান্তিকর তাই না। ধরা যেতে পারে অনন্যতা হলো আদিম মহাবিশ্বের আকঞ্জনীয় শক্তি এবং সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল অবস্থার একটি কেন্দ্র।

উপরের সবকিছুই যেমন হেয়ালীপূর্ণ আবার তেমনি বিভ্রান্তিকরও বটে। এবার ব্ল্যাকহোলের অনন্যতাকে একটু অন্য দৃষ্টিতে দেখা যাক।

একটা বিশাল আকৃতির নক্ষত্র জীবনের শেষ লংগু যখন ব্ল্যাকহোলে পরিণত হতে শুরু করে তখন তার নিজের মহাকর্ষ বলের চাপে এত বেশী সঙ্কুচিত হতে পারে যে, শেষ পর্যন্ত একটা পরমাণুর আকার ধারন করে একটা গাণিতিক বিন্দুতে পরিণত হয়। এই একক বিন্দুতে চাপ, বস্তুর ঘনত্ব এবং স্থান কালের বক্রতা সব কিছুই এক অসীম অক্ষে পৌছায়। এখানে প্রতি ঘন ইঞ্চি পরিমিত স্থানে বস্তুর ঘনত্ব হতে পারে কয়েক লক্ষ কোটি টন। এই হলো অনন্যতার সাধারণ চিত্র। বিভিন্ন ধরনের ব্ল্যাকহোলের অনন্যতা বিচ্ছিন্ন সম্পন্ন।

(ক) শোয়ার্জশীল ব্ল্যাকহোলের অনন্যতা

(Singularity of Schwartzchild Blackhole)

আমরা ইতিমধ্যে জানতে পেরেছি যে, শোয়ার্জশীল ব্ল্যাকহোল স্থির অর্থাৎ আপন অক্ষের চারপাশে ঘূর্ণায়মান নয়। চেহারাটা বর্তুলাকৃতির এবং এর কোন বৈদ্যুতিক চার্জ নেই।

ব্ল্যাকহোলের কেন্দ্রে বিপুল ভরের পদার্থ অসীম ঘনত্বের ফলে প্রবল মহাকর্ষ বল স্থান কালের চরম বক্রতা ঘটায়। শোয়ার্জশীল ব্ল্যাকহোলে আলোর গতিতে চলমান কোন বন্ধ পর্যন্ত ঘটনা দিগন্ত অতিক্রম করলে তা থেকে আর বেরিয়ে আসতে পারে না। কারণ হলো ব্ল্যাকহোলের ঘটনা দিগন্ত অতিক্রমকারী কোন বন্ধের মুক্তগতি (Escape Velocity- মহাকর্ষ বল থেকে মুক্ত হওয়ার গতি) আলোর গতির চেয়ে বেশী হয়। এর অর্থ হলো কোন লেজার (আলোক বিবর্ধন যন্ত্র) যদি অনন্যতার বিপরীত দিকে যেতে চায় তখন অনন্যতা লেজারকে নিজের দিকে টেনে আনে। ঘটনা দিগন্তের পরে মহাকর্ষ আলোর গতির মতই প্রবল সূতরাং এখান থেকে মুক্ত হতে আলোর গতি ($1,86,000$ মাইল/ সেং) সম্পন্ন হতে হবে। আইনষ্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ অনুসারে তা অসম্ভব। অন্য কথায় যে কোন বন্ধ শোয়ার্জশীল ব্ল্যাকহোলের কেন্দ্রের উপর হমড়ি থেকে পড়বে এবং অস্তিত্ব যেন একবারে লোপাট হয়ে যাবে।

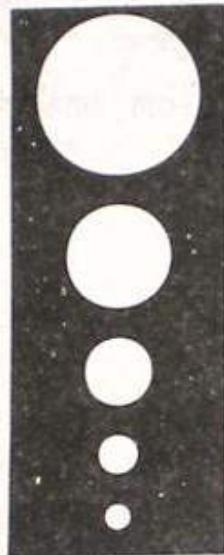
বিশ্বাস: আইনষ্টাইনের তত্ত্বানুসারে শূন্যে আলোর গতি অপরিবর্তনীয় (Constant) এবং এর চেয়ে বেশী গতি সম্পন্ন কোন কিছু হতে পারে না। কিন্তু ২০০২ সালের এপ্রিল মাসে অস্ট্রেলিয়ার পদার্থ বিজ্ঞানী পাওয়েল ডেভিস এবং তাঁর সহকর্মীরা জগৎসৃষ্টির বিভিন্ন তথ্য থেকে প্রমাণ করেছেন মহাবিশ্ব সৃষ্টির প্রথম লগ্নে আলোর গতি বর্তমানের অনেক অনেক গুণ বেশী ছিল। এছাড়া ইদানীং আলোর চেয়ে বেশি গতিবেগ সম্পন্ন কণার সূত্র পাওয়া যাচ্ছে, যার নাম দেওয়া হয়েছে ট্যাকিয়ন (Tachyon)। নিউয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জেরাল্ড ফাইনবার্গ এর মতে ট্যাকিয়ন আলোর চেয়ে লক্ষ কোটি গুণ দ্রুততর, কিন্তু তাকে আলোর গতি বা তার চেয়ে কম গতিতে নামিয়ে আনলে তার অস্তিত্বের বিলুপ্তি ঘটে। ট্যাকিয়ন গতিতে তথাকথিত অতীতই হবে ভবিষ্যত। আইনষ্টাইন যেমন ধারণা দিয়েছিলেন আজ যাত্রা শুরু করে গতকাল পৌছনো সম্ভব। এছাড়া ১৯৯৭ সালে জুলাই মাসে জেনিভা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডঃ নিকোলাস গিসিন আলোর চেয়ে দশ হাজার গুণ গতিতে সাত মাইল দূরত্বে রাখা দু'টি আলোক কণার (photon) মধ্যে সংকেত পরিবহন প্রমাণ করেছেন।

(খ) কের ব্ল্যাকহোলের অনন্যতা। বলয় অনন্যতা।

(Singularity of Kerr Black-hole. Ring Singularity)

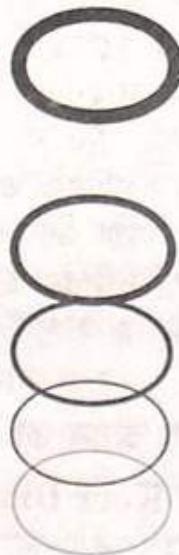
কের বা ঘূর্ণায়মান ব্ল্যাকহোলের অনন্যতা স্থির বা বৈদ্যুতিক চার্জ সম্পন্ন ব্ল্যাকহোলের অনন্যতা থেকে ভিন্ন রূপ। স্থির বা বৈদ্যুতিক চার্জ সম্পন্ন ব্ল্যাকহোলের অনন্যতা যেখানে বিন্দু আকৃতির স্থানে কেরের জ্যামিতি অনুসারে এ ধরণের ব্ল্যাকহোলের অনন্যতা বলয় (Ring) আকৃতির। ফলে কের ব্ল্যাকহোলের অনন্যতায় বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

অনন্যতা মহাকর্ষের চূড়ান্ত বিজয় অন্য কথায় পদার্থ সংকুচিত হয়ে অসীম ঘনত্ব লাভ করে। ঘূর্ণায়মান নয় এমন কোন নক্ষত্র বা বস্তুকে প্রবল চাপে মহাকর্ষ পদার্থ সমূহকে সুসামঞ্জস্যভাবে সংকুচিত করতে থাকে। পরিণামে অনন্যতা একটি অসীম ক্ষুদ্র বিন্দুতে পরিণত হয়।



ঙ্গির বস্তুর বিন্দুতে সংকোচন

অন্যদিকে ঘূর্ণায়মান কোন বস্তু সংকুচিত হতে থাকলে ঘূর্ণিয়ন বলের (Force) ফলে স্ফীত হয়ে বলয় আকৃতি ধারণ করে। পরিণামে অনন্যতা একটি অসীম ক্ষুদ্র পাতলা বলয়ে (Ring) পরিণত হয়।



ঘূর্ণায়মান বস্তুর বলয়ে সংকোচন

মহাবিশ্বের সমস্ত নক্ষত্রই ঘূর্ণায়মান। যে সমস্ত বৃহৎ নক্ষত্র সমূহের জীবনের পরিসমাপ্তি ব্র্যাকহোলের মাধ্যমে ঘটে, তাদের অনন্যতাও বলয় আকৃতির হয়ে থাকে। বলয় আকৃতির অনন্যতা প্রকৃতপক্ষে অসীম ক্ষুদ্র পাতলা লাইন নয়। যদি একে কোটি, কোটি গুণ বিবর্ধিত করা

যায় তবে এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের স্থান (Space) বক্রতার ফলে সাবানের ফেনার ন্যায় না হয়ে কোয়ান্টাম ফোমের মত দেখাবে। এখানে স্থানের নির্দিষ্ট কোন আকার নেই। শুধুমাত্র বিভিন্ন সংস্কারনাময় আকৃতির কেতা বা সেট, অন্য কথায় সবকিছুই গঠন করা সম্ভব।

আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি যে, ঘূর্ণায়মান ব্ল্যাকহোলের ভিতরের ঘটনা দিগন্ত অতিক্রম করার পর স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করা সম্ভব। কারণ এখানে স্থান-কালের স্বাভাবিক এলাকা যদি কেহ নিরক্ষরেখা (equatorial) ছাড়া অন্য যে কোন দিক থেকে অগ্রসর হয় তবে অনন্যতাকে আঘাত না করে ভিতরে পৌছা যেতে পারে। ভিতরে ঘোরা-ফেরা ক'রে ব্ল্যাকহোল পরিত্যাগ ক'রে নিজস্ব মহাবিশ্বে ফিরে আসা সম্ভব। আবার যদি অনন্যতার দিকে অগ্রসর হওয়া যায় তবে সম্পূর্ণ অন্য কোন নতুন মহাবিশ্বে পৌছা সম্ভব।

ঘূর্ণায়মান অক্ষরেখা বরাবর অবলোকন করলে অনন্যতাকে মনে হবে বৃত্তাকার জানালার মত, আবার নিরক্ষরেখার কাছাকাছি থেকে মনে হবে ডিম্বাকার আকৃতির জানালার মত। এই জানালাতে অবলোকন করলে বেশ জটিল কিছু দৃশ্য দেখা যাবে। তবে সহজভাবে বলতে গেলে প্রধানতঃ তিনটি দৃশ্য দেখা যাবে- অনন্যতার চারিপাশে ঠিকরে পড়া নিজস্ব মহাবিশ্বের আলো (সদ্য আসা মহাবিশ্বের); অনন্যতার নিজস্ব আলো এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন মহাবিশ্বের আলো (অপর অনেক মহাবিশ্ব দেখা সম্ভব)। এখানে প্রশ্ন আসতে পারে অনন্যতা থেকে কেন আলো নির্গত হবে? অনন্যতা এমন একটা জায়গা যেখানে আমাদের জানা পদার্থ বিজ্ঞানের যুক্তি সঙ্গত কোন আইন মানে না। অবিরত এই এলাকার চারিপাশে কণার সৃষ্টি এবং ধ্বংস হচ্ছে। এই জন্যই এখান থেকে আলো নির্গত হয়।

প্রকৃতপক্ষে ঠিক অনন্যতার নিকটে তৃতীয় আর একটি আলোক বৃত্ত রয়েছে। যদি আলোক রশ্মি প্রায় সমান্তরাল ভাবে ঘূর্ণায়মান অক্ষরেখা বরাবর অগ্রসর হয় তবে অনন্যতার মহাকর্ষ এবং বিপরীত মহাকর্ষ ভারসাম্য বজায় রাখে। আলোর গমন পথটি স্থির দূরত্বে বিচ্ছিন্ন দেখায় (কেবের জ্যামিতি অনুসারে ত্রিমাত্রার ডিম্বাকার আকৃতির উপবৃত্ত)।

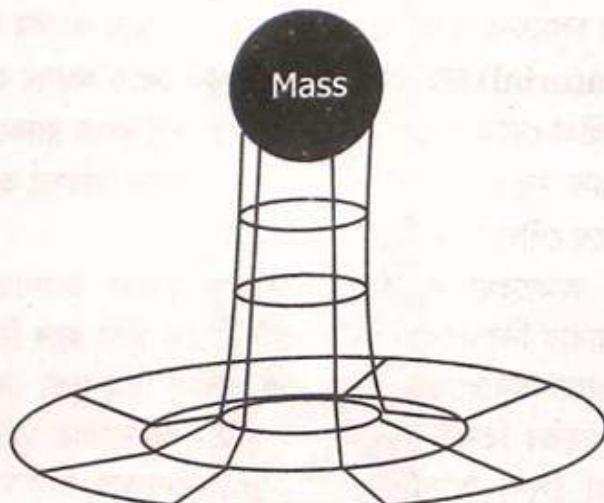
কোন কোন সময় আলোর এই পথ অন্য মহাবিশ্বে অগ্রসর হয়ে আবার ফিরে আসে।

কোন বন্ধ নিরক্ষরেখা ক্ষেত্র বরাবর ঘটনা দিগন্তে প্রবেশ করলে অনন্যতায় ধ্বংসপ্রাণ হবে। বলয় অনন্যতায় আলোর চেয়ে কম গতিতে চলা সম্ভব। শৌয়ার্জশীল ব্ল্যাকহোলের অনন্যতায় তা সম্ভব নয়।

না-ধর্মী স্থানে (Negative Space) সম্পূর্ণ ভিন্ন মহাবিশ্বসমূহ

আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের সমীকরণের কেবের আংশিক সমাধানে বলয় অনন্যতা দ্বারা সীমাবদ্ধ অঞ্চলটি বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য বহন করে। এই অঞ্চলটি না-ধর্মী স্থান-কাল (Negative Space Time) নির্দেশ করে। যদিও এর অর্থ বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিতর্কিত, তবু অধিকাংশ বিজ্ঞানীরাই মনে করেন এই অঞ্চলে মহাকর্ষ বল আকর্ষণের

পরিবর্তে বিকর্ষণ করে। অন্য কথায় এটা এমন একটা অঞ্চল যেখানে রাবারের পাতে কোন ভর রাখলে তা উপরের দিকে বক্রতা সৃষ্টি করবে। অন্য একটি তত্ত্ব (Theory) দাবী করা হয় এই অঞ্চলে বস্তুর ঝণাঝক (Negative) ব্যাসার্ধ থাকে।



ঝণাঝক স্থান-কাল

সংখ্যার মহাবিশ্বে প্রবেশ সম্ভব। পেনরোজের ব্ল্যাকহোলের নকশাতে দেখলে এটা সহজে বোধগম্য হয়। (এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা এ অধ্যায়ের পরবর্তীতে আছে)। এখান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন অনেক মহাবিশ্বে প্রবেশের পথ রয়েছে। ভিতর এবং বাইরের জটিল কিছু পথ অনুসরণ ক'রে ভিতরের ঘটনা দিগন্তে অন্য মহাবিশ্বের ভিতরে প্রবেশ না করে উকি মারা সম্ভব।

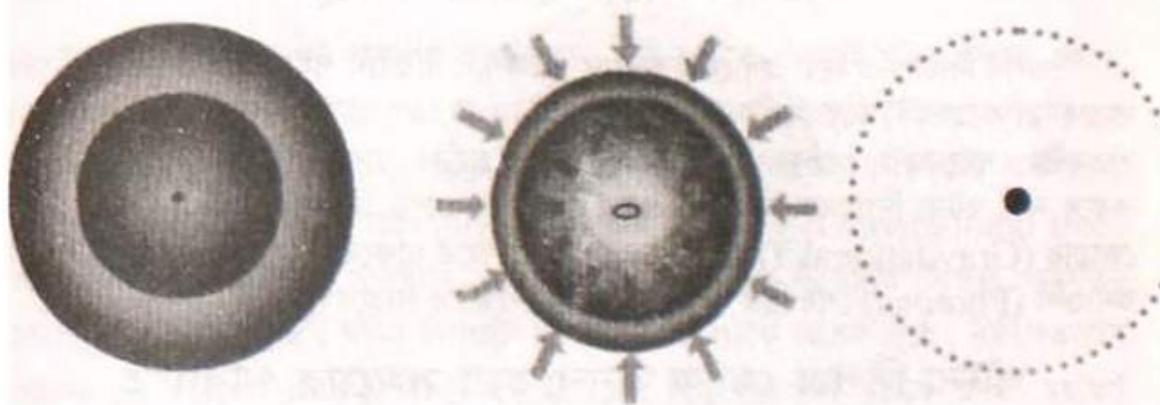
(গ) কের নিউম্যান ব্ল্যাকহোলের অনন্যতা (Singularity of Kerr Newman Black Hole) উম্মুক্ত অনন্যতা (Naked Singularity)

কোন নক্ষত্র ধর্মস্থানে হয়ে ব্ল্যাকহোলে পরিণত হলে অনন্যতার চারপাশে ঘটনা দিগন্তের আবরণ সৃষ্টি ক'রে ঢেকে রাখে। বিশেষ কোন অবশ্যিক্তাবী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ব্ল্যাকহোল ঘটনা দিগন্ত ছাড়াই গঠন হতে পারে। এ ক্ষেত্রে অনন্যতাকে দেখা সম্ভব, এমনকি সেখানে যাতায়াত সম্ভব। কিন্তু আমাদের ভূলে গেলে চলবে না অনন্যতা একটি অসীম ঘনত্বের স্থান। এখানে আমাদের জানা পদার্থ বিজ্ঞানের সমস্ত আইন বাতিল হয়ে যায়। ফলে যে কোন কিছুই ঘটনা সম্ভব। ঘটনা দিগন্ত না থাকায় চারপাশের মহাবিশ্বকে রক্ষা করার কিছু থাকে না। সবকিছু মহাজাগতিক অরাজকতার (Cosmic anarchy) শাসন নিয়ন্ত্রণাধীনে।

উম্মুক্ত অনন্যতার গঠন

উম্মুক্ত অনন্যতার গঠনের কৌশল হলো ঘটনা দিগন্তে দু'ধরনের বল-গুরি (Spin) অথবা বৈদ্যুতিক চার্জ বিপরীতে কাজ করে মহাকর্ষ বলের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়। অতি দ্রুত ঘূর্ণায়মান অথবা শক্তিশালী বৈদ্যুতিক চার্জ সম্পন্ন কোন ধ্বংসপ্রাণ বস্তু ঝ্যাকহোলের ভিতরের ঘটনা দিগন্তে প্রতিবন্ধকরণী বল হিসেবে কাজ করে।

ঘূর্ণায়মান ঝ্যাকহোলের কৌণিক দ্রুতি যত বৃদ্ধি পায় বাইরের এবং ভিতরের ঘটনা দিগন্তে তত কাছাকাছি আসতে থাকে। ঘূর্ণায়মান গতি বৃদ্ধি পেয়ে যখন ঝ্যাকহোলের ভরের সমান হয়, তখন ঘটনা দিগন্ত দু'টি একীভূত হয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। অনুরূপভাবে কোন ঝ্যাকহোলের বৈদ্যুতিক চার্জ যত বৃদ্ধি পেতে থাকে বাইরের ঘটনা দিগন্ত তত ছোট হতে থাকে এবং ভিতরের ঘটনা দিগন্ত বৃদ্ধি পেতে থাকে। বৈদ্যুতিক চার্জ বৃদ্ধি পেয়ে যদি ঝ্যাকহোলের ভরের সমান হয় তখন উভয় দিগন্ত একীভূত হয়ে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যায়। ঝ্যাকহোলের অনন্যতাটি উম্মুক্ত অবস্থায় থাকে। প্রকৃতপক্ষে মহাবিশ্বে ধ্বংসপ্রাণ তারকা মহাকর্ষ বলের বিপরীত প্রতিকূলতা সৃষ্টির জন্য পর্যাণ পরিমাণ বৈদ্যুতিক চার্জ তৈরী করতে পারে না। তবে চরম ঘূর্ণিগতি প্রাণ তারকা উম্মুক্ত অনন্যতার মাধ্যমে জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারে।



ঘটনাদিগন্তের ভিতরে অনন্যতা নিরাপদ থাকে এবং মহাবিশ্বের উপর তেমন একটা প্রভাব পড়ে না। কিন্তু যখন অনন্যতা উম্মুক্ত হয় তখন জানা প্রকৃতির আইনকে উপেক্ষা করে সমগ্র মহাবিশ্বের উপর মিথ্যেজ্ঞায় (interaction) করে।

ঘটনাদিগন্তের অনুপস্থিতির অর্থ হচ্ছে আমরা স্বচ্ছন্দে উম্মুক্ত অনন্যতার ভিতর এবং বাইরে ভ্রমণ করতে পারি। উম্মুক্ত অনন্যতার কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করলে অতীতের যে কোন বিন্দুতে পৌছা সম্ভব।

উম্মুক্ত অনন্যতার গঠিত স্থানের প্রান্ত বা সীমানায় পদার্থ বিজ্ঞানের সমস্ত আইন ভেঙ্গে পড়ে। নিকটবর্তী স্থানে কি ঘটতে পারে তা অনুমান করা কঠিন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্যাসের মেঘ সংগঠিত হয়ে প্রকান্ত ভিন্নজাতের বিড়াল সৃষ্টি করতে পারে। যদি মহাবিশ্বের কোথাও একটি উম্মুক্ত অনন্যতা থাকে তবে তা সর্বত্র অকল্পনীয় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করতে পারে। এরা একেবারে শূন্য থেকে তেজ, আলো, তাপ সৃষ্টি করতে পারে। আপনা আপনি বস্তু গঠন করতে পারে। মহাবিশ্ব হয়তো একটা নতুন অস্তিত্বের নতুন স্তরে উপনীত হতে পারে।

আইনষ্টাইনের সমীকরণ ঘটনা দিগন্তের ভিতরেও কাজ করে

আইনষ্টাইনের সমীকরণে দূরত্বের রাশিটি (Function) স্থান-কালের বক্রতায় ব্যাকহোলের ঘটনা দিগন্তের শুরু থেকে ভিতরে পর্যন্ত অতি সুষমভাবে পরিবর্তন হতে থাকে। ঘটনা দিগন্তের ভিতরে স্থান-কালের বক্রতার অস্বাভাবিক কিছু ঘটার কোনরূপ ইন্দিত পাওয়া যায় না। তবে ছন্দের (Metric) পতন ঘটা এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। স্থানীয় স্থান কালের বক্রতা (মহাকর্ষ ক্ষেত্রের শক্তি) যতক্ষণ পর্যন্ত অনন্যতায় (Singularity) পরিণত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আইনষ্টাইনের সমীকরণ ভাল ভাবেই কাজ করে।

ঘটনা দিগন্তে স্থানের অবস্থা

পদার্থ বিজ্ঞানের মতে এখানে মুক্তভাবে পতনশীল একজন পর্যবেক্ষকের (যদিও নির্ভর করবে ব্যাকহোলটি আবর্তনশীল কিনা) নিকট তেমন অস্বাভাবিক কিছু মনে হবে না। পতনশীল পর্যবেক্ষক কোনরূপ ইতস্তত বোধ বা স্থানের ধারাবাহিকতার বিষ্ণুতা অনুভব করবে না। ঘটনা দিগন্তের নিকটবর্তী স্থান থেকে ভিতরের দিকে শুধুমাত্র মহাকর্ষ বলের জোয়ার (Gravitational Tidal Force) বৃদ্ধি পেতে থাকবে। দিগন্তের বাইরে আলোক কণাণুলি (Photons) শেষ স্থির কক্ষ পথ পর্যন্ত পৌছাতে পারবে।

ঘটনা দিগন্ত থেকে অনন্যতার সময়ের পরিণতি

আইনষ্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকিতাবাদ তত্ত্ব থেকেই কেবলমাত্র আমরা একটি ব্যাকহোলের ভিতরের দৃশ্যের পথ নির্দেশ পাই। অন্য কথায় গাণিতিক সমীকরণের মাধ্যমে মহাকর্ষ এবং স্থান-কালের (Space-time) সম্পূর্ণ চিত্র পাওয়া সম্ভব। তত্ত্বের গাণিতিক বর্ণনানুসারে উপরোক্ত স্থান-কালের দু'টি অঞ্চলে মানুষ বিচরণ করতে পারে। তবে ব্যাকহোলের ঘটনা দিগন্তে পতনশীল একজন পর্যবেক্ষকের অভিজ্ঞতা আর বাইরে অবস্থানকারী অপর পর্যবেক্ষকের অভিজ্ঞতা হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। ঘটনা দিগন্তের বাইরের অবস্থানরত পর্যবেক্ষক সব সময় যে রকম স্বাভাবিক ৩টি স্থান-স্থানাঙ্ক (Space-like Coordinates) এবং ১টি সময় স্থানাঙ্কের (Time-like Coordinates) অবস্থানে থাকে ঠিক তেমনি থাকবে।

পতনশীল পর্যবেক্ষকের নিকট ঘটনা দিগন্ত অতিক্রম কালে উপরের একটি সময়-স্থানাঙ্ক পরিবর্তিত হবে একটি স্থান-স্থানাঙ্কে এবং তটি স্থান-স্থানাঙ্ক পরিবর্তিত হবে তটি সময় স্থানাঙ্কে। যে কোন একটি বরাবর পূর্বের তটি স্থানাঙ্কের সবগুলিই অনন্যতায় অবসান ঘটবে। এই অবস্থানে স্থান-স্থানাঙ্ককে সময় স্থানাঙ্ক মনে হওয়ার অর্থ হ'ল পতনশীল পর্যবেক্ষকের গত্ব্যস্থলের প্রতি কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না, কারণ অনন্যতায় সমন্ত ইচ্ছা শক্তির বিলুপ্ত ঘটবে বিশেষ করে স্থির ব্ল্যাকহোলের ক্ষেত্রে। যে স্থানাঙ্কের মাধ্যমে বাইরে সময় নির্ণয় করা হতো তা এখন স্থান-স্থানাঙ্কের বৈশিষ্ট্য ধারণ করায় এছানে অবস্থানকারী পর্যবেক্ষক ইতস্ততভাবে সক্রিয় থাকবে। বিপরীতমুখী স্থান-কালের এই স্থানাঙ্কে যত চেষ্টাই করা হউক না কেন অনন্যতায় আর কোন স্থায়ী কক্ষপথ (orbit) পাওয়া সম্ভব নয়। স্থায়ী কক্ষপথের অনুপস্থিতি এবং অনন্যতায় অপ্রতিরোধ্য মুক্ত এই পতনকেই আপেক্ষিতাবাদীরা স্থান-কালের জ্যামিতির ধৰ্মস বলে আখ্যায়িত করেছেন।

স্থির ব্ল্যাকহোলের ঘটনা দিগন্ত থেকে অনন্যতায় পৌছাতে ১০ লক্ষ সৌরভর সম্পন্ন কোন ব্ল্যাকহোলে একজন পর্যবেক্ষকের সময় লাগবে দুই মিনিট আর একশত কোটি সৌরভরের ব্ল্যাকহোলে সময় লাগবে ৩৪ ঘণ্টা। অন্য দিকে বাইরের পর্যবেক্ষকের নিকট এই সময় দ্বিগুণ মনে হবে।

ব্ল্যাকহোলের নিরাপদ কক্ষপথ

ব্ল্যাকহোলের নিরাপদ কক্ষপথ বা অবস্থান বের করতে প্রথমেই ঘটনা দিগন্ত কোথা থেকে শুরু তা নির্ণয় করতে হবে। এখানে অবশ্যই ব্ল্যাকহোলের আকৃতিটি প্রথমে বিবেচনায় আনতে হবে। যদি ব্ল্যাকহোল খুব ক্ষুদ্র হয় তবে এর অর্থ হলো ঘটনা দিগন্তটি অনন্যতার খুব নিকটে। ফলে, ঘটনা দিগন্তের বাইরেও মহাকর্ষ জোয়ারের (Gravitational tide) প্রভাব প্রচল। আর যদি গ্যালাক্সি বা কোয়াসারের কেন্দ্রে উপস্থিতি বিশাল আকৃতির ব্ল্যাকহোলের মত হয়, তবে ঘটনা দিগন্তটি হবে অনন্যতা থেকে অনেক দূরে। নীতিগতভাবে এধরণের ব্ল্যাকহোলের এমনকি ঘটনা দিগন্তের বেশ কিছু ভিতরেও তেমন একটা মহাকর্ষ জোয়ার অনুভূত হবে না, যদিও এখান থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়।

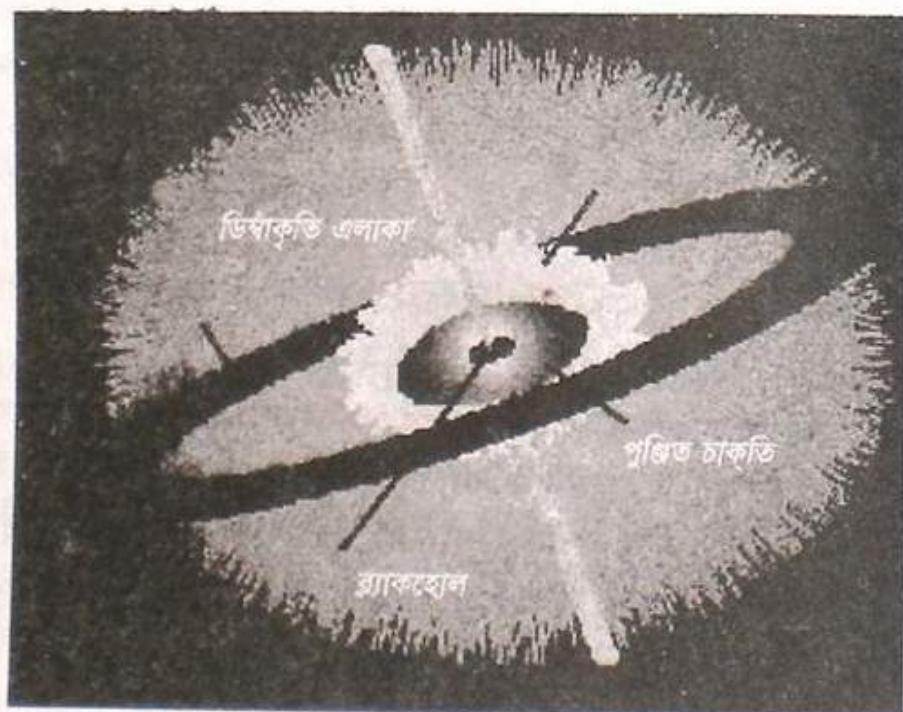
ঘূর্ণায়মান ব্ল্যাকহোলের ঘটনা দিগন্তের মহাকর্ষ প্রভাবমুক্ত এলাকায় অন্য যে কোন ঘূর্ণায়মান গ্রহ, নক্ষত্র বা আন্ত-নক্ষত্রীয় পদার্থসমূহ তার কৌণিক গতি অবিকৃত রেখে ব্ল্যাকহোলের কক্ষপথে অবস্থান করতে পারবে। ব্ল্যাকহোলের কক্ষপথে অবস্থানরত পদার্থটি ক্রমান্বয়ে ছোট হতে থাকবে কারণ এর কণাগুলি পুঞ্জিত চাকতির পদার্থের ঘর্ষণে অথবা মহাকর্ষের বিকিরণের ফলে কণাগুলি শক্তি হারাতে থাকবে। এক সময় ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে ঘটনা দিগন্তে পড়বে।

ব্ল্যাকহোলের পুঞ্জিত চাকতির বাইরে বিশাল ডিম্বাকৃতি এলাকা (Torus)

জাপান ও নাসা (NASA) পরিচালিত- Advanced Satellite for Cosmology and Astrophysics (ASCA) এর গবেষকবৃন্দ পাল নান্দ, রিচার্ড মুশাতকি এবং তার সহযোগীরা অতি সম্প্রতি স্যাটেলাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্য পর্যবেক্ষণের পর ব্ল্যাকহোল সম্পর্কে অতিগুরুত্বপূর্ণ কিছু তত্ত্ব তুলে ধরেন।

ব্ল্যাকহোল সরাসরি দেখা যায় না, সুতরাং এ সম্পর্কে জানা খুব জটিল। বিজ্ঞানীরা গ্যালাক্সির কেন্দ্রে সক্রিয় নিউক্লিয়াস থেকে শক্তিশালী রঞ্জন-রশ্মির নির্গমনের উৎসকে ব্ল্যাকহোলের অস্তিত্বের নির্দেশক হিসাবে বিবেচনা করে থাকেন। বিশাল ব্ল্যাকহোলের চারদিকে ঘূর্ণির মত আবর্তনশীল পুঞ্জিত চাকতির একেবারে গভীর থেকে রঞ্জন রশ্মির উত্তোলন হয়। পুঞ্জিত চাকতিতে পদার্থসমূহ পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে উত্পন্ন ও শুধু হয়ে আসে এবং সর্পিল আকারে (Spiral) ক্রমশঃ ব্ল্যাকহোলের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। পরিশেষে ঘটনা দিগন্তে প্রবেশ করে যেখান থেকে ফেরার আর কোন পথ নেই এবং আমাদের জানা মহাবিশ্ব থেকে চিরতরে অদৃশ্য হয়ে যায়। এ যেন ব্ল্যাকহোলের কঠনালীতে (Throat) পতনশীল ধৰ্মস্থান পদার্থের অন্তিম আর্তনাদ।

সাধারণতঃ গ্যালাক্সিগুলির কেন্দ্রে একটি বৃহৎ আকৃতির ব্ল্যাকহোল তার চারিদিকে পুঞ্জিত চাকতি এবং তার বাহির দিয়ে থাকে পুরু বিশাল ডিম্বাকৃতি এলাকা (Torus), অন্য কথায় অসংখ্য তারকা খচিত গ্যালাক্সির মাঝখানে এই তিনটি অর্থাৎ বিশাল ব্ল্যাকহোল, পুঞ্জিত চাকতি এবং তার বাহির দিয়ে পুরু ডিম্বাকৃতি এলাকা (Torus) অবস্থান করে।



মহাবিশ্বের বৃহৎ আকৃতির ব্ল্যাকহোলগুলি বিশেষ করে কসারের বা গ্যালাক্সির কেন্দ্রীয় ব্ল্যাকহোল প্রচন্ড শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে থাকে। এছাড়া ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে বিশাল আকৃতির ব্ল্যাকহোলে ঘটনা দিগন্তের আয়তনও বিশাল থাকে তাই অনন্যতাটি থাকে অনেক দূরে। ফলে ঘটনা দিগন্তের বাইরে মহাকর্ষীয় বল প্রবল নয়। ঘূর্ণায়মান চৌম্বক ক্ষেত্র এবং মহাকর্ষীয় বল অপেক্ষাকৃত দূর্বল হওয়ায় সকল দিক থেকে আসা কোটি কোটি নক্ষত্র, এই এবং বিভিন্ন পদার্থ সরাসরি ব্ল্যাকহোলে পতন ঘটে না। এই সমস্ত পদার্থ পুঁজিত চাকতির বাহির দিয়ে ব্ল্যাকহোলের নিরাপদ কক্ষপথে শনি ওহের বলয়ের মত অথচ তার চেয়ে অনেক গুণ বিশাল আকৃতির মোটা পুরু ডিম্বাকৃতির সমতলের মত আবরণ সৃষ্টি করে। এভাবেই ব্ল্যাকহোলকে চতুর্দিকে পরিবেষ্টন করে থাকে পুঁজিত চাকতি এবং এর বাহির দিয়ে থাকে বিশাল ডিম্বাকৃতির এলাকা বা Torous।

ব্ল্যাকহোলের শেষ স্থায়ী কক্ষপথ থেকে অনন্যতায়

ব্ল্যাকহোলের সবচেয়ে নিকটতম অবস্থান থেকে যে পথে কোন গ্রহ-নক্ষত্র বা আনন্দক্ষণ্য পদার্থ মহাকর্ষ বলের প্রভাবে ব্ল্যাকহোলের চারিপাশে প্রদক্ষিণ করে তাকেই ব্ল্যাকহোলের শেষ স্থায়ী কক্ষপথ বলে। কমলা আকৃতির অ্যারগোফ্রিয়ার অধ্যন ব্ল্যাকহোলের আবর্তন দ্বারা সবকিছুকে অপসারণ (Sweep) করে ফেলে। এজন্য স্থায়ী কক্ষপথে যেই মাত্র কোন কিছু অবস্থান নেয় তা এই অধ্যনে শোষিত হতে থাকে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে অ্যারগোফ্রিয়ারের বাইরের প্রান্তি স্থির সীমা (Static limit) আর ভিতরের প্রান্তি বাইরের ঘটনা দিগন্তের শুরু। প্রাকৃত ব্ল্যাকহোল শুরু হয় বাইরের ঘটনা দিগন্ত থেকে। এই এলাকাকে অতিক্রান্ত সবকিছুই চিরতরে অদৃশ্য হয়ে যায়। বিশাল মহাকর্ষের কারণে, নিজেকে কোন কিছুই ধরে রাখতে পারে না।



বিশ্বকর হ'ল ভিতরের ঘটনা দিগন্তের মধ্যে ব্ল্যাকহোলের ঘূর্ণিব জন্য এক বিপরীতমূখ্য বলের (Force) উদ্ভব হয়। ফলে, অপেক্ষাকৃত একটি স্বাভাবিক স্থানে (Space) সৃষ্টি হয়। এখানে পতনশীল সবকিছুই সর্পিল আকারে (Spiral) প্রবল ঘূর্ণিতে (Whirlpool) আবর্তিত হতে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে কেন্দ্রের মহাকর্ষ কৃপের দিকে ধাবিত হয়। কতকটা গোসলের বাথটাবের (bath tub) পানি নিষ্কাশনের মত। আর কেন্দ্রে হ'ল সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র ও আনন্দক্ষণ্য পদার্থের অসীম ঘনত্বের অনন্যতা।

গ্যালাক্সির কেন্দ্রে বিশাল ব্ল্যাকহোল

১৯৯৪ সালে 'হাবল স্পেস' টেলিস্কোপ, সংস্থা এম ৮৭ গ্যালাক্সির কেন্দ্রের বিশাল আকৃতির ব্ল্যাকহোল বিদ্যমান বলে চূড়ান্ত অভিমত দেন। এই ব্ল্যাকহোলের ভর হ'ল ২৪০ কোটি সৌরভরের সমান অথচ এলাকাটি (আয়তনে) আমাদের সৌর জগতের চেয়ে বড় নয়। ভীষণ বেগে আবর্তনশীল গ্যাসের অন্তর্ধান কোন কিছু শক্তিশালী মহাকর্ষীয় বলের প্রভাব অর্থাৎ ব্ল্যাকহোলে অস্তিত্বের জোরালো প্রমাণ করে।

১৯৯৫ সালে ডিসেম্বর মাসে হাবল স্পেস টেলিস্কোপ এনজিসি ৪২৬১ গ্যালাক্সিতে আরও একটি সুবিশাল ব্ল্যাকহোলের সন্ধান পান। এই ব্ল্যাকহোলটিকে আটশত আলোকবর্ষব্যাপী এলাকার সর্পিল আকৃতির এক বিশাল ধূলিকণার চাক্তি (disk of dust) জ্বালানী সরবরাহ করছে। সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত রহস্যময় হল ব্ল্যাকহোল এবং চাকতির কেন্দ্র গ্যালাক্সির কেন্দ্র থেকে কিছুটা বিচ্যুত। গ্যালাক্সির কেন্দ্র থেকে প্রায় বিশ আলোকবর্ষ দূরে এই বিশাল আকৃতির ব্ল্যাকহোল কিভাবে অপসারিত হল তা জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের নিকট একটি বিশ্ময়কর ও হতবুদ্ধিকর প্রশ্ন।

এ বিষয়ে বিজ্ঞানীদের একটি আন্তুত ধারণা ব্ল্যাকহোলটি নিজেই চালিত (Self-Propelled) হয়েছে। ব্ল্যাকহোলে পতনশীল পদার্থের শীতল ধূলিকণার চাক্তি রকেটের জ্বালানী ট্যাঙ্কের মত কাজ করে। এখানে মহাকর্ষ বলের প্রবল চাপে পদার্থ কণা কোটি কোটি ডিগ্রীতে উত্পন্ন হয়ে উঠে। এই উত্পন্ন গ্যাস ব্ল্যাকহোল থেকে জেটের আকারে প্রচ্ছন্ন বেগে নিষ্কিণ্ড হয়ে থাকে (যা ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে)। দ্রুত নির্গত গ্যাসের বিপরীত দিকে যেমন রকেট চালিত হয় ঠিক একইভাবে নির্গত এই গ্যাস ব্ল্যাকহোলকে স্থান চ্যুত করে থাকতে পারে।

ইতিমধ্যে বিজ্ঞানীরা অনেক গ্যালাক্সির কেন্দ্রেই বিশাল আকৃতির ব্ল্যাকহোলের অস্তিত্ব জানতে পেরেছেন। এমনকি আমাদের সৌরজগৎ ধারণকারী গ্যালাক্সি ছায়াপথের (milkyway) কেন্দ্রেও ২৬ লক্ষ সৌরভরের একটি বিশাল ব্ল্যাকহোল আছে। এ থেকেই বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন সব গ্যালাক্সির কেন্দ্রে একটি বিশাল ব্ল্যাকহোল আছে। এখন প্রশ্ন হল গ্যালাক্সি গুলির কেন্দ্রে এই বিশাল আকৃতির ব্ল্যাকহোলগুলি সৃষ্টি হয় কি ভাবে?

সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে জানা যায়, সকল স্ফীতি অঞ্চল সম্পূর্ণ গ্যালাক্সির কেন্দ্রে উপস্থিত এই বিশাল ব্ল্যাকহোলের আকৃতি হতে পারে কয়েক লক্ষ থেকে কয়েকশত কোটি সৌরভরের সমান। একটি মাত্র তারকা থেকে এই বিশাল ভরের ব্ল্যাকহোল গঠন কখনও সম্ভব নয়। বিজ্ঞানীদের এখন পর্যন্ত এ ধরণের ব্ল্যাকহোল গঠনের সঠিক ধারণা নেই। তবে আমরা মহাকর্ষের সর্বনাশী প্রভাবের কথা সবাই জানি। চরম ঘনত্বে কোন এলাকার মহাকর্ষও প্রবল এবং তা ঘনত্বের আরও বৃদ্ধি করে। গবেষণায় আরও জানা যায়, গ্যালাক্সির কেন্দ্রের বিশাল ব্ল্যাকহোলের ভর গ্যালাক্সির স্ফীতি ভরের সঙ্গে অতি নিকট সম্পর্কিত। এ থেকেই ধারণা করা যায় বিশাল আকৃতির ব্ল্যাকহোলের গঠন ধারক গ্যালাক্সির গঠনের সঙ্গে নিকট যোগ-সূত্র রয়েছে। খুব সম্ভব উভয়ে একই সাথে গঠিত হয়েছে।

দু'টি ব্ল্যাকহোলের একটীকরণ

যদি দু'টি ব্ল্যাকহোল অথবা যে কোন দু'টি বৃহৎ বস্তু যেমন নিউট্রন তারকা পরম্পরাকে কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করে তবে মহাকর্ষ তরঙ্গের আকারে প্রচুর পরিমাণ শক্তির নির্গমন ঘটাবে। দু'টি বস্তু একটীকরণ না হওয়া পর্যন্ত তারা শক্তি হারাতে থাকবে। দৃশ্যতঃ বড়টি ছোটটিকে গ্রাস করবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয়ে মিলিত হয়ে ভর কেন্দ্র (Center of mass) হবে একটি। আর ঘটনা দিগন্তটি বৃক্ষি প্রাণ ভর দ্বারা নতুনভাবে গঠিত হবে। ঘটনা দিগন্তের আকার সঠিকভাবে নির্ধারিত হয় কেবলমাত্র ব্ল্যাকহোলের ভর এবং ঘূর্ণায়ন গতি দ্বারা।

একটি বৃহৎ ব্ল্যাকহোলের সঙ্গে বড় তারকার সংঘর্ষ ঘটলে তারকাটি সম্পন্ন ছিল ভিন্ন হয়ে যেতে পারে। আবার যদি ছোট একটি ব্ল্যাকহোল বড় কোন তারকার মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করে তবে কোন রকম ভাঙ্গন না ঘটিয়ে তারকাটি স্বাভাবিক জীবন অতিবাহিত করতে পারে।

ছায়াপথ (Milkway) গ্যালাক্সির কেন্দ্রীয় ব্ল্যাকহোল গ্যালাক্সির সমস্ত কিছুকে গ্রাস করবে

এমনকি মহাবিশ্ব যদি চিরকালের জন্য সম্প্রসারিত হওয়া নির্ধারিত হয়ে থাকে তবুও কেন্দ্রীয় ব্ল্যাকহোল গ্যালাক্সির সমস্ত তারকাপুঁজি, গ্রহ, উপগ্রহ, আন্ত-নক্ষত্রীয় পদার্থ সবকিছুকে গ্রাস করবে। গ্যালাক্সির তারকাপুঁজের কক্ষপথ মহাকর্ষীয় বিকিরণ নির্গমনের ফলে ক্রমান্বয়ে শক্তি হারাতে থাকবে এবং গ্যালাক্সিটি ভিতর থেকে বাইরের দিকে গ্রাস হতে থাকবে। সৌর দ্বরণে একটি তারকার ক্ষয়িক্ষুণি কক্ষপথীয় শক্তির পরিমাণ অবিশ্বাস্য রকম সামান্য। গাণিতিক হিসাবে আনুমানিক 10^{60} বছর সময়ে প্রচুর শক্তি হারানোর ফলে গ্যালাক্সির কেন্দ্রীয় ব্ল্যাকহোল সমস্ত তারকা এবং অন্যান্য পদার্থকে গ্রাস করে ফেলবে। কেন্দ্রীয় ব্ল্যাকহোলটি গ্যালাক্সির কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে সমস্ত কিছুকে গ্রাস করে দশ হাজার কোটি (100 বিলিয়ন) সৌরভরের এক সুবিশাল ব্ল্যাকহোলের সৃষ্টি করবে। এমনকি আরও 10^{60} বছর পর এই সুবিশাল ব্ল্যাকহোলের সমস্ত শক্তি বিকিরণ (Radiation) করে বিলুপ্তি ঘটবে। এই ব্ল্যাকহোলের অনন্যতাটি যখন হকিং রেডিয়েশনের মাধ্যমে বিলুপ্তি ঘটবে তখন আবার অকল্পনীয় ভীষণ বিস্ফোরণের (বিগ-ব্যাংগের নাম) মাধ্যমে পুনরায় নতুন মহাবিশ্ব সৃষ্টির জন্য ইলেক্ট্রন, এন্টি ইলেক্ট্রন এবং ফোটনের তরল সুপ সৃষ্টি করবে।



১৯৮০ সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ছায়াপথ গ্যালক্সির কেন্দ্রীয় নিউক্সিয়াসে প্রচল শক্তিশালী চৌম্বক শক্তির প্রভাবে বিশাল অগ্নিশিখার গ্যাসের চক্রকার বেষ্টনীর সঙ্কান পেয়েছেন। এটি সম্ভবত একটি বিশাল ব্ল্যাকহোল। সূর্যের চেয়ে অনেক বড় অথচ আয়তনে সৌর জগতের চেয়ে ছোট। এই অগ্নিশিখাকে ঘিরে রয়েছে বিশাল ধূলির মেঘ এবং অসংখ্য তারকা। উজ্জ্বলতম তারকাঙ্গি রেড জায়েন্টের অনুরূপ এবং সমগ্র এলাকা উজ্জ্বল লোহিত বর্ণের। এই ধূলির অধিকাংশ সমগ্র ছায়াপথ গ্যালক্সির সমতলে যে ধূলি রয়েছে তারই প্রসারণ।

ব্ল্যাকহোলের ঘনমান আয়তন এবং পদার্থ শোষণের ক্ষমতা সীমাহীন

ব্ল্যাকহোলের প্রবল শক্তিশালী মহাকর্ষ বলের জন্য ঘনমান আয়তন (Volume) নির্ণয়ের আমাদের স্বাভাবিক জ্ঞান মোটেই প্রযোজ্য নয়। অন্য কথায় ব্ল্যাকহোলের আকার (size) বুঝাতে ঘটনা দিগন্তের ব্যাসার্ধ (Rs) দিয়ে ঘনমান আয়তন $\left(\frac{4}{3}\pi R^3 s\right)$ নির্ণয় সম্ভব নয়। এটা কিছুটা জটিল। ঘটনা দিগন্ত অতিক্রম করলে ভিতরের স্থান সংক্রান্ত দিক ভবিষ্যত সময় দিক নির্দেশ করে। বাহির থেকে মনে হবে ভিতরে ভবিষ্যৎ সময় একটা স্থান সংক্রান্ত মাত্রায় (Dimension) পরিণত হবে। সূতরাং ব্ল্যাকহোলের ঘনমান আয়তন (volume) হ'ল সমতলের ফ্রেক্রফল গুণক সময় (Surface area \times length of time)। যেহেতু ব্ল্যাকহোল প্রকৃতপক্ষে চিরস্থায়ী সেহেতু এর ঘনমান আয়তনও অসীম। ব্ল্যাকহোলে যদি চিরদিন পদার্থ ভরা হয় তবু কখনও এটা পূর্ণ হবে না, কারণ ঘটনা দিগন্তের ব্যাসার্ধ (Rs) ব্ল্যাকহোলের ভর (Mass) বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তা বৃদ্ধি পায়।

ব্ল্যাকহোলের বৈশিষ্ট্য হ'ল নিকটবর্তী সমস্ত পদার্থ এবং বিকিরণ শোষণ করা। কঙ্কপথে কোন তারকা এসে পড়লে ব্ল্যাকহোল তারকাটি থেকে পদার্থ দ্রুত শোষণ করবে। ব্ল্যাকহোলের চারদিকে বৃত্তাকারে তারকা এবং অন্যান্য পদার্থ গোসলের বাথটাবে পানি নিষ্কাশনের মত শোষিত হবে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই পতনশীল পদার্থের ঘূর্ণির নাম দিয়েছেন পুঁজিত চাকতি (accretion disk)। পতনশীল পদার্থ ক্রমে যতই তার চূড়ান্ত গন্তব্য স্থান ঘটনা দিগন্তের দিকে আসতে থাকবে ততই দ্রুত তা শোষিত হতে থাকবে। পদার্থের বিভিন্ন গতি ও পারম্পারিক সংঘর্ষের ফলে উত্পন্ন হতে থাকবে এবং বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় শক্তির আলোর কণা মুক্ত করতে থাকবে। পদার্থ ব্ল্যাকহোলের প্রায় কেন্দ্রে পতনের শেষ মুহূর্তে উত্পন্ন এবং জলন্ত গ্যাসীয় পদার্থ থেকে প্রচন্ড শক্তি সম্পন্ন গামা-রঞ্জন রশ্মি নির্গত করবে। গ্যালাক্সির কেন্দ্রীয় ব্ল্যাকহোল গ্যালাক্সির সম্পূর্ণ তারকা এবং অন্যান্য পদার্থ শোষণ করে নিতে পারে। সুতরাং ব্ল্যাকহোলের ঘনমান আয়তন এবং শোষণের ক্ষমতা অসীম।

ব্ল্যাকহোলের ঘটনা দিগন্তে সব কিছুর পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব

নাসার (NASA-The National Aeronautics and Space Administration) একজন বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী ডঃ স্টেন ওডেনবাল্ড (Steno denwald) জানান, ব্ল্যাকহোলে পতিত সমস্ত তথ্য (information) ঘটনা দিগন্তে সংরক্ষিত থাকে। সাম্প্রতিক কণাবাদী মহাকর্ষ (quantum gravity) এবং অতিতন্ত্র তত্ত্ব (Superstring theory) এর কিছু বিশেষজ্ঞ গাণিতিক হিসাবে এটাকে সুনিশ্চিত করেন। টিফেন হকিং এবং তাঁর বেশ কিছু সহযোগীরা এক দশকের কিছু আগে একই প্রস্তাব রেখেছিলেন। স্পষ্টতঃ ব্ল্যাকহোলে পতনশীল কোন পদার্থের সকল তথ্য বিশেষ কোন সুকৌশলে সঙ্কেত লিপির আকারে ঘটনা দিগন্তে কণাবাদী ক্ষেত্রে (quantum fields) জমাট অবস্থায় (forzen) সংরক্ষিত থাকে। এটা বেশ কিছু চমকপ্রদ সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে পারে। যদি কোন বিশ্বায়কর উপায়ে ‘পতন’ এবং ‘ধ্রংস’ প্রক্রিয়াকে পশ্চাদিকে পরিচালনা করা যায় তবে ঘড়ি, মানব সমাজ, মহাশূন্যযান, সমগ্র গ্রহাদি সম্পূর্ণ পূর্বকালীন অবস্থায় পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব। অতি সম্প্রতি (২০০২ সালে) জানা এই তথ্যে এখন অনেকে বিশ্বাস করেন এই গাণিতিক সমাধানের অর্থ আমরা এমন এক চরম যুগসঞ্চিকণে এসে দাঁড়িয়েছি যখন কণাবাদী বলবিদ্যা (Quantum mechanics) এর মহাকর্ষ তত্ত্বের (gravitational theory) মধ্যে সংযোগ বৃংকতে সক্ষম। কণাবাদী বলবিদ্যায় পর্যবেক্ষিত সংশ্লিষ্ট যাবতীয় তথ্যের বর্ণনা কণাবাদী যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় (quantum mechanical process) বের করা যায়। এখন একই তথ্যের ভাষা মহাকর্ষ ক্ষেত্র এবং স্থান-কালে (space time) আপেক্ষিক অবস্থানের জন্য প্রয়োগ করা সম্ভব।

শ্বেত গহ্বর/ হোয়াইট হোল

আইনষ্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের সমীকরণগুলিতে বেশ কিছু মনোযোগ আকর্ষণকারী গাণিতিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এগুলি সময়ের সঙ্গে সুস্যামঙ্গ সম্পন্ন (symmetric)। এর অর্থ হ'ল সমীকরণগুলির যে কোন সমাধান যদি গ্রহণ করা যায় এবং যদি কল্পনা করা হয় সময় সামনের পরিবর্তে পিছনের দিকে প্রবাহিত হয় তখন সমীকরণের বৈধ আর একটি সমাধান পাওয়া যায়। ব্ল্যাকহোলকে বর্ণনাকারী সমাধানে যদি আমরা এই নীতিমালা প্রয়োগ করি তবে আমরা এমন একটি বক্তৃত সন্দান পাই যা শ্বেতগহ্বর বা হোয়াইট হোল নামে পরিচিত। ব্ল্যাকহোল মহাশূন্যের (space) এমন একটি এলাকা যেখানে থেকে কোন কিছুই মুক্ত হতে পারে না আবার ব্ল্যাকহোলের সময়ের উল্টো-পিঠে মহাশূন্যের এলাকাটিতে কোন কিছুই পতিত হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে ব্ল্যাকহোল সব কিছুকে গ্রাস করে আর হোয়াইট হোল সবকিছুই নিষ্কেপ করে। অন্য কথায় আমাদের মহাবিশ্বের পদার্থ যখন ব্ল্যাকহোল পতিত হয় তখন হোয়াইট হোল দিয়ে তা অন্য বিশ্বে নিষ্কিণ্ড হয়।

ব্ল্যাকহোল এবং হোয়াইট হোল হ'ল একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। প্রকৃতপক্ষে এদুটি গহ্বরের সঠিক সম্পর্ক এই রূপকের মাধ্যমে বর্ণনা করা যায়। কোন গহ্বরটি কালো বা শ্বেত তা নির্ভর করবে কোন দিক থেকে আমরা তা দেখছি। ঘটনা দিগন্তের বাহিরে থেকে দৃষ্টিগোচর করলে আমরা দেখতে পাব ব্ল্যাকহোল। আবার ভিতরের ঘটনা দিগন্তের মধ্যে থেকে আগমন পথের দিকে দেখলে পাব হোয়াইট হোল। যুগপৎ (একই সময়) ব্ল্যাকহোলে প্রবেশ এবং হোয়াইট হোল পরিত্যাগ ঘটে থাকে। এখানে উল্লেখ্য, যে এটা শুধুমাত্র একমুখী পথ। সম্মুখপানে দৃষ্টিগোচর করলে হোয়াইট হোলের ঘটনা দিগন্ত। তবে এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় সব সময়ই ব্ল্যাকহোলের উল্টো দিকে হোয়াইট হোল নাও থাকতে পারে অর্থাৎ হোয়াইট হোল বিছিন্ন অবস্থায় দূরে থাকতে পারে।

তত্ত্বানুসারে হোয়াইট হোলে ফিরে আসা কখনও সম্ভব নয়। স্থির অনন্যতা সব সময় ভবিষ্যত এবং হোয়াইট হোল সব সময় ‘অতীত’ নির্দেশক। হোয়াইট হোলে ফিরে আসার যে কোন প্রচেষ্টা অদম্য প্রতিরোধের সৃষ্টি করে।

হোয়াইট হল হলো ‘বন্ধ’ এবং শক্তির এক নিরবচ্ছিন্ন উৎস।

নীলাচ্ছাদন (Blue Sheets)

নীলাচ্ছাদন বা ব্লুশীট কতকটা হোয়াইট হোলের মতই। প্রকৃতপক্ষে যদি হোয়াইট হোলের ঘটনা দিগন্তে পৌঁছান যায় তবে তা দেখাও সম্ভব (যদিও সম্পূর্ণ অংশ নয়)। ব্ল্যাকহোলের মহাকূপের গভীরে পতনশীল পদার্থসমূহ মহাকর্ষীয় অবস্থান (Potential energy) শক্তি হারাতে থাকে এবং তা গতিশক্তিতে (Kinetic energy) পরিণত হয়। ঠিক একইভাবে আলো মহাকর্ষ দ্বারা প্রভাবিত হয়। কিন্তু আলোর গতি বৃদ্ধি পেতে পারে না

(শূন্যে সর্বোচ্চ গতি 3×10^8 মি/সেৎ)। ফলে প্রতি সেকেন্ডে স্পন্দনের দ্রুততা (frequency) বৃদ্ধি পেয়ে মাইক্রোওয়েভ থেকে দৃশ্যমান আলো গামা-রশ্মিতে পরিণত হয়। অন্য কথায় তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণের বর্ণালীতে। এই প্রণালীটিই নীল বিচ্যুতি (Blue shift) কতকটা লোহিত বিচ্যুতি (Red shift) ধরনের। এটি শুধুমাত্র একটি আলোর রশ্মির জন্য। একইভাবে ঝ্যাকহোলের ঘটনা দিগন্তে পতনশীল সমস্ত উচ্চ শক্তির তরঙ্গমালার বিকিরণের যে প্রবাহ সৃষ্টি হয় তা নীলাঞ্চাদন বা বুশীট নামে পরিচিত। ঝ্যাকহোলের বাইরের ঘটনা দিগন্ত থেকে যে শক্তি (পদার্থের অবস্থান শক্তি) মহাকর্ষ কৃপে পতিত হয় কেবলমাত্র তা থেকেই নীল শয্যা প্রভাবিত হয়। নীলাঞ্চাদন অকল্পনীয় বিশাল উচ্চ শক্তিসমূহের উৎক্ষেপণ ঘটায়। শক্তির এই বিকিরণ ঝ্যাকহোল পরিভ্রমণের জন্য একটি প্রধান অন্তরায় এবং বিপদ্ধজনকও বটে।

ওয়ার্মহোল (Wormhole)

ওয়ার্মহোল চারমাত্রার (dimension-তি স্থান ও ১টি সময়ের মাত্রা) স্থান কালের এমন একটি জ্যামিতি যা দ্বারা মহাবিশ্বের দূর দু'টি এলাকাকে অথবা সম্পূর্ণ ভিন্ন এক বা একাধিক মহাবিশ্বকে একটি সক্রীয় প্রবেশ পথ (সেতু) দ্বারা সংযুক্ত করে। বৃহৎ আকারে সুসংহত ওয়ার্মহোল হল আইনষ্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের ক্ষেত্র সমীকরণের (field equations) স্থান কালের বক্রতা নিয়ন্ত্রণকারী একটি সমাধান। ওয়ার্মহোলের সবচেয়ে বিশ্বায়কর হলো অপেক্ষাকৃত সহজ পথায় সুদূর মহাশূন্যে অতি অল্প সময়ে ভ্রমন এমনকি অতিক্রান্ত সময়ে ভ্রমণও সম্ভব।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে ঘূর্ণায়মান অথবা বৈদ্যুতিক চার্জ সম্পূর্ণ ঝ্যাকহোলে কোন বক্তুর পতন ঘটলে অনন্যতায় ধ্রংসপ্তাণ্ত নাও হতে পারে। বরং ঘূর্ণায়মান অথবা বৈদ্যুতিক চার্জ সম্পূর্ণ ঝ্যাকহোলের ভিতরের অংশ অনুরূপ হোয়াইট হোলের সঙ্গে এমনভাবে সংযুক্ত করতে পারে যার ফলে ঝ্যাকহোলে পতিত বক্তু হোয়াইট হোল দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে। ঝ্যাকহোল এবং হোয়াইট হোলের এই সংযুক্ততাকেও ওয়ার্মহোল বলা যেতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে হোয়াইট হোল ঝ্যাকহোলের অ-নে-ক দূরে থাকতে পারে। এমনকি স্থান-কালের ভিন্ন একটা এলাকা যা সম্পূর্ণ আলাদা কোন মহাবিশ্ব ওয়ার্মহোলের সংযুক্ততা না থাকায় আমাদের মহাবিশ্ব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। ওয়ার্মহোলের সুবিধেজনক অবস্থানের ফলে বিশাল দূরত্ব অতি সহজে এবং দ্রুত পরিভ্রমণ করা এবং অন্য মহাবিশ্বে প্রবেশ সম্ভব।

ওয়ার্মহোল স্থান-কালের একটি অংশের সঙ্গে অন্য অংশের সংযুক্তকারী একটি দ্বিমুখী সুড়ঙ্গ (tunnel)। ব্ল্যাকহোলের মত এটি বর্তুলাকার (Sphere)। তবে পার্থক্যটা হচ্ছে ব্ল্যাকহোলের ঘটনা দিগন্ত যেখানে শুধু একদিকের রাস্তা, ওয়ার্মহোলের মুখ তা নাও হতে পারে। প্রকৃপনীয় তথ্যানুসারে (Hypothetical) এর ভিতর দিয়ে যাতায়ত সম্ভব। আলো এখানে সামনে পিছনে যাতায়ত করতে পারে। ওয়ার্মহোলের অপর মুখটি অন্য মহাবিশ্বের কোন আলোর উৎসের কাছে থাকে, তখন এখান থেকে আলোক রশ্মি বার্তুলাকার মুখ থেকে আমাদের মহাবিশ্বের প্রান্তে নির্গত হবে। আমাদের মহাবিশ্ব থেকে শুধুমাত্র সুড়ঙ্গের একটি মাত্র মুখ অবলোকন করা সম্ভব। অন্য মহাবিশ্বের যে স্থান দিয়ে সুড়ঙ্গটি অতিক্রম করবে তা একটি পরাস্থান (Hyperspace) আমাদের মহাবিশ্বের মত স্বাভাবিক স্থান (Space) নয়।

১৯৫০ সালে জন হাইলারের নেতৃত্বাধীনে একটি গবেষক দল এবং মার্টিন ক্রসকাল আইনষ্টাইনের সমীকরণের সমাধানে দেখতে পান ওয়ার্মহোলের বিবর্তন শুরু হয় মহাবিশ্বের দুই অংশের দু'টি অনন্যতা থেকে। এই অনন্যতাগুলি ব্ল্যাকহোলের অনন্যতার মত নয়। এগুলি বিগ- ব্যাংগের অনন্যতার মত যেখান থেকে মনে করা হয় মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে। এটি এমন ধরনের অনন্যতা যেখান থেকে সময় প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় কিছুর সৃষ্টি। এ ধরনের দু'টি অনন্যতা কোন পরাস্থানে (hyperspace) মিলিত হলে পরস্পরকে ধ্বংস করে ফেলে এবং ওয়ার্মহোলের সৃষ্টি করে। ওয়ার্মহোল প্রশস্ততা লাভ করে, আবার সক্ষীর্ণ হয়ে মোচড়ায়ে পড়ে এবং আবার দু'টি নতুন অনন্যতার সৃষ্টি করে। সর্বশেষ এই অনন্যতাগুলো একত্রিত ভূপিণ্ড (Big-Crunch) এর অনন্যতার মত। এখানে মহাবিশ্বের বিলুপ্তি ঘটবে। সময় প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুর ধ্বংস হতে থাকবে, এমনকি ওয়ার্মহোল দিয়ে অতিক্রমরত সব কিছুসহ।

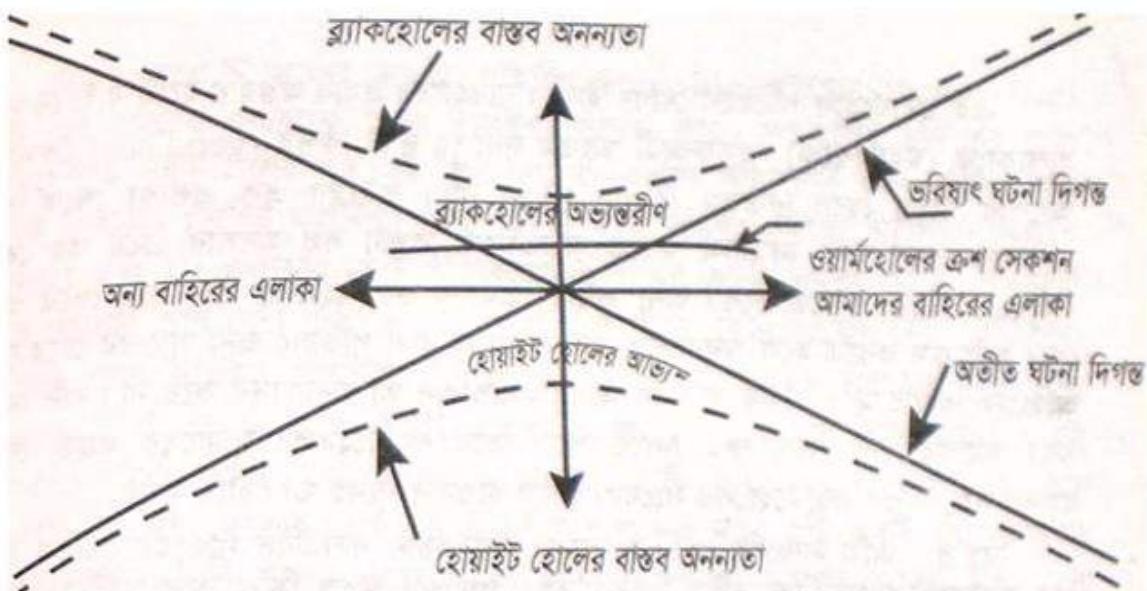
ওয়ার্মহোলের শ্রেণী বিন্যাস

ওয়ার্মহোল বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। সংশ্লিষ্ট ব্ল্যাকহোলের সঙ্গে মিল রেখে এদের নামকরণও অনুরূপ করা হয়েছে। যেমন- শোয়ার্জশীল্ড ওয়ার্মহোল, কের-নিউম্যান ওয়ার্মহোল, মরিস—থ্রোন ওয়ার্মহোল ইত্যাদি।

শোয়ার্জশীল্ড ওয়ার্মহোল

শোয়ার্জশীল্ড জ্যামিতির গাণিতিক সমাধানে ধণাত্মক ও ঋণাত্মক (Positive & Negative) উভয় বর্গমূলের অস্তিত্বকে স্বীকার করে।

পরিপূর্ণ শোয়ার্জশীল্ড জ্যামিতিক গঠনে রয়েছে একটি করে ব্ল্যাকহোল, হোয়াইট হোল এবং দু'টি মহাবিশ্বের দিগন্ত ওয়ার্মহোল দ্বারা সংযুক্ত।



দিগন্তের ভিতরে ঝণাত্মক বর্গমূলের সমাধান হোয়াইট হোলের প্রতিকৃতি প্রকাশ করে। ব্ল্যাকহোল যেখানে সবকিছুকে গ্রাস করে হোয়াইটহোল তাদেরকে নিষ্কেপ করে এবং সময়ের পিছনে চলে।

দিগন্তের বাইরের ঝণাত্মক বর্গমূলের সমাধান অন্য মহাবিশ্বের প্রতিকৃতি প্রকাশ করে। দু'টি পৃথক মহাবিশ্বকে সংযুক্তকারী ওয়ার্মহোল আইনস্টাইন-রোজেন সেতু (Einstein-Rosen Bridge) নামে পরিচিত।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে এই ওয়ার্মহোলের ভিতর দিয়ে এক মহাবিশ্ব থেকে অন্য মহাবিশ্বে কোন বস্তু বা তথ্য ভেদ করতে পারবে কিনা। এখানে দু'টি গুরুতর সমস্যা রয়েছে, প্রথমত ওয়ার্মহোলের স্থায়িত্বার প্রশ্ন, আর দ্বিতীয়টি প্রকৃতপক্ষে একমাত্র সংশ্লিষ্ট সমস্যাটি হচ্ছে এই স্থানকালে দু'টি মহাবিশ্বকে সংযোগকারী আলোর গতির চেয়ে দ্রুততম (time-like) সবচেয়ে স্বল্পতম দূরত্বের দু'টি বিন্দু (geodiscs) নেই।

শোয়ার্জশীল স্থান-কালের (space-time) জ্যামিতিতে দু'টি বাইরের (দু'টি ভিন্ন মহাবিশ্ব) এবং দু'টি ভিতরের (ব্ল্যাকহোল ও হোয়াইটহোল) এলাকা (regions) রয়েছে। (উপরের চিত্র দ্রষ্টব্য)

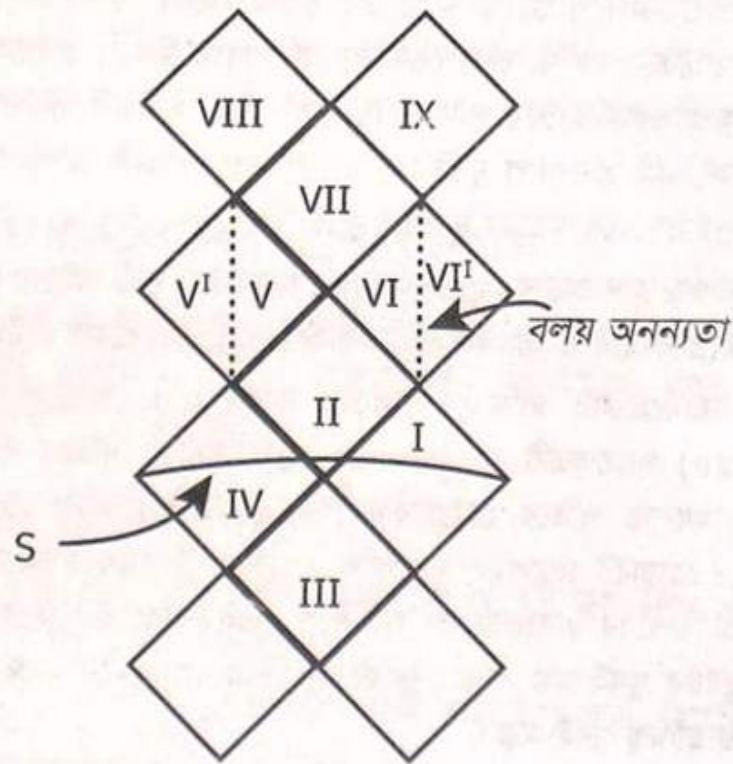
এই ওয়ার্মহোলের স্থায়িত্বের কারণ হল শোয়ার্জশীল জ্যামিতিক স্থানকে (coordinate) পরাক্ষেত্রটি (hypersurface) আপাতঃ দৃষ্টিতে বাইরের এলাকায় (দু'টি মহাবিশ্বের) আলোর গতির চেয়ে কম (Space-like) মনে হলেও ভিতরের এলাকায় (ব্ল্যাকহোল ও হোয়াইট হোলে) প্রকৃত পক্ষে তা নয়। পরিণামে ওয়ার্মহোলটি বাইরের এলাকায় যেখানে স্থির ভিতরের এলাকায় তা গতিশীল। এই কারণেই বাইরের দু'টি এলাকার মধ্যে সংযোগের স্থায়িত্ব খুবই অল্প সময়। বাইরের দু'টি এলাকার মধ্যে তথ্যের আদান-প্রদানের জন্য ওয়ার্মহোলের স্থায়িত্ব খুবই অল্প।

এই ওয়ার্মহোল পরিবহন যোগ্য হিসাবে ব্যবহারের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে বাইরের দুটি এলাকাকে (মহাবিশ্বকে) সংযুক্তকারী স্বল্পতম দূরত্বের দুটি বিন্দুর (geodiscs) কোনটিতে আলোর গতির চেয়ে দ্রুততম (time like) নয়। বাইরের এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় কোন তথ্য অতিক্রম করতে অস্তিত্বক্ষে কিছুটা পথ আলোর চেয়ে কম বেগে (Space like) চলতে হবে। অন্য কথায়, তথ্যকে ওয়ার্মহোলের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অতিক্রম করতে হলে অনন্যতার আঘাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আলোর চেয়ে দ্রুত অতিক্রম করতে হবে। কিন্তু সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ তা অনুমোদন করে না। যদি কোন তথ্য আলোর গতি চেয়ে দ্রুত চলতে পারে তবে ওয়ার্মহোলের স্থায়িত্বের স্বল্পতা কেন সমস্যা নয়, কারণ ওয়ার্মহোলের সংযোগ ভেঙ্গে যাওয়ার পূর্বেই তা পৌছে যাবে।

বিঃ দ্রঃ- অতি সম্প্রতি (২০০২ সালে) অন্ট্রেলিয়ান পদার্থবিদ পাওয়েল ডেভিস এবং তাঁর সহযোগীরা মহাবিশ্ব সৃষ্টির বিভিন্ন তথ্য প্রমাণের উপর ভিত্তি করে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বের শূন্যে আলোর গতি অপরিবর্তনীয় (constant) এ ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করেছেন। তাঁরা বলছেন মহাবিশ্ব সৃষ্টির সূচনালগ্নে আলোর গতি বর্তমানের চেয়ে অনেক অনেকগুণ বেশী ছিল। সময়ের বিবর্তনে তা কমে গেছে।

কের-নিউম্যান ওয়ার্মহোল (Kerr-Newman Wormhole)

কের-নিউম্যান ব্ল্যাকহোলের (বৈদ্যুতিক চার্জ সম্পন্ন ঘূর্ণায়মান ব্ল্যাকহোল) বেশ কিছু বাইরের এলাকার (অন্য মহাবিশ্ব) মধ্যে স্বল্পতম দূরত্বের দুটি বিন্দুর (geodiscs) পথ আছে। এই পথগুলো কমপক্ষে একমুখী রাস্তা হিসাবে পরিবহন যোগ্য।



চিত্রের বিভিন্ন এলাকা I-IX ভিন্ন ভিন্ন মহাবিশ্ব নির্দেশ করে।

চিত্রে বক্ররেখা 'S' আলোর চেয়ে কম গতিশীল (Space-like) পরাক্ষেত্র (Hypersurface) দুটি ভিন্ন বাইরের এলাকাকে (অন্য মহাবিশ্ব) সংযুক্ত করে। সংযোগের স্থায়িত্বের প্রশ্নে শোয়ার্জশীল ওয়ার্মহোলের মত এই স্থান কালের বৈধাতা অনুমোদন করে। যদিও অন্য বিভিন্ন এলাকার (বিভিন্ন মহাবিশ্ব) মধ্যে একটা স্থায়ী সংযোগ অবস্থা বিরাজমান তথাপি চিত্রের I এবং IV এলাকার মধ্যে পরিবহনযোগ্য পথের একটা সমস্যা আছে। সমস্যাটি হচ্ছে আলোর চেয়ে বেশী গতিশীল (Time-like) পথের কোন সংযোগ নেই। তৎসত্ত্বেও আলোর চেয়ে দ্রুততম গতিশীল (Time-like) পথের স্বল্পতম দূরত্বের দুটি বিন্দু (geodisc) I এলাকা থেকে VIII এলাকা অথবা IX এলাকার সঙ্গে রয়েছে। এই পথগুলো পরিবহনযোগ্য। যেহেতু স্বল্পতম দূরত্বের দুটি বিন্দুর পথগুলো আলোর চেয়ে দ্রুতগতিশীল এবং আলোর চেয়ে কম গতিশীল পরাক্ষেত্র নয়। এটি একটি ভিন্ন প্রকৃতির ব্ল্যাকহোলের জ্যামিতি; সুতরাং ওয়ার্মহোলের স্থায়িত্বের সমস্যা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কেউ হয়ত যুক্তি দিতে পারেন এলাকা VIII অথবা IX এলাকা I এর মতই গাণিতিক পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছু নয়। আর সেটাই যদি হয় তবে সেক্ষেত্রে পথটি হবে আলোর চেয়ে দ্রুত গতিশীল বন্ধ জালিকার (Closed time-like loop) মত। কোন কিছু এখানে পথের শুরুতে কিছুটা শক্তি তাড়িত হয়ে পতিত হলে তা পুনরায় স্থান-কালের একই জায়গায় অর্ধাং যেখান থেকে এটা যাত্রা শুরু করেছিল সেখানে ফিরে আসবে, এমন কি যে সময়ে পতিত হয়েছিল তার পূর্বেই ফিরে আসবে। সহজ কথায় রওনা হওয়ার আগেই ফিরে আসবে।

আর যদি VIII অথবা IX এলাকাটি অন্য মহাবিশ্বে রূপান্তরিত হয় অথবা VII এবং VIII অথবা IX এলাকার মধ্যের ঘটনা দিগন্ত জন্মাগ্নি থেকেই অনুরূপ বাইরের ঘটনা দিগন্তের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে তখন, দূরে অপসারিত অন্য কোন ব্ল্যাকহোল হবে। এক্ষেত্রে অবশ্যই এটি অন্য মহাবিশ্ব বা এলাকার জন্য একটি বাইর পথ (exit)। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, পথটি শুধুমাত্র একমুখী। চিত্রে শুধুমাত্র কেউ উপরের দিকে ভ্রমণ করতে পারবে।

মরিস-থ্রোন ওয়ার্মহোল (Morris-Thron Wormhole)

মরিস-থ্রোন ওয়ার্মহোলে পূর্বে আলোচিত ওয়ার্মহোলের চেয়ে বাড়তি কিছু সুবিধে আছে। দ্রষ্টান্ত স্বরূপ এই ওয়ার্মহোলের সঙ্গে কোন রকম ঘটনা দিগন্ত নেই। এখানে আলোর সমন্বয়মূলক গতি (Coordinate speed) কোথাও শূন্য নয়। ফলে দূরের কোন পর্যবেক্ষক কোন ভ্রমণকারীকে বাইরে এক এলাকা (মহাবিশ্ব) থেকে অন্য এলাকা (মহাবিশ্ব) অতিক্রম করা অবলোকন করতে পারবে। এই জাতীয় ওয়ার্মহোলও আলোর চেয়ে দ্রুতগামী (time-like) পথের স্বল্পতম দূরত্বের দুটি বিন্দু (geodiscs) দ্বারা বাইরের বিভিন্ন এলাকা (মহাবিশ্ব) সংযুক্ত থাকে। পরিবহনযোগ্য এ ধরনের ওয়ার্মহোলে স্থানীয়ভাবে আলোর গতির চেয়ে দ্রুত ভ্রমণ করার কোন প্রয়োজন নেই।

মহাজগতিক তার এবং ওয়ার্মহোল (Cosmic String And Wormhole)

পদাৰ্থবিদদেৱ বিবেচনায় মহাবিশ্ব জন্মেৱ সূচনালগ্নে মহাজগতিক সংক্ৰমণ (Cosmological Transition) প্ৰক্ৰিয়ায় পদাৰ্থ তৰল অবস্থা থেকে ঘণীভূত হয়ে কঠিন আকাৰ ধাৰণ কৰে। তৰল থেকে কঠিন অবস্থায় সংক্ৰমণেৱ সময় পদাৰ্থ ফাঁকাস্থানেৱ আকাৰ বা আকৃতি প্ৰহণ কৰে। মহাশূন্যেৱ বিভিন্ন এলাকায় এই ঘণীভূত প্ৰক্ৰিয়াৰ কিছুটা বিভিন্নতা ছিল, ফলে স্থান-কালে (Space-time) বিভিন্ন ধৰনেৱ বিচ্যুতি (defects) ঘটে। এভাৱে মহাবিশ্বব্যাপী কোথাও সূক্ষ্মনল (string) প্ৰাচীৰ অথবা এমন কি গাণিতিক বিন্দু গঠন কৰে। অবশ্য মহাবিশ্বেৱ আমাদেৱ অংশে বৰ্তমানে এ ধৰনেৱ প্ৰাচীৰ বা বিন্দু দৃষ্টিগোচৰ হয় না। সুন্দীৰ্ঘ সময়েৱ সম্প্ৰসাৱণেৱ ফলে হয়তো এগুলো আমাদেৱ দৃষ্টিৰ আড়ালে চলে গেছে। কিন্তু সে সময় থেকে এখন পৰ্যন্ত সূক্ষ্ম নলগুলো মহাবিশ্বেৱ আমাদেৱ অংশেও বিদ্যমান। এমনকি বৰ্তমানে, আমৱা যেমন দেখছি এগুলো মহাবিশ্বে পদাৰ্থেৱ বন্টনে বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা রাখছে।

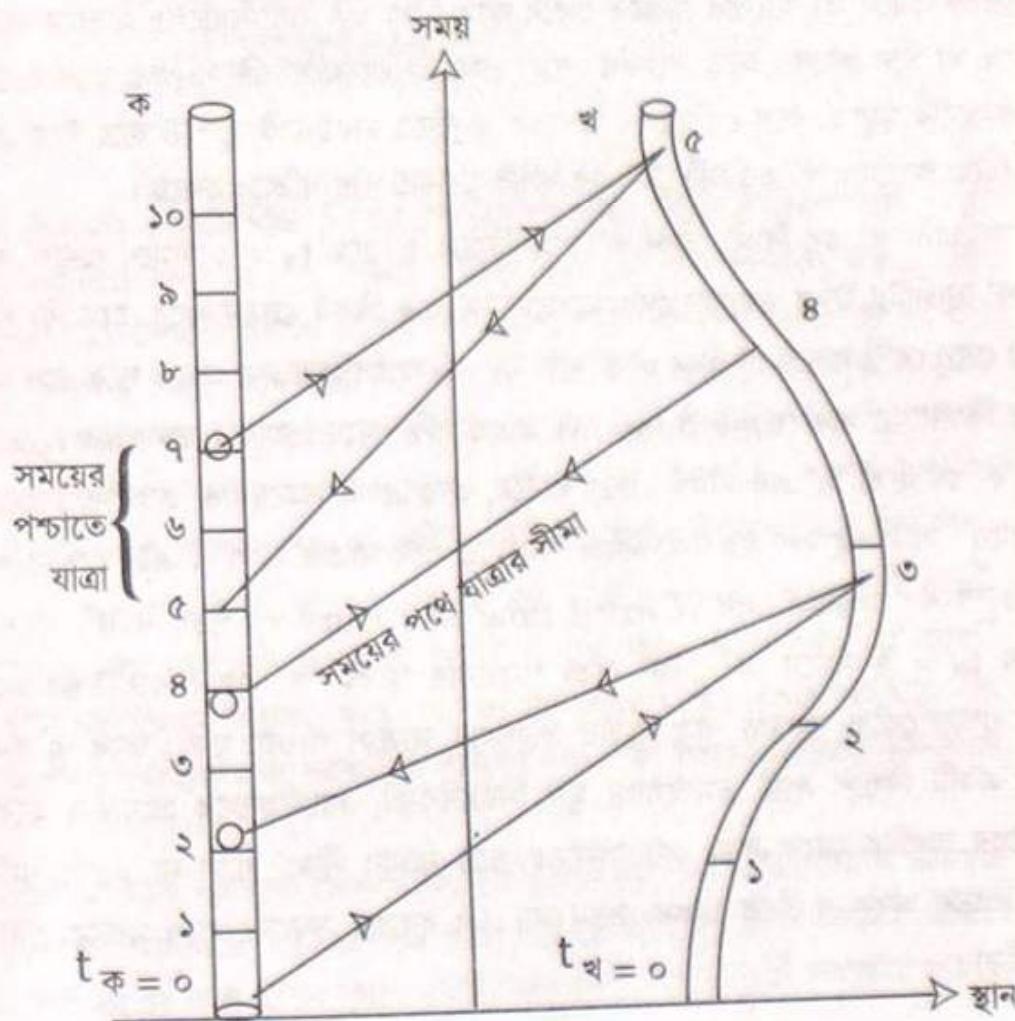
এই সূক্ষ্ম নলগুলোকেই মহাজগতিক তার (cosmic string) বলে। এদেৱ কোন শেষ প্ৰান্ত নেই, কিন্তু সব সময় এটি বন্ধ কুণ্ডলাকাৰ পথ (closed loop) যা দৃশ্যমান মহাবিশ্বেৱ একপ্রান্ত থেকে অদৃশ্যমান মহাবিশ্বেৱ অপৰ প্ৰান্ত পৰ্যন্ত বিস্তৃত। এই তার খুবই সূক্ষ্ম যাৱ ব্যাসাৰ্ধ এক সেণ্টিমিটাৱেৱ এক হাজাৰ ভাগেৱ বিলিয়ন-বিলিয়ন-বিলিয়ন (এক বিলিয়ন=একশত কোটি) ডগ্লাংশ মাত্ৰ। অথচ মাত্ৰ এক কিলোমিটাৱ দৈৰ্ঘ্য এই মহাজগতিক তাৱেৱ ওজন হতে পাৱে আমাদেৱ পৃথিবীৰ সমান। এক হাজাৰ কোটি আলোক বৰ্ষব্যাপী বিস্তৃত তাৱকে যদি গুটান হয় তবে তা ক্ষুদ্ৰ একটি পৱিমাণুৰ সমান হবে আৱ ওজন হবে অতিৰুৎৎ গ্যালাক্সিগুচ্ছেৱ (Supercluster of Galaxies) সমান। কিছু কিছু জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানীৱা মনে কৱেন মহাবিশ্বেৱ সূচনালগ্নে এই তাৱেৱ কুণ্ডলীৰ উপস্থিতি গ্যালাক্সি বা গ্যালাক্সিগুচ্ছ জন্মেৱ 'মহাকৰ্ষীয় বীজ' (gravitational seeds) হিসাবে কাজ কৱেছে। এই তাৱেৱ কুণ্ডলীৰ প্ৰচন্ড মহাকৰ্ষেৱ টান মহাজগতিক সম্প্ৰসাৱণকে (Cosmic Expansion) প্ৰতিৱেদ কৱে পদাৰ্থকে ধৰে রেখে তাৱকা এবং গ্যালাক্সি গঠন কৱেছে। প্ৰচন্ড মহাকৰ্ষেৱ টান এই মহাজগতিক তাৱেৱ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য। পৱিবহনযোগ্য ওয়ার্মহোল গঠন অপেক্ষাকৃত কম গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য। আৱ সবচেয়ে আকষণীয় বিষয় হ'ল এই সূক্ষ্ম নলেৱ ভিতৱ কি রায়েছে?

সহজভাৱে চিন্তা কৱলৈ মনে হবে এই মহাজগতিক তাৱেৱ ভিতৱ মহাবিশ্ব সম্প্ৰসাৱণেৱ লগ্ন থেকে বৰ্তমান অবস্থা পৰ্যন্ত পৱিত্যক পদাৰ্থ দ্বাৱা গঠিত। আসলে মহাজগতিক তার কোন পদাৰ্থ দ্বাৱা পৱিপূৰ্ণ নয়। এটি নিজেই একটি আদি শক্তিৰ ক্ষেত্ৰ (original energy fields)। এই ক্ষেত্ৰগুলি এখনও মহাজগতিক ধ্ৰুবক (Cosmological constant) এৱ সীলমোহৰ বহন কৱে। মহাবিশ্বেৱ জন্মালগ্ন থেকেই নৰ্বত্র প্ৰবল ৰোগীক (negative) চাপ প্ৰসাৱিত।

একটি রবারের টুকরাকে টেনে ধরলে, পদার্থের পৌড়ন (tension) প্রান্ত দু'টিকে একত্রীকরণ করতে চেষ্টা করবে। অথচ প্রসারিত ঝণাত্মক চাপসম্পন্ন মহাজাগতিক তারের ঝণাত্মক পৌড়ন (negative tension) তারটিকে আরও প্রসারিত করবে। মহাজাগতিক তারের ভিতর যে পর্যাণ পরিমাণ বহিরাগত উপাদান (exotic stuff) শক্তির আকারে রয়েছে এর প্রবল ক্ষমতা ব্যবহার করে ওয়ার্মহোলের স্থায়ীভূ বৃক্ষি করা যেতে পারে।

এই মহাজাগতিক তারের ঘনত্ব (density) হ'ল 10^{29} গ্রাম/সিসি। অর্থাৎ একসন্তোষিত তারের ভর হ'ল একহাজার ট্রিলিয়ন মেট্রিক টন। মহাজাগতিক তারের ঘনত্ব ব্ল্যাকহোলের ঘনত্বের চেয়ে অনেকগুণ বেশী। একটি পরিবহনযোগ্য ওয়ার্মহোলের এক ঘনমিটার প্রবেশ পথের জন্য প্রায় 10^{29} কেজি (kgm) ঝণাত্মক ভরে (negative mass) প্রয়োজন হবে। সুতরাং এই মহাজাগতিক তারের ঝণাত্মক চাপ পরিবহনযোগ্য ওয়ার্মহোলের স্থায়ীভূ বৃক্ষি করতে পারে।

সময়ের পথে যাত্রা (Time Travel)



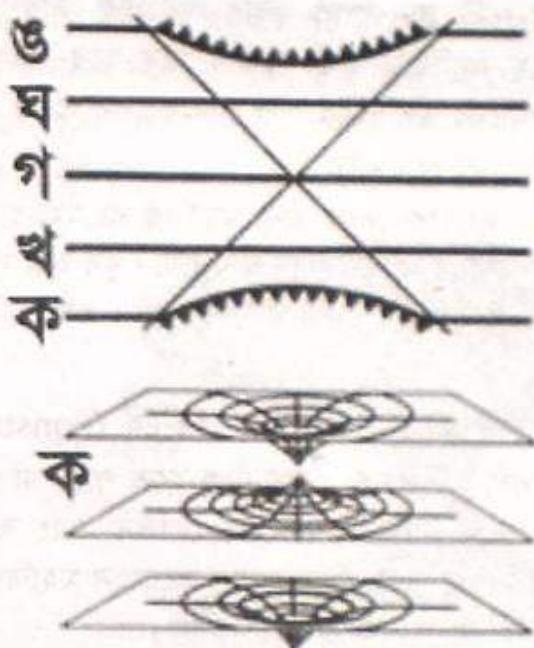
আইনষ্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ অনুসারে সময় স্থান-কালের (Space-time) একটি চতুর্থ মাত্রা (dimension)। স্থান-কালের অনুচিত্রে (Space time diagram) সময়কে যদি আমরা একটি সরল রেখায় কল্পনা করি অর্থাৎ অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ এক সরল রেখায়, তবে এই সময়ের পথে সামনে এবং পিছনে ভ্রমণ সম্ভব।

এখন আমরা নিম্নে স্থান-কালের একটি অনুচিত্রে সময়ের পথে যাত্রা অর্থাৎ সময়ের সামনে ও পিছনে কিভাবে চলা সম্ভব তা বোঝার চেষ্টা করব।

ধরা যাক 'ক' একজন পর্যবেক্ষক, একটি কাঠামোতে স্থির অবস্থানে আছে এবং 'খ' অপর একজন পরিব্রাজক অতি দ্রুত গতিতে 'ক' এর আপেক্ষিকতায় চলমান। 'খ' এর সঙ্গের ঘড়িটি 'ক' এর ঘড়ির চেয়ে ধীরে চলবে কারণ বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ অনুসারে অতিদ্রুত গতি বেগের জন্য সময়ের বিস্তারণ (dilation) ঘটে। 'ক' এবং 'খ' উভয়ই ওয়ার্মহোলের একটি করে মুখ ধারণ করে রাখবে, ফলে তারা পরস্পরের সঙ্গে স্থান (Space) বা ওয়ার্মহোলের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করে চলবে। স্থান-এর মাধ্যমে কোন বার্তা প্রেরণ করলে তা আলোর গতিতে চলবে আবার তা যদি ওয়ার্মহোলের মাধ্যমে পাঠান হয় তবে তা স্থান-কালের অতি সংক্ষিপ্ত পথে আসবে। ওয়ার্মহোলটি সংক্ষিপ্ত হলে বার্তাটি প্রায় পাঠানোর মুহূর্তে এসে পৌছাবে। উপরের অনুচিত্রে অবস্থানটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে এবং চিত্রে সহজে অনুমেয় 'খ' এর ঘড়ি 'ক' এর ঘড়ির তুলনায় ধীর গতিতে চলছে।

'ক' যদি 'খ' এর নিকট কোন বার্তা অনুচিত্রের স্থানাক্তে $t_k = 0$ সময়ে প্রেরণ করে এবং 'খ' বার্তাটির উত্তর ওয়ার্মহোলের মাধ্যমে 'ক' এর নিকট প্রেরণ করে তবে তা শূন্য সময়ের চেয়ে বেশী সময়ে পৌছাবে। 'খ' যদি 'ক' এর আপেক্ষিকতায় আরও দূরে চলে যায় সময়ের বিস্তারণের মান (time dilation) আরও বৃদ্ধি পাবে। আবার স্থানাক্তের $t_k = 8$ সময়ে 'ক' যে বার্তা 'খ' এর নিকট প্রেরণ করবে, প্রায় একই সময়ে 'খ' এর নিকট থেকে উত্তর পাবে। এটাকেই বলা হয় তথাকথিত "সময়ের পথে যাত্রার সীমা"। এই সময়ের পর কাল সাদৃশ্য বন্ধ বক্রচিত্র লেখ (Closed time like Curves) গঠন করে। পুনরায় স্থানাক্তের $t_k = 7$ সময়ে 'ক' কোন বার্তা পাঠানোর পূর্বেই 'খ' এর নিকট উত্তর লাভ করবে। এখান থেকে সময়ের পথে যাত্রার সম্ভাবনার আভাস পাওয়া যায়। তবে এ জন্য অবশ্যই একটি বিশাল স্থায়ী ভ্রমণযোগ্য মুখ নিয়ন্ত্রণকারী ওয়ার্মহোলের প্রয়োজন হবে। স্থান-কালের অনুচিত্র থেকে বুঝা যায় 'সময়ের পথে যাত্রার সীমা' গঠন না হওয়া পর্যন্ত সময়ের পিছনে অর্থাৎ অতীতে যাওয়া সম্ভব নয়। এ ধরণের সময়ের পথে যাত্রার এটাই কঠোর সীমা।

শোয়ার্জশীল (স্থির) ওয়ার্মহোলের স্থান-কালের অনুচ্ছিত Schwarzschild (static) Space-time Diagram of the Wormhole



উপরের চিত্রগুলি শোয়ার্জশীল (স্থির) ব্ল্যাকহোলের অনন্যতাকে বিশ্বেষণ করে। এই চিত্রকে ১-২ অনুচ্ছিতও বলা হয়। '১' সময়ের মাত্রা এবং '২' স্থান সংক্রান্ত মাত্রা। এই চিত্রাঙ্কের (graphs) ক্ষেত্রটি যুগপৎ তলের (Plane) বর্ণনা করে। সময়ের শুরু থেকে অর্থাৎ সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে বিদ্যমান ব্ল্যাকহোলের বিবর্তনের ছবি উপরের চিত্রে ফুটে ওঠে। '১-২' অনুচ্ছিতটি আবার দৃঢ়ভাবে স্থাপিত (embedding) অনুচ্ছিতও বলা হয়, কারণ স্থান-কালের একটি অংশ ত্তীয় মাত্রায় দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয়ে, কিভাবে মুচড়ায়ে যায় তা দেখা যায়। এই চিত্রগুলি অন্তর্নের জন্য খুব জটিল গাণিতিক হিসাব নিকাশের প্রয়োজন হয়।

'ক', 'খ', 'গ', 'ঘ' এবং 'ঙ' স্থান-কালের এক একটি টুকরো অংশ। এই চিত্রটি কালক্রমানুসারে ওয়ার্মহোলের সৃষ্টি করে। 'ঙ' অংশটি স্থান-কালের বক্রতার শুরু। 'ঘ' অংশটি ওয়ার্মহোল দু'টি মহাবিশ্বকে সেতুবন্ধ করে। 'গ' অংশটি ওয়ার্মহোলের সম্মাঝো সবচেয়ে বৃহৎ ব্যাস। 'খ' অংশটি ওয়ার্মহোল এবং পরবর্তীতে মুচড়ায়ে যায়। 'ক' অংশটি চিরস্থায়ী স্থান-কালে পরিণত হয়।

'ক' হচ্ছে ভবিষ্যত অনন্যতা যেখানে সরকিছু পতিত হয়। 'খ' হচ্ছে অতীত অনন্যতা যেখানে বৈজ্ঞানিক ধারণামতে (Theoretically) মহাবিশ্ব সৃষ্টির বীজ নিহিত। এখানে লক্ষ্যণীয় মহাকর্ষ কৃপের তলা ভীষণ সূচাল এটাই অনন্যতা। এখানে দু'টি অনন্যতা রয়েছে,

একটি আমাদের মহাবিশ্ব এবং অপরটি অন্য মহাবিশ্ব। 'খ', 'গ' এবং 'ঘ' অংশগুলি এর অন্তর্গত। অনন্যতা অদৃশ্য হলে স্থান-কাল সংযুক্ত হয়। এটাই প্রকৃত ওয়ার্মহোল। দুটি মহাবিশ্ব অথবা একই মহাবিশ্বের দুটি স্থান স্পর্শ করার অর্থ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া সম্ভব। প্রসঙ্গক্রমে অনুচিত্রিত লক্ষ্য করলে মনে হবে এখানে স্থান-কাল একটি গভীর কৃপের মত। প্রচুর পদার্থের উপস্থিতির জন্য স্থান-কালের গভীর বক্রতার ফলে এই এলাকাকে সাধারণ মহাকর্ষ কৃপ বলা হয়ে থাকে।

শোয়ার্জশীল ওয়ার্মহোল এক মহাবিশ্ব থেকে অন্য মহাবিশ্ব বা মহাবিশ্বের স্থানান্তরে ভ্রমণের একটি পদ্ধা। কিন্তু প্রধান সমস্যা হ'ল এটি খুবই ক্ষণস্থায়ী। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ওয়ার্মহোলটি গঠন এবং পর মুহূর্তে মুচড়ায়ে যাওয়ার ঘটনাটি ঘটে। এটি অতিক্রমের জন্য আলোর চেয়ে দ্রুতগামী হতে হবে।

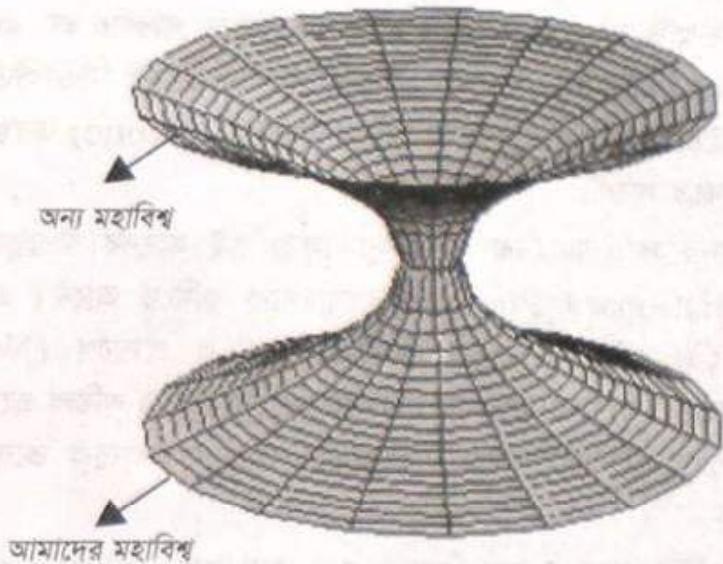
আইনষ্টাইনের তত্ত্বানুসারে শূন্যে আলোর গতি অপরিবর্তনীয় (constant এবং তা 3×10^8 মিৎ/সেকেন্ড) এর চেয়ে বেশী গতিসম্পন্ন কোন কিছু হতে পারে না। কিন্তু ২০০২ সালের এপ্রিল মাসে অস্ট্রেলিয়ার পদার্থ বিজ্ঞানী পাওয়েল ডেভিস এবং তার সহকর্মীরা স্যাটেলাইট থেকে প্রাণ্য জগৎ সৃষ্টির বিভিন্ন তথ্য থেকে প্রমাণ করেছেন মহাবিশ্ব সৃষ্টির প্রথম লগ্নে আলোর গতি বর্তমানের চেয়ে অনেক গুণ বেশী ছিল।

এছাড়া ১৯৬৭ সালে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ অধ্যাপক জেরাল্ড ফাইনবার্গ আলোর চেয়ে লক্ষ কোটিশুণি বেশী গতিসম্পন্ন কণা ট্যাকিয়ন (Tachyon) সূত্র প্রকাশ করেন। আলোর গতি বা তার চেয়ে কম গতিতে তাকে নামিয়ে আনলে তার অস্তিত্বের বিলুপ্তি ঘটে। এই গতিতে সময়ের ধারণা হবে আইনষ্টাইন যেমন বলেছিলেন আজ যাত্রা শুরু করে গতকাল পৌঁছান যাবে।

পরিবহনযোগ্য ওয়ার্মহোল (Traversable Wormhole)

১৯৮৫ সালে পদার্থবিদ ও বিজ্ঞান কল্পকাহিনীর লেখক কার্ল সাগান তার বিখ্যাত উপন্যাস 'কনট্যাক্ট' (contact) প্রকাশ করেন। এর পূর্বে অবশ্য তিনি অনুলিপিটি পদার্থবিদ কীপ থ্রোর্ণ এর নিকট পাঠান। তার উপন্যাসের নায়িকা ব্ল্যাকহোলকে সংক্ষিপ্ত পথ হিসাবে ব্যবহার করে মহাবিশ্বের দূর-দূরান্ত ভ্রমণ বিজ্ঞানসম্ভাবনাবে করতে পারবে কিনা এ বিষয়ে থ্রোর্ণের মতামত জানতে চান। থ্রোর্ণ উত্তরে জানান ব্ল্যাকহোলের কেন্দ্রের মাধ্যমে মহাজাগতিক ভ্রমণ সম্ভব নয়। তবে ব্ল্যাকহোলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় তেমন ওয়ার্মহোলের মাধ্যমে তা সম্ভব। পরবর্তীতে থ্রোর্ণ এবং তাঁর বেশ কিছু সহযোগী ছাত্র এ বিষয়ে গবেষণা করেন। ওয়ার্মহোলকে মহাজাগতিক পরিভ্রমণের সুড়ঙ্গ হিসাবে ব্যবহার করার সম্ভবনাকে তিনি "Black Holes and Time warps: Einstein's Outrageous Legacy" নামে গ্রন্থে প্রকাশ করেন।

মহাজগতিক (Cosmic) ওয়ার্মহোলের প্রধান সমস্যা ইল স্থায়ী কোন অবয়র (Structure) নেই। এটার আকৃতি অনন্যতায় শূন্য। কঠনালী (throat) থেকে প্রসারণ শুরু হয়ে বৃহত্তম ব্যাসার্ধে উপনীত হওয়ার পর মুহূর্তেই আবার সঙ্কোচনে অনন্যতায় ফিরে আসে। ব্যাসার্ধের এই প্রসারণ-সঙ্কোচন খুবই দ্রুত ঘটে। ওয়ার্মহোলের কঠনালীর ব্যাসার্ধ শূন্যেতে পরিণত হওয়ার পূর্বে আলোক রশ্বি পর্যন্ত, এর ভিতর দিয়ে অতিক্রম করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে ওয়ার্মহোলে পতনশীল যে কোন পদার্থই প্রচল মহাকর্ষ বলের আওতায় পড়ে।



ওয়ার্মহোলকে সূড়ঙ্গ পথের (Tunnels) ন্যায় ব্যবহার করার জন্য বেশ কিছু পূরণীয় শর্ত আছে। প্রথমতঃ ওয়ার্মহোলের সূড়ঙ্গটি কোন কিছু অতিক্রম করার সময় অবশ্যই খোলা থাকতে হবে অর্থাৎ তা মুচড়িয়ে ধ্বংসপ্রাণ হওয়া চলবে না। দ্বিতীয়তঃ অবশ্যই সেখানে কোন শক্তিশালী জোয়ার বল (tidal forces) থাকবে না। তৃতীয়তঃ দ্বি-মুর্খী পথ থাকতে হবে। রূপকহোলের মত ঘটনা দিগন্ত থাকা চলবে না। চতুর্থতঃ এর ভিতর দিয়ে ভ্রমণের সময়কে অবশ্যই যুক্তিসঙ্গতভাবে অতি সংক্ষিপ্ত করতে হবে। পঞ্চমতঃ এখানে নিরাপদ মাত্রার বিকিরণ থাকতে হবে।

কীপ থ্রোণ এবং তাঁর ছাত্র মাইকেল মরিস সিদ্ধান্তে আসেন যে, ওয়ার্মহোলের উপরোক্ত সমস্যাগুলি অতিক্রম করা সম্ভব। প্রথম ও প্রধান সমস্যা মুচড়িয়ে ধ্বংসপ্রাণ হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য ইতিমধ্যে অনেক পদার্থবিদ বহিরাগত পদার্থ (exotic matter) ব্যবহার করে ওয়ার্মহোলের মুখ খোলা রাখার পছার কথা বলেছেন।

যদিও বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত বহিরাগত পদার্থের (exotic matter) সন্ধান পাননি, তবু পদার্থ বিজ্ঞানের তত্ত্বানুসারে এ ধরনের পদার্থের অস্তিত্ব প্রকৃতপক্ষেই আছে। বহিরাগত

পদার্থের গঠনে ঋণাত্মক (Negative) শক্তির ঘনায়ন এবং প্রসারণ বা চাপ প্রয়োজন। সম্পূর্ণ শূন্য স্থানে (Vacuum/empty Space) দুটি সরু পরিবাহী ধাতুর পাতে ঠিক একইভাবে ঋণাত্মক শক্তির ঘনায়ন ঘটতে পারে (Casimir field)।

সম্পূর্ণ খালি স্থানে সব সময় ব্যাপক চাপল্যতার (Vacuum Fluctuations) সৃষ্টি হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় পৃথিবীতে ব্যাপক চাপল্যতা (Vacuum Fluctuations) শূন্য অর্থাৎ ধনাত্মক বা ঋণাত্মক নয়। আলোর গতির কাছাকাছি কেউ যদি বহিরাগত পদার্থের ভিতর দিয়ে চলে তবে সে গড় শক্তির ঘনত্ব ঋণাত্মক পাবে। ব্ল্যাকহোলের নিকট ব্যাপক চাপল্য অকল্পনীয় বিকৃত মূর্তি ধারণ করে অর্থাৎ বহিরাগত পর্দাখে পরিণত হয়, প্রকৃতপক্ষে এই ব্যাপক চাপল্যময় বহিরাগত পদার্থ ব্ল্যাকহোলের দিগন্তকে সংকুচিত করে। ওয়ার্মহোলেও ঠিক একইভাবে ব্যাপক চাপল্যতা ঘটিয়ে বহিরাগত (exotic) অবস্থানে এনে ওয়ার্মহোলকে খোলা রাখতে পারে।

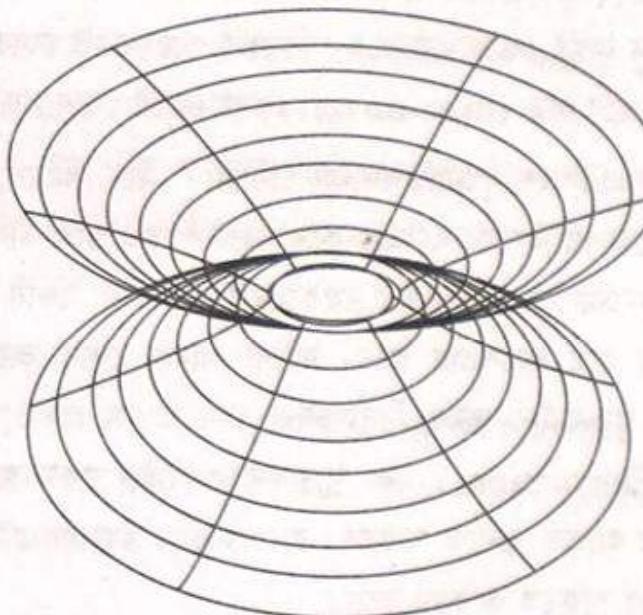
জ্যোতির্পদার্থবিদদের মতে মহাবিশ্ব সৃষ্টির সূচনালগ্নে এই ধরণের ঋণাত্মক চাপের ক্ষেত্র ফীতিদশার (Inflationary Phase) সম্প্রসারণকে কমিয়ে আনে। একইভাবে মহাজাগতিক সূতার (Cosmic String) ক্ষেত্রেও ঋণাত্মক প্রসারণ (Negative tension) আছে। ব্ল্যাকহোল গঠনের জন্য যে পরিমাণ ধনাত্মক ভরের শক্তির প্রয়োজন তা অতিক্রম করতে ওয়ার্মহোল গঠনের জন্যও ঠিক একই পরিমাণ ঋণাত্মক ভরের শক্তির প্রয়োজন।

আমেরিকায় বেশ কিছু প্রখ্যাত জগৎবিজ্ঞানী জন ক্যারামের, গ্যারিগরি বেনফোর্ড, জেফী এল্যানডিস, ম্যাট ভাইসার এবং মাইকেল মরিস ফিজিক্যাল রিভিউ সাময়িকীতে "Natural Wormholes as Gravitational Lenses" নামে বিখ্যাত প্রবন্ধে ওয়ার্মহোল সম্পর্কে এক গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব দেন।

"Wormholes, although allowed by the theory of relativity, are theoretically Unstable. However at the time of the formation of the Universe in the big-bang, wormholes could have been Stabilized loops of negative mass Cosmic String. If so, they would still be here and it is worthwhile to look for them. If we find one the implications are enormous." ওয়ার্মহোল যদিও আপেক্ষিকতা তত্ত্বানুসারে ধারণা করা হয় ক্ষণস্থায়ী। তথাপি বিগ-ব্যাংগের মাধ্যমে মহাবিশ্ব গঠনকালে ঋণাত্মক ভরের মহাজাগতিক সূতার কুকুলী দ্বারা সৃষ্টি ওয়ার্মহোলগুলির স্থায়ীভূত লাভ করে থাকতে পারে, এটাই যদি সত্য হয় তবে তা এখনও বিদ্যমান এবং তা সন্দান করা প্রয়োজন। যদি আমরা একটি খুঁজে পাই তার গুরুত্ব হবে অপরিসীম।

পরিভ্রমণযোগ্য ওয়ার্মহোলকে ধারণা করা যায় ব্ল্যাকহোলের ঝণাত্তক শক্তির প্রতিরূপ। সুতরাং ওয়ার্মহোলকে হোয়াইটহোল হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়। একটি পরিভ্রমণযোগ্য ওয়ার্মহোলের এক ঘনমিটার প্রবেশ পথের জন্য প্রায় 10^{27} কেজি ঝণাত্তক ভরের প্রয়োজন হবে। এখানে উল্লেখ্য ওয়ার্মহোলের প্রান্ত যে পরিমাণ ঝণাত্তক ভর দ্বারা খোলা থাকে, ঠিক সেই পরিমাণ ধনাত্তক ভর এর ভিতর দিয়ে অতিক্রম করলে ওয়ার্মহোলটি ধ্বংসপ্রাণ হয়ে যাবে।

স্থায়ী ওয়ার্মহোলে বহিরাগত পদার্থের একটি পাতলা শক্ত বহিরাবরণ (Shell) গঠন করে। এই বহিরাবরণটি ঝণাত্তক ভর এবং তলের (Surface) চাপ থাকে ধনাত্তক। ঝণাত্তক ভর ওয়ার্মহোলের কঠনলীকে (throat) দিগন্তের বাইরে অবস্থান সুনিশ্চিত করে আর তলের ধনাত্তক চাপ ওয়ার্মহোলকে গুটিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে, ফলে একজন ভ্রমণকারী সহজেই তা অতিক্রম করতে পারে।



যদি বহিরাগত পদার্থ ওয়ার্মহোলকে ধরে রাখে এবং একজন পরিব্রাজক কোনভাবে ক্ষতিকারক বিকিরণ প্রতিক্রিয়া থেকে নিজেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে। তবে তা পরিভ্রমণ যোগ্য। পরিভ্রমণ যোগ্য ওয়ার্মহোলটিকে টাইম মেশিনে পরিণত করতে একটি মুখকে স্থির রাখতে হবে আর অপরটি হবে চলমান। বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে (electrical field) মহাকর্ষের আকর্ষণ অথবা বৈদ্যুতিক চার্জ প্রয়োগ করে এটা করা সম্ভব। স্থির মুখ থেকে চলমান মুখ পর্যন্ত যাত্রা করে পুনরায় স্থির মুখে ফিরে আসলে সময়ের পিছনে (অর্থাৎ অতীতে) ফেরাও সম্ভব।

ওয়ার্মহোলকে পরিভ্রমণ যোগ্য এবং টাইম মেশিন হিসাবে ব্যবহার করা সম্পর্কিত উপরের তথ্যগুলি সম্পূর্ণ প্রকল্পনীয় (Hypothetical)। বাস্তবে এর প্রয়োগ কতটুকু সম্ভব এ সম্পর্কে নিম্নের আলোচনা লক্ষ্যনীয়।

ওয়ার্মহোলকে টাইম মেশিনে রূপান্তর অসম্ভব

যখনি কোন ব্ল্যাকহোলের প্রসঙ্গ আলোচনায় আসে তখনি আমাদের মনে আসে ব্ল্যাকহোলের মাধ্যমে সময়ের সামনে পিছনে এবং মহাবিশ্বের সুদূর কোন প্রান্ত বা সম্পূর্ণ নতুন মহাবিশ্বে সফর করার সম্ভাবনার কথা। যদি তাই সম্ভব হ'ত হয়ত এতদিনে আমাদের চেয়ে অনেক উন্নত এবং অগ্রগামী অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যতের কোন সুসভ্যজাতির ভ্রমণকারী পৃথিবীতে পদচারণা এবং যোগাযোগ করত। সময়ের পথে যাত্রা (time-travel) সম্ভাবনার প্রশ্নে জগৎ বিখ্যাত বিজ্ঞানী টিফেন হকিং মন্তব্য করেন- অন্য বিশ্ব থেকে আগম্ভুক আমাদের দৃষ্টি গোচর না হওয়ার পিছনে কারণ হতে পারে ইতিহাসের এমন এক ত্রাস্তিকালে বাস করছি যে আমাদেরকে পরিদর্শন করার কেউ কোন প্রয়োজন বোধ করে না অথবা সময়ের পথে যাত্রা (time-travel) কোন ক্রমেই কোন পদ্ধতিই সম্ভব নয়।

সম্প্রতি অধিকাংশ জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানীরা মনে করেন, ব্ল্যাকহোলের কেন্দ্রকে (Core) গমনের পথ হিসাবে ব্যবহার করে মহাজাগতিক স্থান-কাল অথবা অন্য কোন ভিন্ন মহাবিশ্বে পাড়ি জমানো সম্ভব নয়। ব্ল্যাকহোলে পতনশীল কোন কিছু কেন্দ্রে পৌছানোর পূর্বেই ছিন্নভিন্ন হয়ে ধ্রংসণাত্মক হ্রেত্রের বা প্রবল খালি স্থানের চাপ্টগল্যের (Vacuum Fluctuations) এবং ক্ষুদ্রাকারের বিভিন্ন রকম ক্ষতিকারক বিকিরণ প্রবল বর্ষণের মাধ্যমে আঘাত হানতে থাকবে। ব্ল্যাকহোলের মহাকর্ষ এই জাতীয় বর্ষণকে আরও অতি উচ্চ মাত্রার শক্তিতে রূপান্তর করে।

১৯৯০ সালে প্রকাশিত এক বিস্তৃত গবেষণামূলক নিবন্ধে কীপ থ্রোর্ন এবং তাঁর সহকর্মীরা সময়ের পথে যাত্রাকে কণাবাদী তত্ত্বের (Quantum theory) সঙ্গে ঐক্যমত ঘটান। অন্যদিকে টিফেন হকিং সহ অন্য অনেক বিজ্ঞানীই প্রস্তাবিত অনুমিত কালক্রম প্রতিরক্ষা (Chronological Protection Conjecture বা CPC) ফলে মহাবিশ্বে সময়ের পথে যাত্রা সম্ভব নয় বলে মত প্রকাশ করেন।

সময়ের পথে যাত্রা (time travel) সংক্রান্ত আর একজন সন্দেহবাদী বিজ্ঞানী হচ্ছেন ম্যাট ভাইস্যার (Mat Visser)। ১৯৯৩ সালের প্রারম্ভে তিনি দেখান ওয়ার্মহোলকে টাইম মেশিন হিসাবে ব্যবহার করে সময়ের পথে যাত্রা সম্ভব নয়, কারণ অনুমিত কালক্রম

প্রতিরক্ষার (CPC) প্রাকৃতিক কৌশল তা প্রতিহত করতে বাধ্য করে। ভাইস্যার এবং তাঁর সহকর্মীবৃন্দ এক পুণরীক্ষণ নিবন্ধে দেখান ওয়ার্মহোলের মুখে রক্ষিত ঘড়ি দু'টি কখনও এত কাছাকাছি আনা সম্ভব নয়, যার ফলে ভ্রমণকারীর পক্ষে স্বাভাবিক নিয়ম লজ্জনের সচেষ্টতা প্রমাণিত হবে। সৃষ্টি কণাবাদী ক্ষেত্রে (quantum field) এবং মহাকর্ষের প্রভাবের ফলে ওয়ার্মহোলের দু'টি মুখ চরম বিন্দুর (Critical Point) দিকে ধারিত হবে এবং পরিণামে ওয়ার্মহোলটি ধ্বংস হয়ে যাবে অথবা পারস্পারিক বিকর্ষণে আবিষ্ট (enduce) হবে। এ বিষয়ে ভাইস্যারের কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি, তবে মনে হয় কল্পিত কণিকার (Virtual particles) ঝাঁক টাইম মেশনটি গঠনের প্রাক্কালে এলাকাকে সাংঘাতিক ভাবে বিস্থিত করবে নতুবা হয়ত কার্যকরী হ'ত।

কালক্রম অনুসারে লজ্জনীয় এলাকার নিকট কল্পিত কণিকাগুলি আলোর চেয়ে কম গতি সম্পন্ন স্থান-সাদৃশ্য (Space-like) বন্ধ কুভলী (loop) গঠন করতে পারে এবং হাইজেন বার্গ (Heis-berg) অনুযায়ী ধার করা শক্তি হারিয়ে স্বাভাবিকের চেয়ে আরও তীব্রতর হয়। কল্পিত কণিকাগুলির শক্তি টাইম মেশিনকে আরও বিপজ্জনক আলোর চেয়ে দ্রুত গতি সম্পন্ন কাল সাদৃশ্য (time-like) বন্ধ কুভলী গঠনে প্রতিরোধ করে এবং পরিবহনযোগ্য ওয়ার্মহোলকে বন্ধ বা মুচড়িয়ে ফেলে।

ভাইস্যারের মতে অনুমিতকালক্রম প্রতিরক্ষা (cpc) কৌশল সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং ওয়ার্মহোলের মাধ্যমে সময়ের পথে যাত্রাকে বাধা দেয়। তবে আলোর চেয়ে দ্রুতগামী কোন কিছু ওয়ার্মহোলের পথে প্রবেশ করতে পারে।

সমান্তরাল মহাবিশ্বসমূহ

Parallel Uneverses

বিজ্ঞান কল্পকাহিনীর (Science fiction) লেখকরা অনেক আগেই তাদের লেখায় অন্য মহাবিশ্ব বা সমান্তরাল মহাবিশ্বের অস্তিত্বের বিচিত্র কাহিনী তুলে ধরেছেন। বর্তমানে তা আর কল্পকাহিনী নয়। বিজ্ঞানীরা সমান্তরাল মহাবিশ্বের বাস্তব অস্তিত্ব সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য প্রকাশ করছেন তা বিজ্ঞান-কল্পকাহিনীর লেখকদের কল্পনাকেও হার মানায়।

নিম্নে ২০০২ সালের ১৪ই আগস্ট বিবিসি এর বিজ্ঞান বিষয়ক ওয়েভ সাইটে সমান্তরাল মহাবিশ্বসমূহ নামে প্রকাশিত প্রবন্ধের (১৪ই ফেব্রুয়ারী ২০০২ সালে বিবিসি বেতার/টিভির প্রচারিত) ভূমিকার বাংলা অনুবাদ।

“এখানে আপনারা যা কিছু পড়বেন সব অসম্ভব এবং পাগলের প্রলাপ বলেই মন হবে, যা বিজ্ঞান কল্পকাহিনীকেও হার মানায়। তথাপি সবকিছুই সত্য।

বিজ্ঞানীরা এখন বিশ্বাস করেন সমান্তরাল মহাবিশ্ব আছে প্রকৃতপক্ষে অগণিত সংখ্যক সমান্তরাল মহাবিশ্বের একটিতে আমরা বাস করছি। অন্য মহাবিশ্বে স্থান-কাল এবং আরও বিচিত্র বহিরাগত পদার্থ (exotic matter) আছে। এই জাতীয় পদার্থের মধ্যে এমনটি আপনিও হতে পারেন সামান্য কিছু ব্যতিক্রমসহ। সবচেয়ে বিস্ময়কর হ'ল বিজ্ঞানীরা বিশ্ব করেন এই সমস্ত সমান্তরাল মহাবিশ্বের অস্তিত্ব আমাদের থেকে মাত্র এক মিলিমিটার দূরে অবস্থান করছে। প্রকৃতপক্ষে কেবলমাত্র দূর্বল সঙ্কেত হিসাবে আমাদের মহাকর্ষ (gravity) অন্য কোন মহাবিশ্ব থেকে আমাদের মহাবিশ্বে প্রবিষ্ট হচ্ছে।”

সমান্তরাল মহাবিশ্বের অস্তিত্ব বুঝতে হ'লে প্রথমেই বুঝতে হবে পরামহাশূন্য (Hyper-Space) কি? পরা মহাশূন্য হ'ল এমন একটি স্থান যা আমাদের মহাবিশ্বের চার মাত্রা (dimensions) চেয়ে অধিক।

কণাবাদী বলবিদ্যার M-তত্ত্বানুসারে ১১ মাত্রার স্থান-কালের মধ্যে ১০টি স্থান (Space) মাত্রা এবং একটি সময় (time) মাত্রা রয়েছে।

ছীকরা দুই হাজার বছর পূর্বে পরা মহাশূন্যের অস্তিত্বের সন্দাবনাকে নাকচ করে দেন কিন্তু ১৮৭০ সালে ভার্ণহার্ড রাইমান পরা মহাশূন্যের অস্তিত্বের সন্দাবনা প্রমাণ করেন পরবর্তীতে ১৯২১ সালে কালুজা পরামহাশূন্যে অন্য মহাবিশ্বের অস্তিত্বের সন্দাবনার কথা বলেন। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন কেবলমাত্র পরামহাশূন্যেই চারটি মৌলিক একত্রীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় যথেষ্ট এলাকা রয়েছে। চার মাত্রার স্থান-কাল (আমাদের মহাবিশ্ব) এই মৌলিক বলগুলি একত্রীকরণের জন্য খুবই ক্ষুদ্র।

মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ নিরূপণ করা হয় দূর গ্যালাক্সির দূরত্ব এবং এর পশ্চাদপসরণ গতির সঙ্গে সম্পর্কিত হাবল কন্সটেন্ট (Hubble's constant) স্থিতি মাপকের (Parameter) সাহায্যে। একটি নির্দিষ্ট দূরত্বের বাইরে পশ্চাদপসরণ গতি আলোর গতিতে অতিক্রম করে। এর বাইরে উপস্থিত কোন বস্তু ডপলার অভিক্রিয়ায় (Doppler effect) লাল বিচৃতি (red-shift) থেকে অসীমে যায় ফলে অদৃশ্যমান থাকে। এই দূরত্বকেই বলা হয় আমাদের দৃশ্যমান মহাবিশ্বের প্রান্তসীমার ঘটনা দিগন্ত এবং আনুমানিক প্রায় (১৫-৩০ বিলিয়ন) ১৫০০-৩০০০ কোটি আলোক বর্ষ পর্যন্ত পরিব্যাঙ্গ। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের বর্তমান দৃশ্যমান মহাবিশ্বের সীমা এটাই। এই সীমার বাইরে কি তা সম্পূর্ণ অনুমানমূলক এবং মহাজগতিক বিজ্ঞানীদের বর্তমান গবেষণার বিষয়। গত দশকে প্রকাশিত বিভিন্ন মহাজগতিক তত্ত্বানুসারে বিশেষ করে অতিক্ষীতি তত্ত্ব (inflationary theories) নির্দেশ করে, আমাদের দৃশ্যমান মহাবিশ্বে বৃহত্তর অতিক্ষীতিতের বুদ্বুদের একটি অতিক্ষুদ্র কণিকা মাত্র। অতিক্ষীতিতের বুদ্বুদটি প্রসার লাভ করেছিল 10^{30} বা তার চেয়ে অধিক আলোকবর্ষব্যাপী সর্বত্র চমৎকার ভাবে। আমাদের দৃশ্যমান মহাবিশ্বের বাইরে কি-এ নিয়ে যদিও অতিক্ষীতি তত্ত্ববাদীদের মধ্যে মতভেদ আছে তথাপি একটি তত্ত্বানুসারে প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্টি ওয়ার্মহোলের মাধ্যমে অধিক মাত্রার অতিক্ষীতিতের বুদ্বুদের অসীম বৃহৎ বিশৃঙ্খলায় সৃষ্টি বিভিন্ন অবকাঠামোর ভগ্নাংশের সংগে আমাদের চার মাত্রার মহাবিশ্বের সংযোগ করতে পারে।

আমাদের মহাবিশ্বে সবকিছু সীমাবদ্ধ সমান্তরাল মহাবিশ্বে সীমাহীন

আমাদের মহাবিশ্বে বা ইউক্লিডিয়ান (Euclidean) স্থান-কালে প্রতীক বৃক্ষি চেতনায় সীমাবদ্ধ। তিনি গোলক (Sphere) দ্বারা পরিবেষ্টিত ইউক্লিডিয়ান জ্যামিতিতে কোন কিছুর আকৃতির বৃক্ষি ঘটে কেবলমাত্র ঘনক্ষেত্রের (Cube) ব্যাসার্ধ বৃক্ষির সঙ্গে। এই মহাবিশ্বে সীমাবদ্ধ সকল মানব সভ্যতার প্রসারণ পরিচালিত হচ্ছে প্রতীক ক্রমন্মোত্তির চাপে এবং প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতার জন্য তা অতিন্দ্রিক থেমে যাবে। পক্ষান্তরে, ওয়ার্মহোল দ্বারা সংযুক্ত সমান্তরাল মহাবিশ্বের দীর্ঘমেয়াদী অগ্রগতি সম্ভব, ফলে উপরোক্ত উভয় সক্ষটাপূর্ণ অবস্থা থেকে যুক্ত। ওয়ার্মহোল দ্বারা সংযুক্ত সুসজ্জিত অসংখ্য সমান্তরাল মহাবিশ্বের বেশ কিছু উপযোগী বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এখানে পরিবেষ্টিত স্থানের ঘনফল আয়তন বৃক্ষি পায় মূল দূরত্ব থেকে ক্রমাবর্যে। এই মহাবিশ্বের কোন মানব সভ্যতার ক্রমন্মোয়ন প্রসারণ পরিচালিত হবে শুধুমাত্র একদিকে অপরিবর্তনীয় হাবে। আর আমাদের মহাবিশ্বে তা প্রসারণ ঘটবে অতিন্দ্রিক গতিতে এবং পরে তা আবার থেমে যাবে।

উপরের বিবৃতিটি একটু জটিল এবং অসাড় গাণিতিক বিষয় বলে মনে হতে পারে। এবার অন্য উদাহরণ দিয়ে তা পুনরুন্ধার করতে চেষ্টা করব। আমাদের মহাবিশ্বে যদি একটি গাছ অবিরাম শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে প্রসারণ ঘটাতে থাকে, পরিশেষে তা বাধাগ্রস্ত হবে এবং সম্পূর্ণ প্রসারণ থেমে যাবে। অথচ সমান্তরাল মহাবিশ্বে এর বৃক্ষ ঘটবে চিরকাল জালের মত। আমাদের মহাবিশ্বে ইউক্লিডিয়ান স্থানে সবকিছুর সীমাবদ্ধতার কারণ ব্ল্যাকহোল গঠনের পূর্বে নির্দিষ্ট পরিমাণ আয়তনের তথ্য ধারণ করার ক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্কিত। এই সীমাবদ্ধতাকে বিকেন ষ্টাইন হকিং (Bekenstein Hawking) সীমা বলে। সমান্তরাল মহাবিশ্বে এ ধরনের কোন সীমাবদ্ধতা নেই। প্রতিটি সমান্তরাল মহাবিশ্বে প্রতিবেশী মহাবিশ্বের প্রদেয় ধনাত্মক (Positive) শক্তির রক্ষণাকারী আবরণ রয়েছে এবং মহাবিশ্বগুলি পরস্পরের সঙ্গে ঝণাত্মক (Negative) শক্তির ওয়ার্মহোল দ্বারা যুক্ত।

আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বের সমীকরণের সমাধান আমাদেরকে জানায় ব্ল্যাকহোলে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় হ'ল স্থান-কালের এই হোলগুলি অন্য মহাবিশ্বের সেতু হিসাবে উপযোগী। বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীতে সমান্তরাল মহাবিশ্ব হচ্ছে অতি সুগরিচিত আমাদের চেনা-জানা মহাবিশ্ব থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এই ভিন্ন জগতের প্রকৃতি সম্পর্কে নানা কল্পনার মধ্যে একটি প্রধান ধারণা হচ্ছে সেখানে আমাদের অনুরূপ সাদৃশ্য কোন অধিবাসীর জীবন যাপন। ভিন্ন ভিন্ন জগতে কিছুটা আলাদা জীবন ব্যবস্থা। কণাবাদী বলবিদ্যার (Quantum Mechanics) বিচিত্র দুনিয়ার দৃষ্টিতে দেখলে উপরের এই ধারণাটি মোটেই অসঙ্গত নয়।

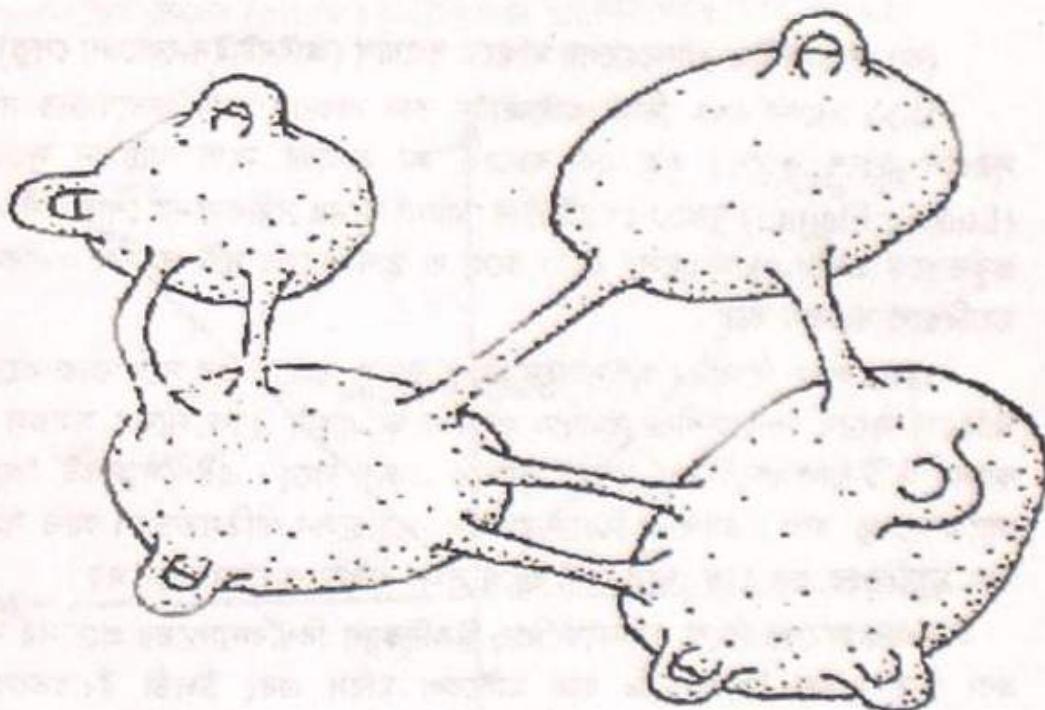
মহাকর্ষ সংক্রান্ত আইনষ্টাইনের সমীকরনের কেরের (Kerr) সমাধান ব্ল্যাকহোলের ভিতরের জ্যামিতি স্থির ধরে নিলে বলয় অনন্যতাকে (Ring Singularity) পরিহার করে নিরক্ষরেখা সমতলে (equatorial plane) পৌছান সম্ভব। ভিতর থেকে অন্য কোন অংশে অথবা আমাদের স্থান-কালে অথবা সম্পূর্ণ নতুন কোন মহাবিশ্বে বাহির হওয়া সম্ভব। এমনকি সময়ের পথে যাত্রাও (time travel) সম্ভব।

অতিদ্রুত ঘূর্ণায়মান কোন নক্ষত্র ধ্বংসপ্রাণ হয়ে কেব ব্ল্যাকহোলে পরিণত হলে আমাদের মহাবিশ্বের ব্ল্যাকহোলে পতিত ধ্বংসপ্রাণ পদার্থ অন্য মহাবিশ্বের অতীত ঘটনা দিগন্ত (past event horizon) দিয়ে হোয়াইটহোলে পুনরায় নির্গত হতে পারে। কেব ব্ল্যাকহোলটি অন্য মহাবিশ্বে পথের (Gateway) যোগান দেবে।

ঘূর্ণায়মান বা বৈদ্যুতিক চার্জসম্পন্ন ব্ল্যাকহোলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অভিক্ষেপ (vertical) অনন্যতা প্রকৃতপক্ষে ভবিষ্যৎ অনন্যতা (future singularity)। এই অনন্যতাটি নিজের দিকে আলোর চেয়ে দ্রুতগামী সময়-সাদৃশ্য (time-like) অনন্যতায় রূপান্তরিত হয়, পরিণামে নীতিগতভাবে কোন মহাশূন্যান ব্ল্যাকহোলের ভিতরে প্রবেশ এবং সেখান থেকে আবার সম্পূর্ণ নতুন মহাবিশ্বে বাহির হতে পারবে। মহাকর্ষ বল তাকে ধ্রংস করতে পারবে না।

পদাৰ্থবিদৱা সমীকৰণের ব্যাখ্যায় যুক্তি দেখান ব্ল্যাকহোলের ভিতৰ অবিৱৰত সৃষ্টি কণাঙ্গলি ব্ল্যাকহোলের অভ্যন্তরে জমা হতে থাকবে এবং ভবিষ্যতে কোন এক মুহূর্তে স্ফুলকার হয়ে আলোর চেয়ে কম গতি সম্পন্ন স্থান-সাদৃশ্য (Space-like) ভবিষ্যত অনন্যতা গঠন করবে এবং অন্য মহাবিশ্বে যাওয়ার প্রবেশ পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে।

টিফেন হকিং -এর ধারণা মতে অন্য কোন মহাবিশ্বের পার্শ্ব স্ফীতি থেকে আমাদের শিশু মহাবিশ্বের জন্মসূচনা হতে পারে। এই তত্ত্বানুসারে অসংখ্য মহাবিশ্বের অন্তিমের সম্ভাবনা রয়েছে এবং তা আবার সীমাহীন গোলক ধার্ধার মত ঘোর্মহোল দ্বারা একাধিক জায়গায় সংযুক্ত।



ওয়ার্মহোল ও শিশু মহাবিশ্বসমূহ

ওয়ার্মহোলের সংযোগ যদি ও অলীক সময়ের (Imaginary time) জন্য, তবে শিশু মহাবিশ্বের সঙ্গে সংযুক্ত ওয়ার্মহোল অতি অন্ত বা অলীক সময়ের জন্য নাও হতে পারে। এটি আমাদের মহাবিশ্বের মত কোটি কোটি আলোক বর্ষ পর্যন্ত এলাকায় প্রসারিত হতে পারে।

আমাদের মহাবিশ্বকে ইলেকট্রন (electron) দৃষ্টিতে নিরক্ষণ করলে দেখতে পাব এক অস্বাভাবিক প্রকাণ্ড, ভয়ঙ্কর ফুটন্ট পুরু ফেনায়িত পুড়িং এর পাত্র। তত্ত্বানুসারে (theory) এই পরিবেশে চলমান ইলেকট্রন ওয়ার্মহোলের সম্মুখীন হয়ে তাতে পতিত হবে এবং অন্য মহাবিশ্বে তা নিষ্কিঞ্চ হবে। পদার্থ বিজ্ঞানের আইন অনুসারে কোন পদার্থ আমাদের মহাবিশ্ব থেকে অদৃশ্য হতে পারে না-এটা কি সেই আইন লজ্জন করে না? অবশ্যই না। একই ধরনের ইলেকট্রন অন্য পথে ফিরে এসে আমাদের মহাবিশ্বে তা ঢুকে পড়ে। প্রকৃত পক্ষে কিছুই হারিয়ে যায় না। আমাদের নিকট ঘটনাটি প্রতিস্থাপন বলে মনে হবে না বরং মনে হবে ইলেকট্রন সোজা পথে চলমান। এখানে উল্লেখ্য ওয়ার্মহোলের উপস্থিতি ইলেকট্রনের ভরের উপর প্রভাব ফেলবে। ইলেকট্রনই একমাত্র এ ধরনের মৌলিকণা নয় যা এভাবে চলাচল করে। হকিং এর ধারনা মতে সমগ্র মহাবিশ্বের সমস্ত কণার ভর এবং সমস্ত কণার মিথ্যক্রিয়া (interactions) এভাবে ওয়ার্মহোলের ভিতর বাহির চলাচল করে বলে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

সমান্তরাল মহাবিশ্বে যাত্রা

(ক) শোয়ার্জশীল্ড ব্ল্যাকহোলের মাধ্যমে সংযোগ (আইনষ্টাইন-রোজেন সেতু)

১৯১৬ সালের প্রথম দিকে আইনষ্টাইন তার সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের সমীকরনের সূত্রগুলি প্রকাশ করেন। এর এক বছরের কম সময়ের মধ্যে অন্তর্যান লুডভিগ ফ্লাম (Ludwig Flamm) বুঝতে পেরেছিলেন আইনষ্টাইনের সমীকরনের শোয়ার্জশীল্ড সমাধান প্রকৃতপক্ষে একটা ওয়ার্মহোলের বর্ণনা করে, যা স্থান-কালের দুটি সমতল এলাকা বা দু'টি মহাবিশ্বকে সংযোগ করে।

১৯৩০ সালে প্রিসটনে আইনষ্টাইন নিজে নাথান রোজেন-এর সঙ্গে কাজ করেন। তারা আবিষ্কার করেন শোয়ার্জশীল্ড সমাধান প্রকৃতপক্ষে একটা ব্ল্যাকহোলের সমতল যা স্থান-কালের দু'টি এলাকার মধ্যে 'সেতু' হিসেবে প্রকাশ করে। এই সেতুকেই 'আইনষ্টাইন-রোজেন সেতু' বলে। এরপরও বিজ্ঞানীরা মনে করেছিলেন নীতিগতভাবে অতি সংক্ষিপ্ত এই পথে মহাবিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ভ্রমণ বাস্তবে রূপায়ন সম্ভব নয়।

১৯৮৫ সালের গ্রীষ্মে ক্যালিফর্নিয়া টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর কীপ থ্রোণ এবং তার দু'জন পি.এইচ.ডি ছাত্র মাইকেল মরিস এবং উলভী ইওরতসেভার এই অবাস্তবতাকে ভঙ্গ করেন। তারা গাণিতিক সমস্যার সমাধান এবং স্থান-কালের জ্যামিতিসহ এমন একটি ওয়ার্মহোলের গঠন দেখান যা দিয়ে মানুষের পক্ষে পরিভ্রমন সম্ভব।

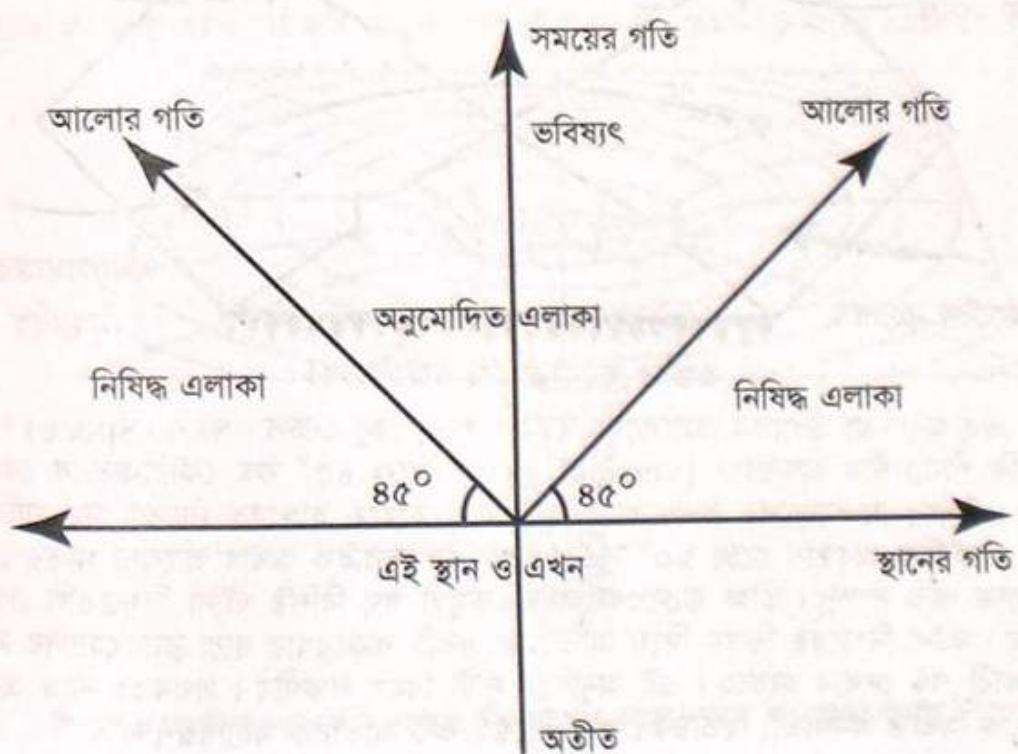
আণুবীক্ষণিক ওয়ার্মহোল (Microscopic Wormholes)

বিজ্ঞানীরা মৌলিকগাণগুলি যেমন ইলেকট্রনের গতি-প্রকৃতি থেকে প্রথম ওয়ার্মহোল সম্পর্কে ধারণা পোষণ করেন। যদি কোন একটি ইলেকট্রনের বাস্তব অস্তিত্ব কোন এক বিন্দুতে পদার্থ হিসাবে গণ্য করা হয় তবে সেই বিন্দুর চারিদিকে স্থান-কালের অবস্থান সঠিক বর্ণনার জন্য শোয়ার্জশীল মাপবিজ্ঞান অনুসারে একটি সম্পূর্ণ ক্ষুদ্র ওয়ার্মহোল (স্পষ্টতই আণুবীক্ষণিক ওয়ার্মহোল নামে পরিচিত) অন্য মহাবিশ্বের সঙ্গে সংযোগ সৃষ্টি করে।

তত্ত্ববিদরা (Theorist) ভেবে বিশ্বিত সমস্ত মৌলিকগাণগুলিই (Subatomic Particles) হতে পারে আণুবীক্ষণিক ওয়ার্মহোল। তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন বৈদ্যুতিক চার্জ সৃষ্টি হয় বলের ক্ষেত্রগুলি থেকে (Fields of Force - এখানে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র) যা সম্ভবত অন্য কোন মহাবিশ্ব থেকে ওয়ার্মহোলের সঞ্চীর্ণ পথে এসে থাকে। এই জাতীয় ধারণা আইনষ্টাইন এবং অন্যান্য আপেক্ষিকতাবাদীদের মর্মস্পর্শী হয়ে উঠে। কারণ তারা সমস্ত পদার্থের গঠনে কণিকা বিন্দুর মাধ্যমে ঘটে বলে ব্যাখ্যা করেন, যা পরিণামে স্থান-কালের বক্রতা সৃষ্টি করে। অন্য কথায় সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের সর্বকিছুর ব্যাখ্যা।

স্থান-কালের অনুচিত্র (Space-time diagram)

বিজ্ঞানীরা প্রায়ই সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের বিচিত্র দুনিয়ায় স্থান-কালের অনুচিত্র ব্যাখ্যা করতে চিত্র লেখের (graph) সাহায্য নিয়ে থাকেন। নিম্নে চিত্রটি লক্ষণীয়ঃ-



'ভবিষ্যত' এর অবস্থান অনুচ্ছেদের উপরে আর 'অতীত' নীচের অংশে স্থানে চলমান সমস্ত ভ্রমণ এলাকা হবে সময়ে অভিক্ষেপ (vertical) রেখার সঙ্গে 85° এর মধ্যে। যে কোন পথ 85° বেশী কৌণিক অবস্থান হবে আলোর চেয়ে কম দ্রুত গতি সম্পন্ন (Space like)। অনুরূপভাবে 85° নিম্ন এলাকাটি নিষিদ্ধ এলাকা।

উপরের চিত্রলেখায় (এই স্থান ও এখন) বিন্দু থেকে ভবিষ্যতের এলাকায় পাড়ি দেওয়া এবং অতীতের যে কোন স্থান থেকে তথ্য পাওয়া যেতে পারে। নিষিদ্ধ এলাকা থেকে কোন কিছু জানা বা ভ্রমণ মোটেই সম্ভব নয়।

শোয়ার্জশীল্ড ব্ল্যাকহোলের পেনরোজ অনুচ্ছেদ (Penrose Diagram of Schwarzschild Black Hole)

অব্রাফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর রোজার পেনরোজ স্থান-কালের এক বিশেষ অনুচ্ছেদ প্রকাশ করেছেন। এই অনুচ্ছেদটি ব্ল্যাকহোলের সমীকরণের সমাধানের বর্ণনা করার জন্য খুবই উপযোগী। এই অনুচ্ছেদগুলির মাধ্যমে ব্ল্যাকহোলের সঙ্গে অন্য বা সমান্তরাল মহাবিশ্বের সংযোগ অতি সহজে অনুমোদ্য।

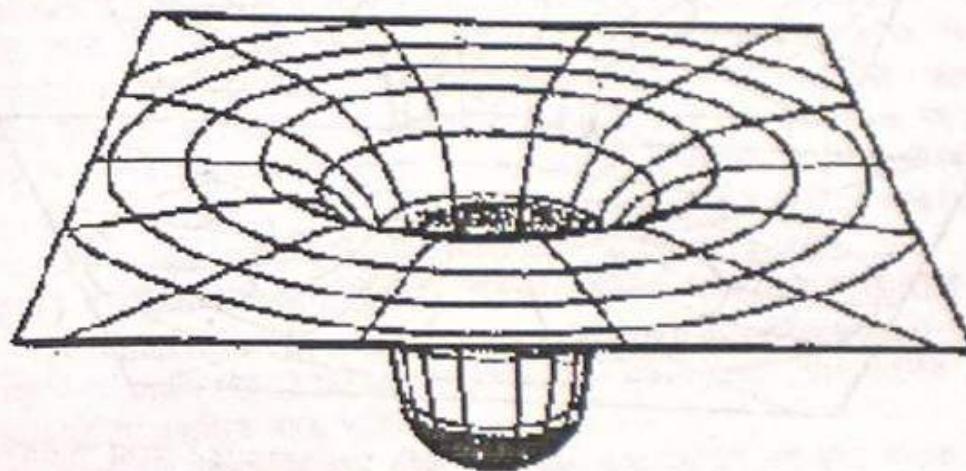
প্রথমে আমরা সাধারণ শোয়ার্জশীল্ড ব্ল্যাকহোলের অনুচ্ছেদ দেখব। একে শোয়ার্জশীল্ড ওয়ার্মহোল বা আইনষ্টাইন-রোজেন সেতু বলা হয়।



এই অনুচ্ছেদটি উপরের চিত্রলেখের মতই। তবে একটু জাতল। স্থান (Space) সমস্ত পথগুলি শীর্ষদেশীয় অক্ষরেখা (vertical axis) থেকে 85° কম কৌণিকভাবে নোয়ান থাকে। উপরে ব্ল্যাকহোলের অনন্যতা চিহ্নিত করা হয়েছে হাঙরের দাঁতের মত-সারিবদ্ধ ভাবে। কৌণিক অবস্থান হচ্ছে 90° সূতরাং এটা স্পেসলাইক অর্থাৎ আলোর গতির চেয়ে কম দ্রুত গতি সম্পন্ন। তীক্ষ্ণ বক্ররেখা দ্বারা একমুখী পথ বিশিষ্ট ঘটনা দিগন্তগুলি দেখান হয়েছে। ঘটনা দিগন্তের ভিতর দিয়ে অতিক্রান্ত একটি বক্ররেখার দ্বারা ব্ল্যাকহোলের মধ্যে ভ্রমণকারী পথ দেখান হয়েছে। এই অনুচ্ছেদে দুটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমতঃ নীচে একটা অতিরিক্ত অতীত অনন্যতা; দ্বিতীয়তঃ অন্য পার্শ্বে একটি অতিরিক্ত মহাবিশ্ব।

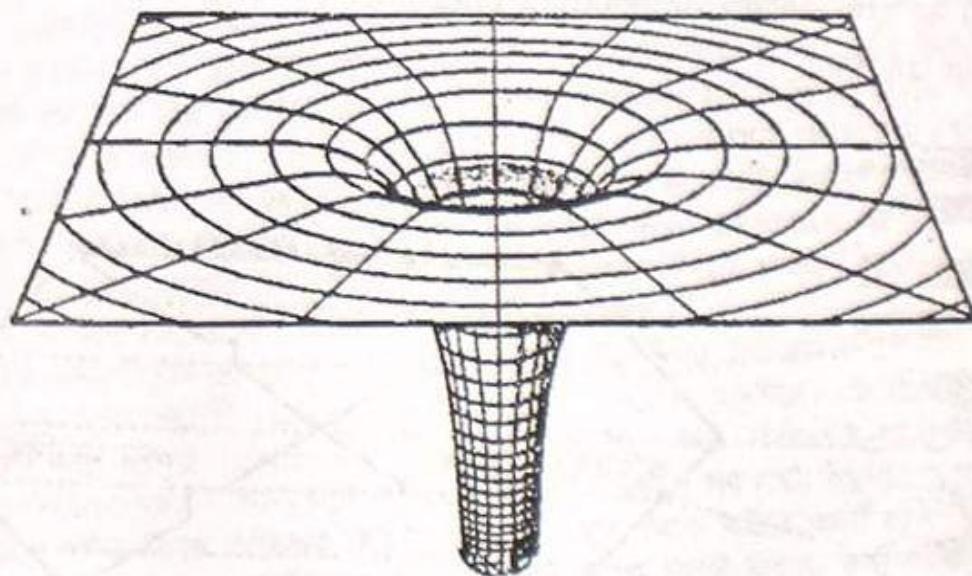
উপরের আইনষ্টাইন-রোজেন সেতুর মাধ্যমে এক মহাবিশ্ব থেকে অন্য মহাবিশ্বে পরিভ্রমণ করতে ভ্রমণকারীকে কম পক্ষে কিছু পথ আলোর চেয়ে দ্রুত গতিসম্পন্ন হতে হবে। এই ধরণের ওয়ার্মহোলের আর একটা সমস্যা হচ্ছে এটি মোটেই স্থিতিশীল নয়।

যদি কল্পনা করা যায় সূর্যের মত বৃহৎ কোন ভরের সাহায্যে হ্রান-কালে একটি বক্রতার সৃষ্টি করলে এর সংকুচিত আয়তন শোয়ার্জশীল্ড গোলকের অনুরূপ সামান্য কিছু বড়। নিম্নের চিত্রের ন্যায় (embedding diagram) অনুচিত গঠন করবে।

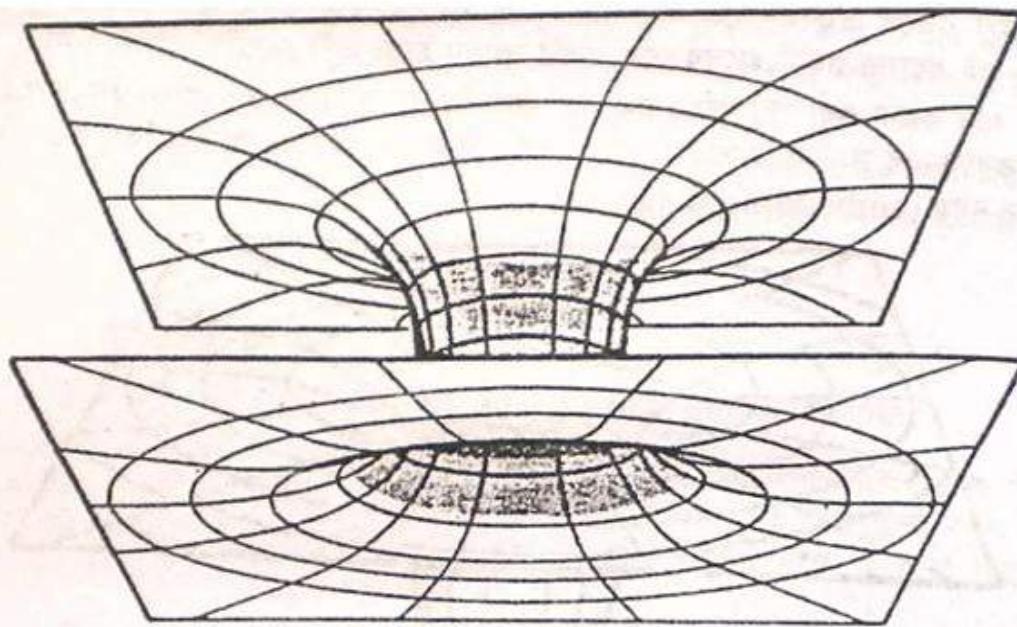


সূর্যের মত ভারী কোন ভরের হ্রান-কালে সৃষ্টি বক্রতা

শোয়ার্জশীল্ড জ্যামিতির আকর্ষণ হচ্ছে যখন কোন ভর সংকুচিত হয়ে নীচে শোয়ার্জশীল্ড ব্যাসার্দের মধ্যে থেকে গর্ত সৃষ্টি করে তা তলবিহীন হয় না। যেমন হয় নীচের চিত্রের মত।



উপরোক্তে অনুচিতের তল অন্য সমতল হ্রান-কালের এলাকার সঙ্গে সংযোগের পথকে উন্মুক্ত করে।



কিন্তু এই সুন্দর মুক্ত কঠিনালীর লোভনীয় পথটি মহাবিশ্বমূহের মধ্যে পরিভ্রমণের জন্য খোলা রাখে এক সেকেন্ডের অতি স্ফুর্দ্ধ ভগ্নাংশ সময়ের জন্য মাত্র।

আমরা যদি পেনরোজ অনুচিত থেকে কোন টুকরো অংশকে ঐক্যযুক্ত বিভিন্ন সময়ের (অনুচিত্রের নীচে অতীত, উপরে ভবিষ্যত) প্রত্যেক টুকরো স্থানের সাদৃশ্য বজায় রেখে একটি দৃঢ় স্থাপন অনুচিত (embedding diagram) অঙ্কন করি তবে আমরা নিম্নলিখিত অনুকরণ চিত্র পাব।



এখান থেকে প্রতীয়মান হয় সমতল স্থানের দু'টি বিপরীতমুখী মোচড়ান এলাকা থেকে শোয়ার্জশীল্ড কঠনালী (throat) গঠন করে। গঠিত কঠপথ একে অপরের দিকে বৃদ্ধি পেয়ে সংযুক্ত হয় এবং পূর্ণমাত্রায় উম্ভুক হয়। তারপর আবার সঙ্কুচিত হয়ে বিচ্ছিন্ন ও পৃথক হয়ে যায়। ওয়ার্মহোলের সম্পূর্ণ বিবরণ ধারাটি (evolution) ঘটে এক সেকেন্ডের অতিক্ষেত্র তগ্নাংশ সময়ের মধ্যে, ফলে আলো পর্যন্ত এক মহাবিশ্ব থেকে অন্য মহাবিশ্বে পাড়ি জমাতে পারে না। মহাকর্ষের প্রবল প্রভাব দু'মহাবিশ্বের দরজা বন্ধ করে দেয়।

আর দ্বিতীয় সমস্যাটি হচ্ছে শোয়ার্জশীল্ড ব্ল্যাকহোলের পেনরোজ অনুচিত্রের ভবিষ্যত অনন্যাত্মক চিত্রে দিগন্তের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে শায়িত থাকে। ফলে, ঘটনা দিগন্ত অতিক্রমকারী কোনকিছুর সেখানে ধ্বংসপ্রাণ হওয়া ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। সাধরণ শোয়ার্জশীল্ড ব্ল্যাকহোলের মোটেই কোন বৈদ্যুতিক চার্জ নেই এবং এটা ঘূর্ণায়মানও নয়।

বৈদ্যুতিক চার্জসম্পন্ন অথবা ঘূর্ণায়মান ব্ল্যাকহোলের অনন্যাত্মার বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত হয়ে যায়। অন্য মহাবিশ্বের প্রবেশ পথকে খোলারেখে আলোর চেয়ে কমগতিতে পরিভ্রমণকে সম্ভব করে তোলে। মহাবিশ্বে ঘূর্ণায়মান ব্ল্যাকহোলের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী।

(খ) রেইজনার-নর্ডস্ট্রোম ব্ল্যাকহোলের মাধ্যমে সংযোগ

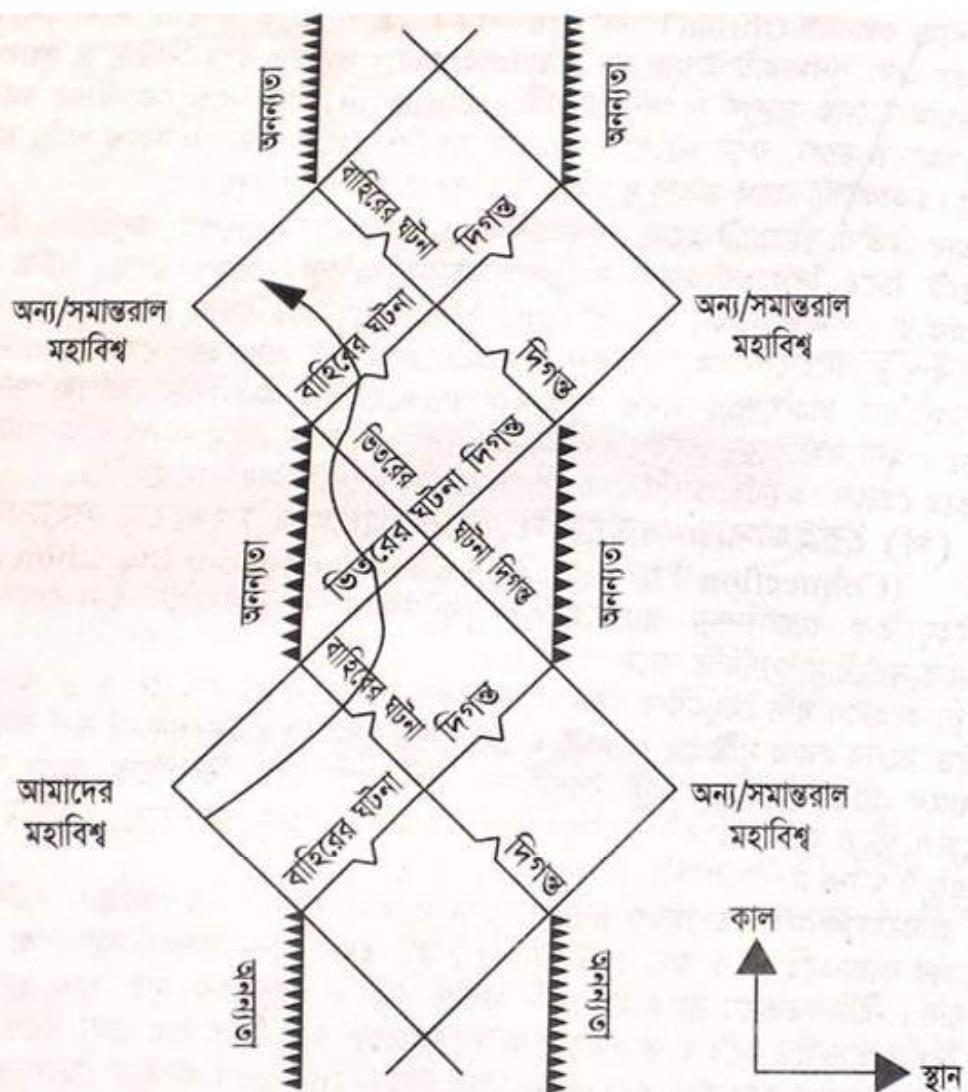
(Connection Through Reissner-Nordstrom Blackhole)

বৈদ্যুতিক চার্জসম্পন্ন ব্ল্যাকহোলের (ঘূর্ণায়মান নয়) নিকট স্থান-কালের বর্ণনা রেইজনার-নর্ডস্ট্রোম জ্যামিতি নামে পরিচিত।

ব্ল্যাকহোলে যদি বৈদ্যুতিক চার্জ প্রয়োগ করা হয় তবে মহাকর্ষ বল ছাড়া আরও একটি অতিরিক্ত বলের ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। একই ধরনের চার্জ হলে (সব ধনাত্মক বা সব ঋণাত্মক) তা প্রস্তরকে বিকর্ষণ করে। এই বৈদ্যুতিক চার্জ মহাকর্ষের বিপরীতে কাজ করে এবং ব্ল্যাকহোল স্ফীত হয়ে বিস্তার লাভ করে। পরিণামে বৈদ্যুতিক চার্জসম্পন্ন ব্ল্যাকহোলে দ্বিতীয় আর একটি ঘটনা দিগন্তের সৃষ্টি হয়।

ব্ল্যাকহোলে যদি বৈদ্যুতিক চার্জের পরিমাণ অন্ত থাকে তবে ভিতরের ঘটনা দিগন্তটি অনন্যাত্মার কাছাকাছি থাকে আর চার্জ যদি বেশী হয় তখন ঘটনা দিগন্তটি অনন্যাতা থেকে দূরে সরে যায়। নীতিগতভাবে ব্ল্যাকহোল যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ বৈদ্যুতিক চার্জ পায় তবে ভিতরের ঘটনা দিগন্ত প্রসারিত হতে হতে বাইরের ঘটনা দিগন্তের সঙ্গে মিশে যায় এবং পরবর্তীতে উভয় ঘটনা দিগন্ত অদৃশ্য হয়ে যায় এবং অনন্যাতাকে উম্ভুক (naked) অবস্থায় ফেলে যায়। যদিও বাস্তবে এ ধরণের হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। যদি কোন সাহসী নভোচারী এধরণের অনন্যাতার কাছে আসে তবে সে আকর্ষিত হবেনা এবং মহাকর্ষের ফলে ধ্বংসপ্রাণও হবেনা কারণ অনন্যাতাটি খুব দুর্বল। প্রকৃতপক্ষে রেইজনার-নর্ডস্ট্রোম অনন্যাতার দিকে ধাবমান বন্তকে বিকর্ষণ করে অর্থাৎ বিপরীত মহাকর্ষ বল (Anti-gravity) কাজ করে।

রেইজনার-নর্ডস্ট্রোম ব্ল্যাকহোলে পতিত হলে দ্বিতীয় ঘটনা দিগন্ত অতিক্রম করলে স্থান-কাল দ্বিতীয় বারের মত ভিন্নমুখী (reversal) হবে। তাই পেনরোজ অনুচিত্রে এই ব্ল্যাকহোলের অনন্যাতাকে খাড়া রেখায় (vertical pine) দেখান হয়েছে। অতি সর্তকতার সাথে এখানে নভোযান পরিচালনা করলে অনন্যাতাকে এড়িয়ে চলা সম্ভব। এখানে সব সময় আলোর চেয়ে কম গতিতে চলে ঘটনা দিগন্ত অতিক্রম করে পুনরায় ব্ল্যাকহোল থেকে বাইরে আসা যাবে। যদিও মহাকর্ষ বল সব সময় অন্য মহাবিশ্বের প্রবেশ দ্বার বন্ধ করতে চেষ্টা করবে, তথাপি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র (electric field) দরজাকে খুলে রেখে ভ্রমণকারীকে সুযোগ করে দিবে। এছাড়া ঘটনা দিগন্ত যদি খুব বড় না হয়, তবে তা অস্থায়ী। এই অস্থায়ীত্বের জন্য ব্ল্যাকহোলটি সম্পূর্ণ বাস্পীভূত হয়ে অনন্যাতাহীন চুম্বকীয় একক মেরু পরিত্যাগ করে।



উপরের স্থান-কালের নকশাটি বৈদ্যুতিক চার্জসম্পন্ন ব্র্যাকহোল কিভাবে বহু মহাবিশ্ব (বা মহাবিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলকে) একত্রে সংযোগ করে তাই দেখান হয়েছে। যেহেতু এখানে অন্যতাতি খাড়া (vertical) একজন দক্ষ নভোচারী উপযোগী নভোযানে ব্র্যাকহোলের ভিতর দিয়ে স্থান-কালের বিভিন্ন সমতল অঞ্চলে আলোর চেয়ে কম গতিতে পরিচালিত হতে পারবে।

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন অন্য মহাবিশ্বের প্রবেশ ঘটারটি শুধুমাত্র একমূল্কী রাস্তা। যাত্রা শুরু করার মহাবিশ্বে (নিজস্ব মহাবিশ্বে) আর ফিরে আসা কখনও সম্ভব নয়। চিত্রে ঘটনা দিগন্তের একমূল্কী রাস্তার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এর অর্থ হ'ল স্থান-কালের সম্পূর্ণ নতুন এলাকা। অন্য কথায় সম্পূর্ণ নতুন অন্য মহাবিশ্বে প্রবেশ ঘটবে। রেইজনার-নর্ডস্ট্রোম জ্যামিতি অসীম সংখ্যার মহাবিশ্বের জোড়ায় পরস্পর সংযুক্ত।

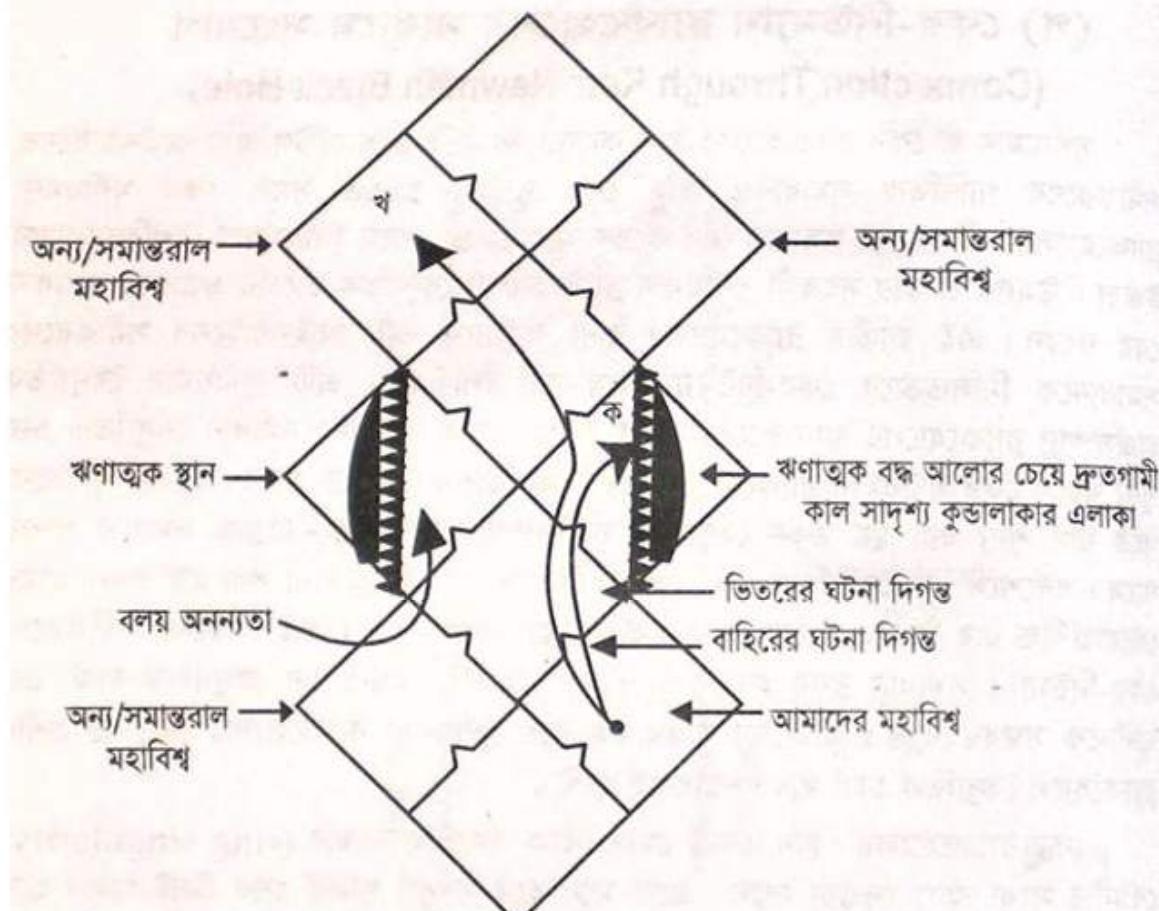
(গ) কের-নিউম্যান ব্ল্যাকহোলের মাধ্যমে সংযোগ (Connection Through Kerr-Newman Black Hole)

ঘূর্ণায়মান বা কের ব্ল্যাকহোলের স্থান-কালের জ্যামিতি বেশ জটিল এবং আইনষ্টাইনের সমীকরণের গাণিতিক সমাধানও তাই বেশ দুরহ। ১৯৬৩ সালে কের ঘূর্ণায়মান ব্ল্যাকহোলের সমীকরণের সমাধান বের করেন আর ১৯৬৫ সালে পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইজরা নিউম্যান ও তার সহকর্মী ঘূর্ণায়মান ব্ল্যাকহোলের বৈদ্যুতিক চার্জের প্রভাবের সমাধান বের করেন। এই জাতীয় ব্ল্যাকহোলের জন্য বর্তমানে তাই আইনষ্টাইনের সমীকরণের সমাধানকে মিলিতভাবে কের-নিউম্যান সমাধান বলা হয়। এটি ঘূর্ণায়মান বৈদ্যুতিক চার্জসম্পন্ন ব্ল্যাকহোলের স্থান-কালের বর্ণনা দেয়। কের-নিউম্যান সমাধান বৈদ্যুতিক চার্জ শূন্য ধরলে কের ঘূর্ণায়মান ব্ল্যাকহোলের গাণিতিক বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে। আবার ঘূর্ণিয়নের গতি যদি শূন্য ধরা হয় তখন বৈদ্যুতিক চার্জসম্পন্ন রেইজনার-নর্ডস্ট্রোম সমাধান পাওয়া যাবে। সর্বশেষে যদি বৈদ্যুতিক চার্জ এবং ঘূর্ণিয়নের গতি উভয় শূন্য ধরা হয় তখন আমরা শোয়ার্জশীল এর স্থির এবং বৈদ্যুতিক চার্জহীন ব্ল্যাকহোল পাই। আইনষ্টাইনের সমীকরণের কের-নিউম্যান সমাধান ব্ল্যাকহোলের প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ ভর বৈদ্যুতিক চার্জ এবং ঘূর্ণনকে সঙ্গবদ্ধ করে। আমাদের বাস্তব মহাবিশ্বে ঘূর্ণায়মান ব্ল্যাকহোলের চেয়ে স্থিতিশীল ব্ল্যাকহোলে বৈদ্যুতিক চার্জ থাকা সম্ভাবনাই বেশী।

কের ব্ল্যাকহোলের কোন একটি মেরু থেকে বলয় অনন্যতার (ring singularity) বেষ্টনীর মধ্যে ঝাঁপ দেওয়া সম্ভব। এতে মনে হবে সম্পূর্ণ পৃথিবী যেন উলট-পালট হয়ে গেছে। এই জাতীয় ব্ল্যাকহোলের সমীকরণ স্থান-কালের এমন একটা এলাকাকে প্রকাশ করে যেখানে বলয়ের কেন্দ্র থেকে ভিতরের দিকের দূরত্ব এবং মহাকর্ষ বলের গুণফল ঋণাত্মক। অর্থাৎ এটি স্থান কালের একটি ঋণাত্মক (Negative) স্থান। আপেক্ষিকতাবাদীরা এই স্থান মহাকর্ষ নিজের দিকে টেনে আকর্ষণ না করে বিপরীত দিকে বিকর্ষণ বা ধাক্কা দিবে বলে জানায়। বলয় এর বাইরে (বিপরীত দিকে) স্থান-কালের এই এলাকায় ব্ল্যাকহোলের মহাকর্ষ পদার্থ এবং আলো উভয়কে বিকর্ষণ করবে। অন্য কথায় এটি ইতিপূর্বে উল্লেখিত হোয়াইট হোলের মত কাজ করবে।

এখানে আর একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটবে। বলয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া নভোচারী যদি বলয়ের খুব কাছাকাছি থেকে ব্ল্যাকহোলের কেন্দ্রকে বৃত্তাকারে সঠিক কক্ষ পথে প্রদক্ষিণ করে তবে সে সময়ের পিছনে চলবে। প্রচলিত পদার্থবিদ্যার আইন অনুসারে নভোচারী যদি বলয় থেকে উল্টো

দিকে ঝাঁপিয়ে ঘূর্ণ্যমান ব্ল্যাকহোল থেকে বেরিয়ে আসে তবু সে স্থান-কালের যে এলাকা থেকে ঝাঁপ দিয়েছিল সেখানে ফিরে আসা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। কেবল ব্ল্যাকহোল শুধুমাত্র একমুখী পথে যাত্রাকে অনুমোদন করে এবং এটি সম্পূর্ণ নতুন অন্য মহাবিশ্বে নিয়ে যাবে। এমনকি বাস্তবপক্ষে যাত্রা শুরু লাগ্নেও পূর্বের স্থানের সঙ্গে কোন রকম সংবাদ আদান-প্রদান করার মত কোন অবস্থায় থাকবে না।



কেবল ব্ল্যাকহোলের প্রেরণাজ অনুচ্ছে

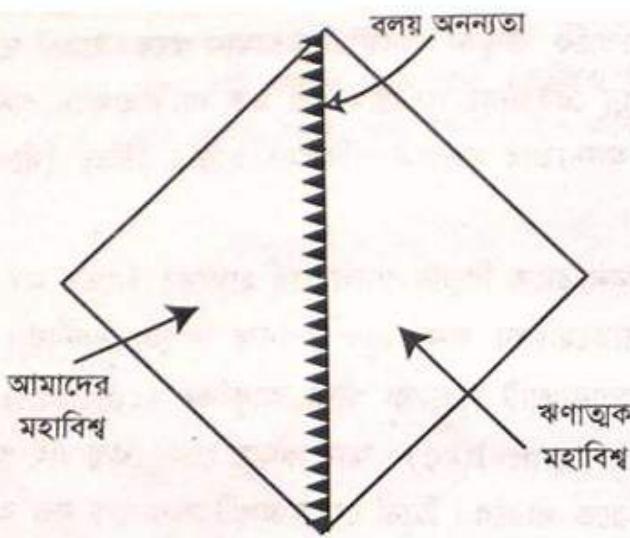
উপরের ঘূর্ণ্যমান ব্ল্যাকহোলের স্থান-কালের নকশাটি প্রায় বৈদ্যুতিক চার্জ সম্পন্ন ব্ল্যাকহোলের মতই, তবে এখানে অতিরিক্ত আর একটি অংশের সংযোজন রয়েছে বিপরীত মহাকর্ষে মহাবিশ্বসমূহ। পথ 'ক' বলয় অনন্যতা পথ 'খ' অন্য মহাবিশ্ব।

আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি একটি বৈদ্যুতিক চার্জ সম্পন্ন ব্ল্যাকহোল যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ শক্তিশালী চার্জ ধারণ করে তখন ভিতরের ঘটনা দিগন্ত বাহিরের দিকে বর্ধিত হয়ে বাহিরের ঘটনা দিগন্তে সঙ্গে মিলিত হয়ে উভয় দিগন্ত অদৃশ্য হয়ে যায় এবং অনন্যতাকে উন্মুক্ত অবস্থায় ফেলে রাখে।

অনুরূপভাবে অতিদ্রুত ঘূর্ণায়মান কের ব্ল্যাকহোল উভয় ঘটনা দিগন্তকে প্রবলবেগে নিষ্কণ্ঠ করে অনন্যতাকে উন্মুক্ত অবস্থায় দৃশ্যমান হয়ে উঠে। তবে এই অনন্যতাটি বৈদ্যুতিক চার্জ সম্পন্ন রেইজনার-নর্ডস্ট্রোম এর মত নয়। এখানে অনন্যতাটি একটি বলয় গঠন করবে। এই অনন্যতার মাধ্যমে পরিভ্রমণ ছাড়াও ভিতর থেকে অনেক দূর বিভিন্ন মহাবিশ্ব দেখা সম্ভব।

চিত্রে বলয় অনন্যতাকে কিছুটা গোলাকার হাঙ্গরের দাঁতের মত চিহ্নিত করা হয়েছে, কারণ এটি স্থির ব্ল্যাকহোলের অনন্যতার তুলনায় কিছুটা সহনীয়। চিত্র থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে অনন্যতাটি লম্বা বা খাড়া আকৃতির (vertical) অর্থাৎ আলোর চেয়ে দ্রুতগামী কাল সাদৃশ্য (time-like)। অন্য কথায় কোন কিছু এই পথে আলোর চেয়ে কম গতিতে অতিক্রম করতে পারবে। চিত্রে যে অঞ্চলটি ঝণাত্মক বন্ধ আলোর চেয়ে দ্রুতগামী (Negative closed time like loop) তা অনন্যতার ভিতর অঞ্চল। এটি এমন একটি অঞ্চল যেখানে অতীত এবং ভবিষ্যতের স্বাভাবিক প্রতিবন্ধকতা অর্থহীন হয়ে যায়। একজন ভ্রমণকারী এই অঞ্চলে তার জীবনের যে কোন অতীত ভবিষ্যত পরিদর্শন করতে পারবে। এই বলয়ের ভিতর দিয়ে যদি ঝণাত্মক অঞ্চলে পরিভ্রমণ করা যায় তবে তা পূর্বের মত একমুখী পথ হবে না, যা যাত্রারাস্ত স্থানে ফিরে যেতে বাধা দিবে। এক্ষেত্রে পেনরোজের অনুচিত খুবই সাধারণ।

অপর পৃষ্ঠায় চিত্রে ঝণাত্মক মহাবিশ্ব এবং ধনাত্মক মহাবিশ্বকে বিচ্ছিন্নকারী বলয় অনন্যতার মাধ্যমে যে কোন কিছু এক মহাবিশ্ব থেকে অন্য মহাবিশ্বে যাতায়াত করতে পারে। নীতিগতভাবে যে কোন মহাবিশ্বের স্থান কালের যে কোন বিন্দু থেকে এই অনন্যতার দিকে অগ্রসর হওয়া যাবে। অনন্যতার কক্ষপথে সঠিক উপযোগী পথে পরিচালিত হলে যাত্রাঞ্চল্যের বিন্দুতে আবার ফিরে আসা সম্ভব। শুধু তাই নয় যাত্রাঞ্চল্যের সময়ের আগেই ফিরে আসা সম্ভব। মহাবিশ্বের কোথাও যদি এরকম কের ব্ল্যাকহোলের উন্মুক্ত অনন্যতা থেকে থাকে তবে নীতিগতভাবে যে কেউ এই মুহূর্তে যেখানে বসে আছে সেখান থেকে মহাবিশ্বের যে কোন স্থানে বা যে কোন সময়ে অতীত, বর্তমান অথবা ভবিষ্যতে ইচ্ছা মত পরিভ্রমণ করতে পারে। শর্ত শুধু একটি তা হল সঠিক গমন পথটি অনুসরণ করতে হবে। এই ভ্রমণের জন্য আলোর চেয়ে দ্রুতগতি সম্পন্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই।



উপরের চিত্রে অতিদ্রুত ঘূর্ণিয়মান ব্ল্যাকহোল ঘটনা দিগন্তকে সবেগে নিষ্কেপ করে অন্বৃত উম্ভুত অনন্যতা ঝণাত্মক মহাবিশ্ব ও স্বাভাবিক (আমাদের) মহাবিশ্বকে সংযুক্ত করে।

কের ব্ল্যাকহোলের একটি নয়, দু'টি একমুখী পথের ঘটনা দিগন্ত একজন ভ্রমণকারীকে নিজস্ব মহাবিশ্বে ফিরে আসতে বাধা দিবে। তবে অনুচিতে দেখা যায় ভ্রমণকারী অনেক মহাবিশ্ব ভ্রমণের জন্য মনোনয়ন করতে পারে। যদিও চিত্রে চারটি (৩ সমান্তরাল ও ১টি আমাদের মহাবিশ্ব) মহাবিশ্ব দেখান হয়েছে, তথাপি অতীত ও ভবিষ্যত উভয় দিকে অসীম সংখ্যার মহাবিশ্বের সংযোজন দেখান সম্ভব। চিত্রে কের ব্ল্যাকহোলে ভ্রমণকারীর দু'টি পথ উদাহরণ স্বরূপ দেখান হয়েছে। পথ 'ক' ভ্রমণকারীকে বলয় অনন্যতায় এবং পথ 'খ' অন্য মহাবিশ্বে নিয়ে যাবে।

জ্যোতির্পদার্থবিদরা যদিও মনে করেন কৌণিক গতি অতিমাত্রায় বৃক্ষি পেয়ে ঘূর্ণিয়মান ব্ল্যাকহোল উম্ভুত অনন্যতা সৃষ্টি করা খুবই জটিল। তবুও আইনষ্টাইনের সমীকরণের উম্ভুত অনন্যতার বাস্তবে সৃষ্টির সম্ভাবনাকে একেবারে নাকচ করেনা।

আইনষ্টাইনের সমীকরণের বিভিন্ন গাণিতিক সমাধানে প্রাণ্ড হতবুদ্ধিকর (puzzling) বিপরীত মহাকর্ষ, ঝণাত্মক সময় অঞ্চল ইত্যাদি যদি আমরা বিবেচনায় নাও আনি তবু পদার্থবিদরা নিশ্চিত যে, আমাদের মহাবিশ্বের ঘূর্ণিয়মান বিশাল আকৃতির ব্ল্যাকহোলের পরাস্থানের মাধ্যমে (Hyperspace) স্থানকালের (Space-time) অন্য অঞ্চল অন্য মহাবিশ্বের সঙ্গে সংযোগ করতে পারে। অন্য মহাবিশ্বকে আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করব? সত্যিই কি স্থানকালের কিছু অসীম অঞ্চল স্তরের উপর স্তর চিরকালের জন্য বিস্তৃত। এটার অর্থ কি হ'তে পারে? সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের সমীকরণের বর্ণনা প্রসঙ্গে বাস্তবে সমানভাবে প্রযোজ্য স্থান-কালের এই বিভিন্ন অঞ্চল প্রকৃতপক্ষে আমাদের মহাবিশ্বেরই একটা অংশ। ঘূর্ণিয়মান ব্ল্যাকহোল পরাস্থানে ইতিপূর্বে বর্ণিত আইনষ্টাইন-রোজেন সেতু থেকে গঠিত ওয়ার্মহোলের মাধ্যমে সংযোগ রক্ষা করে। একটি ঘূর্ণিয়মান ব্ল্যাকহোল আমাদের মহাবিশ্বকে অন্য মহাবিশ্বের সঙ্গে গুরুমাত্র একবার নয় বার বার সংযোগ করে ভিন্ন ভিন্ন স্থান ভিন্ন ভিন্ন সময়ের প্রবেশদ্বারা উপস্থাপন করতে পারে।

১৯৭০ সালের দিকে বিভিন্ন গাণিতিক হিসাবে প্রাণ ফলাফল থেকে পদাৰ্থবিদৱা মত প্রকাশ কৱেন বাস্তব মহাবিশ্বের ব্ল্যাকহোলের অনন্যতা এবং ঘটনাদিগন্তের সঙ্গে জড়িত প্রবল শক্তিশালী মহাকর্ষ বল উপরে বর্ণিত এই পরাস্থানের সংযোগকে কোন কিছু অতিক্রম কৱাৰ পূৰ্বেই বন্ধ হয়ে যাবে। এখান থেকে মনে হয় ওয়ার্মহোলের অস্তিত্ব শুধুমাত্র ফাঁকা মহাবিশ্বেই সম্ভব। তাই বিজ্ঞানীৱা বৰ্তমানে আৱণ ও নিশ্চিত বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীতে বর্ণিত পরাস্থানের এই সংক্ষিপ্ত সংযোগকে ব্যবহাৰ কৱে অন্য মহাবিশ্বে বা সময়েৰ পথে যাত্ৰা মোটেই সম্ভব নয়।

গ্রে-হোল (Grey Holes)

ব্ল্যাকহোল এবং হোয়াইট হোলেৰ সঙ্গে আপেক্ষিকতাবাদীৱা এখন আবাৰ গ্রে-হোলেৰ কথা বলছেন। ব্ল্যাকহোল হ'ল এমন একটি বস্তু যেখানে পদাৰ্থ ও বিকিৰণ পতিত হয় এবং কোন কিছুই এখান থেকে মুক্ত হতে পাৰে না। হোয়াইটহোল হ'ল এমন একটি বস্তু যেখানে থেকে পদাৰ্থ ও বিকিৰণ সব সময় মুক্ত হয়। কোন কিছুই এখানে ভিতৱে অবস্থান কৱে না। আৱ গ্রে-হোল হ'ল এমন একটি বস্তু যেখান থেকে পদাৰ্থ ও বিকিৰণ মুক্ত হয়ে ঘটনা দিগন্তেৰ উপৱে কিছু দূৰত্ব উঠে আবাৰ ফিৱে আসে। এখানে শ্বেত রাখা প্ৰয়োজন, প্ৰতিটি ক্ষেত্ৰেই অৰ্থাৎ ব্ল্যাক/হোয়াইট/গ্রে-হোল বৰ্ণিত হয়ে থাকে দু'টি অনন্যতাৰ মাধ্যমে একটি অতীত এবং অপৱেচন ভবিষ্যত।

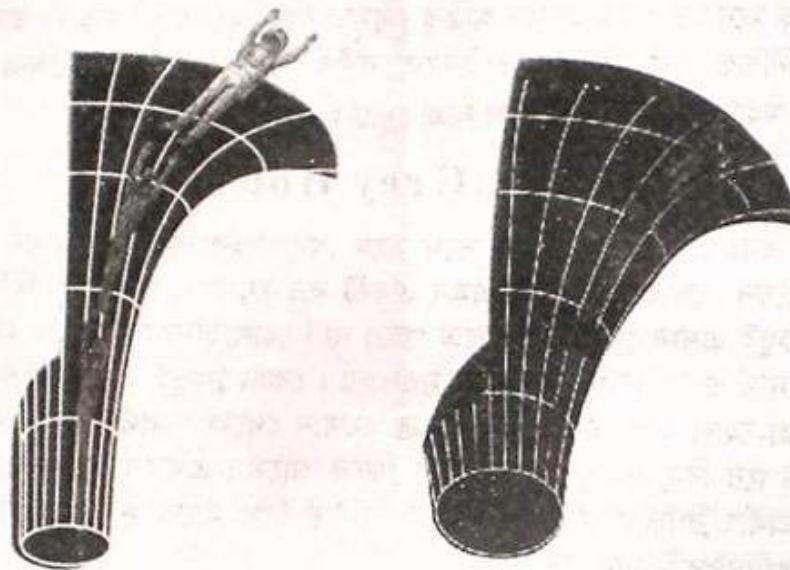
ব্ল্যাকহোলে পতন (Falling in Blackholes)

আমৱা এখন একজন নভোচাৰী যদি ব্ল্যাকহোলে অবতৱণ কৱে তবে কি ঘটবে তা অবলোকন কৱে। আইনস্টাইনেৰ সাধাৱণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বানুসাৱে নভোযানে আপেক্ষাকাৰী নভোচাৰীৰ চেয়ে ব্ল্যাকহোলে অবতৱণকাৰী নভোচাৰীৰ অভিজ্ঞতা সম্পূৰ্ণ ভিন্ন ধৰনেৰ হবে। এৱ প্ৰধান কাৰণ হচ্ছে ব্ল্যাকহোলেৰ নিকট স্থান-কাল বিশ্যেকৰণ কলা-কালুন মেনে চলে।

মনে কৱা যাক, নভোযানটি কোন আপেক্ষাকৃত নিৱাপদ দূৰত্বে অৰ্থাৎ শেষ স্থায়ী কক্ষপথে রাখাৰ পৱ নভোযান থেকে তাৰ সঙ্গী প্ৰথম পদক্ষেপ থেকে ব্ল্যাকহোলে অবতৱণকাৰীকে লক্ষ্য কৱবে। ব্ল্যাকহোলে স্থান ও কাল (Space-time) উভয় প্ৰভাৱিত হয়। নভোযান থেকে ব্ল্যাকহোলে অবতৱণকাৰী নভোচাৰীৰ হাতঘড়ি এবং তা থেকে বিকিৰিত আলো এবং আশেপাশেৰ স্থানেৰ বিকৃতি পৰ্যবেক্ষণ কৱবে। শুৱ থেকে যতক্ষণ পৰ্যন্ত ব্ল্যাকহোলে মহাকৰ্ষ বল সৱাসিৱ অবতৱণকাৰীকে নীচেৰ দিকে টানতে শুৱ না কৱবে, ততক্ষণ পৰ্যন্ত সব কিছুই স্বাভাৱিক মনে হবে। তাৱপৱ নভোচাৰীকে সহসা গহৰে (হোলে) ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখবে।

আমাদেৱ সূৰ্যৰ চেয়ে অন্ধ কিছুগুণ বড় তাৱকাৰ ধৰণ প্ৰাণিৰ ফলে সৃষ্টি ব্ল্যাকহোলে পতন বেশী মাত্ৰায় বিপদজনক। এধৰনেৰ ব্ল্যাকহোল অতিমাত্ৰায় স্থানকে ভাঁজ কৱে বিকৃতি ঘটায়; যাৱ ফলে পতনশীল নভোচাৰী ব্ল্যাকহোলেৰ আপেক্ষাকৃত খাড়া ঢাল (Slope) বিশিষ্ট মহাকৰ্ষ কুপেৰ মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে। মহাকৰ্ষ বল নভোচাৰীৰ পায়েৱ দিকে যাথায় চেয়ে অনেক বেশী শক্তিসহ নীচেৰ দিকে টানবে। গহৰেৰ খুব নিকটে নভোচাৰী টানা লম্বা এবং পাতলা সেমাই এৱ মত হতে থাকবে। পৱিশেষে তাকে ছিন্ন-ভিন্ন কৱে ফেলবে।

আবার অতি বৃহৎ আকারের ব্ল্যাকহোলের মহাকর্ষ কুপ অপেক্ষাকৃত কম খাড়া চাল বিশিষ্ট। যদি কোন নভোচারী এক কোটি সৌরভরের কোন ব্ল্যাকহোলে অবতরণ করে তবে সে খুব অল্প মাত্রায় মহাকর্ষ বল বা জোয়ার শক্তি (Tidal force) অনুভব করবে। এই শক্তি অবতরণকারীকে মেরে ফেলার মত যথেষ্ট নয়।



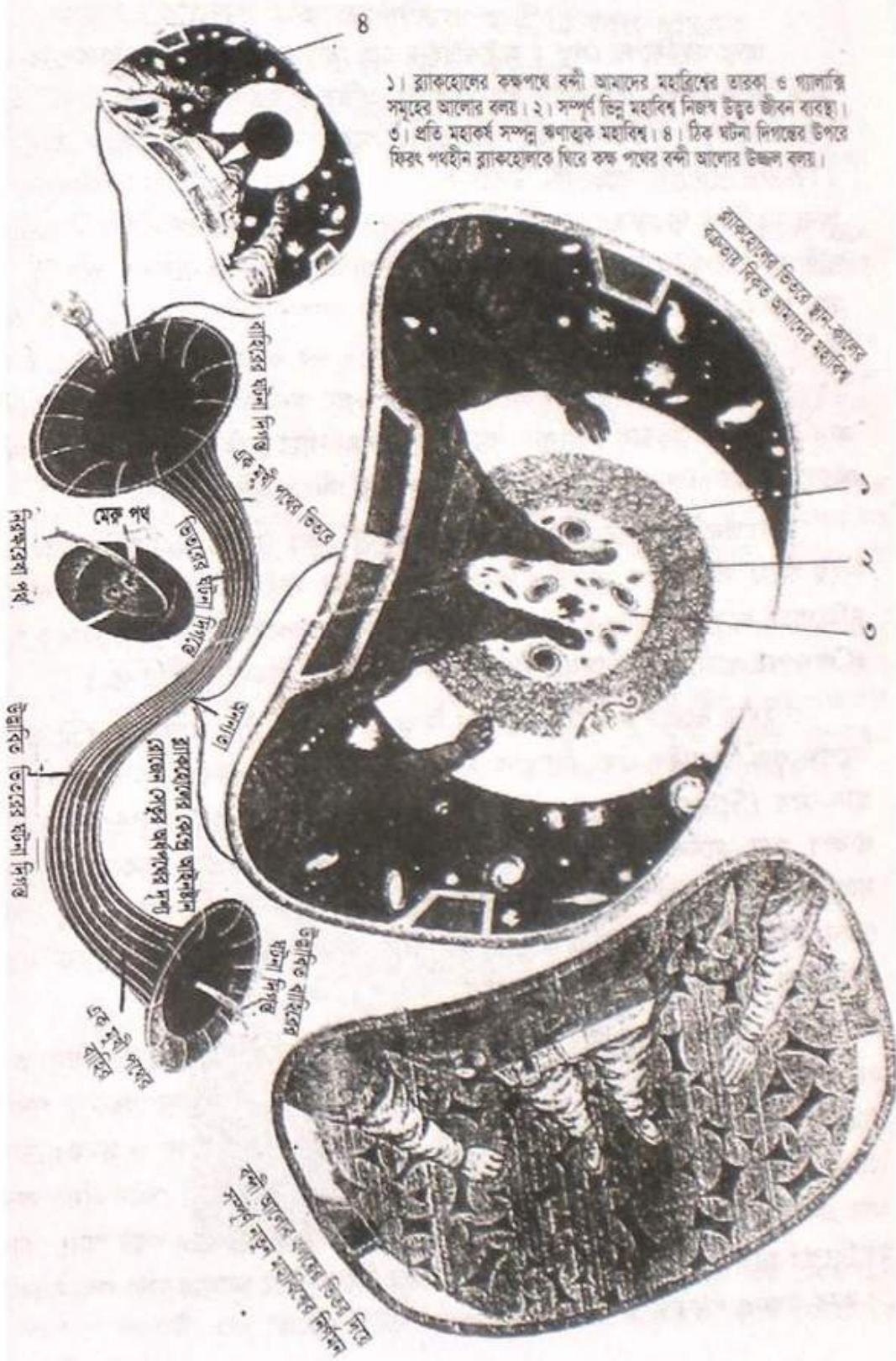
নভোচারীর ব্ল্যাকহোলের দিকে যাত্রা শুরু করার প্রথম কয়েক মিনিট অস্বাভাবিক কোন কিছুই ঘটবে না। নভোযান থেকে টেলিফোপের সাহায্যে অবতরণকারী নভোচারীর হাত ঘড়ির সময় লক্ষ্য করলে নভোযানে রাখিত ঘড়ির মত একই সময় দেখাবে। অবতরণকারীর চারপাশের স্থান অবিকৃত অবস্থায় এবং তার থেকে বিকিরিত আলোও অতি স্বাভাবিক দেখাবে।

কিছু সময় পর নভোচারী ক্রমশঃ যতই ঘটনা দিগন্তের দিকে অগ্রসর হবে মহাকর্ষ বল বা জোয়ার বলের প্রভাব তার উপর ততই বৃদ্ধি পেতে থাকবে। পায়ের দিক মাথার দিকের চেয়ে রেশি টানবে। যদিও পতনশীল নভোচারীর কাছে সময় মনে হবে একই ভাবে অতিবাহিত হচ্ছে, কিন্তু নভোযানে অপেক্ষারত সঙ্গীর মনে হবে অবতরণকারীর ঘড়ি ধীরে চলতে শুরু করেছে। এখন ব্ল্যাকহোলের শক্তিশালী মহাকর্ষ বল স্থান ও কালের বিকৃতি ঘটাচ্ছে। তার সঙ্গীটি আরও লক্ষ্য করবে সে ক্রমশঃ লোহিত বর্ণ ধারণ করছে এবং আলো ও মহাকর্ষ বলের সঙ্গে সংগ্রাম করে শক্তি হারাচ্ছে।

ঘটনা দিগন্তের খুব কাছাকাছি পতনশীল দীর্ঘয়িত নভোচারী প্রায়ই অদৃশ্য আলো ও মহাকর্ষ বলের সঙ্গে সংগ্রাম করায় সমস্ত শক্তি হারিয়ে লোহিত বর্ণ এবং প্রায় স্থিমিত হয়ে যাবে। দুর্ভাগ্যক্রমে তার সঙ্গী আর কখনও তাকে ব্ল্যাকহোলে পতন অবলোকন করতে পারবে না। কারণ সময় ধীর হতে আরও ধীরে চলতে থাকবে এবং একেবারে ব্ল্যাকহোলের সন্নিকটে মনে হবে সে বুঝি কখনও ঘটনা দিগন্ত অতিক্রম করতে পারবে না, অসীম সময়ের জন্য বাইরে ঝুলতে থাকবে।

সাহসী পতনশীল নভোচারী আগের চেয়ে অনেক দ্রুত এখন ব্ল্যাকহোলের দিকে ধাবিত হতে থাকবে। কিন্তু সে জানেনা যে তার সঙ্গী তাকে ঘটনা দিগন্তের নিকট চিরকালের জন্য ছির হয়ে থাকতে দেখছে। তার মনে এখন অনেক প্রয়োজনীয় চিন্তা। সামনেই কোথাও বিশাল ব্ল্যাকহোল ফাঁদ পেতে আছে। এখান থেকে কোন মুক্তি নেই। যেইমাত্র সে ঘটনা দিগন্তের অন্ধকারাচ্ছন্ন শূন্য স্থান অতিক্রম করবে হঠাৎ তার সামনে হতবুদ্ধিকর সুবিন্যস্ত, অপূর্ব দৃশ্য ফুটে উঠবে। ব্ল্যাকহোলের মধ্যে স্থান-কাল অতিমাত্রায় বক্রতা লাভ করায় অন্য মহাবিশ্ব দৃষ্টিগোচর হবে। খুব সর্তকভাবে পথ চলতে পারলে সে অন্য মহাবিশ্বে পৌছাতে পারবে। নভোচারীটি দেখবে ব্ল্যাকহোলটি কক্ষ পথের বন্দি আলোর এক অতি উজ্জ্বল বলয় দ্বারা বৃত্তাকারে পরিবেষ্টিত হয়ে আছে।

ମହା ଅଲୟାତସ୍ତ୍ରେ ଡ୍ରାକହୋଲ



অন্য মহাবিশ্বের সেতুঃ আইনষ্টাইন এবং তাঁর সহকর্মী নাথান রোজেনের ধারণা মতে ব্ল্যাকহোলের কঠনালীর মুখ অবিকল প্রতিরূপ কঠনালীর অপর একটি মুখকে (ওয়ার্মহোল) উচ্চুক্ত করে অন্য মহাবিশ্বের সঙ্গে সংযুক্ত করতে পারে। তত্ত্বানুসারে (Theoretical) নভোচারী উপরোক্ত আইনষ্টাইন- রোজেনের সেতু ব্যবহার করে অন্য মহাবিশ্বে যাওয়ার পথ করে নিতে পারবে। কিন্তু সম্মুখের পথ ভীষণ বিপদজনক। যদি ব্ল্যাকহোলটি খুব একটা বড় না হয় তবে সে প্রবল জোয়ার বলের তরঙ্গে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে। আবার ব্ল্যাকহোলটি যদি ঘূর্ণায়মান না হয় তবে কেন্দ্রে উপস্থিত অসীম ঘনত্বের অনন্যতাকে আঘাত করা ছাড়া আর কোন পথ থাকবে না। সেখানে তার মৃত্যু অবধারিত। অন্য দিকে ঘূর্ণায়মান ব্ল্যাকহোলের বলয় অনন্যতা কেবলমাত্র নভোচারীকে অন্য মহাবিশ্বে যাওয়ার নিরাপদ পথ করে দিতে পারে। কিন্তু তবু তাকে অনন্যতা থেকে নিজেকে রক্ষা করে খুব সর্তকতার সঙ্গে পথ চলতে হবে।

পরিবর্তনশীল দৃশ্য এবং শুধুমাত্র একমুখী পথঃ নভোচারী ব্ল্যাকহোলের মধ্য দিয়ে চলার সময় প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনশীল দৃশ্যের সম্মুখীন হবে। অনেক মহাবিশ্ব দৃষ্টিগোচর হবে। এ সমস্ত মহাবিশ্বের ভিন্ন প্রকৃতির তারকাপুঁজি এবং অন্য অনেক মাত্রা (Dimensions) এবং অকল্পনীয় অন্য ধরনের জীবন ব্যবস্থা থাকতে পারে।

যেইমাত্র নভোচারী ভিতরের ঘটনা দিগন্তে- পৌঁছাবে, সেখানে স্থান (Space) অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক এবং নিজেকে সহজভাবে পরিচালনা করতে পারবে। এখানে স্থান-কাল (Space-time) অতিমাত্রায় বক্র বা মোচড়ান (Warped) অবস্থায় থাকার জন্য অনেক মহাবিশ্বের আলো দেখতে পাবে। কিন্তু সে কেবলমাত্র নিজস্ব মহাবিশ্বের সঙ্গে আইনষ্টাইন-রোজেন সেতু দ্বারা সংযুক্ত মহাবিশ্বেই যেতে পারবে। অন্য কোন মহাবিশ্বে নয়। এখান থেকে ফেরার আর কোন পথ নেই। সে শুধুমাত্র নতুন মহাবিশ্বের সামনের দিকেই যেতে থাকবে।

নতুন মহাবিশ্বে প্রবেশঃ নভোচারী আমাদের থেকে সম্পূর্ণ নতুন ভিন্ন এক মহাবিশ্বে বিলীন হয়ে যাবে। এই মহাবিশ্বে বিস্ময়কর অস্তুত বিভিন্ন ধরনের পদার্থ থাকতে পারে। আমাদের মহাবিশ্বের মত চার মাত্রার (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ ও সময়) চেয়ে অনেক বেশী মাত্রা (dimensions) থাকতে পারে। যদি নভোচারী কোন সময় অন্য আর একটি ঘূর্ণায়মান ব্ল্যাকহোলের সঙ্কান পায়, তখন সে তা ব্যবহার করে অন্য কোন মহাবিশ্বের সঙ্গে সংযোগ করতে পারে। আমাদের বিশ্বে ফিরে আসার মত গথ সম্ভবত সে আর কখনও পাবে না।

ବ୍ୟାକହୋଲେର ମହାଜାଗତିକ ମରୀଚିକାର ପ୍ରଭାବ (Cosmic Mirages)

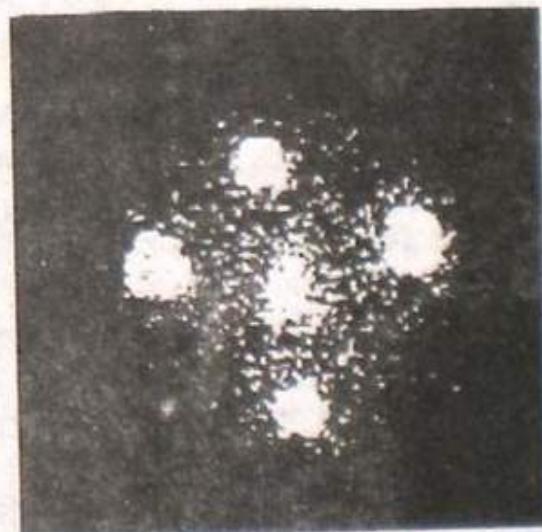
ଅତି ସାମ୍ପ୍ରତି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀରା ଆବିଷ୍କାର କରେଛେନ ବ୍ୟାକହୋଲେର ପ୍ରବଳ ମହାକର୍ଷେର ଜନ୍ୟ ମହାଜାଗତିକ ମରୀଚିକାର ପ୍ରଭାବ ରଯେଛେ । ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍‌ଓ ଏ ସମ୍ପର୍କେ ଭବିଷ୍ୟାଂ ବାଣୀ କରେଛିଲେନ ।

ଶକ୍ତିଶାଲୀ ମହାକର୍ଷ ପ୍ରଭାବିତ କୋନ ଏଲାକାର ନିକଟ ଦୁର ଥେକେ ସଥନ କୋନ ଆଲୋ ଏସେ ପଡ଼େ ତଥନ ତା ବକ୍ରତା ବା ବିକୃତ ଆକାର ଧାରଣ କରବେ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରତ ବିଭିନ୍ନ ଧରନେର ଆଲୋର ପ୍ରଭାବ ଘଟାବେ ।

ଆଇନଷ୍ଟାଇନେର ଆପେକ୍ଷିକତାବାଦ ତତ୍ତ୍ଵସାରେ ଆଲୋ ସଥନ କୋନ ଅତି ବୃହତ ବନ୍ତ୍ର ସେମନ ସୂର୍ୟର ନିକଟ ଦିଯେ ଅତିକ୍ରମ କରେ ତଥନ ତା ବକ୍ର ହୁଏ ଯାଏ । ଦୂରେର କୋନ ତାରକାର ରଶ୍ମୀକେନ୍ଦ୍ର ଥେକେ ବିକିର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋ ବ୍ୟାକହୋଲେର ପ୍ରବଳ ମହାକର୍ଷେର ଫଳେ ଭିନ୍ନ ପଥଗାମୀ ହୁଏ, ଯାର ଜନ୍ୟ ତାରକାଟିକେ ସାଭାବିକେର ଚେଯେ ବେଶୀ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ମନେ ହୁଏ ।

ବ୍ୟାକହୋଲ ନିଜେଇ ଏକଟି ଛୋଟ ଦୂରବିନେର କାଁଚ ବା ଲେସେର ମତ କାଜ କରେ । ଅପର ଦିକେ ଗ୍ୟାଲାକ୍ରିର ନିକଟବତୀ ବିକୃତ ବା ମୋଚଡ଼ାନ କୋନ ସ୍ଥାନ ବୃହତ ଦୂରବିନେର କାଁଚ ବା ଲେନସେର ମତ କାଜ କରେ, ପରିଣାମେ ଦୂରେର କୋନ ବନ୍ତ୍ର ହତେ ଆଲୋକ ଚାରିଦିକେ ଏମନଭାବେ ଛଢିଯେ ଦେଯ ଯା ଏକଟି ବନ୍ତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତ ମନେ ହବେ ଅନେକ ବନ୍ତ୍ର ।

ଯଦି କେହ ଏକଟି ଦୂରବତୀ ତାରକା ଏବଂ ମହାଜଗ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକରେ ମାଝଖାନେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ ତଥନ ବ୍ୟାକହୋଲ ଲେସେର ମତ କାଜ କରବେ । କୋନ ତାରକା ଥେକେ ବିଜ୍ଞୁରିତ ଆଲୋକ ରଶ୍ମୀ ବ୍ୟାକହୋଲେର ନିକଟ ପୌଛାଲେ ତା ପ୍ରବଳ ମହାକର୍ଷେର ପ୍ରଭାବେ ବକ୍ରତା ପ୍ରାଣ୍ତ ହବେ । ଏଇ ବକ୍ରତାଟି ମରୀଚିକାର (mirages) ସୃଷ୍ଟି କରେ । ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ମନେ କରବେ ସେ ଦୁଟି ତାରକା ଦେଖଛେ । ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ସେ ଏମନ ଏକଟା କିଛୁ ଦେଖଛେ ଯା ସେଥାନେ ନେଇ ଏବଂ ଯା ଆଛେ ତା ଦେଖଛେ ନା ।



ଚାରଶତ ଆଲୋକବର୍ଷ ଦୂରେର ଏକ ଗ୍ୟାଲାକ୍ରି ଆଟ୍ଷତ କୋଟି ଆଲୋକ ବର୍ଷ ଦୂରେର ଏକ କୋଯାସାରେର ଆଲୋକେ ଭିନ୍ନ ପଥଗାମୀ ଏବଂ ବିଜ୍ଞେଦ ଘଟିଯେ ଗ୍ୟାଲାକ୍ରିର କେନ୍ଦ୍ରେର ଚାରିଦିକେ ଚାରାଟି କୋଯାସାରେର ପ୍ରତିବିଷ ସୃଷ୍ଟି କରେଛେ ।

ব্ল্যাকহোল নিজে খুবই সমতল এবং তা দেখা যায় না। পুঁজিত চাকতিবিহীন কোন ব্ল্যাকহোলের চারিদিকের স্থান বেশ কৌতুহলপ্রদ। সেখানে অনেক তারকার অনেক প্রতিবিম্ব দেখা যাবে। ব্ল্যাকহোলের পিছনে যদি কোন গ্যালাক্সি থাকে তবে তা ব্ল্যাকহোলের চারিদিকে বলয় (Ring) আকৃতিতে দেখা যাবে। এই বলয়কে সাধারণত আইনষ্টাইন বলয় (Einstein's Ring) বলা হয়। এটিও ব্ল্যাকহোলের মহাকর্ষের প্রভাব।

ব্ল্যাকহোলের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য

কয়েক বছর পূর্বেও ব্ল্যাকহোল সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল এখান থেকে কোন কিছুই মুক্ত হতে পারে না, বর্তমানে কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে প্রাণ্ত তথ্য এবং বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় ব্ল্যাকহোল থেকে আলো, তাপ, শক্তি, মহাকর্ষ, মহাজাগতিক রশ্মি ইত্যাদি তরঙ্গের আকারে বিকিরণ ঘটায়। এই বিকিরণ সমগ্র মহাবিশ্বের গ্রহ, নক্ষত্র, জীবন ব্যবস্থাকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। এ বিষয়ে বিজ্ঞানীদের জ্ঞান এখন পর্যন্ত সীমিত। তবে ইদানিং এর উপর যথেষ্ট গবেষণামূলক কাজ হচ্ছে। ব্ল্যাকহোল থেকে তরঙ্গের আকারে আলো তাপ ও অন্যান্য শক্তি বিকিরণ কিভাবে ঘটে তা আলোচনার পূর্বে তরঙ্গ বিশেষ করে আলো তরঙ্গ কি এবিষয়ে জানার চেষ্টা করব।

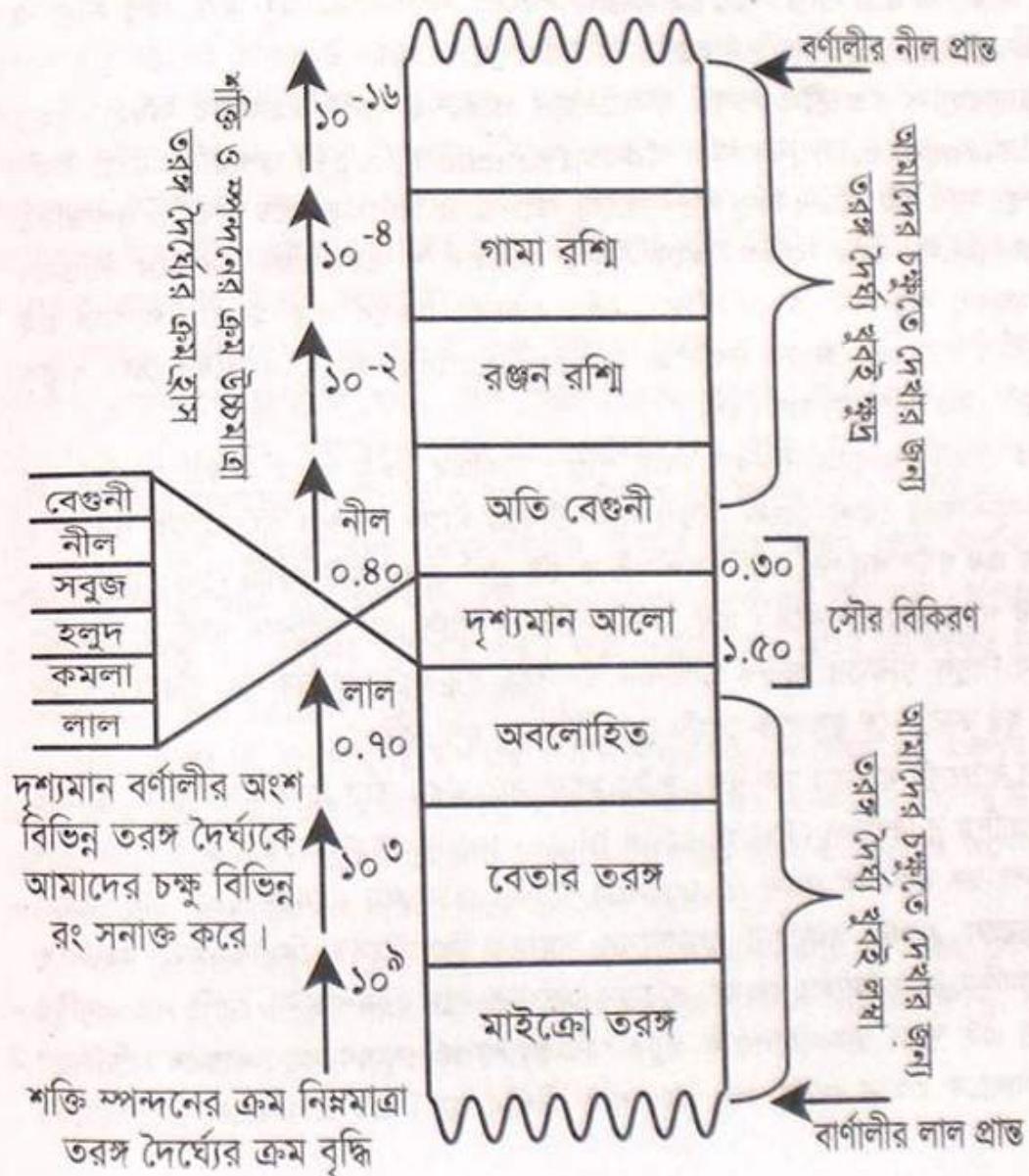
আলো তরঙ্গ (Light Waves)

আমরা যখন কোন কিছু দেখার কথা বলি এর প্রকৃত অর্থ হল সেই বস্তু থেকে নির্গত আলো তরঙ্গ আমাদের চক্ষুতে এসে পড়ে। এই আলোর তরঙ্গমালা কোন বস্তু থেকে যতক্ষণ আমাদের চক্ষুতে এসে না পৌঁছাবে ততক্ষণ আমরা তা কোন ক্রমেই দেখতে পাব না। তেমনিভাবে রঙীন কোন বস্তুকে দেখতে সেই বস্তু থেকে সঠিক বা নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের (wave length) আলো নির্গত হয়ে আমাদের চোখে তা সংবেদন সৃষ্টি করতে হবে।

আলো এবং তাপ উভয়ই বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় (electromagnetic-radiation) বিকিরণের ভিন্নরূপ বহিঃ প্রকাশমাত্র। এই বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বিকিরণ এবং মহাকর্ষ তরঙ্গ পুরুরে পাথর ছুড়লে পানিতে আলোড়নের ফলে সৃষ্টি জল তরঙ্গের ন্যায় স্থান-কালে (Space-time) প্রসার লাভ করে। পুরুরে ছুড়ে মারা পাথর দ্বারা সৃষ্টি আলোড়ন বা টেউ এর মধ্যে যেমন বিভিন্ন উচ্চতা এবং দূরত্ব পাশাপাশি দু'টি টেউয়ের মধ্যে বিভিন্ন হতে পারে। ঠিক তেমনি বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বিকিরণের তরঙ্গের দৈর্ঘ্যও বিভিন্ন হয়ে থাকে। এই তরঙ্গমালার দৈর্ঘ্য এক সেন্টিমিটারের ট্রিলিয়ন (10^{12}) ভাগের এক ভাগ থেকে কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। এই সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মধ্যে সমস্ত দৈর্ঘ্যের তরঙ্গমালা অবাধ স্বচ্ছন্দ বর্ণালী (spectrum) সর্বত্র বিরাজমান। বিজ্ঞানীরা কাজের সুবিধের জন্য এই বিশাল তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ব্যবধানের বর্ণালীকে কয়েকটি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ভিত্তিতে ভাগ করেছেন এবং বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন নাম দিয়েছেন। সর্বনিম্ন তরঙ্গমালার বিকিরণকে গামা রশ্মি বলে। এই জাতীয় রশ্মি অকল্পনীয় পরিমাণ শক্তি ধারণ করে। আর সবচেয়ে দীর্ঘায়িত তরঙ্গমালা যা কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে তাকে বেতার তরঙ্গ (Radio-waves) বলে। এ জাতীয় তরঙ্গ খুব অন্ত শক্তি ধারণ করে। বেতার তরঙ্গ জীব জগতের জন্য তেমন ক্ষতিকারক নয় আবার গামা রশ্মি চরম সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে সবচেয়ে শুন্দর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের চেয়ে সবচেয়ে বৃহৎ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 10^{-22} গুণ বড়। এটি একটি অকল্পনীয় বিশাল সংখ্যা। এই বিশাল দীর্ঘ বর্ণালীর মধ্যে আমাদের সূর্য যে বিদ্যুৎ-চূম্বকীয় বিকিরণ ঘটে তার শতকরা সতৰ ভাগ বিকিরণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হচ্ছে 0.3 থেকে 1.50 মাইক্রোমি। এটি বর্ণালীর অতি শুন্দরতম একটি অংশ। পৃথিবীতে প্রাণীজগৎ টিকে থাকার জন্য এটিই প্রয়োজন।

আমাদের চক্ষু বিভিন্ন আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিভিন্ন রঙের বিশ্লেষণ করে। নিম্নের চিত্রটি মনযোগ সহকারে লক্ষ্য করলে আলো তরঙ্গ মালার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি সহজে বোধগম্য হবে। চিত্রে দীর্ঘতর আলো তরঙ্গমালা উপরের বর্ণালীর লালপ্রান্ত নির্দেশ করে। যদি মহাকাশে কোন বস্তু দ্রুত গতিতে আমাদের নিকট থেকে দূরে সরে যায় তবে এই বস্তু থেকে নির্গত আলো তরঙ্গ ডপলার অভিক্রিয়ায় (Doppler effect) লোহিত বিচ্ছিন্নতা (red shift) আর বিপরীত ক্ষেত্রে অর্ধেৎ আমাদের দিকে আগমণরত বস্তু থেকে নির্গত আলো তরঙ্গ নীল বিচ্ছিন্নতা (blue shift)।



ব্ল্যাকহোল অকল্পনীয় শক্তির উৎস এবং উচ্চ শক্তির গামা-রশ্মি বিকিরণ

বেশ কিছু ব্ল্যাকহোল নক্ষত্র থেকে সৃষ্টি হয়নি। বিভিন্ন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা গবেষণার পর ধারণা করেন বিপুল পরিমাণ আন্তর্নক্ষত্রীয় (Intersteller) গ্যাস একত্রে জমা হয়ে কোয়াসার বা গ্যালক্সির কেন্দ্রীয় বৃহৎ আকারের ব্ল্যাকহোলে পতন ঘটে। কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাস কেন্দ্রকীয় সংযোজন (Nuclear fusion) প্রক্রিয়ায় যে পরিমাণ শক্তি (Energy) মুক্ত করে, ব্ল্যাকহোলে দ্রুত পতনশীল ঠিক একই পরিমাণ গ্যাস তার চেয়ে একশত গুণ বেশী শক্তি মুক্ত করে। তদানুসারে মহাকর্ষ বলের প্রভাবে কোটি কোটি সৌর ভরের আন্ত নক্ষত্রীয় গ্যাস বৃহৎ ব্ল্যাকহোলে পতনের ফলে কোয়াসার এবং কিছু গ্যালক্সি সংকূলতায় (Galactic) পদ্ধতি অকল্পনীয় শক্তি উৎপাদনের প্রধান উৎস।

ব্ল্যাকহোলে পতনশীল পদার্থ ঘটনাদিগতে প্রবেশের পূর্বেই মহাকর্ষীয় অবস্থান হেতু শক্তি (Potential energy) গতি শক্তিতে (Kinetic energy) রূপান্তরিত হয়ে ভীষণ গতিসম্পন্ন হয়। এই শক্তির কিছু অংশ আলো, তাপ এবং বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। ব্ল্যাকহোলের মেরু অঞ্চল থেকে নির্গত বেগমান পদার্থের জেট সবচেয়ে দীপ্তিমান অংশ। সম্ভবত শক্তিশালী আবর্তনশীল চুম্বকীয় ক্ষেত্রের প্রভাবে প্রায় আলোর গতিতে এই জেট নিষ্কিণ্ড হয়। এই জেটের উজ্জ্঳লতা (Luminosities) আমাদের সূর্যের চেয়ে চালিশ লক্ষ কোটি (৪০ ট্রিলিয়ন) গুণ বেশী।

এই জেটের মাধ্যমে একবার গ্যাস পুঁজিত চাক্তির কেন্দ্র থেকে নির্গত হওয়ার পর পুনরায় নতুন করে কেন্দ্র থেকে আরও গ্যাস টানতে থাকে। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটির পুনরাবৃত্তি ঘটে প্রতি অর্ধ ঘন্টা পর পর। প্রতি অর্ধ ঘন্টায় এই জেট এক কোটি কোটি (১০০ ট্রিলিয়ন) টন ভরের গ্যাস নিষ্কেপ করে। এই বিশাল পরিমাণ গ্যাস প্রায় আলোর গতিতে নিষ্কেপ করতে যে বিপুল পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন তা সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের বার্ষিক যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয় তার চেয়ে ছয় লক্ষ কোটি (ছয় ট্রিলিয়ন) গুণ বেশি।

বিগ ব্যাংগের মাধ্যমে মহাবিশ্ব সৃষ্টির সূচনা লগ্নে চরম তাপ এবং ঘনত্বের ফলে অতি ক্ষুদ্রকায় আদিম ব্ল্যাকহোল (Primordial black hole) এর সৃষ্টি হয়। এ ধরণের ক্ষুদ্র ব্ল্যাকহোলের ভর হয়ত বা গ্রহানু (asteroid) বা তার চেয়ে কম (যেমন 10^{12} কিলোগ্রাম) কিন্তু আয়তনে একটা পরমাণুর থ্রোটেনের সমান। বিজ্ঞানীদের হিসাব মত মহাবিশ্বে বর্তমানে আদিম ব্ল্যাকহোলের সংখ্যা প্রতিঘণ্ট আলোক বর্ষে তিনশতটির বেশী নয়। সৃষ্টির সূচনা লগ্নে এই ক্ষুদ্র ব্ল্যাকহোলগুলি প্রচুর পরিমাণ পদার্থ শোষণ করে থাকবে। বিকিরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এখান থেকে ভর এবং শক্তি বিলীন হয়। এই প্রক্রিয়াকে ব্ল্যাকহোলের

বাল্পীয়করণ বা হকিং রেডিয়েশন বলে। উপ-পারমাণবিক (Subatomic)কণ যেমন প্রটোন এবং প্রতি প্রটোন (anti-proton) ক্ষুদ্রে ব্ল্যাকহোলের নিকট সৃষ্টি হয়ে থাকে। যদি এই প্রটোন এবং প্রতি প্রটোন মহাকর্ষ বলের আওতায় না পড়ে তবে পারম্পরিক সংঘর্ষে ধ্বনি প্রাণ হয়ে শক্তি উৎপাদন করে। এই শক্তির প্রভাবে আদিম ব্ল্যাকহোল থেকে শক্তির নিষ্কাশন হয়। এই পদ্ধতি যত অধিক মাত্রায় পুনরাবৃত্তি ঘটায় ব্ল্যাকহোলটি ততই ক্ষুদ্র হতে থাকে অন্য দিকে বিকিরনের শক্তি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরিশেষে এটি তার সমস্ত ভর (mass) হারিয়ে অস্তিত্বের শেষ মুহূর্তে একশত কোটি (এক বিলিয়ন) মেগাটন হাইড্রোজেন বোমার সমান শক্তি মুক্ত করবে।

উচ্চ শক্তির গামা রশ্মি বিকিরণ

প্রতিকণা (anti-particles) হচ্ছে কণার ঠিক বিপরীত ধর্মী। যেমন ঝণাত্মক চার্জ সম্পন্ন ইলেকট্রনের প্রতিকণা হচ্ছে ধনাত্মক চার্জ সম্পন্ন পজিট্রন (positron)। পজিট্রন এবং ইলেক্ট্রনের সংঘর্ষ ঘটলে পরম্পরাকে ধ্বনি করে ফেলে বিপুল শক্তির গামা রশ্মি বিকিরণ ঘটায়। ১৯৯০ সালে কম্পটন (compton) পর্যবেক্ষক দল ব্যাপক হারে গামা বিকিরনের অনুসন্ধান করেন। তাদের ধারণায় উচ্চ শক্তির কণাগুলির (সর্বাধিক সাধারণ প্রটোন ও ইলেক্ট্রন) মধ্যে সংঘর্ষের ফলে সৃষ্টি গামা-রশ্মি বিকিরণকারী পজিট্রন অধিক মাত্রায় ব্ল্যাকহোলের নিকটে উৎপন্ন হয়।

পৃথিবীর মাটি থেকে মহাশূন্যের গামা বিকিরণ নির্ণয় সম্ভব নয়, কারণ এই বিকিরণ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে শোষিত হয়। তবে পরোক্ষভাবে রাতের আকাশে আলোর ঝলক (flashes of light) পর্যবেক্ষণ করে তা অনুসন্ধান করা সম্ভব। যখন উচ্চ শক্তির গামা রশ্মি আমাদের বায়ুমণ্ডলের পরমাণুতে আঘাত করে তখন ইলেক্ট্রন ও পজিট্রনের জোড়া সৃষ্টি হয়। এগুলি আবার অন্য পরমাণুগুলিকে আঘাত করে আরও প্রচুর ইলেক্ট্রন ও পজিট্রনের জোড়া গঠন করে ইলেক্ট্রন বৃষ্টি (electron shower) সৃষ্টি করে। ফলশ্রুতিতে রাতের আকাশে এক ধরনের আলোর ঝলক দৃষ্টি গোচর হয়। এটিই সেরিনকভ বিকিরণ (Cerenkov Radiation) নামে অভিহিত।

গামা-রশ্মির বিক্ষেপণ খুবই ক্ষণস্থায়ী। এটা সাধারণত এক সেকেন্ডের একশত থেকে এক হাজার ভাগের একভাগ মাত্র। বিভিন্ন গামা রশ্মির বিকিরণ কেবলমাত্র আলোর উজ্জ্বলতা দ্বারাই পৃথক করা যায়। আদিম ব্ল্যাকহোল থেকে বিকিরিত গামা রশ্মি আরও অনেক বেশী ক্ষণস্থায়ী-এক সেকেন্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র।

গামা বিকিরণ বায়ুতে বেশি কিছু মিটার এবং মানব দেহ কোষে বেশ কিছু সেন্টিমিটার পর্যন্ত ভেদ করতে পারে। গামা বিকিরণ সম্পর্কে অনেক তথ্য আজও অজানা, তবে এ বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা এবং অনুসন্ধান চলছে।

মহাকর্ষ তরঙ্গ (Gravity waves)

আইনষ্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে ভবিষ্যতবাণী করা হয়েছিল বিভিন্ন গতিশীল পদার্থের মহাকর্ষতরঙ্গ স্থান-কালের বক্রতাকে প্রভাবিত করে। বৃহৎ আকৃতির বেগমান বস্তুসমূহ বিশেষ করে যুগল তারকা প্রণালীতে (binary star system) মহাকর্ষ তরঙ্গের আকারে বিকিরণ প্রক্রিয়ায় প্রচন্ড (potential) মহাকর্ষ শক্তি হারায়। যদি আমরা কোন পুরুরে একটা পাথর ছুড়ে মারি তবে পতনশীল কেন্দ্র থেকে বৃত্তাকারে চারিদিকে উচু-নীচু মৃদু চেউয়ের আকারে সমস্ত পুরুরব্যাপী তা ছড়িয়ে পড়ে। মহাকর্ষ তরঙ্গ ও ঠিক একইভাবে স্থান-কালের বক্রতায় পুরুরের মত তা চারিদিকে ছড়ায়ে পড়ে। ধ্রংসপ্রাণ তারকার চারিদিকে এই মহাকর্ষ তরঙ্গ গোলক আকারে বিস্তৃতি লাভ করে ঝণাত্মক ও ধনাত্মক স্থান-কালের বক্রতায় স্পন্দন সৃষ্টি করে। প্রতিটি চেউ বাইরের দিকে প্রায় আলোর গতিতে চলে এবং পদার্থের মধ্যে দিয়ে চলার সময় তা পরিবর্তিত হয় না। ফলে, স্থানের (space) বিশাল এলাকায় অপরিবর্তিত অবস্থায় যে কোন সক্ষেতকে বহন করতে পারে।

বর্তমানে মহাকর্ষ তরঙ্গ নিরঃপণ এবং পরিমাপের জন্য ব্যাপক গবেষণা চলছে। এই মহাকর্ষ তরঙ্গের মাধ্যমে ব্ল্যাকহোল, সুপারনোভা, নিউট্রন তারকা ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য পাওয়া সম্ভব হবে। এ ছাড়া মহাজাগতিক দূরত্ত আমাদের মহাবিশ্বের সূচনা এবং শেষ পরিণতি সম্পর্কেও জানা সম্ভব হবে।

ব্ল্যাকহোলের তাপমাত্রা

১৯৭৪ সালের পূর্বে বিজ্ঞানীদের ধরণা ছিল ব্ল্যাকহোল থেকে কোন কিছুই বিকিরণ ঘটে না। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত কেবলমাত্র ব্ল্যাকহোলেরই চরম ও পরম তাপমাত্রা রয়েছে। ব্ল্যাকহোলে শক্তি (energy) থেকে পদার্থ কণা (particles) সৃষ্টি করতে পারে এবং তা মহাশূন্যে (space) নিক্ষেপ করে। এই প্রক্রিয়াকে হকিং প্রণালী (Hawking Process) বলে।

প্রিস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্ল্যাকহোলের জনক নামে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী জন হাইলের পিএইচডি এর ছাত্র জ্যাকব বিকেন ষ্টাইন সর্বপ্রথম হিসাব করে দেখান তিন সৌরভর সম্পন্ন সবচেয়ে ছোট ব্ল্যাকহোলের তাপমাত্রা এক ডিগ্রীর দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ চরম শূন্য তাপমাত্রার (-২৭৩°C) উপরে। এই তাপমাত্রায় সব অনু পরমাণুর উষ্ণতার গতি (Thermal motion) স্তুক হয়ে যায়। ব্ল্যাকহোলের আকৃতি যদি একশত কোটি গুণ বড়

হয় তবে তার তাপমাত্রাও একশত কোটি গুণ ঠাণ্ডা হবে। (তবে অবশ্যই তা চরম শূন্যতায় নয়।) এর অর্থ হ'ল কোনভাবে ব্ল্যাকহোল থেকে এই তাপশক্তি নিষ্কাশিত হয়। বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত পৃথিবীতে যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সৃষ্টি করতে পেরেছেন ব্ল্যাকহোলের নিম্ন-তাপমাত্রা তার চেয়ে অনেক অনেক গুণ নিম্ন-মাত্রার। ব্ল্যাকহোলের এই তাপমাত্রা ঘটনা দিগন্তের আয়তনের উপর নির্ভর করে।

এই চরম শীতলতা সত্ত্বেও ব্ল্যাকহোলের চারিদিকে চরম উত্তপ্তি পদার্থ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতে পারে। ব্ল্যাকহোলের মহাকর্ষ কুপ বিভিন্ন ধরণের পদার্থ ও তারকাকে প্রবল বেগে ঢানতে থাকে। এ সময় পদার্থগুলি প্রায় আলোর গতির কাছাকাছি চালিত হওয়ায় একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটে। পরিণামে কোটি কোটি ডিগ্রীতে উত্তপ্ত হয়ে উঠে। ব্ল্যাকহোলের নিকটবর্তী কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান গ্যাস বেশী দ্রুত গতিতে আবর্তিত হতে থাকে। ব্ল্যাকহোলের দ্রুত বেগে ঘূর্ণীর আকারে পতনশীল পদার্থ অকল্পনীয় উত্তাপ সৃষ্টি হওয়ায় বিভিন্ন রঙের আলো নির্গত করে। আলোর এই বিভিন্ন রং বিভিন্ন তাপমাত্রার সঙ্গে সম্পর্কিত। পূর্বে বর্ণিত বিভিন্ন রঙের পুঁজিত চাকতির কেন্দ্রে নীলাভ অঞ্চলটিতে সবচেয়ে উত্তপ্ত পদার্থের অবস্থান এবং ব্ল্যাকহোলের সবচেয়ে নিকটবর্তী। এখান থেকে অতি বেগুনী (Ultraviolet) এবং রঞ্জন-রশ্মি নির্গত হয়। পুঁজিত চাকতির কেন্দ্র থেকে দূরবর্তী অঞ্চলে লালাভ রং অঞ্চলটি অপেক্ষাকৃত কম উত্তপ্ত।

ষিফেন হকিং এর গাণিতিক হিসাব অনুসারে মহাবিশ্ব সৃষ্টির প্রাক্কালে প্রোটন আকৃতির ক্ষুদ্র ব্ল্যাকহোলের তাপমাত্রা প্রায় বার হাজার কোটি ডিগ্রী (১২০ বিলিয়ন) এবং তা প্রচল হারে তাপশক্তির বিকিরণ ঘটায়।

মহাজাগতিক রশ্মি (Cosmic Rays)

মহাজাগতিক রশ্মি হ'ল পৃথিবীর বায়ু মণ্ডলে আঘাতকারী প্রচন্ড শক্তি সঞ্চালিত কণা। ১৯১২ সালে ভিট্টের হেস নামে একজন বিজ্ঞানী সর্ব প্রথম মহাশূন্যের কোন অঙ্গাত স্থান থেকে এ ধরণের রশ্মির বিকিরণ ঘটে বলে জানান। সাধারণ স্বল্প শক্তিসম্পন্ন (Low energy particles) মহাজাগতিক রশ্মিগুলি যেমন নিউট্রিনোস (Neutrinos), ইলেক্ট্রন (Electron), মাউন (Moun) ইত্যাদি উপপারমাণবিক কণার আকারে আসে। আর উচ্চ শক্তিসম্পন্ন (high energy) প্রটোন ও ইলেক্ট্রন এবং অনেক সময় ভারী পদার্থের (হিলিয়াম) নিউক্লিয় (Nuclei) পদার্থ কণার আকারে আলোর গতিতে চলমান। এছাড়া সর্বোচ্চ শক্তি সম্পন্ন মহাজাগতিক রশ্মি (Highest Energetic Cosmic Ray) গামা রশ্মি এর আলোক কণা (Photon) ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

উপরে উল্লেখিত মহাজাগতিক রশ্মিগুলি মহাবিশ্বে আলোর গতিতে সর্বত্র প্রতিনিয়ত ছুটে চল্ছে। উচ্চ শক্তিসম্পন্ন মহাজাগতিক রশ্মি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আঘাত হানার ফলে অপেক্ষাকৃত কম শক্তির আনুষঙ্গিক(Secondary) মৌলকণার বর্ষণ সৃষ্টি করে। এগুলি পৃথিবীর ভূমিতে অবলোকন করা যায়। উচ্চ কম শক্তিসম্পন্ন পদার্থ কণার সমষ্টি (যেমন নিউট্রিনোস, ইলেক্ট্রন এবং মাউন) আমাদের সমস্ত শরীরের ভিতর দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে গড়ে প্রায় দশ হাজার কোটি পরিমাণ অতিক্রম করে চলে। একইভাবে আমাদের চারপাশের সবকিছুর ভিতর দিয়ে প্রতিনিয়ত কোনরূপ মিথস্ক্রিয়া না ঘটিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

এই মহাজাগতিক রশ্মি মহাবিশ্বের অন্য যে কোন কিছুর চেয়ে অনেক বেশী শক্তি (Energy) বহন করে। মোটমুটি ভাবে প্রতি সেকেন্ডে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে কৃপে পাথর ছোড়ার মত একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন পদার্থ কণা প্রবেশ করে। মহাবিশ্বের কোন স্থানে এমন কোন বল (forces) আছে যা পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী বেগবর্ধক যন্ত্র (accelerator) যে পরিমাণ শক্তি (energy) তৈরী করতে পারে, তার চেয়ে কেবলমাত্র একটি প্রটোনকে দশ কোটিশুণ বেশী শক্তি প্রদান করে থাকে।

বিভিন্ন ধরনের মহাজাগতিক রশ্মিগুলির মধ্যে শক্তি ধারণ ক্ষমতার ব্যাপক ব্যবধান রয়েছে। সবচেয়ে দূর্বলতম শক্তি একশত কোটি ইলেক্ট্রন ভোল্ট (1 GeV) আর এ পর্যন্ত পাওয়া সর্বোচ্চ শক্তিশালী মহাজাগতিক রশ্মির শক্তি প্রায় 10^{20} ইলেক্ট্রন ভোল্ট অর্থাৎ দশ লক্ষ কোটি কোটি ইলেক্ট্রন ভোল্ট (100 billion GeV)। এ পর্যন্ত পৃথিবীতে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির যন্ত্রে সর্বোচ্চ শক্তিশালী মৌলকণার শক্তি হচ্ছে দশ হাজার কোটি ইলেক্ট্রন ভোল্ট (100 GeV)।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে মহাজাগতিক রশ্মির পতনের প্রবাহ শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ত্রাস পায়। 1 GeV শক্তির মৌলকণা পতনের হার যেখানে প্রতি সেকেন্ডে প্রতি বর্গমিটারে প্রায় দশ হাজারটি অন্য দিকে 1000 GeV শক্তির পতনের হার প্রতি সেকেন্ডে প্রতি বর্গমিটারে মাত্র একটি মৌলকণা। আবার সবচেয়ে শক্তিশালী মহাজাগতিক রশ্মির (10^{20} ev) পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে পতনের হার মাত্র প্রতি বর্গকিলোমিটারে একটি।

মহাজাগতিক রশ্মি বিকিরণের উৎস স্থল ঝ্যাকহোল

দীর্ঘদিন ধারণ জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের নিকট মহাজাগতিক রশ্মি উৎপত্তির উৎস সম্পর্কে সঠিক কোন ধারণা ছিলনা। ২০০২ সালে The National Aeronautics and Space Administration (NASA) এবং প্রিস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকবৃন্দ চারটি উপবৃত্তাকার (elliptical) গ্যালাক্সির উচ্চ শক্তির মহাজাগতিক রশ্মি উৎপত্তির সঙ্গে সম্পর্কিত বলে চিহ্নিত করেছেন। গবেষকবৃন্দ মনে করেন গ্যালাক্সির কেন্দ্রে অতি বৃহৎ আকারের ঝ্যাকহোলের অস্থাভাবিক বিশ্যায়কর উজ্জ্বল পশ্চাদপসরণের কোয়াসার থেকে তা নিষ্ক্রিয় হয়।

পরবর্তীতে গবেষকবৃন্দ বেশ কিছু উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সি পর্যবেক্ষণ করেন। তাদের সিদ্ধান্ত মতে এই জাতীয় গ্যালাক্সির কেন্দ্রে কমপক্ষে দশ কোটি সৌরভারের একটি করে ঘূর্ণয়মান ঝ্যাকহোল আছে। এগুলি বিশাল ব্যাটারীর মত ক্ষুলিদের আকারে চতুর্দিকে প্রায় আলোর গতিতে মৌলকণ সবেগে নিষ্কেপ করে। সক্রিয় কোয়াসার থেকে পুরাদণ্ডভাবে বিকিরণ প্রক্রিয়ায় মহাজাগতিক রশ্মি নিষ্কেপ করে তার শক্তির অধিকাংশ নিঃশেষ করে ফেলে।

এছাড়া বিগ-ব্যাংগের মাধ্যমে মহাবিশ্ব সৃষ্টির সূচনা লগ্নে আদিম ক্ষুদ্র ঝ্যাকহোল জীবনের অন্তিম কালে প্রচন্ড বিক্ষেপণের ফলে গামারশ্মির মাধ্যমেও মহাজাগতিক রশ্মির বিকিরণ ঘটায়। আবার বিগ-ব্যাংগের মাধ্যমে মহাবিশ্ব সৃষ্টি প্রাক্কালে পরমাণু গঠনের পূর্বে অসংখ্য নিউট্রিনোস (Neutrinos), সৃষ্টি হয় এবং তা প্রায় আলোর গতিতে সমগ্র মহাবিশ্বব্যাপী ছুটে বেড়াতে থাকে এবং এখনও সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেনি। প্রতি সেকেন্ডে একজন মানুষের শরীরের প্রতি বর্গ সেন্টিমিটার স্থান দিয়ে প্রায় পনর কোটি নিউট্রিনোস অতিক্রম করে চলে।

মহাজাগতিক রশ্মি পৃথিবীর আবহাওয়া পরিবর্তনের রহস্য ব্যাখ্যা করতে পারে

আমেরিকার কিছু গবেষকদের মতে আবহাওয়া পরিবর্তনের হতভুদ্ধিকর উপাদান পৃথিবী বর্হিভূত কোন কিছুর ব্যাখ্যার মাধ্যমে হতে পারে। নিউইর্ক আলবানী রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফানকুন যু-এর ধারণা মতে এর ব্যাখ্যা রয়েছে মহাজাগতিক রশ্মির মধ্যে। তিনি যুক্তি দেন যে, মহাজাগতিক রশ্মি মেঘের আবরণের পরিবর্তন ঘটায় যা তাপমাত্রা পরিবর্তনের ধার্ধার ব্যাখ্যা দিতে পারে।

আমেরিকার ভূ-প্রকৃতি বিদ্যা সমিতি থেকে প্রকাশিত গবেষণামূলক সাময়িকীতে (Space physics) যু প্রকাশ করেন মহাজাগতিক রশ্মি উচ্চতার (height) উপর নির্ভর করে পৃথিবীর মেঘাচ্ছন্নতার উপর প্রভাব ফেলে। এই রশ্মির বিদ্যুৎ চার্জসম্পন্ন অতি ক্ষুদ্র কণা সমস্ত গ্রহসমূহতে সৌর প্রবাহের (Solar wind) তীব্রতার উপর নির্ভর ক'রে- বিভিন্ন দ্রুতির স্পন্দনে (Frequency) আঘাত হানে। পার্থিব মেঘের আবরণের নিয়মতাত্ত্বিক পরিবর্তনের ফলে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা নির্ভরশীল। অন্য কথায় মহাজাগতিক রশ্মির সান্নিধ্যে পার্থিব মেঘের পরিবর্তন ঘটে এবং এটাই দীর্ঘ দিনের অনুসন্ধানের সৌর এবং আবহাওয়া বৈষম্যের সংযোগ পদ্ধতি। পৃথিবীতে মহাজাগতিক রশ্মির আসার পরিমাণ নির্ভর করবে সৌর প্রবাহের প্রবলতার (intensity) উপর।

সাম্প্রতিক কৃত্রিম উপগ্রহ (satellite) থেকে প্রাণ্ত তথ্যে দেখা যায় মহাজাগতিক রশ্মির তীব্রতা এবং নিম্ন মেঘ দ্বারা আচ্ছাদিত পৃথিবীর অংশ বিশেষ পরম্পর সম্পর্কযুক্ত। যুর গবেষণায় আরও জানা যায়, মহাজাগতিক রশ্মির পরিমাণ এবং বৈদ্যুতিক চার্জ দ্বারা সৃষ্টি হুলাগু (ions) নিম্ন বায়ুমণ্ডলীয় কণার উৎপাদনের হার উদ্বৃত্তি করে মেঘকে আরও অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ঘন মেঘ গঠনে অবদান রাখে।

যু-আরও বিশ্বাস করেন বায়ুমণ্ডলীয় রাসায়নিক ব্যবধান ঘটার পিছনে প্রাকৃতিক ও মনুষ্যজাতি, উভয়ের ভূমিকা থাকতে পারে। তবে তা মহাজাগতিক রশ্মিকে প্রভাবিত করে ফলে মেঘের আবরণীও প্রভাবান্বিত হয়।

উচ্চতার পরিবর্তনের জন্য বায়ুমণ্ডলীয় যে তারতম্য ঘটে তাতে শুধু নিম্ন ট্রোপস্ফিয়ারে পরিবেষ্টক (ambient) কণা বেশী মাত্রায় থাকে এবং উপরের দিকে এর পরিমাণ কমে যায় এবং মেঘের আবরণের ধরনকে প্রভাবিত করে। অধিক উচ্চের মেঘগুলি সাধারণত সূর্যের তাপমাত্রাকে মহাশূন্যে ফেরত পাঠায় আর নিম্নের মেঘ এই তাপমাত্রাকে ধরে রাখে।

ঝ্যাকহোলের বাস্পীভবন

কণাবাদী বলবিদ্যার (Quantum mechanics) অনিশ্চয়তা নীতিতে শক্তির নিত্যতার সূত্র (Law of conservation of energy) ভঙ্গ হতে পারে। তবে তা খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য। মহাবিশ্বে শক্তি ও পদার্থের সৃষ্টি হতে পারে একেবারে শূন্য থেকে এবং তা আবার অদৃশ্য হয়ে যায় পর মুর্হুতেই। বিশেষ একটি নির্দিষ্ট উপায়ে সংঘটিত অন্তর্ভুক্ত প্রক্রিয়াটিকে শূন্যস্থানের চাঞ্চল্য (Vacuum fluctuations) নামে অভিহিত।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন সমস্ত শূন্যস্থানই (empty space) কল্পিত কণিকার (Virtual particles) জোড়ায় পরিপূর্ণ। খুব অল্প সময়ের জন্য তা অস্তিত্বে আসে এবং অল্প দূরত্বে বিচ্ছিন্ন হয়ে পুনরায় সংস্পর্শে এসে পরম্পরাকে ধ্বংস করে ফেলে। কণার যখন সৃষ্টি হয় তখন শক্তি নিত্যতার সূত্র ভঙ্গ করে, কিন্তু যখন পরম্পরাকে ধ্বংস করে ফেলে তখন সমস্ত শক্তির আবার পুনরুদ্ধার ঘটে।

উপরে বর্ণিত কল্পিত কণিকা ঝ্যাকহোলের দিগন্তে সৃষ্টি হতে পারে। একটি কণিকা বিচ্ছিন্ন হয়ে ঝ্যাকহোলের গভীরে পতনের ফলে শক্তির বিকিরণ ঘটায় আর অপরাটি মুক্ত হয়ে ঝ্যাকহোল থেকে দূরে শক্তিকে বহন করে। এটি শুধুমাত্র একজোড়া কণিকার জন্য। এমনিভাবে যদি অবিরত প্রক্রিয়াটির পুনরাবৃত্তি ঘটে তবে ঝ্যাকহোল থেকে বিকিরণের প্রবাহধারা সৃষ্টি হবে। এই প্রক্রিয়াকে হকিং বিকিরণ (Hawking radiation) বলে। ঝ্যাকহোল ক্রমশ সংকুচিত হয়ে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। এটাই ঝ্যাকহোলের বাস্পীভবন। একটি ঝ্যাকহোলের বাস্পীভূত হতে সূদীর্ঘ অকল্পনীয় সময়ের প্রয়োজন।

মহাবিশ্ব, স্ন্যাকহোল, ওয়ার্মহোল এবং সমান্তরাল
মহাবিশ্বের বৈজ্ঞানিক সারতথ্য ও কোরান-হাদীস

মহাবিশ্বের বিশালতা, সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং পরিমাণমিতি মহাবিশ্বের বিশালতা

সার-সংক্ষেপ (বিজ্ঞান)	কোরান/ব্যাখ্যা
<p>১। (ক) আমাদের পৃথিবীর চেয়ে সূর্যের আয়তন তেরলক্ষ গ্রিস হাজার গুণ বেশী। সূর্য একটি মাঝারি আকৃতির তারকা। এর চেয়ে তিন থেকে চার হাজার গুণ বড় বা ছোট তারকাও রয়েছে। অসংখ্য তারকা এবং বিভিন্ন ধরণের মহাজাগতিক বস্তু নিয়ে এক একটি গ্যালাক্সি গঠিত হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধারণামত দৃশ্যমান মহাবিশ্বে কমপক্ষে সাড়ে বার হাজার কোটি গ্যালাক্সি আছে এবং প্রত্যেক গ্যালাক্সিতে কমপক্ষে দশ হাজার কোটি তারকা আছে। দূরবীক্ষণ যত্রের সাহায্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যে দৃশ্যমান মহাবিশ্ব অবলোকন করছেন তার বিস্তৃতি হতে পারে দেড় থেকে তিন হাজার কোটি আলোক বর্ষব্যাপী (এক আলোক বর্ষ= এক লক্ষ কোটি কিলোমিটার) দৃশ্যমান মহাবিশ্বের প্রান্ত সীমার বাইরে ডপলার অভিক্রিয়া (Doppler effect) লাল-বিচ্যুতি (red-shift) অসীমে যায়, ফলে অদৃশ্যমান থাকে। কোন অবস্থাতেই তা আমাদের মহাবিশ্ব থেকে দৃশ্যমান হবে না।</p> <p>বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে প্রকাশিত বিভিন্ন মহাজাগতিক</p>	<p>বর্তমানে মানুষ মহাবিশ্বের বিশালতা সম্পর্কে জানতে পেরেছে কিন্তু সাড়ে চৌদশত বছর পূর্বে পরিত্র কোরানে এই মহাবিশ্বের বিশালতা কিভাবে বর্ণিত হয়েছে এবার তা লক্ষ্য করুন।</p> <p>কোঁ: তিনি স্তরে স্তরে সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করেছেন, তুমি দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন পার্থক্য দেখতে পাবে না, আবার তাকিয়ে দেখো কোন ত্রুটিও দেখতে পাও কি না? অতঃপর তুমি বার বার তাকাও, তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হয়ে ফিরে আসবে। নিচয় আমি সর্বনিম্ন আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুশোভিত করেছি। ৬৭:৩-৫</p> <p>কোরানের আরও কয়েকটি আয়াতে সর্বনিম্ন বা পৃথিবীর নিকটবর্তী আকাশকেই শুধুমাত্র প্রদীপমালা বা তারকাপুঁজি দিয়ে সুজিত করার কথা বলা আছে। এছাড়া কোরানের আরও বেশ কিছু আকাশ সম্পর্কিত আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয়, নিম্নতম আকাশটিই আমাদের দৃশ্যমান মহাবিশ্ব আর অন্যান্য স্তরে স্তরে সজিত বাকী ছয়টি আকাশ আমাদের অদৃশ্যমান-মহাবিশ্ব। এই বিশালতা সম্পর্কে কোরানের আরও আয়াত -</p> <p>কোঁ: যদি আমি ওদের (অবিশ্঵াসী) সামনে আকাশের কোন দরজাও খুলে দেই অতঃপর তারা তাতে আরোহন করতে থাকে তবুও ওরা একথাই বলবে যে আমাদের দৃষ্টির</p>

তত্ত্বানুসারে আমাদের দৃশ্যমান মহাবিশ্বটি বৃহত্তর অতিক্ষীতিত্ত্বের বুদ্বুদের (Post inflationary bubble) একটি অতি স্ফুন্দ্র কণিকা।

অতিক্ষীতিত্ত্বের বুদ্বুদটি প্রসার লাভ করেছিল 10^{10} বা তার চেয়ে অধিক আলোকবর্ষ ব্যাপী।

সুতরাং দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান মহাবিশ্বের বিশাল অসীমতা মানুষের যে কোন ধরণের ক঳না ও বোধগম্যের বাইরে।

বিভাট ঘটানো হয়েছে না বরং আমরা যানুগ্রহ হয়ে পড়েছি। ১৫:১৪-১৫

কোঁ পৃথিবীতে যে সকল বৃক্ষ আছে যদি তা সমস্তই কলম হয় এবং এই সমুদ্র তার সাথে ও সাত সমুদ্রযুক্ত হয়ে কালি হয় তথাপি আল্লাহর বাক্যাবলী শেষ হবে না। নিচয় আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়। ৩১:২৭।

কোঁ তুমি বল যদি আমার প্রতিপালকের বাক্যাবলী প্রকাশের জন্য সমুদ্র কালি হয়, তবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হবার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে, যদিও আমি ওর সাহায্যার্থে এর মত আরো সমুদ্র আনয়ন করি।
১৮ : ১০৯।

আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টি, নির্দশন, শক্তি, প্রজ্ঞা, গুণাবলী ইত্যাদির কথা অবশ্যই অসীম।

মহাবিশ্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্য

সার-সংক্ষেপ (বিজ্ঞান)	কোরান/ব্যাখ্যা
১। (খ) বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী জন হইলার এবং তাঁর সহকর্মী রবার্ট ডিকের মতে উপরে বর্ণিত এই বিশাল অসীম মহাবিশ্বের যা কিছু আছে এবং যেভাবে আছে তা ছাড়া ‘জীবন’ (life) অসম্ভব। জীবন বলতে আমরা যা বুঝি এমনকি একেবারে স্ফুন্দ্র যে কোন ধরনের জীবনের অস্তিত্বের জন্যও এই বোধগম্য মহাবিশ্বের সৃষ্টির প্রয়োজন রয়েছে। উপরোক্ত বিজ্ঞানীদের মতে-	কোঁ তোমরা কি দেখো না আল্লাহ নভোমভল ও ভূমভলে যা কিছু আছে সমস্তই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ (নেয়ামত সমূহ) পরিপূর্ণ করেছেন। ৩১ : ২০।
‘মহাবিশ্বটি কত সুন্দর বা কত বৃহৎ	কোঁ তিনি নিজ অনুগ্রহে নভোমভল ও ভূমভলের সমস্ত কিছু তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। নিচয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নির্দশন আছে। ৪৫ : ১৩।
	কোঁ আমি নভোমভল ও ভূমভল এবং ওদের

তা উপলব্ধি করার জন্য এতে দর্শকের প্রয়োজন। এই দর্শক চাইলে প্রয়োজন জীবনের। জীবনের জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন ধরনের ভারী মৌলের (heavy elements)। হাইড্রোজেন থেকে ভারী মৌল তৈরীর জন্য প্রয়োজন তাপ কেন্দ্রকীয় দহন (thermo neuclear combustion)। এই কেন্দ্রকীয় দহনের জন্য তারকার মধ্যে সুদীর্ঘ সময় (কোটি কোটি বছর) ধরে তা রক্ষণ (দাহ্য) করা প্রয়োজন। [বিন্দুঃ কেন্দ্রকীয় সংযোজন (neuclear fusion) প্রক্রিয়ায় তারকার মধ্যে হাইড্রোজেনকে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করে অন্য কথায় দাহ্য করে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ভারী মৌল হিলিয়াম, কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, সিলিকন, লোহ ইত্যাদি তৈরী হয়।] এই সুদীর্ঘ সময়ের (কোটি কোটি বছর) জন্য স্থান-কালের (Space-time) মাত্রায় (dimensions) মহাবিশ্বকে বিস্তৃত বা প্রসারিত রাখতে হবে।

মধ্যে কোন কিছুই গ্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। আমি এগুলো যথাযথ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু ওদের অধিকাংশই তা বোঝে না। ৪৪ : ৩৮-৩৯।

কোঃ আমি নভোমভল ও ভূমভল এবং উভয়ের অন্ত-বর্তী কোন কিছুই উদ্দেশ্যহীন ভাবে সৃষ্টি করিনি। যদিও অবিশ্বাসীদের ধারণা তাই, সুতরাং অবিশ্বাসীদের জন্য জাহানামের শাস্তি রয়েছে ৩৮:২৭।

কোঃ তিনি সুপরিকল্পিত ভাবে নভোমভল ও ভূমভল সৃষ্টি করেছেন। ৩৯:৫

কোঃ নভোমভল ও ভূমভল এবং ওদের অন্ত গত কোন কিছুই আমি তাৎপর্যহীন সৃষ্টি করিনি এবং নিচয় সেই সময় (কিয়ামত) উপনীত হবে। ১৫:৮৫

কোঃ নভোমভল ও ভূমভলে এবং যা ওদের অন্তবর্তী তা আমি গ্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। আমি যদি চিত্তবিনোদনের উপকরণ সৃষ্টি করতে চাইতাম তবে আমি আমার নিকট যা আছে তা নিয়েই তা করতাম, আমি তা করিনি। ২১:১৬-১৭।

কোঃ তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না, মহিমান্বিত আল্লাহ, যিনি প্রকৃত মালিক তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি সম্মানিত আরশের অধিপতি। ২৩:১১৫-১১৬

মহাবিশ্বের পরিমাণমিতি

সার-সংক্ষেপ (বিজ্ঞান)	কোরাল/হাদীস /ব্যাখ্যা
<p>১। (গ) বিজ্ঞানীদের হিসাব মতে দশ হাজার কোটি তারকা খচিত এক একটা গ্যালাক্সি থেকে যদি কেবলমাত্র একটি করে তারকা কম করা যায় তবে মহাবিশ্বক্ষেত্রের (Big Bang) পর থেকে সম্প্রসারিত মহাবিশ্বে পুনরায় বৃহৎ সংকোচনের (Big Crunch) জন্য নির্ধারিত সময়ের থেকে মাত্র এক বৎসর কম হবে, তাতে করে কোন একটি তারকারও বিবর্তন (evolve) সম্ভব হবে না ফলে জীবনের বিবর্তনও নয়।</p> <p>মহাবিশ্বক্ষেত্রের পর থেকে সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বের গতিকে বিশ্ময়কর সূক্ষ্মতায় এবং সঠিক মাত্রায় নির্ধারণ করা হয়েছে। ষিফেন হকিং এর মতে- “বিগ ব্যাংগের এক সেকেন্ড পর থেকে সম্প্রসারণের হার যদি এক ভাগের একশত হাজার মিলিয়ন মিলিয়ন ভাগ কম হ'ত তবে এই মহাবিশ্ব বর্তমান অবস্থায় আসার অনেক পূর্বেই ভেঙ্গে (ধ্রংস) যেত।”</p> <p>বিজ্ঞানী পাওয়েল ডেভিস মন্তব্য করেছেন পদাৰ্থ বিজ্ঞানের ধারা বা প্রাকৃতিক আইন (Law of Nature) কেমন সুন্দরভাবে জীবনধারণের জন্য উপযোগী করা হয়েছে। “যদি প্রকৃতি (nature) সামান্যতম ভিন্নধরণের সংখ্যা নির্ধারণ করত তবে এই পৃথিবী সম্পূর্ণ অন্য জায়গা হয়ে যেত। খুব সম্ভব আমরা তা দেখার জন্য উপস্থিত থাকতাম না। সাম্প্রতিক মহাবিশ্বের প্রাথমিক সৃষ্টি</p>	<p>বর্তমানে বিজ্ঞানীরা সমগ্র পৃথিবীতে ভূতাত্ত্বিক ও প্রাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান, মহাশূন্যে স্যাটেলাইট থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য প্রমাণের উপর ভিত্তি করে মহাবিশ্বের সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে পেরেছেন। মহাবিশ্ব সৃষ্টির সবকিছুতেই একটা অতিসূক্ষ্ম ভারসাম্য বা সাম্যাবস্থা (equilibrium) এবং সুনির্দিষ্ট পরিমাণ দেখে তারা শুধু বিস্ময়ে হতবাকই নন এর পিছনে সবকিছু পরিচালনায় এবং রক্ষণাবেক্ষণে একজন মহান সৃষ্টিকর্তার অন্তিমের কথাই প্রমাণ করে। মহাবিশ্বের প্রাথমিক সৃষ্টি সম্পর্কে মানুষ যে একদিন জানতে পারবে, কোরানের নিম্নোক্ত আয়াতগুলি থেকে তা প্রতীয়মান হয়।</p> <p>কোঃ তোমরা তো (ওহে মানুষ) প্রাথমিক সৃষ্টি সম্বন্ধে অবগত হয়েছো, তবে তোমরা অনুধাবন কর না কেন? ৫৬:৬২</p> <p>কোঃ ওরা কি লক্ষ্য করে না, কিভাবে আল্লাহ সৃষ্টিকে অন্তিমদান করেন? ২৯:১৯</p> <p>কোঃ বল-পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং অনুধাবন কর কিভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন? ২৯:২০</p> <p>মহাবিশ্ব সম্পূর্ণ শূন্য থেকে সৃষ্টি এবং তা সৃষ্টির পূর্বেই ‘লওহে মাহফুজে’ পরিকল্পনা করা হয় তা নিম্নোক্ত হাদীস থেকে জানা যায়।</p>
	১৬৯

আবিকারে আমরা জানতে পারি সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বের গতিকে বিশ্লেষকর সূক্ষ্মতায় এবং মাত্রায় নির্ধারণ করা হয়েছে।” মহাবিশ্বের সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থায় এর ঘনত্বও অতি সূক্ষ্মমাত্রায় নির্ধারণ করা হয়। এই ক্রান্তিক ঘনত্ব মানের (Critical Density Value) চেয়ে যদি এক ভাগের কোটি কোটি অংশের কম বা বেশী হ'ত মহাবিশ্বে কোন রকম তারকা বা গ্যালাক্সির সৃষ্টি হ'ত না, পরিণামে মানুষ নামের কোন জীব সৃষ্টি হ'ত না।

আরনোপেনজিয়াস এবং রবার্ট উইলসন প্রথম মহাজাগতিক পশ্চাত্ত্বমি বিকিরণ (Cosmic background radiation) এর সন্দান পান (এ জন্য ১৯৬৫ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন)। তারা মহাবিশ্বের সৃষ্টির জন্য নিখুঁত পরিকল্পনার উপর নিম্নোক্ত চমৎকার মন্তব্য করেন।

“জ্যোতির্বিজ্ঞান (Astronomy)
আমাদেরকে এক অপূর্ব যোগসূত্রের সন্দান দেয়। এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে সম্পূর্ণ শূণ্য থেকে। এখানে ‘জীবন’ বিকাশের জন্য সঠিক প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে অতি সূক্ষ্ম ভারসাম্য প্রদান করা হয় এবং যার পিছনে একটি পরিকল্পনা (উদ্দেশ্য) আছে।”

হাঃ সৃষ্টির প্রথম থেকে মহান আল্লাহর অঙ্গিত্ব বিরাজমান ছিল, তিনি ছাড়া আর কোন কিছুর অঙ্গিত্ব ছিল না। তিনি সৃষ্টি জগতের সব কিছুই ‘লওহে মাহফুজে’ নির্ধারিত করলেন। অতঃপর সম্পূর্ণ আকাশ ও জমিন সব কিছুরই সৃষ্টি করলেন। সূত্র-ওমার ইবেন হাফস, ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) বর্ণিত।

কোঃ সেই মহান সত্ত্বাই নভোমভল ও ভূমভল সৃষ্টি করেছেন সঠিক সূক্ষ্ম সম্ভায়। তিনি যখন আদেশ করেন ‘হও’ অমনি তা হয়ে যায়। ৬৪৭৩

কোঃ তিনি সুপরিকল্পিতভাবে নভোমভল ও ভূমভল সৃষ্টি করেছেন। ৩৯৪৫

কোঃ তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে যথোচিত প্রকৃতি বা পরিমাপ দান করেছেন। ২৫৪২

কোঃ যিনি সমস্ত কিছুকে করেছেন সুষম (সুসংহত) ২৭৪৮

কোঃ আল্লাহর বিধানে (তাঁর নিকট) প্রত্যেক বস্তুর জন্য নির্ধারিত রয়েছে একটি নির্দিষ্ট আনুপাতিক পরিমাপ। ১৩৪৮

কোঃ ওরা কি নিজেদের মধ্যে অনুধাবন করে না যে, আল্লাহ নভোমভল ও ভূমভল এবং এর মধ্যবর্তী বস্তু সমূহ সৃষ্টি করেছেন যথাযথ পরিমাপে সঠিক অনুপাতে এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। ৩০৪৮

ঝ্যাকহোল বনাম জাহানাম

সার-সংক্ষেপে (বিজ্ঞান)	কোরআন / হাদীস
২। ক) ঝ্যাকহোল মহাবিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী রহস্যময় বিদ্যমান বস্তু। মহাকাশের গোপন স্থানে লুকায়িত বিশাল আকৃতির এই সর্বভূক্তি ভীতি প্রদণ বটে।	<p>কোঃ নিচয় জাহানাম ওৎ (ambush) পেতে রয়েছে। ৭৮:২১</p> <p>কোঃ তোমাদের (অবিশ্বাসীদের) জাহানামে একত্রিত করা হবে; এবং তা কত নিকৃষ্টর স্থান। ৩:১২</p> <p>অনুরূপ কোরআনে অনেক আয়াত আছে যেমন ২:২০৩, ৩:১৫১, ৩:১৯৭</p>
খ) বিপুল পরিমাণ পদার্থ অতি অল্প স্থানে অসীম ঘনত্বে থাকার ফলে স্থান-কালের (Space-time) গভীর বক্রতার জন্য সক্ষীর্ণ মহাকর্ষ কৃপ সৃষ্টি করে।	<p>কোঃ দূর হতে অগ্নি যখন ওদের দেখবে তখন ওরা শুনতে পাবে এর ক্রুদ্ধ গর্জন ও চিকির এবং যখন ওদের হস্তপদ শৃঙ্খলিত অবস্থায় ওর কোন সক্ষীর্ণ স্থানে নিষ্কেপ করা হবে, তখন ওরা সেখানে ধ্বংস কামনা করবে। আজ তোমরা একবারের জন্য ধ্বংস কামনা করো না, বহুবার ধ্বংস হবার কামনা করতে থাক। ২৫:১২-১৪</p> <p>কোঃ কিন্তু যার পাল্লা হাল্কা (ভাল কাজের) হবে। ফলতঃ তার স্থান হবে (তলাবিহীন) কৃপে (Pit)। তা কি তুমি জান? তা উচ্চ অগ্নি। ১০১:৮-১১ (ইউসুফ আলী সাহেব অনুদিত)</p> <p>হাঃ নবী করিম (সঃ) বলেছেন। তোমরা কেহ কোন মুসলিম ভাইয়ের প্রতি অস্ত্র প্রদর্শন কর না। অস্তাত বশে শয়তান তাকে আঘাত করার জন্য প্ররোচনা করতে পারে। ফলে সে অগ্নিকৃপে নিষ্ক্রিষ্ট হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত বুখারী শরীফ।</p> <p>হাঃ আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর স্বপ্নে দেখেন জাহানাম কৃপের মত। বুখারী শরীফ।</p> <p>হাঃ নবী (সঃ) বলেছেন জাহানামের এক বিন্দু যাকে কুম এই পৃথিবীতে পড়লে সমস্ত মানুষ এবং যাবতীয় কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে (পৃথিবীর)। তিরমিজ (পদার্থের অসীম ঘনত্বের নমুনা)।</p>
গ) প্রবল মহাকর্ষ বলের প্রভাবে কোন কিছুই এমন কি আলো ও বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বিকিরণ পর্যন্ত মুক্ত হতে পারে না। ঝ্যাকহোলের ঘটনা দিগন্তে পতনশীল সমস্ত পদার্থ (গ্রহ, নক্ষত্র, গ্যাস) ও শক্তি দৃশ্যমান	<p>কোঃ ওদেরই (অবিশ্বাসী) বাসস্থান নরকে এবং সেখানে থেকে কোথাও পালাবার জায়গা পাবে না। ৪:১২১</p> <p>কোঃ অতএব জাহানামের দরজাসমূহে প্রবেশ কর। এতেই অনন্তকাল বাস কর।</p>

মহাবিশ্ব থেকে চিরকালের জন্য অদৃশ্য হয়ে যায়। এছাড়া বাইরের ঘটনা দিগন্তে আমাদের স্থান-কালের চারটি মাত্রা (৩টি স্থান ও ১টি সময়) বিপরীত ভাবে পরিবর্তিত হাওয়ায় এখানে অবস্থানকারীর নিজের অদৃষ্টের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না, কারণ তার সমস্ত ইচ্ছা শক্তি লোপ পাবে।

আর অঙ্কারাবীদের আবাস স্থল কতই নিকৃষ্ট। ১৬ঃ২৯

কোঁ: সেদিন তার কোন সামর্থ্য থাকবে না এবং সাহায্যকারীও নয়। ৮৬ঃ১০

কোঁ: আজ আমি এদের মুখ মোহর (সীল) করে দেবো, এদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং এদের পা এদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে। ৩৬ঃ৬৫

ঘ) মহাকর্ষ কৃপে পতনশীল কোন নভোচারী প্রথমে টেনে লম্বা পাতলা শেমাই এবং পরিশেষে ছিল-ভিল হয়ে যাবে।

কোঁ: কখনও না সে অবশ্যই নিষ্ক্রিয় হবে পিষ্টকারীর মধ্যে (break into pieces) আপনি কি জানেন পিষ্টকারী কি? এটা আল্লাহর প্রজুলিত অগ্নি যা হৃদয় পর্যন্ত পৌছাবে। এতে তাদেরকে আবদ্ধ করে দেয়া হবে। সুন্দীর্ঘ শব্দে। ১০৪ঃ৪-৮

নক্ষত্রে জীবনোপকরণের সমস্ত মৌল উপাদান সৃষ্টি এবং পরিশেষে তা ব্ল্যাকহোল বা এর জ্বালানীতে ঝুপান্তর।

সার-সংক্ষেপে (বিজ্ঞান)	কোরান/হাদীস/ব্যাখ্যা
<p>৩। (ক) সাধারণত একটি নক্ষত্রে সুন্দীর্ঘ সময়ব্যাপী হাইড্রোজেন গ্যাস জ্বালানী হিসাবে প্রজুলিত হয়ে কেন্দ্রীয় একীভবন প্রক্রিয়ায় (neuclear fusion) হিলিয়ামে পরিণত হয়। সমস্ত জ্বালানী হাইড্রোজেন যখন শেষ হয়ে যায় তখন কেন্দ্রে হিলিয়াম কোর গঠন করে। নির্দিষ্ট ভরের পর্যাপ্ত হিলিয়াম প্রচন্ড চাপে সঙ্কুচিত হয়ে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং নতুন করে প্রজুলন শুরু হয়। প্রচন্ড তাপশক্তি বিকিরণের ফলে নক্ষত্রের বাইরের গ্যাসের আবরণ দ্রুত শতগুণ সম্প্রসারিত হয়ে অপেক্ষাকৃত শীতল</p>	<p>নক্ষত্রের বিবর্তন ধারা (জন্ম/মৃত্যু) যদিও মানুষের সাম্প্রতিক জ্ঞান, চৌদ্দশত বছর পূর্বে হয়রত মুহাম্মাদ (সা:) এ সম্পর্কে বলে গেছেন। তারকাই যে দোয়খের আগনে পরিণত হবে তার ইঙ্গিত পবিত্র কোরআনেও পাওয়া যায়।</p> <p>কোঁ: আমি সর্বনিম্ন আকাশকে প্রদীপমালা (তারকারাজি) দ্বারা সুসজ্জিত করেছি, সে গুলোকে শয়তানদের জন্যে ক্ষেপনাত্মক করেছি এবং প্রস্তুত করে রেখেছি তাদের জন্য জলত অগ্নির শাস্তি। ৬৭ঃ৫ (তারকাকে আল্লাহ কিভাবে ক্ষেপনাত্মক ব্যবহার করবেন এ সম্পর্কে বিস্তারিত পরবর্তীতে আছে)।</p>

<p>হওয়ায় লোহিত বর্ণ ধারণ করে। নক্ষত্রের জীবনের এই পর্যায়কে রেডজায়েন্ট (Red Giant) বলে।</p>	<p>দোষথের অগ্নি সম্পর্কে মুসলিম ও তিরমিষ শরীফে বর্ণিত হাদীসের ডিনটি পর্যায়ের গ্রথম অংশটিকু নিম্নরূপ।</p> <p>হাঃ দোষথের অগ্নিকে (তারকা) সহস্র বছর পর্যন্ত প্রজ্ঞালিত করবার পর তা রক্তবর্ণ ধারণ করে। হরায়রা (রাঃ) বর্ণিত।</p>
--	---

খ) আমাদের সূর্যও যখন রেডজায়েন্টে পরিণত হবে, তখন তা শতঙ্গ বৃক্ষে পেয়ে বিশাল বায়বীয় দীপ্তি লোহিত গ্যাস চারিদিকে ফুলে ফেপে উঠবে। বায়ুমণ্ডলটি হবে অস্থচ্ছ দীপ্তি লাল গ্যাসের এবং প্রকৃত সূর্য দেখা যাবে না। ফলে একজন দর্শকের কাছে মনে হবে সূর্য খুব নিকটে একটি বিশাল লোহিত বস্ত। এই উক্ত লোহিত গ্যাস পৃথিবীতে রক্ষাকারী ছাদ ওজন স্তর এবং বায়ুমণ্ডলীয় জলবায়ুকে ধ্বংস করে দিবে। সমুদ্রের সমস্ত পানি বাঞ্চীভূত হয়ে যাবে। ভূত্তক শক্ত শুষ্ক লাভায় পরিণত হবে। পৃথিবীর সমস্ত উদ্ধিদ ও সব ধরনের জীবনের বিলুপ্তি ঘটবে।

কোরানের বিভিন্ন আয়াতে এবং হাদীসে এই দৃশ্যটি সুনিপুনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

কোঃ অতৎপর যখন আকাশ বিদীর্ঘ হবে (ওজন স্তর) তখন তা হয়ে যাবে রক্তবর্ণ রঞ্জিত লাল চামড়ার ন্যায়। ৫৫৯৩৭

কোঃ সেদিন আকাশ হবে গলিত তামার ন্যায় ৭০৯৮ কোঃ যেদিন আকাশ মেঘপুঞ্জসহ বিদীর্ঘ হবে। ২৫৯২৫ কোঃ যখন আকাশ ছিন্নযুক্ত হবে। ৭৭৯৯ কোঃ অতএব ভূমি সেই দিনের অপেক্ষা কর যেদিন আকাশে সূল্পষ্ঠ ধূমাচ্ছন্ন প্রতিপন্ন হবে এবং তা মানব জাতিকে গ্রাস করে ফেলবে এ হবে মর্মন্ত্রদ শাস্তি। ৪৪১১০-১১

কোঃ যখন সমুদ্রগুলো বাঞ্চীভূত হয়ে ক্ষীত হবে। (Boil over with a swell) ৮১৯৬/৮২৪৩

কোঃ নিশ্চয়ই পৃথিবীর উপর যা কিছু আছে তা নিশ্চিহ্ন করে উদ্ভিদ শূন্য শুক্র ময়দানে পরিণত করব। ১৮৯৮ (মঙ্গল গ্রহের ভূমির মত)

হাঃ ছয়টি লক্ষণ (আলামত) আসার পূর্বেই তৃরিত ভাল কাজগুলি কর দর্জাল জাতির আর্বিভাব হওয়া, ধূয়া, ভূমির জন্ম, পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয় প্রচণ্ড আলোড়ন যা ব্যাপক গণহত্যার পরিণত হবে, জনতার এবং বিশেষ ব্যক্তিত্বের মৃত্যু। মুসলিম শরীফে আবু হরায় (রাঃ) বর্ণিত। হাঃ কিয়ামতের দিন সূর্য মাথার এক সুরমাশলাই (প্রায় অর্ধহাত) পরিমাণ উপরে থাকবে।

গ) রেডজায়েন্ট তারকায় পরবর্তী বিবর্তনে কেন্দ্রে সঞ্চিত হিলিয়াম ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়ে আরও কেন্দ্রকীয় একীভবন প্রক্রিয়ায় পর্যায়ক্রমে কার্বন, অক্সিজেন, সিলিকন ও লোহ মৌল সৃষ্টি করে। বিভিন্ন মৌল তাপ শক্তিকে বিকিরণ করে। কিন্তু লোহ মৌল তারকার কেন্দ্রে তাপশক্তিকে বিকিরণ না করে শোষণ করে এবং শক্তিকে আবদ্ধ করে। নক্ষত্রের কেন্দ্রটি যখন লোহ মৌল পরিণত হয় তখন অভ্যন্তরে দাহ্য ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। নতুন মৌল আর সৃষ্টি হয় না (অপেক্ষাকৃত ছোট তারকার ক্ষেত্রে) ক্রম সংকোচনের ফলে নক্ষত্রটি আকারে বিস্ময়কর ভাবে ক্ষুদ্র ও সাদাটে হয়। নক্ষত্রের জীবনের এই পর্যায়কে হোয়াইট ডোর্ফাফ বা শ্বেতবামন (White Dwarf) বলে।

ঘ) সাধারণ আকৃতির তারকাগুলি লোহ মৌল সৃষ্টির পর আর নতুন কোন পদার্থ সৃষ্টি করে না তবে অতি বৃহৎ আকৃতির তারকার অভ্যন্তরে লোহের পরেও আরও ভারী মৌল সৃষ্টি হয়। বিবর্তন ধারার পরিসমাপ্তি ঘটে সুপারনোভা নামে প্রচন্ড বিস্ফোরণের মাধ্যমে। ফলে বাইরের আবরণকে ছিন্ন করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরায় পরিণত হয় এবং তারকায় উৎপন্ন জীবন ধারণের জন্য অতি প্রয়োজনীয় মৌল ও যৌগ কণা যেমন- কার্বন, সিলিকন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, লোহ, সোনা, রূপা, ইউরেনিয়াম ইত্যাদি উক্তা বৃষ্টির (Meteor Shower) আকারে পৃথিবীতে আসে। পৃথিবীর মাটিতে প্রতিদিন ৫০-১০০ টন করে

আমরা সবাই লৌহের বহুবিধি ব্যবহার এবং প্রচন্ড শক্তির সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু একটি তারকায় লোহ মৌল কিভাবে সৃষ্টি হয় তা অতি সাম্প্রতিক জ্ঞান-অথচ পরিব্রহ্ম কোরানে এর ইঙ্গিত রয়েছে।

কোঃ আমি লোহা দিয়েছি, যাতে প্রচন্ড শক্তি আছে এবং মানুষের জন্য বহুবিধি কল্যাণ আছে। ৫৭:২৫

উপরে বর্ণিত দোষখের অগ্নি সম্পর্কে হাদীসের দ্বিতীয় পর্যায়টি শ্বেতবামন তারকায় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

হাঃ পুনরায় তাকে সহস্র বছর প্রজুলিত পর শুভ বর্ণ ধারণ করে। মুসিলম ও তিরমিয়ি।

সাম্প্রতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ব্যাপক গবেষণায় সমস্ত সৃষ্টি জগতের প্রাণীর জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন মৌল (elements) সরবরাহ সম্পর্কে ধারণা হয়েছে। চৌদশত বছর পূর্বের আরবের নিরক্ষর নবীর কাছে অবতীর্ণ কোরানে কি ভাবে তা বর্ণিত হয়েছে এবারে তা সুধী পাঠক সমাজ লক্ষ্য করুন।

কোঃ আকাশে রয়েছে তোমাদের জীবনে পকরণের উৎস ও প্রতিশ্রুত সমস্ত কিছু (দোষখ, বেহেশত) আছে। আসমান ও জমিনের প্রতিপালকের শপথ, নিশ্চয় এ তোমাদের বাক্যালাপের মতই সত্য ৫১:২২-২৩।

কোঃ আমি তোমাদের জন্য তাতে (পৃথিবীতে) জীবিকার উপকরণ সৃষ্টি

অতিক্রুদ্ধ উক্তা কণা (Micrometeorites) মহাশূন্য থেকে এসে পড়ে। এ ছাড়া সারা বছর বিভিন্ন সময় বৃহৎ আকারের উক্তাপিণ্ড পৃথিবীতে এসে থাকে।

বিশ্বে:- আমরা প্রতিদিন যা কিছু খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করি তাতে প্রধানত হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন, সোডিয়াম মৌলগুলি বিভিন্ন জটিল প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি অসংখ্য যৌগিক পদার্থ থাকে। এছাড়া আরও প্রায় ৬০টি মৌলের বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ পরিমাণে খুব সামান্য হলেও জীবন ধারণের জন্য অত্যন্ত জরুরী। এছাড়া প্রতি মুহূর্তে আমরা যে শ্বাস-প্রশ্বাস নেই এবং আমাদের চারিদিকে অসংখ্য জানা এবং অজানা সমস্ত উপাদানের গঠনের মূলেই রয়েছে তারকায় সৃষ্টি ১১৮টি মৌল।

(ঙ) সুপারনোভা বিস্ফোরণের পর তারকার অবশিষ্ট কেন্দ্রীয় অংশটুকুর ভর যদি ১.৪ সৌর ভরের বেশী হয় তখন তা প্রবল মহাকর্ষ বলের প্রভাবে ইলেক্ট্রন, প্রটোন, নিউট্রন ও অন্যান্য উপ-পরমাণুর সুপের একটি নিউট্রনের গোলাক তৈরী ক'রে নিউট্রন নক্ষত্রে পরিণত হয়। এই সমস্ত তারকার ঘনত্ব খুব বেশী হয় ফলে মহাকর্ষ বল আরও বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থায় আশে-পাশের পদার্থ শোষন করে যদি এর ভর ৩ সৌর ভরের বেশী হয় তখন তা ব্ল্যাকহোলে পরিণত হয়।

করেছি এবং তাদের জন্যও যাদের জীবিকাদাতা তোমারা নও। আমার কাছে প্রত্যেক বস্তুর ভাস্তুর রয়েছে এবং আমি তা প্রয়োজনীয় পরিমাণেই সরবরাহ করে থাকি। ১৫:২০-২১

কোঃ এবং যিনি তোমাদের আকাশ ও জমিন হতে উপজীবিকা দান করেন। ২৭:৬৪

কোঃ আল্লাহ ব্যতীত কি কোন সৃষ্টা আছে যে তোমাদেরকে আসমান ও জমিন হতে জীবিকা দান করে? ৩৫:৩

কোঃ তিনিই তোমাদের তাঁর নির্দশনাবলী দেখান এবং আকাশ হতে তোমাদের জন্য জীবনোপকরণ প্রেরণ করেন। ৪০:১৩

কোঃ তিনি যদি জীবনপোকরণ সরবরাহ বন্ধ করেন, এমন কে আছে যে, তোমাদের জীবিকা দান করবে? ৬৭:২১

অনুরূপ আয়ত পবিত্র কোরাণে আরও আছে।

দোয়খের অগ্নি সম্পর্কে মুসলিম ও তিরমিয়ি শরীফে বর্ণিত হাদিসের তৃতীয় অংশটুকুঃ

হাঃ তৎপর সহস্র বছর প্রজুলিত করার পর তা ঘোর কৃষ্ণর্ণ ধারণ করে এবং তা সে অবস্থায় আছে।

সাতধরণের ব্ল্যাকহোল ও জাহানাম

সার-সংক্ষেপে (বিজ্ঞান)	কোরান/হাদীস/ব্যাখ্যা
<p>৪। বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে সাত ধরণের ব্ল্যাকহোলের অস্তিত্বের কথা বলেছেন।</p> <p>(ক) শোয়ার্জশীল ব্ল্যাকহোল এগুলি স্থির আবর্তনশীল নয়। (খ) রেইজনার-নর্ডস্ট্রোম ব্ল্যাকহোল এগুলিও স্থির তবে বৈদ্যুতিক চার্জ আছে।</p> <p>(গ) কের-ব্ল্যাকহোল এ ধরণের ব্ল্যাকহোল আবর্তনশীল কিন্তু কোন বৈদ্যুতিক চার্জ নেই।</p> <p>(ঘ) কের-নিউম্যান ব্ল্যাকহোল এগুলি আবর্তনশীল ও বৈদ্যুতিক চার্জ সম্পন্ন।</p> <p>(ঙ) আদিম আনুবীক্ষণিক ব্ল্যাকহোল সবচেয়ে ক্ষুদ্রাকার উপপরমাণু প্রটোনের সমান অথচ এর ভর হতে পারে একশত কোটি টন এবং তাপমাত্রা বার হাজার কেলভিন (Kelvin)।</p> <p>(চ) পালসার বা নিউটন তারকা অতি শক্তিশালী চুম্বক ক্ষেত্র সম্পন্ন বিশাল আকৃতির তারকার ধ্রংসপ্রাণ অবস্থা।</p> <p>(ছ) কোয়াসার-মহাবিশ্বের সবচেয়ে পুরাতন অঞ্চলে অতিমাত্রায় উজ্জ্বল। এ পর্যন্ত প্রাণ এ ধরণের ব্ল্যাকহোলের সর্বোচ্চ ওজন দশ হাজার কোটি সৌর ভরের সমান।</p>	<p>কোরান ও হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে আমরা সাত ধরণের দোষখের সন্ধান পাই</p> <p>(ক) জাহানাম, (খ) জাতুগ্রাহাম, (গ) হতামা, (ঘ) ছাঁটো, (ঙ) ছাকার, (চ) জাহীম এবং (ছ) হা-বিয়া</p> <p>কোঃ তাদের সবার (শয়তানের অনুসারীদের) নির্ধারিত স্থান হচ্ছে জাহানাম। এর সাতটি দরজা আছে। প্রত্যেক দরজার জন্য এক একটি পৃথক দল আছে। ১৫:৪৩-৪৪</p> <p>হাঃ পুণরঢানের দিনে দোষবীদের মধ্যে যাকে সবচেয়ে কম শাস্তি দেওয়া হবে তার পায়ের পাতার নীচে দু'টি উত্পন্ন নিভন্ত আগুন (Smouldering embers) স্থাপন করা হবে, ফলে তার মগজ তামার পাত্রে বা কুম-কুমে (সুরক্ষ গলাবিশিষ্ট পাত্র) ফুটন্ত পানির মত ফুটতে থাকবে। যদিও তাকে সবচেয়ে কম শাস্তি দেওয়া হবে তবু সে তার চেয়ে বেশী শাস্তি কেহ পাচ্ছে বলে মনে করবে না। বুখারী ও মুসলিম শরীফে আল নুম্যান ইবনে বশির বর্ণিত। এখানে আদিম অণুবীক্ষণিক ব্ল্যাকহোল সাদৃশ্য।</p>

ବ୍ୟାକହୋଲେର ପ୍ରଧାନ ଚାରଟି ଅନ୍ତଳ ଏବଂ ଏଥାନ ଥେକେ କୋନ କିଛୁଟି
ପିଛନେ ଫିରେ ଯେତେ ପାରେ ନା ।

ସାର-ସଂକ୍ଷପେ (ବିଜ୍ଞାନ)	କୋରାନ/ହାଦୀସ/ବ୍ୟାଖ୍ୟା
<p>୫। ମହାବିଶ୍ୱେ ଆବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବ୍ୟାକହୋଲେର ସଂଖ୍ୟାଇ ବେଳୀ । ସଦିଓ ବ୍ୟାକହୋଲ ଶୁଣୁ ହୁଏ ବାହିରେର ଘଟନା ଦିଗନ୍ତ ଥେକେ, ତଥାପି ଆରଗୋଫିଯରେର ହିଂସା ଥେକେ ଭିତରେ ଦିକେ ପତନଶୀଳ ଯେ କୋନ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରାୟ ଆଲୋର ଗତିତେ ପ୍ରଚନ୍ଦ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆକାରେ ଘଟନା ଦିଗନ୍ତେର ଦିକେ ଅନୁସର ହୁଏ ଏବଂ ଏଥାନ ଥେକେ କୋନ କିଛୁଟି ପିଛନେ ଫିରେ ଯେତେ ପାରେ ନା । ଏଭାବେ ବ୍ୟାକହୋଲେର ଗଠନ କାଠାମୋ ବିଶ୍ଵେଷଣ କରଲେ ଆମରା ଚାରଟି ଅନ୍ତଳ ବା ଏଲାକା ପାଇ । (୧) ଆରଗୋଫିଯାର ବା ପୁଣିତ ଚାକ୍ରି, (ଆବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବ୍ୟାକହୋଲେର କ୍ଷେତ୍ରେ) (୨) ବାହିରେର ଘଟନା ଦିଗନ୍ତ, (୩) ଭିତରେର ଘଟନା ଦିଗନ୍ତ ଏବଂ (୪) ଅନନ୍ୟତା । (ଚିତ୍ର ନଂ-୯୭ ପୃଃ)</p>	<p>କୋଃ ଓଦେରଇ ବାସସ୍ଥାନ ଜାହାନାମେ ଏବଂ ସେଥାନେ ଥେକେ ତାରା କୋଥାଓ ପାଲାବାର ହାନ ପାବେ ନା । ୪୧୨୧</p> <p>କୋଃ ସଥନଇ ତାରା ଯନ୍ତ୍ରଣା କାତର ହୁୟେ ଜାହାନାମ ହତେ ବେର ହତେ ଚାଇବେ, ତଥନଇ ତାଦେର ଓତେ ଫିରିଯେ ଦେଓଯା ହବେ । ୨୨୧୨ ଅନୁରୂପ ଆୟାତ ୩୨୧୦</p> <p>ହାଃ ଦୋୟଥେର ଅଗ୍ନି ବେଡ଼ା ଚାରଟି ପୁରୁଷ ପ୍ରାଚୀର ହବେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଚୀରେର ବ୍ୟବଧାନ ୪୦ ବହୁ ରାତ୍ରାର ସମତୁଳ୍ୟ ହବେ । ତିରମିଯି</p>

ବ୍ୟାକହୋଲେର ପୁଣିତ ଚାକ୍ତି ବନାମ ଜାହାନାମେର ଅଗ୍ନି

ସାର-ସଂକ୍ଷେପେ (ବିଜ୍ଞାନ)	କୋରାନ/ହାଦୀସ/ବ୍ୟାଖ୍ୟା
<p>୬। ବ୍ୟାକହୋଲେର ପୁଣିତ ଚାକ୍ତି (accretion disk) ଏଲାକାଯ ପତନଶୀଳ ଧୂଲିକଣା ଓ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥର ଆବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବିଶାଳ ସ୍ଵର୍ଗ ଘଟନା ଦିଗନ୍ତେ (event horizon) ଦିକେ ଅହସର ହୟ । ପ୍ରଚନ୍ଦ ଗତିତେ (ପ୍ରାୟ ଆଲୋର ଗତି) ଅହସରମାନ ପଦାର୍ଥର କଣାଙ୍ଗଳି ପରିସ୍ପରରେ ସନ୍ଦେ ଘାତ-ପ୍ରତିଘାତେ ଅକଳ୍ପନୀୟ ତାପମାତ୍ରାଯ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୟ ଆଶ୍ରମ ଜୁଲେ ଉଠେ । ପଦାର୍ଥର ପତନ ଯତ ବୃଦ୍ଧି ପାବେ ଉତ୍ତାପତ ତତ ବୃଦ୍ଧି ପେଯେ ଉଚ୍ଚ ଆଲୋକ ତରଫମାଳା ରଞ୍ଜନ ରଶ୍ମୀ (X-ray) ଏବଂ ଗାମାରଶ୍ମୀ ନିର୍ଗତ କରତେ ଥାକେ । ଗ୍ୟାସ ଓ ଧୂଲିକଣା ବ୍ୟାକହୋଲେ ପତିତ ହେଯାର ସମୟ କ୍ରମାବ୍ୟୟେ ସଂକୁଚିତ ହେତେ ଥାକେ ଏବଂ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୟ ତାପମାତ୍ରା କୋଟି କୋଟି ଡିଗ୍ରୀତେ ଉପନୀତ ହୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗେ ଆଲୋ ନିର୍ଗତ କରେ । ଆଲୋର ବିଭିନ୍ନ ରଂ ବିଭିନ୍ନ ତାପମାତ୍ରାର ସଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କିତ । ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାର ପଦାର୍ଥ ସମ୍ମହ ଥାକେ ବ୍ୟାକହୋଲେର ସବଚେଯେ ନିକଟେ ଏବଂ ତା ଅତି ବୈଶନ୍ତି (Ultraviolet) ଚିତ୍ର-୨୦-୧୦୦ ପୃଃ ।</p> <p>ପୁଣିତ ଚାକ୍ତିତେ ପ୍ରଚନ୍ଦ ବେଗେ ପତନଶୀଳ ପଦାର୍ଥ କଣା ବ୍ୟାକହୋଲେ ସୃଷ୍ଟ ଚୁମ୍ବକ କ୍ଷେତ୍ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ ପ୍ରଚନ୍ଦ ଶକ୍ତି ଓ ଗତି ପ୍ରାଣ ହେଯାଯ ରଞ୍ଜନ ଓ ଗାମା ରଶ୍ମୀର ସୁଦୀର୍ଘ ଜେଟ ବ୍ୟାକହୋଲେର ଚାରିପାଶେ ଓ ସୁଦୂରେ ଆଲୋର ବନ୍ୟ ଛଡ଼ାଯେ ଦେଯ ।</p>	<p>କୋঃ ତିନଟି କୁଣ୍ଡଲୀର ଆକାରେ ଉଥିତ ଧୂ-ପୁଣ୍ଡର (ଛାୟାର ଦିକେ ଚଲ, ଯେ ଛାୟା ଶୀତଳ ନୟ ଏବଂ ଯା ରକ୍ଷା କରେ ନା ଅଗ୍ନିଶିଖାର ଉତ୍ତାପ ହତେ । ଏତ ଦୂର୍ଘ ସାଦୃଶ୍ୟ ବୃହ୍ତ ଅଗ୍ନି କୁଣ୍ଡଲଙ୍କ ନିଷ୍କେପ କରବେ । ତା ଯେନ ପୀତବର୍ଣେର ଉତ୍ତର ଶ୍ରେଣୀ । ୭୭:୩୦-୩୩</p> <p>କୋঃ ଆমি ସୀମାଲଜ୍ଞଥନକାରୀଦେର ଜନ୍ୟ ଅଗ୍ନି ପ୍ରସ୍ତ୍ରତ ରେଖେছି । ଯାର ବୈଷନ୍ନୀ ତାଦେରକେ ପରିବେଷ୍ଟନ କରେ ଥାକବେ । ଓରା ପାନି ଚାଇଲେ ଓଦେର ଗଲିତ ଧାତୁର ନ୍ୟାୟ ପାନୀୟ ଦେଓୟା ହବେ । ୧୮:୨୯ ।</p> <p>କୋঃ ସେଦିନ ଆକାଶ ହବେ ଗଲିତ ଧାତୁର ମତ ଏବଂ ପରତସମ୍ମହ ହବେ ରଙ୍ଗିନ ପଶମେର ମତ ୭୦୯୮୯ (ବ୍ୟାକହୋଲେ ପତନଶୀଳ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର) ।</p> <p>କୋঃ ଏଟା (ପିଷ୍ଟକାରୀ-ହୋତାମା) ଆହ୍ଲାହ ପ୍ରଜ୍ଞଲିତ ଅଗ୍ନି । ଯା ହୁଦ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୌଛାବେ । ଏତେ ତାଦେରକେ ଆବଳ କରେ ଦେଯା ହବେ । ସୁଦୀର୍ଘ ସ୍ତରେ ୧୦୪୯୬-୯</p> <p>କୋঃ ଆମି ତୋମାଦେରକେ ଶିଖା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଗ୍ନି (Blazing fiercely) ସମ୍ପର୍କେ ସର୍ତ୍ତକ କରେ ଦିଯେଛି । ୯୨:୧୪</p> <p>କୋঃ ନିଶ୍ଚଯ ମୁନାଫେକରା (hypocrites) ଜାହାନାମେର ସର୍ବନିନ୍ଦା ସ୍ତରେ । ୪:୧୪୫</p> <p>କୋঃ ତାରା ଜାହାନାମେର ଅଗ୍ନି ଓ ଫୁଟନ୍ତ ତରଲେର ମାଝଖାନେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରବେ । ୫୫:୪୪</p> <p>ହାଃ ଅବଶ୍ୟଇ ଏଟା (ଜାହାନାମ) ଦୂର୍ଘ ସାଦୃଶ୍ୟ କୁଣ୍ଡଲଙ୍କ ନିଷ୍କେପ କରେ । ଇବନେ ଆକ୍ରାସ (ରାଃ)</p>

ব্ল্যাকহোলের স্থায়ী কক্ষ পথ থেকে ক্রমাবয়ে পতনশীল সমস্ত পদার্থ অর্থাৎ গ্রহ, নক্ষত্র এবং অন্যান্য আন্ত-নক্ষত্রীয় পদার্থ সমূহ ধূলিকণা বা গ্যাসের আকৃতিতে প্রচল বেগে সর্পিল ঘূর্ণির আকারে (Spiral whirlpool) ব্ল্যাকহোলের কেন্দ্র বা অনন্যতার দিকে ধাবিত হবে। কতকটা বাথটাবে পানি নিষ্কাশনের মত।

এখানে আরও উল্লেখ্য যে অতিবৃহৎ আকৃতি ব্ল্যাকহোলের অনন্যতা ঘটনা দিগন্ত থেকে বেশ দূরে থাকায় পতনশীল পদার্থ ততটা মহাকর্ষ বল অনুভব করবে না ফলে ঘূর্ণির বল বেশী থাকায় ঘটনা দিগন্তে দীর্ঘ সময় তা প্রদক্ষিণ করবে।

বর্ণিত বুখারী।

হাঃ তোমাদের (সাধারণ) অগ্নি জাহানামের অগ্নির ৭০টি উপাদানের (parts) মধ্যে একটি। সাধারণ পার্থিব আগুন থেকে এই অগ্নির (জাহানামের) ৬৯টি উপাদান বেশী আছে। প্রত্যেকটি উপাদান (পার্থিব) অগ্নির মত উন্নত। আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণিত মুসলিম ও বুখারী।

হাঃ নিঃসন্দেহে আমি জাহানামকে দেখেছি বিজ্ঞ অংশ একে অপরকে গ্রাস করছে। (সূর্য গ্রহণের সময় নামাজে) হ্যরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত বুখারী। এটি হতে পারে পতনশীল পদার্থের প্রবল সর্পিল ঘূর্ণিস্ত্রোত। (চিত্র ১১৫ পৃঃ)

হাঃ আল আকবাস বিন আব্দুল মুত্তালিব (বর্ণিত) বলেন, 'হে আল্লাহর রসূল আবু তালেব আপনাকে সবসময় নানাভাবে প্রতিরক্ষা (defence) করছেন, এ জন্য তিনি কি কোন সুবিধে পাবেন না?' নবী (সাঃ) বলেছিলেন, 'হ্যা, তিনি এজন্য অগ্নির সবচেয়ে অগভীর স্থানে থাকবেন। আর আমার কারণে না হলে জাহানামের সর্বনিম্ন স্থানে থাকতেন,' বুখারী ও মুসলিম।

রেইজনার-নর্ডস্ট্রোম ব্ল্যাকহোল অস্থায়ী এবং জাহানাম থেকে পর্যায়ক্রমে বিশ্বাসীদের উদ্ধার।

সার-সংক্ষেপে (বিজ্ঞান)	কোরান/ হাদীস/ ব্যাখ্যা
৭। রেইজনার-নর্ডস্ট্রোম ব্ল্যাকহোলের বাইরের ঘটনা দিগন্তে পতনশীল পদার্থ ভিতরের ঘটনা দিগন্তের দিকে একমুখী	কোঃ তাদের সবার (শয়তানের অনুসারী) নির্ধারিত স্থান হচ্ছে জাহানাম। এর সাতটি দরজা আছে। প্রত্যেক দরজার জন্য এক একটি পৃথক দল আছে। ১৫:৪৩-৪৪ কোঃ আল্লাহ বলবেন, আচ্ছা, এখন তোমাদের চূড়ান্ত পরিণাম জাহানাম। এখানে তোমরা চিরকাল থাকবে। রক্ষা পাবে কেবল তারাই যাদেরকে আল্লাহ রক্ষা করতে চাইবেন। যদি না

রাস্তায় আকর্ষিত হয়, তারপর তা আরও ভিতরে অর্থাৎ অনন্যতার দিকে শেষিত হয় না কারণ অনন্যতাটি দুর্বল হওয়ায় মহাকর্ষ জোয়ার বল (Gravitational tidal force) কম। ফলে এখানে বিপরীত মহাকর্ষ বল (anti-gravity) কাজ করে। এছাড়া ঘটনা দিগন্ত যদি খুব বড় না হয়, তবে তা অস্থায়ী। এই অস্থায়ীত্বের জন্য ব্ল্যাকহোলটি সম্পূর্ণ বাস্পীভূত হয়ে অনন্যতাহীন চৰকীয় একক মেরু পরিত্যাগ করে।

আল্লাহ অন্য রকম ইচ্ছা করেন। ৬:১২৮।
 হাঃ মুসলিম শরীফে আবু সাইদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে (গ্রন্থ ০০১, নং ৪৩০) হয়রত মুহাম্মাদ (সঃ) প্রথমে বলেছেন, সমস্ত বেহেশতবাসীদের মধ্যে তোমরা (মুসলিমরা) হবে এক চতুর্থাংশ তারপর তিনি বলেছেন এক তৃতীয়াংশ এবং সর্বশেষে বলেছেন অর্ধেক।
 ব্যাখ্যা- প্রথমে মুসলমানরা বেহেশত বাসীদের মধ্যে এক চতুর্থাংশ হবে তারপর বিভিন্ন পর্যায়ক্রমে মধ্যস্থতায় (Intercession) মাধ্যমে সমস্ত বেহেশতবাসীর মধ্যে অর্ধেক হবে মুসলিমরা।
 হাঃ বুখারী ও মুসলিম শরীফে বিচার দিন সম্পর্কিত বেশ কিছু সুনীর্ধ হাদীস আছে। (যেমন বুখারী শরীফে খন্দ ১ গ্রন্থ ১২ নং ৭৭০; খন্দ ৮ গ্রন্থ ৭৬ নং ৫৭৭; খন্দ ৯ গ্রন্থ ৯৩ নং ৫৩২ ইত্যাদি এবং মুসলিম শরীফে গ্রন্থ ০০১ নং ০৩৪৯, ০৩৫২, ০৩৬৭ ইত্যাদি) এই সমস্ত হাদীস থেকে দেখা যায় বিচার সম্পূর্ণ হওয়ার পর জাহানামীদের মধ্যে থেকে বেশ কিছু লোককে পর্যায়ক্রমে যাদের অন্তরে (হন্দয়ে) এক দিনার সমান ওজন থেকে অনুপরিমাণ ওজনের সৈমান থাকবে তাদেরকে জাহানাম থেকে উদ্ধার করা হবে এবং বেহেশতের প্রাঙ্গনে এনে তাদের উপর পানি বর্ষণের মাধ্যমে অঙ্কুরোদগম মত জাগিয়ে তোলা হবে এবং বেহেশতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে।

হাঃ কিছু লোক শুধুমাত্র অগ্নিস্পর্শ করার পর পরিবর্তিত রঙে অগ্নি থেকে বেরিয়ে আসবে এবং তারা বেহেশতে প্রবেশ করবে এবং বেহেশতবাসীরা তাদেরকে জাহানামী অগ্নির লোক আখ্যায়িত করবে। বুখারী শরীফে আনাস বিন মালিক বর্ণিত

ব্ল্যাকহোলের অনন্যতা (Singularity) অসীম সম্ভাবনার ফেনায়িত শয়া আবার অবিরত সৃষ্টি ও ধ্বংসক্ষেত্র।

সার-সংক্ষেপে (বিজ্ঞান)	কোরান/ হাদীস/ ব্যাখ্যা
৮। (ক) অনন্যতা হ'ল আদিম মহাবিশ্বের অকল্পনীয় শক্তি এবং সম্পূর্ণ বিশ্বজ্ঞল অবস্থার একটা কেন্দ্র। এখানে আঘাতকারী যে	মহাধ্বংসের ফলে (কিয়ামত) নিম্ন আকাশের সমস্ত তারকা, গ্রহ-নক্ষত্র কেন্দ্রীয় বিশাল ব্ল্যাকহোলের অনন্যতায় পতিত হবে। কোরান হাদীসের অনেক জায়গায় এর উল্লেখ আছে এবং বিজ্ঞানও একই কথা

কোন কিছু সম্পূর্ণ ধৰৎস হয়ে
অন্তত হারিয়ে ফেলে। এখানে
বস্তুর ঘনত্ব, চাপ এবং স্থান-কালের
বক্তা সব কিছুই এক অসীম
অঙ্কে পৌছায়।

অনন্যতার সম্পূর্ণ ভিন্ন অন্য আর
একটি রূপ হলো এটি অসীম
সম্ভাবনার ফেনায়িত শয্যা অর্থাৎ
এর মধ্যে থাকতে পারে সম্পূর্ণ
ভিন্ন প্রকৃতির যুগপৎ মহাবিশ্ব
কেলাষিত ভগ্নাকৃতির গাছ আবার
তেমনি ছোট বিড়ল ছানাটিও।

এ যুগের একজন জগৎ বিখ্যাত
বিজ্ঞানী ষিফেন হকিং তার বিখ্যাত
মহাবিশ্বের উৎপত্তি, নামক প্রবক্তা
লিখেন- “ঘূড়ির মত মহাবিশ্বটাকে
গুটিয়ে নিয়ে তাঁর যেমন খুশি সেভাবে
মহাবিশ্বকে আবার শুরু করা সৃষ্টিকর্তার
ইচ্ছাধীন। সুতরাং মহাবিশ্বের বর্তমান
অবস্থা হবে সৃষ্টি কর্তার প্রাথমিক অবস্থা
নির্বাচনের ফল।”

বলছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এই গ্রন্থের
অন্যত্র আছে। এখানে কোরান হাদীসের অংশ কিছু
অংশ তুলে ধরা হলো।

কোঃ সেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে ফেজবো,
যেভাবে গুটানো হয় লিখিত দণ্ড। যেভাবে আমি
প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম। সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি
করব আমার প্রতিশ্রূতি নিশ্চিত আমাকে তা পূর্ণ
করতেই হবে। ২১:১০৪।

কোরানের এই আয়াতটি কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে
ঘটবে তা বোঝার জন্য বুখারী শরীফের ইবনে
আবাস (রাঃ) বর্ণিত নিম্ন হাদিসটির সাহায্য নেওয়া
যেতে পারে।

হাঃ তোমরা খালি পা উলঙ্গ এবং সুন্নাহ (লিঙ্গাঘোর
তৃকচ্ছেদ) না করা অবস্থায় সমবেত হবে (শেষ
বিচার দিন) তারপর তিনি উপরের আয়াতের শেষ
অংশটুকু অর্থাৎ যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি
করেছিলাম সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। আবৃত্তি
করেন।

কোঃ আপ্যায়নের জন্য কি এটিই শ্রেয় না যাককুম
বৃক্ষ? সীমালজ্বনকারীদের জন্য এ আমি পরীক্ষাস্বরূপ
সৃষ্টি করেছি। এই বৃক্ষ জাহানামের মূল (তলদেশ)
হতে উদগত হয়। ৩৭ঃ ৬২-৬৪ অনন্যতাই হল
ব্র্যাকহোলের মূল বা কেন্দ্র।

কোঃ যাকুম বৃক্ষ হবে পাপীর খাদ্য। গলিত তামার
মত, তা ওর উদরে ফুটতে থাকবে। ফুটত পানির
মতন। ৪৪:৪৩-৪৬।

(খ) বলয় আকৃতির অনন্যতার
কোয়ান্টাম ফোম নির্দিষ্ট কোন আকার
না থাকায় বিভিন্ন সম্ভাবনাময় আকৃতির
সেট অন্য কথায় যে কোন কিছু গঠন

কোঃ আমি অকৃতজ্ঞদের জন্য শৃঙ্খল, বেড়ি,
লেলিহান অগ্নি প্রস্তুত করেছি। ৭৬:৪

কোঃ আমার নিকট আছে শৃঙ্খল, প্রজ্বলিত
আগুন। গলায় আটকে যায় এমন খাদ্য এবং

করা সম্ভব। উন্মুক্ত অনন্যতায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্যাসের মেঘ সংগঠিত হয়ে আমাদের কল্পনার ভিতর বা বাইরে যে কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে। আবার সর্বত্র অকল্পনীয় বিশ্বজগতে সৃষ্টি করতে পারে।

উন্মুক্ত অনন্যতায় একেবারে শূন্য থেকে ওজন, আলো, তাপ সৃষ্টি করতে পারে। আপনা আপনি বস্তু গঠন করতে পারে, মহাবিশ্ব একটা নতুন অঙ্গিত্বের নতুন স্তরে উপনীত হতে পারে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ যে মহাবিশ্বে ঘূর্ণায়মান ব্ল্যাকহোলের সংখ্যাই বেশী এবং এজাতীয় ব্ল্যাকহোলের অনন্যতা বলয় আকৃতির হয়ে থাকে।

মর্মস্তুদ শাস্তি। ৭৩০১২-১৩

কোঁ: সুতরাং ওরা (সীমালঙ্ঘনকারীরা) আশ্বাদন করুক ফুটন্ট তরল এবং ঘন অঙ্গকারময় তীব্র শীতল তরল। ৩৮০৫৭

বিশ্বদ্রঃ আল গ্যাসাক শব্দটির অর্থ অনেকে পুঁজ করেছেন কিন্তু ইউসুফ আলী সাহেব ইংরেজী অনুবাদে শব্দটির অর্থ দেন fluid of dark, murky intensely cold এটিই সঠিক বলে মনে হয়। কারণ কেবলমাত্র ব্ল্যাকহোলেই চরম উত্তাপ এবং তীব্র শীতল তাপমাত্রায় পদার্থসমূহ থাকতে পারে। গ্যাসাক শব্দটি বেশ কয়েকটি আয়তে আছে। জাহান্নামীদের বিভিন্ন অপরাধের শাস্তির জন্য বিভিন্ন ধরনের উপকরণ, ভয়ঙ্কর ও অকল্পনীয় জীবজন্ম, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি ব্যবহারের কথা অনেক সংখ্যক হাদীসে আছে। মুসলিম মাত্রই আমরা তা কম-বেশী সবাই জানি। এখানে স্থান সংকুলান না হওয়ায় উল্লেখ করা সম্ভব হলো না।

(গ) ব্ল্যাকহোলের
অনন্যতা এমন
একটা জায়গা
যেখানে পদার্থ
বিজ্ঞানের কোন
আইন

(Physical or
laws of
nature) মানে
না। অবিরত এই
এলাকার চারপাশে
পদার্থ কণার সৃষ্টি
এবং ধ্বংস হচ্ছে।

কোঁ: দূর হতে অগ্নি যখন ওদের দেখবে, তখন ওরা শুনতে পাবে এর ক্রুদ্ধ গর্জন ও চিৎকার এবং যখন ওদের হস্তপদ শৃঙ্খলিত অবস্থায় ওর কোন সংকীর্ণ স্থানে নিষ্কেপ করা হবে, তখন ওরা সেখানে ধ্বংস কামনা করবে। আজ তোমরা একবারের জন্য ধ্বংস কামনা কর না, বহুবার ধ্বংস হবার কামনা করতে থাকে। ২৫০১২-১৪

কোঁ: নিচয় যারা আমার নির্দশন সমূহের প্রতি অবিশ্বাসী হয়েছে, তাদের আমি নরকানলে প্রবেশ করাব, যখন তাদের চামড়া জুলে পুড়ে যাবে। তখন আবার আমি তা বদল করে দেব যেন তারা শাস্তির আশ্বাদ গ্রহন করে। নিচয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। ৪০৫৬

কোঁ: সর্বাদিক হতে তার নিকট মৃত্যু (যন্ত্রনা) আসবে, কিন্তু তার মৃত্যু ঘটবে না এবং সে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। ১৪০১৭

কোঁ: কিন্তু যারা অস্থীকার করে তাদের জন্য আছে জাহান্নামের আওন। ওদের মৃত্যুর আদেশ দেওয়া হবে না যে ওরা মরবে। ৩৫:৩৬। অনুরূপ আয়াত কোরানে আরও আছে ৭৪:২৮, ২০:৭৪; ৮৭:১২-১৩ ইত্যাদি।

আমাদের মনে স্বাভাবিক একটা প্রশ্ন আসতে পারে এই চরম এবং অকল্পনীয় পরিবেশে দূর্বল মানুষ কি করে শাস্তি গ্রহনের জন্য টিকে থাকবে? নিম্নে বর্ণিত কোরানের আয়াত এবং হাদীসের উন্নতি কি এ প্রশ্নের উত্তর হতে পারে?

কোঁ: আমি তোমাদের মৃত্যুকাল স্থির করেছি এবং আমি অঙ্গমও নই। আমি তোমাদেরকে তোমাদেরই অনুরূপ পরিবর্তিত করে দেব, এবং তোমাদের এরূপভাবে গঠন করব, যা তোমরা অবগত নও। ৫৬:৬০-৬১।

কোঁ: নিশ্চয় তোমরা এক স্তর হতে অন্য স্তরে অধিরোহণ করবে। ৮৪:১৯।

দোষখীদের শারীরিক গঠন হবে বিশাল এ সম্পর্কে মুসলিম ও বুখারী শরীফে উল্লেখ আছে।

হাঁ: একজন অবিশ্বাসীর পেষকদন্ত (মাড়ীরদাঁত) বা ছেদকদন্ত হবে উভদ (পবর্ত) এর মত এবং তার চামড়ার পুরুত্ব হবে তিন রাত্রির ভ্রমনের পথের সমান। আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণিত মুসলিম।

হাঁ: জাহান্নামে অবিশ্বাসীদের দুই কাঁধের দূরত্ব হবে সবচেয়ে দ্রুততম আরোহীর (অশ্ব) তিন দিনের যাত্রার পথ। আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণিত মুসলিম, বুখারী।

হাঁ: তাদের (জাহান্নামীদের) বসতে মক্কা থেকে মদিনার দূরত্ব পরিমাণ (প্রায় ৪০০ কিলোমিটার বা ২৫০মাইল) স্থানের প্রয়োজন হবে।

ব্ল্যাকহোলের চারদিকে বিশাল ডিষ্টাক্যুল বলয় (Torus) বনাম শেষ বিচার দিনের সমতল ভূমি।

সার-সংক্ষেপ (বিজ্ঞান)	কোরান/হাদীস/ব্যাখ্যা
৯। গ্যালাক্সির তারকাপুঁজ্বের কক্ষপথ মহাকর্ষ বিকিরণের	গ্যালাক্সির কেন্দ্রীয় ব্ল্যাকহোল বা জাহান্নামে সমস্ত তারকা, গ্রহ, এবং অন্য সমস্ত কিছুর পতন ঘটবে এ সম্পর্কে কোরান/ হাদীসেও উল্লেখিত হয়েছে।

জন্য ক্রমান্বয়ে শক্তি হারাতে থাকে।	কোং শপথ সে পতন স্থানের, যেখানে নষ্টত্ব সমূহ ধ্বংসপ্রাণ হয়। ৫৬০৭৫
সূনীর্ধ সময়ে ক্ষয়িক্ষণ কক্ষপথীয় শক্তি হারানোর ফলে গ্যালাক্সির ভিতর থেকে বাইরের দিকে কেন্দ্রীয় ব্ল্যাকহোল ক্রমান্বয়ে সমস্ত তারকা গ্রহ, এবং অন্যান্য পদার্থকে গ্রাস করে ফেলবে।	বিহুৎঃ অধিকাংশ অনুবাদে 'মাওয়াকিয়ি' শব্দের অর্থ অন্তগমন বা অন্তাচল করা হয়েছে অথচ অভিধানের কোথাও এ ধরনের অর্থ নেই। প্রকৃত আভিধানিক অর্থ ধ্বংসের স্থান বা সময়। বিস্তারিত জানার জন্য কাজী জাহান সাহেবের আল কোরান দ্য চ্যালেঞ্জ (মহাকশ পর্ব-১) গ্রন্থের ২২৭ পৃষ্ঠায় দেখুন। অনুরূপভাবে আকাশে গ্যালাক্সির অবস্থানের কথা কোরান শরীফের পৃথক তিনটি সূরায় তিনটি আয়াতে উল্লেখ আছে। যদিও অনেক অনুবাদে 'বর্জ' শব্দটি রাশিচক্র বা কক্ষপথ করা হয়েছে তবে আধুনিক অনেক অনুবাদেই গ্যালাক্সির সমতুল্য শব্দ যেমন- Constellation, mansions of the stars পাওয়া যায়।
বিশাল আকৃতির ব্ল্যাকহোলের ঘটনা দিগন্তের বেশ কিছু ভিতরে তেমন একটা মহাকর্ষ জোয়ার (gravity tidal) অনুভূত হয় না। যদিও এখান থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। কসার বা গ্যালাক্সির কেন্দ্রে অবস্থানরত বিশাল আকৃতির ঘূর্ণায়মান ব্ল্যাকহোলের প্রচল শক্তিশালী চৌম্বিক ক্ষেত্রের জন্য মহাকর্ষ প্রভাব মুক্ত এলাকায় চারিদিক থেকে আসা কোটি কোটি; ঘূর্ণায়মান তারকা, গ্রহ, এবং অন্ত-নক্ষত্রীয় পদার্থ তার কৌণিক গতি অবিকৃত রেখে	কোং নিশ্চয় আমি আকাশে গ্যালাক্সিসমূহ সৃষ্টি করেছি। ১৫০১৬ কোং গ্যালাক্সি বিশিষ্ট আকাশের শপথ। ৮৫০১ অনুরূপ আয়াত রয়েছে ২৫০৬১ কোং যখন সূর্যকে নিষ্কিপ্ত (সংকুচিত বা আলোহীন) করা হবে। যখন তারকা সমূহ ঝরে পড়বে (বা নিষ্কিপ্ত হবে)। যখন পর্বতসমূহ অপসারিত (বা চলমান বা মরীচিকার মত অদৃশ্য) হবে। ৮১০ ১-৩ কোং যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে। যখন তারকাসমূহ (বা গ্রহ সমূহ) ঝরে পড়বে (বা বিষ্কিপ্ত হবে)। ৮২০ ১-২ কোং যখন নক্ষত্রাজির আলো নির্বাপিত হবে। যখন আকাশ বিদীর্ণ (বা ফেটে) যাবে। যখন পর্বতমালা ধূলিকণার ন্যায় বিষ্কিপ্ত হবে এবং রসূলগণের উপস্থিতির সময় নির্ধারিত হবে। এই সমূদয় স্থগিত রাখা হয়েছে কোন দিবসের জন্য? বিচার দিনে জন্য ৭৭০৮-১৩ কোং এবং চাঁদ আলোহীন হয়ে যাবে। এবং চাঁদ ও সূর্যকে একত্রিত করা হবে। ৭৫০৮-৯ শপথ তারকার যখন তা ধ্বংস হয় (ভেঙ্গে পড়ে/পতিত হয়) ৫৩ ১ কোং পৃথিবী ও পর্বতমালা ঐ দিন কাঁপবে এবং পর্বতসমূহ প্রবাহমান বালু কারাশিতে পরিণত হবে। ৭৩০১৪ কোং পর্বতমালা সমেত পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হবে, একই ধাক্কায় ওরা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। সেদিন মহাপ্রলয় সংঘটিত হবে। সেদিন আকাশ বিদীর্ণ ও বিষ্কিপ্ত হবে (বা ফেটে চৌচির বা বিকল হওয়া) ৬৯০১৪-১৬ কোং যখন পৃথিবী প্রবল প্রকম্পনে প্রকম্পিত হবে। এবং পর্বতমালা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে পড়বে। ফলে তা উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পর্যবসিত হবে।

ব্ল্যাকহোলের নিরাপদ
কক্ষপথে অবস্থান
করতে পারে। এই
সমন্ত পতনশীল
পদার্থ ধূলিকণার
আকারে পুঞ্জিত
চাকতির (accretion
disk) বাহির দিয়ে
শনি গ্রহের বলয়ের
মত অথচ তার চেয়ে
অনেক অনেক গুণ
বিশাল আকৃতির
মোটা পুরু
ডিস্কার্ক্যুলের সমতলের
মত আবরণ সৃষ্টি
করে। এটাকেই
Torus বলে। আর
ইতিপূর্বেই উল্লেখ
করা হয়েছে যে,
পুঞ্জিত চাকতির
পতনশীল পদার্থ
প্রচন্ড তাপমাত্রা প্রাণ
হয়।

৫৬৯৪-৬

হাঃ বুখারী শরীফে আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত পূনরুত্থানের দিন সূর্য ও
চন্দ্রকে গুটিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

হাঃ মুসলিম শরীফে মিকদাদ বিন আসরাদ বর্ণিত পূনরুত্থানের দিন
সূর্য মানুষের এত নিকটে থাকবে যে তা ওধুমাত্র একমাইল দূরত্বে।

ইতিমধ্যে আমরা জেনেছি ব্ল্যাকহোলকে পরিবেষ্টন করে আছে পুঞ্জিত
চাকতি এবং তার বাহির দিয়ে চারদিকে শনি গ্রহের বলয়ের মত
বিভিন্ন পদার্থের ধূলিকণার ডিস্কার্ক্যুলের বিশাল সমতল ভূমির আবরণ
বা Torus। এটাই কোরান - হাদীসে উল্লেখিত শেষ বিচার দিনের
সমবেত করার স্থান কিনা একটু নিম্ন বর্ণিত কোরান হাদীসের উন্নতি
থেকে ভেবে দেখব কি?

কোঃ যে দিন এই জমীনকে পরিবর্তিত করা হবে অন্য জমীনসমূহে
এবং পরিবর্তন করা হবে আসমানসমূহকে এবং সকলে উপস্থিত হবে
আল্লাহর সম্মুখে-যিনি এক পরাক্রমশালী ১৪৯৪৮

বিশ্বঃ উপরের আয়তে আমাদের পৃথিবীর জমীনকে একবচনে এবং
চারদিক থেকে আসা অসংখ্য গ্রহ, নক্ষত্র ও বিভিন্ন পদার্থ কণায় সৃষ্টি
নতুন জমীনকে বহুবচনে উল্লেখ করা হয়েছে।

কোঃ আপনি এ যমীনকে উন্মুক্ত সমতল দেখবেন, সেদিন সবাইকে
আমি একত্রিত করব, এবং কাউকেই ছেড়ে দেব না। ১৪৯৪৭।

আর যমীনকে এমন সমতল কুক্ষ-ধূসর ময়দানে পরিণত করাব যে,
ভূমি তাতে কোন উচ্চ-নীচ এবং সংকোচন দেখতে পাবে না।
২০৯১০৬-১০৭

কোঃ উভয়ের (স্বর্গ ও নরক) মধ্যে পর্দা (প্রাচীর) থাকবে এবং আরাফের
উপরে অনেক লোক থাকবে। তারা প্রাতোককে তার চিহ্ন দ্বারা চিনে
নেবে। ১৭৯৪৬

কোঃ আর যমীন যখন সম্প্রসারিত করে সমতল করা হবে। আর তার
মধ্যে যা কিছু আছে তা বাহিরে নিক্ষেপ করবে ও শূন্যগর্ড হবে।
১৮৪৪৩-৪

হাঃ পূনরুত্থানের দিন মানুষকে সমবেত করা হবে সাদা ঈমৎ লালচে
সমতলে যা কুটির মত। কারও জন্য কোন চিহ্নিত স্থান থাকবে না।
বুখারী ও মুসলিম শরীফে সাহল বিন সাঈদ (রাঃ) বর্ণিত।

যে জমীনের উপর শেষ বিচার অনুষ্ঠিত হবে তার অভ্যন্তর থেকে
দোষথের আবির্ভাব হবে।

হাঃ কিয়ামতের দিন জাহান্নামকে সাত স্তর জমীনের নিচ হতে আনা
হবে।

মহাবিশ্বের সবকিছুই ব্ল্যাকহোলে জ্বালানীস্বরূপ পতন বনাম জাহানামের জ্বালানী
এবং পুনঃসৃষ্টি

সার -সংক্ষেপ (বিজ্ঞান)	কোরান/হাদীস/ব্যাখ্যা
<p>৯। ডিম্বাকৃতি এলাকার মিহি ধূলিকণার ন্যায় পদার্থসমূহ ক্রমান্বয়ে ব্ল্যাকহোলের পুঞ্জিত চাক্তির পদার্থের ঘর্ষণে এবং মহার্ক্ষ বিকিরণের ফলে শক্তি হারাতে থাকবে এবং একসময় ভারসাম্য হারিয়ে ধ্বংসপ্রাণ হয়ে ঘটনা দিগন্তে পড়বে।</p>	<p>পুঞ্জিত চাক্তির বাহির দিয়ে পরিবেষ্টিনকারী মিহি ধূলিকণার ডিম্বাকৃতির সমতল এলাকায় যা শেষ বিচারের দিন হাশেরে মাঠে পরিণত হবে বলে মনে হয়। এখানে উপস্থিত সবাই ব্ল্যাকহোল বা জাহানাম দেখবে।</p> <p>কোঁঃ তোমরা অবশ্যই জাহানাম দেখবে। অতঃপর তোমরা তা অবশ্যই দেখবে দিব্য প্রত্যয়ে। ১০২৫৬-৭</p> <p>কোঁঃ এবং সকলের নিকট জাহানাম প্রকাশ করা হবে। ৭৯৪৩৬ গ্যালাক্সির সমস্ত তারকা গ্রহ ও অন্যান্য পদার্থসমূহ এবং পুনরুত্থানকৃত মানুষ ও জীৱ ব্ল্যাকহোলে পতন ঘটবে এবং ইঙ্কন বা জ্বালানী হিসাবে কাজ করবে।</p> <p>কোঁঃ তবে সেই আগুনকে ভয় কর যার ইঙ্কন (জ্বালানী) মানুষ ও পাথর, যা অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত আছে। ২৪২৪</p> <p>কোঁঃ হে বিশ্বাসীগণ তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার পরিজনদের আগুন হতে রক্ষা কর। মানুষ ও পাথর যার ইঙ্কন হবে। ৬৬৪৬</p> <p>কোঁঃ আমি অবশ্যই নরকের জন্য বহু জিন ও মানব সৃষ্টি করেছি। ৭৪১৭৯</p> <p>কোঁঃ আমি জিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহানাম পূর্ণ করবই। ১১৪১১৯, অনুরূপ আয়ত ৩২৪১৩। জাহানামের ইঙ্কন মানুষ ছাড়া জিন ও পাথর উল্লেখিত হয়েছে। পাথর বলতে তারকাসমূহের জীবন বিবর্তনের সৃষ্টি বিভিন্ন মৌলের মিশ্রণ এবং গ্রহের বিভিন্ন যৌগ উপাদান সমূহ হতে পারে। বিশাল এ মহাবিশ্বে পথিকীর মত অসংখ্য গ্রহ রয়েছে এবং সেখানে ভিন্ন প্রকৃতির জীবের বা alien এর অস্তিত্বের সন্দাবনার কথা বিজ্ঞানীরা বেশ জোরাল ভাবেই বলছেন। এছাড়া কোরানেও পৃথিবী ছাড়া অন্য কোথাও জীবের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ আছে।</p> <p>কোঁঃ তার অন্যতম নির্দশন আসমানসমূহ ও জমীন সমূহ সৃষ্টি এবং এ দুয়ের মধ্যে তিনি যে সব জীব-জন্ম ছড়িয়ে দিয়েছেন সেগুলো তিনি যখন ইচ্ছা তখনই ওদের সমবেত করতে সক্ষম। ৪২৪২৯ এছাড়া আরও অন্য কয়েকটি আয়াত আছে। বিজ্ঞানীদের ভাষায় যা alien কোরানের ভাষায় তা জিন হতে পারে।</p> <p>আকাশের অবস্থাঃ পতনশীল রেডজায়েন্ট তারকাগুলি আশে- পাশে সমস্ত পরিবেশ এবং আকাশকে লোহিত বর্ণ ধারণ করবে।</p>
<p>১৯৮০ সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ছায়াপথ (milkyway) গ্যালাক্সির কেন্দ্রীয় নিউক্লিয়ার প্রচন্ড শক্তিশালী চৌম্বক শক্তির কারণে বিশাল অগ্নিশিখার গ্যাসের চক্রাকার বেষ্টনীর সন্ধান পেয়েছেন। এটি সম্ভবত একটি বিশাল ব্ল্যাকহোল সূর্যের চেয়ে অনেক বড় অর্থে আয়তনে সৌরজগতের চেয়ে ছেট। এই অগ্নিশিখাকে ঘিরে রয়েছে বিশাল ধূলির মেঘ এবং অসংখ্য তারকা। উজ্জ্বলতম তারকাগুলি রেডজায়েন্টের অনুরূপ এবং সমগ্র এলাকা</p>	<p>কোঁঃ তোমরা অবশ্যই জাহানাম দেখবে। অতঃপর তোমরা তা অবশ্যই দেখবে দিব্য প্রত্যয়ে। ১০২৫৬-৭</p> <p>কোঁঃ এবং সকলের নিকট জাহানাম প্রকাশ করা হবে। ৭৯৪৩৬ গ্যালাক্সির সমস্ত তারকা গ্রহ ও অন্যান্য পদার্থসমূহ এবং পুনরুত্থানকৃত মানুষ ও জীৱ ব্ল্যাকহোলে পতন ঘটবে এবং ইঙ্কন বা জ্বালানী হিসাবে কাজ করবে।</p> <p>কোঁঃ তবে সেই আগুনকে ভয় কর যার ইঙ্কন (জ্বালানী) মানুষ ও পাথর, যা অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত আছে। ২৪২৪</p> <p>কোঁঃ হে বিশ্বাসীগণ তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার পরিজনদের আগুন হতে রক্ষা কর। মানুষ ও পাথর যার ইঙ্কন হবে। ৬৬৪৬</p> <p>কোঁঃ আমি অবশ্যই নরকের জন্য বহু জিন ও মানব সৃষ্টি করেছি। ৭৪১৭৯</p> <p>কোঁঃ আমি জিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহানাম পূর্ণ করবই। ১১৪১১৯, অনুরূপ আয়ত ৩২৪১৩। জাহানামের ইঙ্কন মানুষ ছাড়া জিন ও পাথর উল্লেখিত হয়েছে। পাথর বলতে তারকাসমূহের জীবন বিবর্তনের সৃষ্টি বিভিন্ন মৌলের মিশ্রণ এবং গ্রহের বিভিন্ন যৌগ উপাদান সমূহ হতে পারে। বিশাল এ মহাবিশ্বে পথিকীর মত অসংখ্য গ্রহ রয়েছে এবং সেখানে ভিন্ন প্রকৃতির জীবের বা alien এর অস্তিত্বের সন্দাবনার কথা বিজ্ঞানীরা বেশ জোরাল ভাবেই বলছেন। এছাড়া কোরানেও পৃথিবী ছাড়া অন্য কোথাও জীবের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ আছে।</p> <p>কোঁঃ তার অন্যতম নির্দশন আসমানসমূহ ও জমীন সমূহ সৃষ্টি এবং এ দুয়ের মধ্যে তিনি যে সব জীব-জন্ম ছড়িয়ে দিয়েছেন সেগুলো তিনি যখন ইচ্ছা তখনই ওদের সমবেত করতে সক্ষম। ৪২৪২৯ এছাড়া আরও অন্য কয়েকটি আয়াত আছে। বিজ্ঞানীদের ভাষায় যা alien কোরানের ভাষায় তা জিন হতে পারে।</p> <p>আকাশের অবস্থাঃ পতনশীল রেডজায়েন্ট তারকাগুলি আশে- পাশে সমস্ত পরিবেশ এবং আকাশকে লোহিত বর্ণ ধারণ করবে।</p>

উজ্জ্বল লোহিত বর্ণের।
এই ধূলির অম্বলটি
সমগ্র ছায়াপথ
গ্যালাক্সির সমতলে যে
ধূলি রয়েছে তারই
প্রসারণ।

গ্যালাক্সির কেন্দ্রীয় এই
ব্ল্যাকহোল ভিতর থেকে
বাহিরের দিকে
ক্রমান্বয়ে সমস্ত তারকা,
গ্রহ এবং অন্যান্য
পদার্থকে গ্রাস করবে।
এমনিভাবে ছায়াপথের
কেন্দ্রীয় ব্ল্যাকহোলটি
দশ হাজার কোটি
(১০০ বিলিয়ন) সৌর
ভরের এক সুবিশাল
ব্ল্যাকহোল সৃষ্টি করবে।
আরও সুদীর্ঘ অকল্পনীয়
(১০^{৩০} বৎসর) সময় পর
এই বিশাল ব্ল্যাকহোলটির
অনন্যতাটি যখন হকিং
রেডিয়েশনের মাধ্যমে
বিকিরণ ও বাস্পীয়করণ
প্রক্রিয়ায় বিলুপ্তি ঘটবে
তখন আবার ভীষণ আর
এক মহাবিস্ফোরণের
(big bang-2)
মাধ্যমে পুনরায় নতুন
মহাবিশ্ব সৃষ্টির জন্য
ইলেকট্রন, এন্টি
ইলেকট্রন এবং আলোক
কণার (photon)
তরল সুপ সৃষ্টি করবে।

কোঁ: অতঃপর যখন আকাশ বিদীর্ঘ হবে, তখন তা হয়ে যাবে
রক্ত বর্ণ রঞ্জিত লাল চামড়ার ন্যায়। ৫৫৯৩৭
কোঁ: সেদিন আকাশ হবে গলিত তামার ন্যায় ৭০৯৮
ব্ল্যাকহোলের পতনশীল চারদিক থেকে আসা অসংখ্য তারকা
এবং বিভিন্ন পদার্থ দীর্ঘ সময় ধরে এবং ব্ল্যাকহোলের বা
জাহানামের জুলানী হিসাবে ব্যবহৃত হবে।

আমি শপথ করি ভাষ্যমান গ্রহ নক্ষত্রের যা ভেসে বেড়িয়ে
(আবর্তনশীল অবস্থায়) অদ্শ্য হয়। ৮১৯১৫-১৬

কোঁ: আমি সর্বনিম্ন আকাশকে প্রদীপমালা (তারকারাজি) দ্বারা
সু-সজ্জিত করেছি, সেগুলোকে শয়তানদের জন্যে ক্ষেপনাস্ত্রবৎ
করেছি এবং প্রস্তুত করে রেখেছি তাদের জন্য জলস্ত অগ্নির
শাস্তি। ৬৭৯৫

কোঁ: তাদের (অবিশ্বাসীদের) বাসস্থান জাহানাম, যখন তা
স্থিমিত হবে তখন আমি ওদের জন্য অগ্নি বৃক্ষি করে দেবো।
১৭৯৯৭।

বিজ্ঞানীদের হিসাবমত এক অকল্পনীয় সু-দীর্ঘ সময় (১০^{৬০}
বৎসর) পর ব্ল্যাকহোলের অনন্যতাটি বাস্পীয়করণ হয়ে আর এক
মহাবিস্ফোরনে পুনরায় নতুন মহাবিশ্ব সৃষ্টি হবে।

কোঁ: বল পৃথিবীতে পরিশ্রমণ কর এবং অনুধাবণ কর কিভাবে
তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন? অতঃপর আল্লাহ পুনরায় সৃষ্টি
করবেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান ২৯৯২০

কোঁ: তিনি সৃষ্টিকে অন্তিমে আনয়ন করেন। অতঃপর তিনি
একে পুনরায় সৃষ্টি করবেন, এ তার জন্য সহজ। নভোমভূল ও
ভূ-মভলে তারই মর্যাদা সর্বোচ্চ। তিনিই পরাক্রমশালী,
বিজ্ঞানময়। ৩০৯২৭

কোঁ: তোমরা তো প্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে অবগত হয়েছ, তবে
তোমরা অনুধাবণ করলা কেন? ৫৬৯৬২।

নিম্নের বুখারী শরীফের দু'টি হাদীস মহান আল্লাহ পুনরায় সৃষ্টির
উদ্দেশ্য বর্ণনা করে।

হাঃ বেহেশত এবং জাহানাম তর্কে লিখে হয় এবং জাহানাম
বলে, “আমাকে অহংকারী ও অত্যাচারীদেরকে পাওয়ার
অধিকার দেওয়া হয়েছে” বেহেশত বলে, “আমার ব্যাপারটি
কি? জনতার মধ্যে যারা দুর্বল এবং ন্যূন শুধু তারাই কেন আমার
কাছে আসবে? এতে আল্লাহ বেহেশতকে বললেন, তুমি আমার
করুন। আমার দাসদের মধ্যে যাকে খুশী তাকে প্রদান করি।
তারপর আল্লাহ জাহানামকে বললেন, “তুমি আমার শাস্তি,
আমার দাসদের মধ্যে যাকে খুশী তাকে শাস্তি দিয়ে থাকি এবং
প্রত্যেকে তোমরা পূর্ণ হবে।” জাহানামের ক্ষেত্রে আল্লাহ
যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর পা এর উপর না রাখবেন, জাহানাম পূর্ণ
হবে না। এ অবস্থায় জাহানাম বলবে, যথেষ্ট!! সেই

সময় এটা পূর্ণ হবে এবং এর বিভিন্ন অংশ পরস্পরের কাছাকাছি আসবে এবং আল্লাহ সৃষ্টির কোন বিষয়ে ক্রটি করবেন না। বেহেশতের জন্যই আল্লাহ নতুন সৃষ্টি করে তা পরিপূর্ণ করবেন। আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণিত।

হাঃ লোকদের যখন জাহানামের (অগ্নি) নিকটবর্তী করা হবে এবং এটা তখন বলতে থাকবে “আরও আছে কি?” বহুবিশ্বের প্রতিপালক যখন এর উপর পা রাখবেন তখন এর বিভিন্ন পার্শ্ব পরস্পরের কাছাকাছি আসবে এবং এটা বলবে, “যথেষ্ট! যথেষ্ট!! আপনার মহানুভবতা, পরাক্রমশীলতা এবং বদন্যতায়” বেহেশতে তখন পর্যন্ত আরও মানুষের জন্য জায়গা থাকবে। আল্লাহ তখন বেহেশতের অতিরিক্ত স্থান পরিপূর্ণের জন্য আরও মানুষ সৃষ্টি করবেন। আনাস (রাঃ) বর্ণিত।

র্যাকহোলের ঘটনা দিগন্তে পতনশীল সমস্ত কিছুর তথ্য (information) সংরক্ষিত থাকে এবং তা সম্পূর্ণ পূর্বকালীণ অবস্থায় পুনরুজ্জীবিতকরণ সম্ভব।

সার -সংক্ষেপ (বিজ্ঞান)	কোরান/ব্যাখ্যা
১০। নাসার (NASA) একজন বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী ডঃ ষ্টেন ওডেনভার্ড জানান র্যাকহোলে পতিত সমস্ত তথ্য (information) ঘটনা দিগন্তে সংরক্ষিত থাকে। সাম্প্রতিক কণাবাদী মহাকর্ষ (quantum gravity) এবং অতিতন্ত্র তত্ত্বে (superstring theory) এর কিছু বিশেষজ্ঞ গাণিতিক হিসাবে এটাকে সুনির্ণিত করেন। ষ্টিফেন হকিং এবং তাঁর কিছু সহযোগীরা একদশক আগে একই প্রস্তাব রাখেন।	কোরান ও হাদীসে সবকিছু লিখে সংরক্ষণ করা এবং শেষ বিচারের দিন সবকিছুর পুনরুজ্জীবিত করার কথা অনেক জায়গায় বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে তারই কিছুর নমুনা। কোঃ আমি সব কিছুই লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করেছি। ৭৮:২৯
র্যাকহোলের পতনশীল কোন পদার্থের সকল তথ্য বিশেষ কোন সুকৌশলে সংকেত লিপির আকারে ঘটনা দিগন্তে কণাবাদী ফেল্ডে (quantum field) জমাট (frozen) অবস্থায়	কোঃ সেদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে, কারণ ওদেরকে ওদের কৃতকর্ম দেখান হবে। কেউ অনু পরিমাণ সংকাজ করলে তা দেখবে, এবং কেউ অনু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও দেখবে। ৯৯:৮-৮ কোঃ প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তার আমল নামা (কার্যলিপি) দেখতে আহবান করা হবে এবং বলা হবে তোমরা যা করতে আজ তোমাদের তারই প্রতিফল দেওয়া হবে। আমার নিকট সংরক্ষিত এই আমলনামা, যা সত্য ভাবে তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। তোমরা যা করতে তা আমি লিপিবদ্ধ করেছিলাম। ৪৫:২৮-২৯
	কোঃ আমি প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্ম তার গ্রীবালগ্ন করেছি এবং কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য একে পুনৰ্জাগরণে বের করব যা সে উন্মুক্ত পাবে। আমি বলব, তুমি তোমার গ্রন্থ পাঠ কর, তোমার হিসাব গ্রহণের জন্য আজ তুমি নিজেই যথেষ্ট। ১৭:১৩-১৪
	কোঃ বিচার দিন নির্ধারিত আছেন। ৭৮ : ১৭

সংরক্ষিত থাকে। এটা বেশ কিছু চমকপ্রদ সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে পারে। যদি কোন বিশ্লেষকর উপায়ে পতন এবং ধ্রংস প্রক্রিয়াকে পশ্চার্থদিকে পরিচালনা করা যায় তবে পতনশীল সবকিছু যেমন ঘড়ি, মানব সমাজ, মহাশূন্যযান, সমগ্র গ্রহাদি ইত্যাদি সম্পূর্ণ পূর্বকালীন অবস্থায় পুনরায় জীবিত করা সম্ভব।

কোঁ: এক নির্ধারিত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে সকলকে একত্রিত করা হবে। ৫৬৪৫০

কোঁ: আমি তোমাদের মৃত্যুকাল স্থির করেছি এবং আমি অঙ্গমও নই। আমি তোমাদেরকে তোমাদেরই অনুরূপ পরিবর্তিত করে দেব এবং তোমাদের এইরূপ গঠন করব যা তোমরা অবগত নও তোমরা তো প্রথম সৃষ্টি সময়ে অবগত হয়েছ তবে তোমরা অনুধাবন কর না কেন? ৫৩৪৬০—৬২

কোঁ: দেহে যখন আজ্ঞা পুণ সংযোজিত হবে। ৮৭৪৭

কোঁ: সেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে ফেলবো, যেভাবে গুটান হয় লিখিত দণ্ড, যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। আমর প্রতিশ্রূতি নিশ্চিত, আমাকে তা পূর্ণ করতেই হবে। ২১৪১০৪

বিশ্বং: এখানে আকাশ শব্দটি একবচনে আছে এর অর্থ শুধুমাত্র নিম্নতম বা প্রথম আকাশ যা তারকাগুঞ্জ খচিত তাই গুটানো হবে।

কোঁ: মৃত্তিকা তাদের কতটুকু গ্রাস করবে তা আমর জানা আছে এবং আমার কাছে আছে সংরক্ষিত নথি। (record) ৫৪৪৪

ব্ল্যাকহোল বা জাহান্নামের ধারণ ক্ষমতা অসীম।

সার-সংক্ষেপ (বিজ্ঞান)	কোরান/হাদীস/ব্যাখ্যা
১১। ব্ল্যাকহোলের ঘনমান আয়তন অসীম। অন্য কথায় ব্ল্যাকহোলে যদি চিরদিন পদার্থ ভরা হয় তবু কখনও এটা পূর্ণ হবে না। ব্ল্যাকহোলের ঘটনা দিগন্তে স্থান সংক্রান্ত মাত্রা (Space-dimension) ভবিষ্যত সময় মাত্রায় (time dimension) পরিণত হয়। সুতরাং ব্ল্যাকহোলের আয়তন সমতলের ক্ষেত্রফল গুণক সময় (Surface area \times lenght of time)। যেহেতু ব্ল্যাকহোল মোটামোটি চিরস্থায়ী সেহেতু এর ঘনমান আয়তনও অসীম এছাড়া ঘটনাদিগন্তের ব্যাসার্ধ ব্ল্যাকহোলের ভর (mass) বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়।	কোঁ: স্মরণ কর সেই দিনের কথা, যেদিন জাহান্নামকে জিজ্ঞাসা করবো তুমি কি পূর্ণ হয়েছে? জাহান্নাম বলবে- আরো কি আছে? ৫০৪৩ জাহান্নামের ধারণ ক্ষমতাও যে অসীম তা বুধারী ও মুসলিম শরীফে আবু হুরাইরা (রাঃ) এবং আনাস (রাঃ) বর্ণিত বেশ কয়েকটি হাদীস বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া প্রায় একই রকম কথা পুনরাবৃত্তি আছে। নিম্নে এ ধরনের দু'টি হাদীস তুলে ধরা হলো। হাঃ লোকদের জাহান্নামে অবিরাম নিষ্ক্রিপ্ত করা হবে এবং জাহান্নাম বলতে থাকবে আরও আছে কি? যখন মহিমান্বিত প্রতিপালকের পা এর উপর রাখবেন এবং তখন এর বিভিন্ন অংশ পরম্পরের কাছাকাছি আসতে থাকবে এবং এটা বলতে

একটি ছোট ঝ্যাকহোল গ্যালাক্সির সম্পূর্ণ তারকা এবং অন্যান্য পদার্থ শোষণ করে নিতে পারে। সূতরাং ঝ্যাকহোলের শোষনের ক্ষমতা অসীম।

থাকবে, “যথেষ্ট! যথেষ্ট!! আপনার মহিমায় ও সম্মানে”।

হাঃ যদি ‘খালফাত’ পাথরের চেয়ে সাতগুণ বড় কোন প্রকান্ড পাথর থাকত এবং তা জাহানামের প্রান্ত থেকে নিষ্কেপ করলে সুন্দর বছর সময় ধরে এর ভিতর দিয়ে চলার পর তা তলদেশে পৌছাবে।

ঝ্যাকহোল বা জাহানামের মরীচিকার (mirage) প্রভাব।

সার-সংক্ষেপ (বিজ্ঞান)	কোরান/ হাদীস/ ব্যাখ্যা
<p>১২। অতি সাম্প্রতি জ্যোতি বিজ্ঞানীরা আবিক্ষার করেছেন ঝ্যাকহোলের প্রবল মহাকর্ষের জন্য মহাজাগতিক মরীচিকার (Cosmic mirage) প্রভাব রয়েছে। আইনষ্টাইনও এ সম্পর্কে ভবিষ্যত বাণী করেছিলেন। ঝ্যাকহোল নিজেই একটি দূরবীনের কাঁচ বা লেনসের মত কাজ করে। দূরের কোন বস্তু (তারকা, গ্যালাক্সি বা অন্য মহাবিশ্ব) থেকে আসা আলোক রশ্মি ঝ্যাকহোলের নিকট পৌছালে তা প্রবল মহাকর্ষ প্রভাবে বক্রতা প্রাপ্ত হবে। এই বক্রতাই মরীচিকার সৃষ্টি করবে। এখানে একজন পর্যবেক্ষকের মনে হবে যে সে দু'টি</p>	<p>বুখারী ও মসুলিম শরীফে একাধিকবার আবু সাঈদ আল খুদরী (রাঃ) বর্ণিত সুন্দীর্ঘ সহীহ হাদীসে শেষ বিচার দিনের বিস্তারিত বর্ণনা আছে। এই হাদীসের অংশ বিশেষ নিম্নরূপ-</p> <p>হাঃ পুনরুত্থানের দিন এক আহবানকারী ঘোষনায় বলবেন, “প্রত্যেক জাতি যে যার উপাসনা করত তাকে অনুসরণ করুক” তখন একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া অন্য কোন কিছু যেমন মূর্তি এবং অন্যান্য দেব-দেবীকে উপাসনা করত তারা সবাই জাহানামে পতিত হবে। তারপর সেখানে যারা উপস্থিত থাকবে তাদের মধ্যে একমাত্র আল্লাহকে উপাসনাকারী প্রকৃতপক্ষে অনুগত এবং কপটচারী উভয়ই এবং বাকী দলটি হবে ধর্মগ্রন্থ (Scripture) অনুসারীরা। গ্রন্থধারীদের মধ্যে যারা আল্লাহর অংশীবাদী বা পুত্র হিসাবে ইজরা, যীশু- খ্রীষ্টকে উপসানা করত তাদেরকে বলা হবে, “তোমরা মিথ্যাবাদী। আল্লাহ কাহাকেও স্ত্রী বা পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন নাই।” তারা জিজ্ঞাসিত হবে, “তোমরা এখন কি চাও?” তারা বলবে, “হে আমাদের প্রভু! আমরা ত্রুট্যাত্ম, সূতরাং আমাদেরকে কোন পানীয় দেওয়া হউক। তারা তখন নির্দিষ্ট দিকে নির্দেশিত হবে এবং বলা হবে, “তোমরা পান করবে।” যেহেতু তারা জাহানামের অভিমুখে একত্রিত হবে যা পানির মরীচিকার (mirage) মত দেখাবে এবং যার বিভিন্ন পার্শ্ব পরস্পরকে ধ্বংস করবে। তখন তারা সবাই অগ্নিতে পতিত হবে।</p> <p>কোরানের কিছু আয়াত থেকে জাহানামে পানির মরীচিকা কিভাবে ঘটতে পারে তা বোঝার চেষ্টা করব।</p> <p>কোঃ আকাশ বিদীর্ঘ হবে এবং বহু দরজা ফাটল হবে এবং পাহাড়সমূহ (বালুকণায় পরিণত হয়ে) চালিত হবে। তখন তা</p>

বস্তু দেখছে। প্রকৃত
পক্ষে সে এমন একটা
কিছু দেখছে যা
সেখানে নেই এবং যা
আছে তা দেখছে না।

মরীচিকায় পরিণত হবে। ৭৮:১৯-২০
মরুভূমির ধূলিকণায় যেভাবে মরীচিকার প্রভাবে পানির আধার বলে
ভুল হয়। অথবা আর একটি পক্ষায় এই মরীচিকার প্রভাব ঘটতে
পারে যা বোঝার জন্য কোরানের দুটি সুরার ৪টি আয়াতের সাহায্য
নেওয়া যেতে পারে।

কোং যেদিন পরিবর্তিত করা হবে এ যমীনকে অন্য যমীনসমূহে
এবং পরিবর্তিত করা হবে আকাশসমূহকে। ১৪:৪

উপরের আয়াতে শেষ বিচারের জন্য পুনরুত্থান দিনের পূর্বে
আমাদের পৃথিবীর যমীনকে অন্য যমীনসমূহে রূপান্তর করা হবে
এবং সমুদয় আকাশসমূহকে অর্থাৎ প্রথম থেকে সম্পূর্ণ আকাশের
মধ্যে একটি পরিবর্তন আনা হবে। এই পরিবর্তনের ধারাটি কি
হবে তা পরিষ্কার ফুটে উঠেছে কোরানের নিম্নের তিনটি
আয়াতে।

কোং যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হবে এবং যখন
জাহানামে আগুন উদ্দীপিত হবে এবং যখন জান্মাত নিকটবর্তী
হবে। ৮১:১১-১৩

যখন আকাশের আবরণকে অপসারণ করে নিম্নতম আকাশে
জাহানামের আগুন উদ্দীপিত করা হবে এবং সর্বশেষ আকাশের
জান্মাতকে নিকটবর্তী করা হবে। এই নিকটবর্তী জান্মাতের পানির
বিভিন্ন উৎস জাহানামে মরীচিকার প্রভাব ঘটাতে পারে।

ব্ল্যাকহোলের অপসরণ

সার-সংক্ষেপ (বিজ্ঞান)	হাদীস/ ব্যাখ্যা
১৩। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত প্রত্যেকটি গ্যালাক্সির কেন্দ্রে একটি বিশাল আকৃতির ব্ল্যাকহোল আছে। ১৯৯৫ সালে বিজ্ঞানীরা NGC-4261 গ্যালক্সি আটশত আলোকবর্ষ ব্যাপী এলাকায় স্পাইরাল আকৃতির ধূলিকণার চাকতি ব্ল্যাকহোলটিকে জ্বালানী সরবরাহ করছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে সবচেয়ে বিশ্রয়কর ও হতবুদ্ধিকর প্রশ্ন হ'ল এই বিশাল আকৃতির ব্ল্যাকহোল গ্যালক্সির কেন্দ্র থেকে বিশ আলোকবর্ষ দূরে কিভাবে বিচুতি ঘটেছে। তাদের ধারণা ব্ল্যাকহোলের পতনশীল পদার্থের শীতল ধূলিকণার চাকতি রকেটের জ্বালানী ট্যাঙ্কের মত কাজ করে। পতনশীল পদার্থ প্রবল মহাকর্ষ <td>মুসলিম শরীফে আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণিত নিম্নলিখিত হাদীসটি বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। হাঃ সেদিন জাহানাম আনা হবে ৭০টি নিয়ন্ত্রকের সাহায্যে এবং প্রত্যেকটি নিয়ন্ত্রক নিয়ন্ত্রণ করবেন ৭০ জন ফেরেশতা। এছাড়া বুখারী শরীফের নিম্নে হাদীসটি এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। এটি একাধিকবার বর্ণিত হয়েছে।</td>	মুসলিম শরীফে আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণিত নিম্নলিখিত হাদীসটি বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। হাঃ সেদিন জাহানাম আনা হবে ৭০টি নিয়ন্ত্রকের সাহায্যে এবং প্রত্যেকটি নিয়ন্ত্রক নিয়ন্ত্রণ করবেন ৭০ জন ফেরেশতা। এছাড়া বুখারী শরীফের নিম্নে হাদীসটি এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। এটি একাধিকবার বর্ণিত হয়েছে।

বলের চাপে ও ঘর্ষনে কোটি কোটি ডিগ্রীতে উৎপন্ন হয়ে উঠে। এই উৎপন্ন গ্যাস ব্ল্যাকহোল থেকে জেটের আকারে প্রবল বেগে নিষ্কিণ্ড হতে থাকে। দ্রুত নির্গত গ্যাসের বিপরীত দিকে যেমন রকেট চালিত হয় ঠিক একইভাবে নির্গত এই গ্যাস ব্ল্যাকহোলের স্থান চূর্ণ করে থাকতে পারে। প্রকৃত কারণ অবশ্য বিজ্ঞানীদের নিকট এখনও অজানা।

হাঃ আমি জাহানাম দেখেছি এবং এর বিভিন্ন অংশ একে অপরকে গ্রাস করছে। হ্যারত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত।

ব্ল্যাকহোলের শক্তিশালী মহাজাগতিক রশ্মি (energetic cosmic rays) মহাবিশ্বের সমস্ত জীবন-ব্যবস্থার শক্তির এবং যাবতীয় তথ্য আদান-প্রদানের উৎস।

সার-সংক্ষেপ (বিজ্ঞান)	কোরান / ব্যাখ্যা
<p>১৪। ক) বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আঘাতকারী প্রচল শক্তিশালী উপপারমাণবিক শক্তিশালী মহাজাগতিক রশ্মির পতন এবং পরবর্তীতে পৃথিবীর ভূমিতে অপেক্ষাকৃত কমশক্তির আনুষঙ্গিক (Secondary) মৌলকণায় রূপান্তরিত হয়ে বর্ষিত হওয়ার কথা জানতে পারেন। মাত্র ২০০২ সালে নাসা এবং প্রিস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকবৃন্দ নানা পরীক্ষা-পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে নিশ্চিত হয়েছেন এই জাতীয় শক্তিশালী মহাজাগতিক রশ্মি (energetic cosmic ray) উৎস স্থল হ'ল ব্ল্যাকহোল। এগুলি বিশাল ব্যাটারীর মত স্ফুলিঙ্গের আকারে পৃথিবীর দিকে প্রায় আলোর গতিতে উপপারমাণবিক কণা সবেগে নিষ্কেপ করে।</p> <p>স্বল্প শক্তি সম্পন্ন নিউট্রিনোস, (neutrinos), ইলেক্ট্রন (electrons) ও মাউন (moun) এবং উচ্চ শক্তি সম্পন্ন প্রোটন, ইলেক্ট্রন এবং অনেক সময় ভারী নিউক্লিও (muclei) মহাবিশ্বের সর্বত্র আলোর গতিতে প্রতিনিয়ত ছুটে চলে।</p>	<p>কোরানের সুরা আল-মুরসালাতের (৭৭) প্রথম ছয়টি আয়াতের অনুবাদে প্রচলিত জ্ঞানে বোধগম্যের জন্য মূল শব্দগুলির সঙ্গে কিছু শব্দ সংযোজন করা হয়েছে। শব্দমাত্র মূলশব্দগুলি অনুবাদ করলে উক্ত সুরার প্রথম ছয়টি আয়াতের অর্থ নিম্নরূপঃ</p> <p>কোঃ শপথ তার যা কল্যাণস্বরূপ ক্রমাগতভাবে প্রেরিত হয়। অতঃপর অতি তীব্র বেগে চলে। বিস্তীর্ণ এলাকায় বিস্তার লাভ করে। অতঃপর বিদীর্ণ হয়ে বিভক্ত হয়। অতঃপর যা স্মরণ জগ্নিতকারী। অনুশোচনা কিংবা সতকর্তা স্বরূপ।</p> <p>৭৭:১-৬</p> <p>বিংশ-একবিংশ শতাব্দীর সক্ষান্ত প্রাণ মহাজাগতিক রশ্মির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলিই উপরোক্ত সুরায় প্রথম ছয়টি আয়াতে ফুটে উঠেছে। সুরাটির নাম মুরসালাত শব্দের অর্থও নিষ্কেপ (Emissary)।</p> <p>বাম পার্শ্বের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সঙ্গে এখন নিম্নের কোরানের দুটি সুরার চারটি আয়াত গভীর মনোযোগ সহকারে লক্ষণ।</p>

মহাজাগতিক রশ্মি আমরা চোখে দেখিনা, তবে নানাভাবে এদের উপস্থিতি প্রমাণিত হয়েছে। স্বল্প শক্তির ওজনহীন কণা নিউট্রিনস আমাদের শরীরের ভিতর দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে গড়ে প্রায় দশ হাজার কোটি (১০০ বিলিয়ন) পরিমাণ অতিক্রম করে চলে। তেমনিভাবে চার পাশের সবকিছুর মধ্যে দিয়ে চলে। আর উচ্চ শক্তিশালী কণিকাগুলি যেমন, প্রটোন (যা পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী যন্ত্রে উৎপন্ন শক্তির চেয়ে দশ কোটি গুণ শক্তি যোগায়।) পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আঘাত হানার ফলে অপেক্ষাকৃত কমশক্তি আনুষঙ্গিক (secondary) উপ-পারমাণবিক কণার বর্ষণ সৃষ্টি করে। এগুলি পৃথিবীর ভূমিতে বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে অবলোকন করা যায়।

সমস্ত উপপারমাণবিক মৌলকণা (ইলেক্ট্রনস, নিউট্রোস, ফুন্মাউন, প্রটোন ইত্যাদি) যা দ্বারা সমস্ত পদার্থ গঠিত হয় স্থান-কালের কোন বিন্দুতে এর সঠিক অবস্থান বর্ণনার জন্য শোয়ার্জশীল মাপ বিজ্ঞান অনুসারে একটি সম্পূর্ণ ক্ষুদে ওয়ার্মহোল (microscopic worm holes) এবং যা অন্য মহাবিশ্বের সঙ্গে সংযোগ সৃষ্টি করে। যেমন বৈদ্যুতিক চার্জ সৃষ্টি হয় বলের ক্ষেত্রগুলি (fields of forces) থেকে যা সম্ভবত অন্য কোন মহাবিশ্ব থেকে ওয়ার্মহোলের সঙ্কীর্ণ সূক্ষ্ম পথে এসে থাকে।

আমাদের সমগ্র মহাবিশ্বকে ইলেক্ট্রন দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করলে দেখতে পাব এক অস্বাভাবিক প্রকান্ড ভয়ঙ্কর ফুটত পুরু ফেনায়িত পুড়িং এর মত।¹⁰ তত্ত্বানুসারে

করুন।

কোঁ: সমস্ত প্রশংসা আল্ট্রাহার যিনি আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সমস্ত কিছুরই মালিক এবং পরলোকেও সকল প্রশংসা তারই। তিনি বিজ্ঞানময় অভিজ্ঞ তিনি জানেন যা জমীন সমূহে প্রবেশ করে, যা তা হতে বের হয় এবং যা আকাশ হতে বর্ষিত হয় ও যা কিছু আকাশে উপ্থিত হয়। তিনি দয়াময়; ক্ষমাশীল। ৩৪ঃ১-২

কোঁ: তিনি জানেন যা কিছু জমীনসমূহে প্রবেশ করে ও জমীনসমূহ হতে নির্গত হয় এবং আকাশ হতে যা বর্ষিত হয় এবং আকাশে যা কিছু উপ্থিত হয় তোমরা যেখানেই থাকনা কেন, তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমরা যা কিছু কর আল্ট্রাহ তা দেখেন। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আধিপত্য তারই, সমস্ত বিষয় আল্ট্রাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। ৫৭ঃ৪-৫

কোরানের ৩৪ঃ১-২ সুরায় মহাবিশ্বের ভূমণ্ডল এবং মহাশূন্যের মধ্যে কিছু (মহাজাগতিক রশ্মি এবং অন্য আরও কিছু) আদান-প্রদানের মাধ্যমে আল্ট্রাহর বিশেষ দু'টি গুণ দয়া ও ক্ষমা সম্পর্কিত।

পৃথিবীতে প্রত্যেকটি প্রাণীর টিকে থাকার জন্য জীবিকা ছাড়াও অনেক জানা এবং অজানা উপাদান এবং প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। যেমন শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের জন্য অক্সিজেন, কার্বন চক্র, নাইট্রোজেন চক্র, শিলাচক্র ইত্যাদি। এখানে কোরানের অন্য দুটি সুরায় দু'টি আয়াত বিশেষভাবে স্মরণীয়।

কোঁ: যমীনসমূহে এমন কোন বিচরণ শীল প্রাণী নেই, যার জীবিকার দায়িত্ব আল্ট্রাহর

(theoretical) এই পরিবেশে চলমান ইলেকট্রন ওয়ার্মহোলের সম্মুখীন হয়ে তাতে পতিত হবে এবং অন্য মহাবিশ্বে তা নিষ্কিঞ্চ হবে। পদার্থ বিজ্ঞানের আইনানুযায়ী সমান সংখ্যক ইলেকট্রন অন্য পথে আমাদের মহাবিশ্বে চুকে পড়ে। ইলেকট্রনের মত অন্য সমস্ত অসংখ্য উপ-পারমাণবিক মৌলকণ একইভাবে চলাচল করে।

এখানে বিশেষভাবে স্মরণীয় ওয়ার্মহোলের সংযোগ যদিও অলীক সময়ের (imaginary time) জন্য, তবে মহাবিশ্ব সৃষ্টির সূচনালগ্নে সৃষ্টি ওয়ার্মহোলগুলি অতি অল্প বা অলীক সময়ের জন্য নাও হতে পারে। এটি আমাদের মহাবিশ্বের সঙ্গে সংযুক্ত এবং কোটি কোটি আলোক বর্ষ ব্যাপী এলাকায় প্রসারিত হতে পারে।

তত্ত্ববিদরা (theorist) ভেবে বিশ্বিত সমস্ত মৌলকণগুলিই (subatomic particles) হতে পারে আণুবীক্ষণিক (microscopic) ওয়ার্মহোল। আর সমস্ত পদার্থের গঠন কণিকা বিন্দুর মাধ্যমে ঘটে এবং স্থান-কালে বক্রতা সৃষ্টি করে।

উপর ব্যতীত (অন্য কারো উপর আছে)। তিনি জানেন তারা কোথায় থাকে এবং কোথায় সাময়িকভাবে সমাপিত (temporary deposit) হয়। সবকিছু সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ (Record) থাকে। ১১৪৬

কোঁ: এবং কে তোমাদের আকাশ ও ভূমভল হতে উপজীবিকা দান করেন? ২৭৪৬৪

কোরানের উপরোক্ত ৫৭:৪-৫ সুরায় ৩৪:১-২ সুরার ন্যায় ভূমভল ও মহাশূন্যের মধ্যে কিছু আদান-প্রদানের মাধ্যমে আল্লাহর সবকিছু জানা, দেখা, তথ্য সংরক্ষণ এবং আধিপত্য প্রকাশ পেয়েছে। কোরানের বিভিন্ন সুরায় অনেক আয়াতে এর প্রতিধ্বনি রয়েছে।

কোঁ: ওদের অন্তরে যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে তা তোমরা প্রতিপালন অবশ্যই জানেন নভোমভল ও ভূমভলে এমন কোন রহস্য নেই, যা সুস্পষ্ট কেতাব লিপিবদ্ধ নেই। ২৭:৭৪-৭৫

কোঁ: তুমি যে কোন কর্মেই রত হও, এবং তার কোরান হতে যাই পাঠ কর এবং তোমরা যে কোন কাজই করনা কেন, আমি তোমাদের পরিদর্শক যখন তোমরা ওতে লিঙ্গ হও। নভোমভল ও ভূমভলের তার বিন্দু পরিমাণেও অপ্রকাশিত থাকে না তোমার প্রতিপালকের নিকট এবং এর ক্ষেত্র অথবা বৃহৎ বিষয়, প্রকাশ্য গ্রন্থে অস্তর্গত ব্যতীত নয়। ১০:৬১ অনুরূপ আয়াত রয়েছে ৩৬:১২; ২২: ৭০; ৩৪:৩ ইত্যাদি।

কোঁ: আকাশে রয়েছে তোমাদের জীবনোপকরণের উৎস ও প্রতিশ্রূত সমস্ত কিছু। ৫১:২২

**ବ୍ୟାକହୋଲେର ଅକଳ୍ପନୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ
ତା ପୃଥିବୀର ଆବହାଓୟାକେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ।**

ସାର-ସଂକ୍ଷେପ (ବିଜ୍ଞାନ)	କୋରାନ/ ହାଦୀସ/ ସ୍ୟାଖ୍ୟା
<p>୧୪ । ଥ) ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନୀରା ନିଶ୍ଚିତ କେବଳମାତ୍ର ବ୍ୟାକହୋଲେରଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରିମାଣ ଉତ୍ତାପ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ପରିମାଣ ଶୀତଳ ଅନ୍ୟ କଥାଯ ଚରମ ଓ ପରମ ତାପମାତ୍ରା ରହେଛେ । ପୂର୍ବେହି ଉତ୍ସ୍ରେଖିତ ହରେହେ ବ୍ୟାକହୋଲେ ପତନଶୀଳ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥରେ ଧୂଳିକଣା ଓ ଗ୍ୟାସ ପ୍ରଚନ୍ଦ ଗତିତେ ପୁଣିତ ଚାକତି ଥେକେ ପ୍ରଥମେ ଘଟନା ଦିଗନ୍ତ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀତେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଗନ୍ଧବ୍ୟାହ୍ରଳ ମହାକର୍ଷ କୃପେର ଦିକେ ଧାବିତ ହୁଏ । ଧାବମାନ ଏହି ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ପରମ୍ପରର ସଙ୍ଗେ ଘାତ-ପ୍ରତିଘାତେ କୋଟି କୋଟି ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାଯ ଉତ୍ତାପ ହୁଏ ଉଠେ । ଟିଫେନ ହକିଂ ଏର ଗାଣିତିକ ହିସାବ ମତ ଆଦିମ କ୍ଷୁଦେ (ପ୍ରଟୋନେର ଆକାରେର) ବ୍ୟାକହୋଲେର ତାପମାତ୍ରା ବାର ହାଜାର କୋଟି କେଲିଭିନ୍ନ । ବିପରୀତେ ବ୍ୟାକହୋଲେର ଭିତରେ ତିନ ସୌରଭର ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟାକହୋଲେର ଶୀତଳ ତାପମାତ୍ରା ପରମ ଶୂନ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା (-୨୭୩°C) ଏବଂ ଏକ ଡିଗ୍ରୀର ଦଶ ଲକ୍ଷ ଭାଗେର ଏକ ଭାଗେରେ କମ । ଆବାର ବ୍ୟାକହୋଲଟି ଯଦି ଉପରେ ଉତ୍ସ୍ରେଖିତ ବ୍ୟାକହୋଲେର ଚେଯେ ଏକଶତ କୋଟିଶହ ବଡ଼ ହୁଏ ତବେ ତାର ତାପମାତ୍ରାଓ ଏକଶତ କୋଟି ଗଣ ଠାର୍ଡା ହବେ ।</p> <p>ଗତ ଶତାବ୍ଦୀର ଆଶିର ଦଶକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜ୍ଞାନୀଦେର ଧାରଣା ଛିଲ ବ୍ୟାକହୋଲ ଥେକେ ତାପ, ଆଲୋ କୋନ କିଛୁଇ ବିକିରଣ ଘଟେ ନା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନେ ତାଦେର ଏହି ଧାରଣା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏଛେ । ବ୍ୟାକହୋଲ ଥେକେ କୋନ ନା କୋନଭାବେ ଏର ପ୍ରଚନ୍ଦ ଉତ୍ତାପ ଏବଂ ପରମ ଶୀତଳ ତାପମାତ୍ରା ମହାବିଶ୍ଵେ ସମ୍ବଲିତ ହୁଏ ।</p>	<p>ବ୍ୟାକହୋଲ ବା ଜାହାନାମେର ପ୍ରଚନ୍ଦ ଉତ୍ତାପ ଏବଂ ପରମ ଶୀତଳ ତାପମାତ୍ରା କୋରାନେର ନିମ୍ନଲିଖିତ ସୁରାର ଆୟାତ ଥେକେ କିଛୁଟା ଅନୁମେଯ ।</p> <p>କୋঁ: ସুତରାঁ ଓରା (সীମାଲଜନକାରୀରା) ଆସ୍ତାଦନ କରକୁ ଫୁଟ୍ଟ ତରଲ ଏବଂ ଘନ ଅନ୍ଧକାରମୟ ତୀତ୍ର ଶୀତଳ ତରଲ । ୩୮୯୫୭</p> <p>କୋঁ: ସେଖାନେ ଓରା କୋନ ଶୀତଳ ବଞ୍ଚି ଉପଭୋଗ କରବେ ନା, ପାନୀଯଓ ନୟ କେବଳ ଫୁଟ୍ଟ ତରଲ ଏବଂ ଘନ ଅନ୍ଧକାରମୟ ତୀତ୍ର ଶୀତଳ ତରଲ । ୭୮୯୨୪-୨୫</p> <p>ବିଶ୍ରଦ୍ଧଃ ଉପରେର ଆୟାତେ ଆଲ ହାମୀମ ଏବଂ ଆଲ ଗ୍ୟାସାକ ଶବ୍ଦ ଦୂଟି ଅନେକେ ଯଥାକ୍ରମେ ଫୁଟ୍ଟ ପାନି ଓ ପୁଜ ଅନୁବାଦ କରେଛେନ କିନ୍ତୁ ଇଉସୁଫ ଆଲୀ ସାହେବ ଅନୁବାଦ କରେଛେନ boiling fluid ଏବଂ fluid of dark murky intensely cold । ଏହି ସଠିକ ବଲେ ମନେ ହୁଏ ।</p> <p>ଜାହାନାମେ ପ୍ରଚନ୍ଦ ଉତ୍ତାପ ଏବଂ ପରମ ଶୀତଳ ତାପମାତ୍ରା ଆମାଦେର ପୃଥିବୀର ଆବହାଓୟାତେ ଯେ ପ୍ରଭାବ ଫେଲେ ତା ନିମ୍ନଲିଖିତ ବୁଝାରୀ ଶରୀଫେର ସହିହ ହାଦୀସ ଥେକେ ଜାନା ଯାଏ ।</p> <p>ହାଃ ଜାହାନାମ ଏକବାର ତାର ରବେର କାହେ ଅଭିଯୋଗ କରେ, ହେ ଆହ୍ଲାହ ଆମାର ଏକ ଅଂଶ ଅପର ଅଂଶକେ ଥେଯେ ଫେଲଛେ, ତଥନ ଆହ୍ଲାହତାଯାଳା ତାକେ ଦୁ'ଟି ନିଃଶ୍ଵାସ ଛାଡ଼ାର ଅନୁମତି ଦେନ । ଏକଟି ଶୀତକାଳେ, ଅପରଟି ଗ୍ରୀକାଳେ, ଏଜନ୍ୟାଇ ତୋମରା ତୀତ୍ର ଗରମ (ଗ୍ରୀକ) ଏବଂ ତୀତ୍ର ଶୀତ (ଶୀତକାଳ) ଅନୁଭବ କର । ଆବୁ ହରାଇରା (ରାଃ) ବର୍ଣିତ । ହାଦୀସେ ବର୍ଣିତ ନିଃଶ୍ଵାସ ତାପେର ବିକିରଣ ସମତୁଳ୍ୟ ।</p>

পার্থিব বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা ব্ল্যাকহোল থেকে
বিকিরিত মহাজাগতিক রশ্মির উপর নির্ভরশীল।

সার-সংক্ষেপ (বিজ্ঞান)	কোরান/ হাদীস/ ব্যাখ্যা
<p>১৪। গ) সাম্প্রতিক স্যাটেলাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্যে এবং আমেরিকার বেশ কিছু গবেষক ও নিউয়র্কের আলবানী রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদালয়ের বিজ্ঞানী ফানিকুন যু এর (Fanqun yu) গবেষণায় জানা যায় মহাজাগতিক রশ্মির তীব্রতা এবং নিম্নমেঘ দ্বারা আচ্ছাদিত পৃথিবীর অংশ বিশেষ পরম্পর সম্পর্কযুক্ত। মহাজাগতিক রশ্মির বৈদ্যুতিক চার্জ সম্পন্ন অতি ক্ষুদ্র উপ-পারমাণবিক কণা সমস্ত এই-সমূহতে সৌর প্রবাহের (Solar wind) তীব্রতার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন দ্রুতির স্পন্দনে (frequency) আঘাত হানে। পার্থিব মেঘের বায়ু মণ্ডলের নিয়মতাত্ত্বিক পরিবর্তনের ফলে বায়ু মণ্ডলের তাপমাত্রা নির্ভরশীল। যু-এর গবেষণায় মহাজাগতিক রশ্মির পরিমাণ এবং বৈদ্যুতিক চার্জ দ্বারা সৃষ্ট স্থূলাণু (ions) নিম্ন বায়ুমণ্ডলীয় কণার উৎপাদনের হার উদ্বৃত্তি করে মেঘকে আরও অঙ্ককারাচ্ছন্ন করে ঘন মেঘ গঠনে অবদান রাখে। অন্য কথায় পার্থিব বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রায় তারতাম্যের জন্য মহাজাগতিক রশ্মি প্রধান ভূমিকা রাখে।</p>	<p>কোঃ তিনিই তোমাদের বিদ্যুৎ দেখান, যা ভয় ও ভরসার সংগ্রাম করে এবং তিনি উত্থিত করেন ঘন মেঘমালা।</p> <p>১৩৪১২</p> <p>কোরানের উপরের আয়াতে ঘন মেঘ গঠনে বিদ্যুতের ভূমিকার ইঙ্গিত দেয়। এখন নিম্নের দুটি হাদীস থেকে জাহান্নাম বা ব্ল্যাকহোল থেকে যে তাপ বিকিরণ ঘটে এবং তা আমাদের পার্থিব আবহাওয়ার প্রভাব ফেলে তা লক্ষ্য করুন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণিত।</p> <p>হাঃ যখন খুব গরম থাকে, শীতল না হওয়া পর্যন্ত নামাজে অপেক্ষা কর কারণ তাপের তীব্রতা জাহান্নাম থেকে প্রবাহিত বায়ু (বিকিরণ)।</p> <p>বুখারী শরীফে আবু সাউদ (রাঃ) বর্ণিত অনুরূপ আর একটি হাদীস ঠাভা না হওয়া পর্যন্ত নামাজে দেরী কর, কারণ তাপের তীব্রতা আসে জাহান্নাম থেকে নিঃসৃত বাতাসে।</p> <p>মহাজাগতিক রশ্মির উৎস স্থল ও ব্ল্যাকহোল বা জাহান্নাম।</p>

ওয়ার্মহোল/ আইনষ্টাইন-রোজেন সেতু এবং জান্নাতে প্রবেশের জন্য
জাহান্নামের উপর স্থাপিত সেতু।

সার-সংক্ষেপ (বিজ্ঞান)	কোরান/ হাদীস/ ব্যাখ্যা
<p>১৫। (ক) ওয়ার্মহোল ই'ল মহাবিশ্বের বিশাল দূরত্বের দু'টি এলাকাকে একটি সংকীর্ণ প্রবেশ</p>	<p>কোঃ বিচার দিন নির্ধারিত আছে, সেদিন শিঙায় ফুৎকার দেওয়া হবে এবং তোমরা দলে দলে সমাগত হবে। সেদিন আকাশ খুলে যাবে, তখন তা</p>

পথ (সেতু) দ্বারা সংযুক্ত অতি সংক্ষিপ্ত পথ। এটি স্থান-কালের (space-time) একটি অংশের সঙ্গে অন্য অংশের সংযুক্তকারী ছিমুখী সুড়ঙ্গ (tunnel)। ঝ্র্যাকহোলের মত এটি বর্তুলাকার (sphere) তবে পার্থক্যটা হচ্ছে ঝ্র্যাকহোলের ঘটনা দিগন্ত যেখানে শুধু একদিকের রাস্তা ওয়ার্মহোলের মুখ তা নাও হতে পারে। এই পথে সুদূর মহাশূন্যে অতি অল্প সময়ে এমনকি অতিক্রান্ত সময়ে ভ্রমণ যেমন সম্ভব তেমনি সম্পূর্ণ নতুন অন্য কোন মহাবিশ্বে প্রবেশও সম্ভব।

১৯৩০ সালে প্রিস্টনে আইনষ্টাইন ও নাথান রোজেন আবিষ্কার করেন শোয়ার্জশীল সমীকরণের সমাধান প্রকৃতপক্ষে ঝ্র্যাকহোলের একটা সমতল যা স্থান কালের দুটি এলাকার মধ্যে সেতু (bridge) হিসাবে প্রকাশ করে। একেই আইনষ্টাইন-রোজেন সেতু বলে। পরবর্তীতে কীপথ্রোগ এবং তার দু'জন ছাত্র গাণিতিক সমাধানের মাধ্যমে দেখান এই পথে মহাবিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ভ্রমণ যেমন সম্ভব তেমনিভাবে সম্পূর্ণ নতুন অন্য কোন মহাবিশ্বে পাড়ি জমানোও সম্ভব। তবে এখানে অবশ্যই মনে রাখতে হবে এই ওয়ার্মহোলের স্থায়ীভূ খুবই কম এবং ঘটনা দিগন্তে ধ্রংস হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

অনেক দরজায় পরিণত হবে। ৭৮ঃ১৭-১৯
কোঃ নিশ্চয় যারা আমার নির্দর্শনকে অঙ্গীকার করে এবং অহংকার বশত তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদের জন্য আকাশের ঘারসমূহ উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জাহানে প্রবেশ করতে পারবে না, যে পর্যন্ত সূচের ছিদ্রে উট প্রবেশ না করে, এ রূপে আমি অপরাধীদের প্রতিফল দেব। ৭ঃ৪০

কোঃ এবং তোমাদের মধ্যে এমন কেউই নেই যে অমান্য করে, সকলকেই ওর উপর দিয়ে যেতে হবে। এ তোমাদের প্রতিপালকের অনিবার্য নির্দেশ। পরে আমি সংযমীদের উদ্ধার করব এবং সীমালজ্জনকারীদের সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দেব। ১৯ঃ ৭১-৭২

কোরআনের আর একটি পরোক্ষ আয়াতে সেদিন জাহানের (অন্য মহাবিশ্ব) নিকটবর্তী করার কথা আছে।

কোঃ যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হবে এবং যখন জাহানামে আগুন উদ্বিগ্নিত হবে এবং যখন জাহান নিকটবর্তী হবে। ৮১ঃ১১-১৩

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আবু সাঈদ আল খুদরী (রাঃ) বর্ণিত শেষ বিচার দিন সংক্রান্ত এক সুদীর্ঘ হাদীসে সমস্ত জাতির বিচার শেষে শুধুমাত্র এক আল্লাহকে বিশ্বাসী (কপটাচারীসহ) মহান আল্লাহ দেখা দিবেন।

হাঃ তারপর জাহানামের উপর দিয়ে সেতু স্থাপন করা হবে, মধ্যস্থতার জন্য অনুমতি দেওয়া হবে, এবং তারা বলতে থাকবে “হে আল্লাহ রক্ষা কর, রক্ষা কর।” আল্লাহর রসূলকে (সাঃ) জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল “সেতুটি কি? তিনি বললেন “এটি একটি ফাঁকা স্থান (void) যেখানে আকস্মিক পতন (slip) ঘটবে।”

বিংশ্রঃ বুখারী ও মুসলিম শরীফে শেষ বিচার দিন সম্পর্কিত অনেকগুলি বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাণ সুদীর্ঘ হাদীস রয়েছে। পরবর্তীতে হাদীসগুলির বিভিন্ন অংশ বিশেষ উল্লেখ পাবেন।

**অস্তুত বহিরাগত পদাৰ্থ (exotic matter) ব্যবহাৰ কৰে ওয়াৰ্মহোলেৰ মুখ
বা সেতুৰ পথ দীৰ্ঘ সময় খোলা রাখা সম্ভব।**

সাৱ-সংক্ষেপ (বিজ্ঞান)	কোৱান/ হাদীস/ ব্যাখ্যা
<p>১৫। ৬) ওয়াৰ্মহোলেৰ সংক্ষিপ্ত পথ সেতুৰ মত ব্যবহাৰ কৰে অন্য মহাবিশ্বে পৌছানৰ সম্ভাবনাৰ কথা বিজ্ঞানীৱা যেমন বলছেন তেমনি এৱ গঠন থেকে পৱৰ্তীতে মোচড়ায়ে ধৰণ হয়ে অনন্যতায় পৱিণত হয় -অবিশ্বাস্য রকম খুবই অল্প সময়ে। অন্য কথায় এই ওয়াৰ্মহোল খুবই ক্ষণস্থায়ী। তবে বিজ্ঞানীৱা এটাও বিশ্বাস কৰেন ঝণাত্মক ভৱেৰ বাহিৱাগত অস্তুত পদাৰ্থ (exotic matter) ব্যবহাৰ কৰে ওয়াৰ্মহোলেৰ মুখ দীৰ্ঘ সময় খোলা রাখা সম্ভব। মহাবিশ্বে এই জাতীয় পদাৰ্থেৰ অস্তিত্বেৰ সম্ভাবনাৰ কথা পদাৰ্থ বিজ্ঞানেৰ আইনে অস্বীকাৰ কৰে না।</p> <p>ব্ল্যাকহোলেৰ নিকট ওয়াৰ্মহোলেৰ স্থায়ীভুত্ব বৃক্ষিৰ সম্ভাবনা বেশী থাকে। কাৱণ এৱ নিকট ফাঁকাস্থানেৰ চাপ্পল্যতা (vacuum fluctuation) ফলে ভীষণ বিকৃত মূৰ্তি ধাৱণ কৰে ঝণাত্মক ভৱেৰ (exotic) পদাৰ্থেৰ সৃষ্টি কৰে ঘটনা দিগন্তকে সঙ্কোচনেৰ মাধ্যমে বিলুপ্তি ঘটায় এবং সংযোগকাৰী ওয়াৰ্মহোলেও অনুৱপ ফাঁকাস্থানেৰ চাপ্পল্যতাৰ মাধ্যমে exotic পদাৰ্থেৰ ঝণাত্মক ভৱেৰ জন্য ওয়াৰ্মহোলেৰ স্থায়ীভুত্ব বাড়িয়ে অন্য মহাবিশ্বে যাওয়াৰ পথকে খোলা রাখে।</p> <p>মহাবিশ্বেৰ জন্মেৰ সূচনা লগ্ন থেকে প্ৰবল শক্তিশালী ঝণাত্মক ভৱেৰ মহাজাগতিক তাৱ (cosmic string) আমাদেৱ দৃশ্যমান মহাবিশ্ব থেকে অদৃশ্য মহাবিশ্ব পৰ্যন্ত বিস্তৃত। আদি শক্তিৰ ক্ষেত্ৰ (original energy</p>	<p>কোৱান এবং হাদীসেৰ বিভিন্ন তথ্য থেকে আমৱা জানতে পাৱি শেষ বিচাৰ দিন প্ৰত্যেকে জাহান্নাম দেখবে। জাহান্নাত বা বেহেশতে যেতে এই জাহান্নামেৰ উপৰ দিয়ে একটি অতি সৱু সূক্ষ্ম সেতু অতিক্ৰম কৰতে হবে। শুধুমাত্ৰ আল্লাহ যাদেৱকে চাইবেন তাৱাই এই সেতু অতিক্ৰম কৰতে সম্ভম হবে বাঁকীৱা জাহান্নামে নিষ্কিপ্ত হবে।</p> <p>কোৱানেৰ ওয়াছামা-ইযাতিল হৰুকি - ৫১:৭ আয়াতটি প্ৰচলিত বিভিন্ন অনুবাদে কক্ষপথ/বহুপথ/তৱঙ্গায়িত/অসংখ্য পথে পৱিপূৰ্ণ আকাশেৰ শপথ হিসাবে অনুবাদ কৰা হয়েছে। অথচ তিন শব্দেৰ উপৰোক্ত আয়াতেৰ 'যাতা' শব্দটিৰ ক্ৰিয়াৰ ভাৱ প্ৰকাশক হিসাবে আভিধানিক অৰ্থহলো অতিশয় তীব্ৰ ভাৱে চেপে ধৰা আৱ 'হৰুক' শব্দটিৰ অৰ্থ হ'ল-একত্ৰে সংলগ্ন কৰে ঘন ও সুদৃঢ় কৰা, অত্যন্ত দক্ষতাৰ সাথে বুনন সৃষ্টি কৰা, ভাৱসাম্যেৰ সাথে অথচ আলগাভাৱে ঝুলা, সৱুফালি, কুণ্ডলীকৃত ব্যাস, একটি সূতা বা তাৱ, লম্বাপুচ্ছ, সূতা বা রশিকে পাক দেওয়া।</p> <p>উপৱেৰ অৰ্থগুলিৰ মধ্যে মহাজাগতিক তাৱেৰ বৈশিষ্ট্যগুলি পৱিষ্ঠাৰ ফুটে উঠে। এ বিষয়ে বিস্তৃত জানতে কাজী জাহান সাহেবেৰ আল কোৱান দ্যা চালেঞ্জ (মহাকাশ পৰ্ব-১) গ্ৰন্থেৰ ২৪৮-২৪৯ পৃষ্ঠায় দেখুন।</p> <p>মুসলিম শৱীফে আবু সাঈদ আল খুদৰী</p>

fields) দ্বারা পরিপূর্ণ এই মহাজাগতিক তার exotic পদার্থের প্রবল ক্ষমতা ব্যবহার করে অন্য মহাবিশ্বে পাড়ি দেওয়ার জন্য ব্ল্যাকহোলের নিকট সৃষ্টি ওয়ার্মহোলের পথ খোলা রাখার স্থায়ীভুক্ত বৃক্ষি করে।

এই মহাজাগতিক তার খুবই সূক্ষ্ম এবং এর ব্যাসার্ধ এক সেন্টিমিটারের লক্ষ কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র। অন্য দিকে এক ঘন সেন্টিমিটার মহাজাগতিক তারের ঝণাত্বক ভর হচ্ছে দশ কোটি কোটি (এক হাজার ট্রিলিয়ন) মেট্রিক টন। অর্থাৎ অন্য মহাবিশ্বে পাড়ি দেওয়ার জন্য যে ঝণাত্বক ভরের প্রয়োজন তা মহাজাগতিক তারের আছে।

আমেরিকার বেশ কিছু প্রখ্যাত জগৎ বিজ্ঞানী অতি সম্প্রতি ফিজিক্যাল রিভিউ সাময়িকীতে ওয়ার্মহোল সম্পর্কে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেন- “ওয়ার্মহোল যদিও আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বানুসারে ধারণা করা হয় ক্ষণস্থায়ী তথাপি বিগ-ব্যাংগের মাধ্যমে মহাবিশ্ব গঠনকালে ঝণাত্বক ভরের মহাজাগতিক তারের কুভলী দ্বারা সৃষ্টি ওয়ার্মহোলগুলির স্থায়ীভুক্ত লাভ ক'রে থাকতে পারে। এটাই যদি সত্য হয় তবে এখনও বিদ্যমান এবং তা সন্দান করা প্রয়োজন। যদি আমরা একটা খুজে পাই তার গুরুত্ব হবে অপরিসীম।”

(ৱা) বর্ণিত হাদীস-

হাঃ সেতুটি হবে একটা চুলের চেয়ে সরু এবং তরবারীর চেয়ে তীক্ষ্ণ।

হযরত আনাস (রা) বর্ণিত অনুজ্ঞপ্রাপ্ত একটি হাদীস-

হাঃ সেতুটি হবে তরবারীর ন্যায় তীক্ষ্ণ এবং চুলের ন্যায় সরু। ফেরেশতারা বিশ্বাসী নর-নারীকে উদ্ধার করবেন। ফেরেশতা জিবরাইল (আঃ) আমার কোমর ধরবেন এবং আমি বলতে থাকব- হে প্রভু আমাদেরকে উদ্ধার করুন, আমাদেরকে উদ্ধার করুন। নিম্নে পতন ঘটবে অনেক সংখ্যক।

স্পেনে মুসলিম শাসনামলের প্রথ্যাত দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক অগ্রদৃত আবু হামিদ আল গাজালী সাহেবের লেখা ‘উলুম আল দীন’ গ্রন্থের চতুর্থ খন্ড থেকে এই সেতু সম্পর্কে কিছু উদ্ধৃতি নিম্নরূপ-

“এটি জাহানামের উপর একটি সূনীর্ধ সেতু যা তরবারীর চেয়ে তীক্ষ্ণ এবং চুলের চেয়ে অনেক সূক্ষ্ম। এই পৃথিবীতে যে সোজা এবং সঠিক পথে চলেছে সে খুব সহজে এটি অতিক্রম করবে এবং উদ্ধার পাবে। আর যে বিপথগামী ও পাপের বোঝায় পরিপূর্ণ প্রথম পদক্ষেপেই তার পতন ঘটবে এবং জাহানামে পড়ে যাবে। সেতুর নীচেই জাহানামের অগ্নি। পাপীরা মাথা নীচের দিকে এবং পা উপরের দিকে অবস্থায় নীচে পড়বে। নবী (সাঃ) তখন বলবেনঃ হে আমাদের প্রভু, আমাদেরকে রক্ষা করুন, আমাদেরকে রক্ষা করুন। জাহানামবাসীদের আর্তনাথ এবং কান্না শুনতে পাবেন। তখন আপনার অবস্থাটি কেমন হবে?”

ওয়ার্মহোল বা সেতু অতিক্রমের গতি

সার-সংক্ষেপ (বিজ্ঞান)	কোরান/হাদীস/ব্যাখ্যা
<p>১৫। গ) বিভিন্ন ধরণের ব্ল্যাকহোলের সঙ্গে সম্পর্কিত ওয়ার্মহোলও বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে এবং তাদের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যথেষ্ট তারতাম্য রয়েছে।</p> <p>শোয়ার্জশীল্ড ওয়ার্মহোলঃ এই ওয়ার্মহোলের অনুচিত্রে (চিত্র নং- ১৪২পৃঃ) দুটি অনন্যতা একটি আমাদের মহাবিশ্ব অপরাটি অন্য মহাবিশ্ব নির্দেশ করে। অনন্যতা অদৃশ্য হলে স্থান-কাল (Space-time) সংযুক্ত হয়ে ওয়ার্মহোল সৃষ্টি করে ফলে আমাদের মহাবিশ্ব থেকে অন্য মহাবিশ্বে যাওয়া সম্ভব। তবে এই ওয়ার্মহোলের মধ্যে কোন তথ্য বা কোন কিছু অতিক্রম করতে আলোর চেয়ে বেশী গতিসম্পন্ন হতে হবে। আবার অনন্যতায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।</p> <p>বিশ্বঃ আইনষ্টাইনের তত্ত্বানুসারে শূন্যে আলোর গতি অপরিবর্তনীয় (constant) কিন্তু ২০০২ সালের এপ্রিল মাসে অক্টোলিয়ার পদার্থবিদ পাওয়েল ডেভিস এবং তার সহকর্মীরা স্যাটেলাইট থেকে প্রাপ্ত জগৎ সৃষ্টির বিভিন্ন তথ্য থেকে প্রমাণ করেছেন মহাবিশ্ব সৃষ্টির প্রথম লগ্নে আলোর গতি বর্তমানের অনেক অনেক গুণ বেশী ছিল। এতে ক'রে শূন্যে আলোর গতি অপরিবর্তনীয় (constant) ধারণাটিও ঠিক নয়।</p> <p>১৯৬৭ সালে কলাম্বিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পদার্থবিদ অধ্যাপক জেরোল্ড ফাইনবার্গ আলোর চেয়ে লক্ষ কোটি গুণ বেশি গতি সম্পন্ন কণা ট্যাকিয়ন (Tachyon) সূত্র প্রকাশ করেন। আলোর গতি বা তার চেয়ে কম গতিতে তাকে নামিয়ে আনলে তার অস্তিত্বের বিলুপ্তি ঘটে। এই গতিতে সময়ের</p>	<p>কোঃ আর আমিহই তোমাদের উপর সাতটি পথ সৃষ্টি করেছি। বক্তৃত আমি সৃষ্টি সম্পর্কে অমনোযোগী নই ২৩৪১৭</p> <p>উপরের কোরানের আয়াতে যেমন আমরা বিভিন্ন ধরণের ওয়ার্মহোল বা পথের ইঙ্গিত পাই। তেমনি ভাবে এই বিভিন্ন জাতীয় ওয়ার্মহোল পাড়ি দেওয়ার জন্য যে বিভিন্ন ধরণের গতির (Speed) প্রয়োজন তা নিম্নের বুখারী ও মুসলিম শরীফের আবু সাউদ আল খুদরী (রাঃ) শেষ বিচার দিন সংক্রান্ত সুদীর্ঘ হাদীসে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির অংশ বিশেষ নিম্নরূপ-</p> <p>হাঃ বিশ্বাসীদের কেহ কেহ চোখের পলকের মুহূর্তে (আলোর চেয়ে বেশী গতি বুঝান হয়েছে) সেতু অতিক্রম করবে। কেহ কেহ আলোর গতিতে (as quick as lightning) প্রবল বায়ুর বেগে, দ্রুততম ঘোড়া অথবা স্তু উটের বেগে। সুতরাং কেহ কেহ নিরাপদে অক্ষত অবস্থায় রক্ষা পাবে এবং অনেকে জাহানামে পতিত হবে। সর্বশেষ ব্যক্তিটি হেঁড়িয়ে মৃত্যুর গতিতে (সেতুর উপর দিয়ে) অতিক্রম করবে।</p> <p>সেতুটি অতিক্রম করার জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন গতি ছাড়াও কোরান ও হাদীসে শেষ বিচার দিনের ময়দান থেকে জান্নাতে পাড়ি দেওয়ার জন্য বিশ্বাসীদের এক ধরণের জ্যোতি বা আলো প্রদানের কথা বলা হয়েছে।</p> <p>কোঃ সেদিন তুমি বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী</p>

ধারণা হবে আইনষ্টাইন যেমন বলেছিলেন আজ যাত্রা শুরু করে গতকাল পৌছান যাবে।

কের-নিউট্যান ব্ল্যাকহোলে আলোর চেয়ে দ্রুতগামী (time-like) পথের স্বল্পতম দূরত্বে দু'টি বিন্দুর (geodiscs) বেশ কিছু পথ (ওয়ার্মহোল) আছে যা বাইরের বেশ কিছু এলাকার (অন্য মহাবিশ্ব) সঙ্গে সংযুক্ত করে। পথগুলি কমপক্ষে একমুখী রাস্তা হিসাবে পরিবহনযোগ্য এবং ওয়ার্মহোলের স্থায়ীত্বের সমস্যা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এই ওয়ার্মহোল যদি অন্য কোন মহাবিশ্বের বা ঘটনা দিগন্তের সঙ্গে সম্পর্কিত হয় তবে সেক্ষেত্রে পথটি হবে অন্য মহাবিশ্বের বাহির পথ এবং তা শুধু একমুখী পথ। আলোর চেয়ে কম গতিতে ভ্রমণ সম্ভব। মরিস-থ্রোণ ওয়ার্মহোল আলোর গতির চেয়ে দ্রুতগামী (time-like) পথের স্বল্পতম দূরত্বের দু'টি বিন্দু (geodiscs) দ্বারা অন্য অনেক মহাবিশ্বের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। এই জাতীয় ওয়ার্মহোলের সঙ্গে কোন রকম ঘটনা দিগন্ত নেই। আলোর সমন্বয় গতি (coordinate speed of light) কোথাও এখনে শূন্য নয়। ফলে দূরের কোন পর্যবেক্ষক কোন ভ্রমণকারীকে বাইরের এক এলাকা থেকে অন্য এলাকা অতিক্রম করা অবলোকন করতে পারবে। পরিবহন যোগ্য এ ধরণের ওয়ার্মহোলে স্থানীয় ভাবে আলোর গতির চেয়ে দ্রুত ভ্রমণ করার কোন প্রয়োজন নেই।

আধুনিক পদাৰ্থ বিজ্ঞানীরা মনে কৱেন, মানুষের জড়দেহ থেকে মুহূর্তে অনুসমষ্টিতে ক্রপান্তরিত কৱৈ দূর-দূরান্তে প্রেরণ করা সম্ভব।

নারীগণকে তাদের সম্মুখ ভাগে ও দক্ষিণ পার্শ্বে তাদের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হতে দেখবে বলা হবে আজ তোমাদের জন্য জান্মাতের সুসংবাদ, যার নিম্ন দেশে নদী প্রবাহিত, যেখানে তোমরা স্থায়ী হবে, এটিই, মহাসাফল্য। সেদিন কপটচারী নারী ও কপটচারী পুরুষ বিশ্বাসীদেরকে বলবে তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম যাতে আমরা তোমাদের জ্যোতির কিছু পাই। তাদের বলা হবে তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও ও আলোর সন্ধান কর। অতঃপর উভয়ের মাঝামাঝি একটি প্রাচীর স্থাপিত হবে। যাতে একটি দরজা থাকবে, ওর ভিতর থাকবে করণা এবং বাইরে থাকবে শান্তি। ৫৭৪১২-১৩

কোঃ সেদিন আল্লাহ নবী ও তাঁর বিশ্বাসী সঙ্গীদের অপদস্থ করবেন না। তাদের জ্যোতি তাদের সামনে ও ডানপাশে বিচ্ছুরিত হবে এবং তারা বলবে হে আমাদের প্রতিপালক আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণত্ব দান কর এবং আমাদের ক্ষমা কর, তুমি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। ৬৬৪৮
মুসলিম শরীফে জাবির বিন আবুল্লাহ (রাঃ) নিকট শ্রুত আবু জুবাইর (রাঃ) বর্ণিত শেষ বিচার দিন সংক্রান্ত হাদীসে বিশ্বাসী ও কপটচারী (মুনাফেক) দের জ্যোতির বর্ণনা-

হাঃ কপটচারী ও বিশ্বাসী প্রত্যেক ব্যাক্তিকে জ্যোতি প্রদান করা হবে; জাহানামের সেতুতে তীক্ষ্ণ কাঁটা ও আঁটা থাকবে, আল্লাহ যাকে চাইবেন তা দ্বারা তাকে ধরবেন। তারপর কপটচারীদের আলো নির্বাপিত হবে এবং বিশ্বাসীরা উদ্ধার

পাবে। সন্তুর হাজার লোকের প্রথম দলটির মুখে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল থাকবে এবং তাদের কোন হিসাব চাওয়া হবে না, পরবর্তী অনুগামী দলটির মুখ আকাশের উজ্জ্বলতম তারকার মত থাকবে। এইভাবে একের পর আরেক দল অনুসরণ করবে।

এটি যেন বিজ্ঞান কল্পকাহিনীর অন্য মহাবিশ্বে পাড়ি দেওয়ার জন্য দেহের সমস্ত মৌলিকগাঁকে আলোক কণায় (Photon) পরিণত করে teleportation- এর মত।

বিভিন্ন শক্তিশালী রশ্মির বিকিরণ সংযোগকারী ওয়ার্মহোল বা সেতুকে অত্যন্ত বিপদজ্জনক করে তুলবে।

সার-সংক্ষেপ (বিজ্ঞান)	হাদীস/ ব্যাখ্যা
<p>১৫। ঘ) ব্ল্যাকহোলে অতি উচ্চ গতিতে পতনশীল প্রচন্ড উত্তপ্তি পদার্থ থেকে উচ্চ শক্তিশালী বিভিন্ন রঙের আলোক রশ্মি (যেমন- X-ray বা রঞ্জনরশ্মি, গামা রশ্মি) তরঙ্গমালার আকারে বিকিরণ ঘটায়। এর প্রভাব ব্ল্যাকহোলের মহাকর্ষ কৃপ থেকে ঘটনা দিগন্তে উচ্চ শক্তি নিষ্কেপ করে। এছাড়া ব্ল্যাকহোলে চুম্বক ক্ষেত্রের (magnetic field) ফাঁকা স্থানের চত্বরের দরুন (Vacuum fluctuation) ক্ষুদ্রাকারের বিভিন্ন শক্তিশালী রশ্মির প্রবল বর্ষন ঘটায়। এ সমস্ত বিকিরণের জন্য ব্ল্যাকহোল এলাকায় এবং সংযোগকারী ওয়ার্মহোল বা সেতুর পথ খবুই বিপদজ্জনক করে তোলে।</p> <p>এছাড়া পরিবহনযোগ্য ওয়ার্মহোলের ভিতর প্রবাহিত কল্পিত কণিকার (virtual particles) শক্তি আরও বিপদজ্জনক বদ্ধআলোর চেয়ে দ্রুতগতি সম্পন্ন কুণ্ডলী (closed time like</p>	<p>জাহানামে বা ব্ল্যাকহোল থেকে বিকরিত বিভিন্ন রকম ক্ষতিকারক ও বিপদজ্জনক আলোক রশ্মি হাদীসের বর্ণনাতেও পরিষ্কার জানা যায়।</p> <p>মুসলিম ও বুখারী শরীফে আবু সাইদ আল খুদরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীস।</p> <p>হাঃ এটা ·হ'ল (সেতু) আকশিক পতনের স্থান যেখানে সাঁড়াশি জাতীয় বাঁধার যন্ত্র বিশেষ (clamps) এবং (আংটার মত) কন্টকাকীর্ণ বীজাণু (thorny seed) যার এক প্রান্ত প্রশস্ত এবং অন্য প্রান্ত সরু এবং প্রান্তদ্বয় বক্র কন্টক। এ ধরনের কন্টকাকীর্ণ বীজাণু 'আসসাদান' নামে পরিচিত নাজদে দেখা যায়। বিশ্বাসীদের কেহ কেহ চোখের পলকের মুহূর্তে সেতু অতিক্রম করবে। কেহ কেহ আলোর গতিতে; প্রবল বায়ুর বেগে, দ্রুততম ঘোড়া অথবা স্ত্রী উটের বেগে। সুতরাং কেউ কেউ নিরাপদে অক্ষত অবস্থায় আবার কেউ কেউ ক্ষত অবস্থায় রক্ষা পাবে এবং অনেকে জাহানামে (অগ্নিতে-পুঁজিত চাকতি) পতিত হবে।</p> <p>মুসলীম শরীফের আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণিত আর একটি হাদীস।</p> <p>হাঃ জাহানামে প্রচন্ড বেগে সাদানের কাঁটার মত</p>

loop) প্রাতরোধ করতে যেয়ে ওয়ার্মহোলকে বক্ষ বা মোচড়ায়ে ফেলে। আপেক্ষিকবাদীরা আইনষ্টাইনের সমীকরণের ব্যাখ্যায় যুক্তি দেখান ব্ল্যাকহোলের ভিতর অবিরত সৃষ্টি কণগুলি ব্ল্যাকহোলের অভ্যন্তরে জমা হতে থাকবে এবং ভবিষ্যতে কোন এক মুহূর্তে স্তপাকার হয়ে আলোর চেয়ে কম গতি সম্পন্ন (space-like) ভবিষ্যৎ অনন্যতা গঠন করবে এবং অন্য মহাবিশ্বে যাওয়ার প্রবেশ পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে।

নাক্ষণ্ণ হবে। তিনি [রসূল (সাঃ)] বললেন, তোমরা কি সাদান দেবেছ? তারা উত্তর দিল “হ্যাঁ”। আল্লাহ’র রসূল (সাঃ) বললেন, সত্তি এই সমষ্টি (আংটা) সাদানের কাটার মত হবে তবে আল্লাহ ছাড়া এর আকার কেহ জানে না। লোকদের কর্মফলের উপর নির্ভর করে এগুলি অবরোধ সৃষ্টি করবে। কেউ কেউ তাদের কর্মের (ভাল) জন্য মুক্ত হবে এবং অনেককে উদ্ধার করার পর পুরস্কৃত করা হবে।

মুসলিম শরীফের অনুরূপ অপর আর একটি হাদিস যা জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) নিকট শুন্ত আবু জুবায়ের (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত।

হাঃ জাহান্নামের সেতুর উপর সূচি মুখযুক্ত কাঁটা এবং আংটা থাকবে। এগুলি তাকেই ধরবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করবেন।

ব্ল্যাকহোল ওয়ার্মহোলের মাধ্যমে অন্য বহু সংখ্যক মহাবিশ্বের সঙ্গে সংযুক্ত।

সারা-সংক্ষেপে (বিজ্ঞান)	কোরান/ হাদীস/ ব্যাখ্যা
১৫। শঙ্খ) আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক-তাবাদ তত্ত্বানুসারে ঘূর্ণায়মান কের-ব্ল্যাকহোলের ভিতর থেকে অসীম সংখ্যার মহাবিশ্বে প্রবেশ সম্ভব। কেরের আংশিক সমাধানে বলয় অনন্যতা (ring singularity) দ্বারা সীমাবদ্ধ অঞ্চলটি বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য বহন করে এবং এটি ঋণাত্মক স্থান-কাল (negative space time) নির্দেশ করে। এই অঞ্চলে মহাকর্ষ বল আকর্ষণ না করে বিকর্ষণ করে। ফলে, অনন্যতার দিকে অগ্রসর হলে ভিতরের অংশ হোয়াইট হোলের সঙ্গে ওয়ার্মহোল দ্বারা সংযুক্ত থাকতে পারে। ফলে ব্ল্যাকহোলে পতিত বস্তু হোয়াইট হোল দিয়ে অন্য বিশ্বে নিষ্কিণ্ণ হতে পারে। কোন কোন	শেষ বিচার দিনে হাশরের মাঠের (Torus) মাঝখান থেকে উঠে আসবে জাহান্নাম (ব্ল্যাকহোল) এ জাহান্নামের উপর সেতু বা ওয়ার্মহোলের এক মুখ বা দরজা দিয়ে প্রবেশ করে বিশ্বাসীদেরকে নেওয়া হবে ওয়ার্মহোলের অপর মুখ বা দরজায় যা অন্য মহাবিশ্ব বা জান্নাতের সঙ্গে সংযুক্ত। অল্প বিশ্বাসীরা এই ওয়ার্মহোল অতিক্রমকালে জাহান্নামে নিষ্কিণ্ণ হবে। পরবর্তীতে বিভিন্ন পর্যায়ে তাদেরকে উদ্ধার করা হবে। সেতু বা ওয়ার্মহোলের হাশরের মাঠের সঙ্গে সংযুক্ত অংশের কোরান ও হাদীসের বর্ণনা ইতিমধ্যে আলোচিত হয়েছে এবার অপর অংশের বর্ণনা নিম্নরূপ। কোঃ যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হবে এবং যখন জাহান্নামে আগুন উদ্বৃপ্তি হবে এবং যখন জান্নাত নিকটবর্তী হবে। ৮১:১১-১৩ কোঃ সংযমীদের জন্য উত্তম আবাস আছে।

ক্ষেত্রে হোয়াইট হোল এবং ব্ল্যাকহোল বিশাল দূরত্বের ব্যবধানে অবস্থান করে। আমাদের মহাবিশ্ব ওয়ার্মহোল দ্বারা সম্পূর্ণ নতুন অন্য মহাবিশ্ব সংযুক্ত না থাকাই সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য থেকে জেনেছেন মহাবিশ্বের অধিকাংশই ঘূর্ণায়মান ব্ল্যাকহোল। এই জাতীয় ঘূর্ণায়মান বা বৈদ্যুতিক চার্জ সম্পন্ন ব্ল্যাকহোলের সংগে সংশ্লিষ্ট ছাড়া (vertical) অনন্যতা প্রকৃতপক্ষে ভবিষ্যৎ অনন্যতা (future singularity) নিজের দিকে আবর্তিত হয়ে আলোর চেয়ে দ্রুতগামী (time like) অনন্যতায় ঝর্পাত্তিরিত হয়। এই অবস্থায় নীতিগতভাবে কোন কিছু ব্ল্যাকহোলের ভিতর প্রবেশ এবং সেখান থেকে আবার সম্পূর্ণ নতুন মহাবিশ্বের বাহির হতে পারবে। মহাকর্ষ বল তাকে ধ্বংস করতে পারবে না।

ঘূর্ণায়মান ব্ল্যাকহোলের কৌণিক গতি বা বৈদ্যুতিক চার্জ অস্বাভাবিক রকম বৃদ্ধি পেয়ে এর ভরের সমান হয় তখন উভয় ঘটনাদিগন্তের বিলুপ্তি ঘটিয়ে উন্মুক্ত অনন্যতার (naked singularity) সৃষ্টি করে। এখানে মহাকর্ষ বল বিপরীত মুখী অর্থাৎ আকর্ষণ না করে বিকর্ষণ করে। ফলে অন্য মহাবিশ্বের দরজা খোলা রাখে। এই ধরনের ব্ল্যাকহোল শুধুমাত্র একবার নয় বার বার ভিন্ন ভিন্ন স্থান

জান্মাত চিরস্থায়ী যার দ্বার উন্মুক্ত থাকবে তাদের জন্য। ৩৮:৪৯-৫০

কোঃ যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করত, তাদের দলে দলে জান্মাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, যখন তারা ওর নিকটে আসবে তখন তারা উন্মুক্ত দরজা দিয়ে জান্মাতে পৌছাবে এবং জান্মাতের রক্ষীরা ওদের বলবে তোমাদের প্রতি সালাম। তোমরা সুখী হও, এবং স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য জান্মাতে প্রবেশ কর। ৩৯:৭৩

কোঃ যদি আমি ওদের (অবিশ্বাসী) সামনে আকাশের কোন দরজাও খুলে দেই অতঃপর তারা তাতে আরোহণ করতে থাকে তবুও ওরা একথাই বলবে যে, আমাদের দৃষ্টি বিভাট ঘটানো হয়েছে না বরং আমরা যাদুগ্রস্থ হয়ে পড়েছি। ১৫:১৪-১৫

বুখারী ও মুসলিম শরীফে সাইল ইবনে সাদ বর্ণিত হাঃ বেহেশতের আটটি দরজা আছে এর মধ্যে একটির নাম রেয়ান। একমাত্র রোজাদার ছাড়া কেহ এটাতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং যখন তারা এতে প্রবেশ করবে পিছন থেকে এর দরজা বন্ধ হয়ে যাবে আর কেউ প্রবেশ করবে না।

বুখারী শরীফে আবু সাইদ আল খুদরীর বর্ণিত আর একটি হাদীস-

হাঃ বিশ্বাসীদেরকে অগ্নি (জাহানাম) থেকে রক্ষা করার পর বেহেশত এবং জাহানামের মাঝে সেতুতে থামিয়ে দেওয়া হবে। পৃথিবীতে তারা পরস্পরের প্রতি যে অন্যায় করেছে তার প্রতিশোধ গ্রহণ শুরু হবে তাদের মধ্যে। যখন তারা পৃত-পবিত্র হবে (প্রতিশোধ গ্রহণের মাধ্যমে) তখন তাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে। সেই সম্ভা যার হাতে আমার আত্মা (জীবন) তাদের প্রত্যেকে তার পৃথিবীর

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সংযোগ করতে পারে। নীতিগতভাবে এ ধরনের অনন্যতার মাধ্যমে আলোর চেয়ে কমগতিতে ভ্রমণ সম্ভব।

বাসস্থান থেকে বেহেশেতের বাসস্থান অনেক ভাল জানবে।

ইতিমধ্যে আলোচিত বেশ কিছু হাদীস থেকে জানা যায়, বিচার সম্পূর্ণ হওয়ার পর জাহানামীদের মধ্যে থেকে বেশ কিছু লোককে এক দিনার সমান ওজন থেকে অণুপরিমাণ ওজনের সমান ঈমান (হৃদয়ে) থাকবে তাদেরকে রসূল (সাঃ) এর মধ্যস্থতায় বিভিন্ন পর্যায়ে ধাপে ধাপে জাহানাম থেকে উদ্বার করা হবে। বেহেশেতের প্রাঞ্জণে এনে তাদের উপর পানি বর্ষণের মাধ্যমে অঙ্কুরোদগমের মত জাগিয়ে তোলা হবে এবং বেহেশেতে প্রবেশের অনুমিত দেওয়া হবে।

ঝ্যাকহোলের কেন্দ্র বা ওয়ার্মহোল ব্যবহার করে অন্য মহাবিশ্বে ভ্রমণ বা যাতায়াত সম্ভব নয়।

সার-সংক্ষেপ (বিজ্ঞান)	কোরান/ব্যাখ্যা
১৫। (চ) আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বের প্রকাশ এবং পরবর্তীতে সমীকরণের গাণিতিক সমাধান, বিভিন্ন ধরনের দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সুদূর মহাকাশ পর্যবেক্ষণ, স্যাটেলাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং ব্যাপক গবেষণার ফলে জগৎ বিজ্ঞানীরা ঝ্যাকহোল, ওয়ার্মহোল ও সমান্তরাল মহাবিশ্ব সম্পর্কে অন্তর্ভুক্ত সব বিভিন্ন ধরনের তথ্য পান। এই সমস্ত গবেষণালক্ষ তথ্যের উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানীরা এক সময় ধারণা করেছিলেন ঝ্যাকহোলের	কোঃ হে দুই 'ওজনদার বস্তু' শীঘ্ৰই তোমাদের বিষয় মীমাংসা করবার আমার অবসর হবে। ৫৫৩১ এখানে আয়াতে 'ছাকাল' শব্দটির অর্থ দুই ওজনদার বস্তু। অনেক অনুবাদে দুই ওজনদার বস্তু বলতে জিন ও মানুষ দুই সম্প্রদায়কে বুঝান হয়েছে আবার অনেকে একাল এবং পরকাল (দুই দুনিয়া) বুঝিয়েছেন অথচ প্রকৃত অর্থ হচ্ছে কোরান ও হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি মহাব্রহ্মসের ফলে এই মহাবিশ্বের সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র এবং অন্যান্য সবকিছু জাহানামে নিষ্ক্রিয় হবে। এই জাহানাম হ'ল দুই ওজনদার বস্তুর একটি অপরাদি বেহেশত বা অন্য মহাবিশ্ব। শেষ বিচার দিনে আল্লাহ এই জাহানাম ও জান্নাতের মধ্যে ফয়সালা করবেন। কোঃ হে জিন ও মানব সম্প্রদায় নভোমভল ও ভূমভলের প্রান্ত অতিক্রম করা যদি তোমাদের সাধ্যে কুলায়, তবে তোমরা অতিক্রম কর। কিন্তু অনুমতি (ছাড়পত্র) ছাড়া তোমরা তা অতিক্রম করতে পারবে না। ৫৫৩৩

কেন্দ্র বা ওয়ার্মহোলকে টাইম-মেশিন হিসাবে ব্যবহার করে মহাবিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য মহাবিশ্বে পাড়ি জমানো সম্ভব। কিন্তু সম্প্রতিক বিভিন্ন গাণিতিক হিসাব থেকে প্রাণী ফলাফলে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মত প্রকাশ করেন ব্ল্যাকহোলের কেন্দ্রকে বা ওয়ার্মহোল ব্যবহার করে বিভিন্ন মহাবিশ্বে পরিষ্করণ বা যাতায়াত সম্ভব নয়।

এই আয়াতটির প্রেক্ষাপটও শেষ বিচার দিনের হাশরের মাঠের দৃশ্যের বর্ণনা। মহাবিশ্বের ফলে এই মহাবিশ্বের সমস্ত এহ, নক্ষত্র ও যাবতীয় অন্য সবকিছু প্রথমে বিশাল ব্ল্যাকহোলের চারিপাশে ডিম্বাকৃতি বিশাল মিহিবালির এলাকা বা torus সৃষ্টি করে এক নতুন একত্রিত ভূ-প্ল্যাট বা হাশরের মাঠ সৃষ্টি করবে (পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে সবকিছু অবশ্য ব্ল্যাকহোল বা জাহানামে পতিত হবে) আল্লাহর ছাড়পত্র বা অনুমতি ছাড়া জিন বা মানুষের কেউ এই একত্রিত ভূ-প্ল্যাট (earths) ছেড়ে নভোম্বল ভেদ করে বেহেশত বা অন্য মহাবিশ্বে নিজের শক্তিতে যেতে পারবে না। অন্য মহাবিশ্ব বা বেহেশত এখন পর্যন্ত যে কেউ অবলোকন করে নাই তার ইঙ্গিত রয়েছে নিম্নের কোরানের আয়াতে। [মিরাজে নবী করিম (সাঃ) ব্যতীত।]

কোঃ কোন ব্যক্তিই জানে না, তার জন্যে কৃতকর্মের কি কি নয়ন প্রীতিকর প্রতিদান লুকায়িত আছে। ৩২:১৭

দৃশ্যমান (আমাদের মহাবিশ্ব) ও অদৃশ্যমান (সমান্তরাল) মহাবিশ্বসমূহ।

সার-সংক্ষেপ (বিজ্ঞান)	কোরআন/হাদীস/ ব্যাখ্যা
১৬। ১৯২১ সালে কালুজা পরামহাশূন্যে (hyperspace) অন্য মহাবিশ্বসমূহের অস্তিত্বের সম্ভাবনার কথা বলেন। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা পরোক্ষভাবে অনেক তথ্যে এবং থিঅ্যরির উপর ভিত্তি করে অসংখ্য সমান্তরাল মহাবিশ্বের অস্তিত্বের ধারণা করেন। আমাদের মহাবিশ্বের সবকিছু চার মাত্রায় (তিনি স্থান ও একটি কালমাত্রা) সীমাবদ্ধ আর পরামহাশূন্যে কণাবাদী বল বিদ্যার (quantum mechanics) এম তত্ত্বানুসারে (M-theory) স্থান-কালের মাত্রা (dimensions) এগারটি (দশটি স্থান ও একটি	কোঃ অতঃপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করেন, যা ছিল ধূম্রপুঞ্জ বিশেষ। অনন্তর তিনি ওকে (আসমানকে) ও ভূম্বলকে বললেন তোমরা উভয়ে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় আমার আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত হও। ওরা বলল আমরা তো আনুগত্যের সাথেই প্রস্তুত আছি। অতঃপর তিনি ধূম্রপুঞ্জগুলিকে দু'দিনে সগু আকাশে পরিণত করলেন এবং প্রত্যেক আকাশের নিকট তাঁর কর্তব্য ব্যক্ত করলেন এবং তিনি পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমানকে প্রদীপমালা দ্বারা সুশোভিত এবং সুরক্ষিত করলেন। এসব পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ কর্তৃক সুবিন্যস্ত। ৪১:১১-১২পৃথিবীর নিকটবর্তী আকাশে প্রদীপমালা, গ্রহ-নক্ষত্রাদি দিয়ে সাজানোর কথা আরও উল্লেখ আছে। ৩৭:৬ এবং ৬৭ : ৫ আয়াতে এছাড়া ১৫ : ১৬, ২৫:৬১ এবং ৮৫ : ১ আয়াতে আকাশে গ্যালক্সিসমূহ বা constellation স্থাপনের কথা আছে। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় উপরের

কাল) এই পরামহাশূন্যে
সবকিছুর নিয়ন্ত্রণকারী চারটি
মৌলিক বল মহাকর্ষ বল
(gravitational force)
বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বল
(electromagnetic force)
দূর্বল কেন্দ্রকীয় বল (weak
nuclear force) ও শক্তিশালী
কেন্দ্রকীয় বল (strong
nuclear force)
একত্রীকরণের জন্য প্রয়োজনীয়
যথেষ্ট এলাকা রয়েছে।

আমরা জানি আমাদের মহাবিশ্ব
প্রচল গতিতে সম্প্রসারিত
হচ্ছে। একটা নির্দিষ্ট দূরত্বের
বাইরে এই সম্প্রসারণের
পশ্চাদপসারণ গতি আলোর
গতিকে অতিক্রম করে। এই
দূরত্বকেই বলা হয় আমাদের
দৃশ্যমান মহাবিশ্বের প্রান্ত সীমা
বা ঘটনা দিগন্ত এবং তা প্রায়
আনুমানিক দেড় থেকে তিন
হাজার কোটি আলোক বর্ষ দূরে
(এক আলোক বর্ষ এক লক্ষ
কোটি কিলোমিটার সমান
দূরত্ব)। দৃশ্যমান আমাদের
মহাবিশ্বের সীমা এটাই। এই
সীমার বাইরে কি তা সম্পূর্ণ
অনুমানমূলক এবং মহাজাগতিক
বিজ্ঞানীদের বর্তমান গবেষণার
বিষয়। দৃশ্যমান মহাবিশ্বের প্রান্ত
-সীমার বাইরে উপস্থিত কোন
বস্তু ডাপলার অভিক্রিয়ায়
(Doppler effect) লাল
বিচ্যুতি (red shift) থেকে
অসীমে যায় ফলে অদৃশ্যমান
থাকে। কোন অবস্থাতে তা

সবগুলি আয়াতে (গহ, নক্ষত্র এবং গ্যালাক্সি সমূহ
আকাশ) আকাশকে একবচনে ব্যবহার করা হয়েছে।
কোরানের ভাষায় পৃথিবীর নিকটবর্তী আকাশ বা প্রথম
আকাশই আমাদের দৃশ্যমান মহাবিশ্ব। কোরানের
৫১:২২ আয়াত অনুসারে আল্লাহর প্রতিক্রিয়ত সবচুই
আসমানে। এখান থেকে প্রতীয়মান হয় জাহান্নাম ও
জান্নাত উভয়ই আসমানে। জাহান্নাম নিষ্ঠতম আকাশে
যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। কোরান ও হাদীসের
বিভিন্ন তথ্য থেকে শেষ বা সশ্র আকাশে জান্নাত এটা
পরিষ্কার বুঝা যায়। আর হাদীস থেকে জানা যায় ষষ্ঠ
আকাশে সিদরাতুল মুনতাহা যেখানে নিম্ন এবং উর্ধ
থেকে আসা সবকিছু তথ্য সংরক্ষিত হয়। হয়রত
মুহাম্মদ (সা:) মিরাজ সংক্রান্ত হাদীস থেকে বিভিন্ন
আসমানে বিভিন্ন নবীর সাক্ষাত লাভ ছাড়া কোরান ও
হাদীসে অন্যান্য আসমানের তেমন কোন তথ্য পাওয়া
যায় না। কোরানের ভাষায় পৃথিবীর নিকটবর্তী আকাশ
বা প্রথম আকাশই আমাদের চেনা-জানা দৃশ্যমান
মহাবিশ্ব। আর অদৃশ্য সমান্তরাল মহাবিশ্বসমূহ হতে
পারে দ্বিতীয় আকাশ থেকে সংক্ষম আকাশের মধ্যে।

সবকিছু অর্থাৎ সমস্ত পদার্থের পরমাণু থেকে শুরু করে,
গহ, নক্ষত্র তথ্য মহাবিশ্বের সম্পূর্ণ কাঠামো এবং গতি
চারটি মৌলিক বল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কোরানের সুরা
নাফিয়াত (৭৯) এর প্রথম চারটি আয়াত ক্রমান্বয়ে (১)
মহাকর্ষ বল (২) দূর্বল কেন্দ্রকীয় বল (৩) বিদ্যুৎ-
চুম্বকীয় বল এবং (৪) শক্তিশালী কেন্দ্রকীয় বলের
শপথের কথা বুঝান হয়েছে এবং পঞ্চম আয়াতে এসে
যারা সকল কর্ম বা সবকিছু নিয়ন্ত্রণকারীর শপথের কথা
বলা হয়েছে। কোরানের অনুবাদকারীগণ উপরের
আয়াতগুলিতে যদিও আরবী অর্থজ্ঞাপক ফেরেশতা
শব্দটি নেই তবু ফেরেশতাদের উপস্থিতি করে
আয়াতগুলি অনুবাদ করেছেন। তবে মোটামুটিভাবে
মূল শব্দের অর্থগুলি অনুবাদে রেখেছেন ১ম আয়াতের
প্রবলভাবে আকর্ষণকারী, ২য় আয়াতে মৃদুভাবে কাজ
করা ৩য় আয়াতে দ্রুত সন্তুরণ এবং ৪র্থ আয়াতে
দ্রুততর কার্য সম্পাদন করা। প্রকৃতপক্ষে উপরোক্ত

আমাদের মহাবিশ্ব থেকে দৃশ্যমান হবে না। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে প্রকাশিত বিভিন্ন মহাজাগতিক তত্ত্বানুসারে (theories) আমাদের দৃশ্যমান মহাবিশ্ব বৃহত্তর অতিক্ষীতিতের বৃদ্ধবুদ্ধের (post inflationary bubble) একটি অতি ক্ষুদ্র কণিকা। অতিক্ষীতিতের বৃদ্ধবুদ্ধটি প্রসারলাভ করেছিল ১০^৩ বা তার চেয়ে অধিক আলোক বর্ষ ব্যাপী। অইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বানুসারে তাকে ভাব সূর্যায়মান ব্ল্যাকহোলের নকশিতের থেকে অসীম সংখ্যার মহাবিশ্বে প্রবেশ সম্ভব।

ছিফেন হকিং- এর মতে অসংখ্য মহাবিশ্বের অঙ্গিতের সম্ভাবনা রয়েছে এবং তা আবার সীমাহীন গোলক ধার্ধারমত ওয়ার্মহোল দ্বারা একাধিক জায়গায় সংযুক্ত। প্রতিটি সমান্তরাল মহাবিশ্বে প্রতিবেশী মহাবিশ্বের প্রদেয় ধনাত্মক (positive) রক্ষাকারী আবরণ রয়েছে এবং মহাবিশ্বগুলি পরস্পরের সঙ্গে ঝণাত্মক (negative) শক্তির ওয়ার্মহোল দ্বারা যুক্ত।

আইনষ্টাইনের

আপেক্ষিকতাবাদের সমীকরণের গাণিতিক সমাধানে স্থান-কালে কিছু অসীম অক্ষল স্তরের উপর স্তর চিরকালের জন্য বিস্তৃত। আবার একটি সূর্যায়মান

চারটি বলের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলিই এখানে উল্লেখ আছে। আর সবগুলি বলের (forces) নিয়ন্ত্রণ কর্তাই আল্লাহ।

কোরং নভোমভল ও ভূমভলের সমস্ত বলই (all forces) তারই (আল্লাহর) ৪৮:৪ (ইউসুফ আলী সাহেব অনুদিত)

কোং আল্লাহ সং আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবী ও সেই পরিমাণ এ সবের মধ্যে তার আদেশ অবতীর্ণ হয়। যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং সবকিছু তার গোচরীভূক্ত। ৬৫:১২

আমাদের অন্তরালে উপস্থিত জাল্লাতের বিশাল ব্যাপকতা কোরআনে নিম্নের আয়াত থেকে সহজে অনুমেয়। কোং তোমরা সীয় প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর ও জাল্লাতের দিকে ধাবিত হও, যার বিস্তৃতি আসমান ও জমিন জুড়ে যা ধর্ম ভীরুগণের (মুতাকী) জন্য নির্মিত হয়েছে। ৩:১৩৩ অনুরূপ আয়াত ৫৭:২১

স্তরের উপর স্তর অসংখ্য সমান্তরাল মহাবিশ্বের বিজ্ঞানীদের ধারণা আজ থেকে চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে হ্যরত মুহাম্মদ (সা:) নিম্নলিখিত দু'টি হাদীসে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

হাঃ যে ব্যক্তিটি অগ্নি (জাহান্নাম) থেকে সবচেয়ে শেষে বের হবে এবং সবচেয়ে শেষে বেহেশতে প্রবেশ করবে তাকে আমি জানি। সে ব্যক্তিটি অগ্নি থেকে (জাহান্নাম) হামাগুড়ি দিয়ে বের হবে এবং আল্লাহ তাকে বলবেন, “যাও এবং বেহেশতে প্রবেশ কর।” সে এর নিকটে যাবে, কিন্তু তার মনে হবে এটা (বেহেশত) পূর্ণ হয়ে গেছে এবং সে ফিরে এসে বলবে ‘হে প্রভু, আমি এটাকে পূর্ণ পেয়েছি।’ আল্লাহ বলবেন, যাও এবং বেহেশতে প্রবেশ কর এবং তুমি পৃথিবীর সমান পাবে এবং এর চেয়ে দশগুণ (অথবা তুমি পৃথিবীর তুলনায় দশগুণ বড় পাবে) এতে লোকটি বলবে, ‘যদিও তুমি বাদশা, তুমি কি আমার সঙ্গে উপহাস করছ?’ আমি দেখেছি আল্লাহর নবী (সা:) (যখন তা বলেন) এমনভাবে হাসছিলেন যে মাড়ীর পূর্বদন্ত বিকশিত হয়েছিল। বলা হয়েছিল বেহেশতবাসীদের মধ্যে এটি হবে সবচেয়ে নিম্নতম যোগ্যতার ব্যক্তিদের জন্য।

ব্ল্যাকহোল আমাদের মহাবিশ্বকে
অন্য মহাবিশ্বের সঙ্গে শুধুমাত্র
একবার নয় বার বার সংযোগ
করে ভিন্ন ভিন্ন স্থান ভিন্ন ভিন্ন
সময়ের প্রবেশদ্বার উপস্থাপন
করতে পারে।

বুখারী শরীফ, আব্দুল্লাহ (রাঃ) বর্ণিত।
বুখারী শরীফের আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণিত অপর একটি
হাদীসের অংশ বিশেষ।

হাঃ বেহেশতের একশতটি স্তর আছে যা আল্লাহ
সংরক্ষিত রেখেছেন আল্লাহর কারণে যে সমস্ত
মুজাহিদগণ যুদ্ধ করেন। প্রত্যেক দু'টি ধাপের মধ্যে
দূরত্ব হচ্ছে নভোমভল ও ভূমভলের মধ্যের দূরত্বের
সমান। সুতরাং তোমরা যখন আল্লাহর কাছে কোন
কিছু চাও তখন, "ফেরদৌস" চাও যা বেহেশতের
মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বউচ্চে উপস্থিত।" আমি
(বর্ণনাকারী) মনে করি তিনি বলেছেন। "এর উপর
(ফেরদৌস) অত্যন্ত দয়াময়ের সিংহাসন এবং এখান
থেকেই বেহেশতের নদী সমূহের উৎস ধারা।"

হাঃ জান্নাতের নিম্নস্তরের লোকগণ এর উর্ধ্বতন
মহলসমূহকে একুপ দেখবে যেকুপ তোমরা আকাশের
পূর্ব বা পশ্চিম কিনারে উদিত নক্ষত্রকে দেখে থাক।
বুখারী শরীফ হ্যরত সাহুল (রাঃ) বর্ণিত।

হাঃ নিম্নে অবস্থানকারী উচ্চে অবস্থানকারীকে একুপ
দেখতে পাবে, যেকুপ তোমরা পৃথিবীতে অবস্থান করে
আকাশের চন্দ্র, সূর্য, তারকা দর্শন করে থাক।
উপরের হাদীস থেকে মনে হয় জান্নাত অসংখ্য অছের
সমন্বয়ে গঠিত।

আমাদের মহাবিশ্বের সবকিছু সীমাবদ্ধ পক্ষান্তরে সমান্তরাল মহাবিশ্বে সবকিছু সীমাহীন

সার-সংক্ষেপ (বিজ্ঞান)	কোরআন/হাদীস/ ব্যাখ্যা
১৭। (ক) আমাদের মহাবিশ্বের স্থান-কাল ইউক্লিডিয়ান (Euclidean) তিনি গোলক ঘনক্ষেত্র দ্বারা পরিবেষ্টিতে। ফলে এখানে সব কিছুর (আকৃতি, মানব সভ্যতা ইত্যাদি) প্রসারণের একটা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ব্ল্যাকহোল গঠনের পূর্বে নির্দিষ্ট আয়তনে যে পরিমাণ তথ্য ধারণ করতে পারে তার সঙ্গে সম্পর্কিত। এই	কোরানের অনেক সুরায় চিরস্থায়ী জান্নাত এবং এর অফুরন্ত ভোগ বিলাসের জীবনোপকরণের কথা বলা হয়েছে। নিম্নে এর অংশবিশেষ বর্ণিত হ'ল- কোঃ বেহেশত চিরস্থায়ী ৭:৪২, ৪৩:৭১ কোঃ বেহেশতে স্থায়ী সুখ-সমৃদ্ধি ৯:২১ কোঃ তাদের স্বর্গে প্রবেশ করাব যার নিম্নে নদীসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। ৪:১২২, ৫:৮৫, ৫:১১৯, ২০:৭৬, ২৯:৫৮ কোঃ বেহেশ্তের ফলরাশি ও ছায়া চিরস্থায়ী। ১৩:৩৫, ৫৬:২৮-৩৩

সীমাবদ্ধতাকে বিকেনষ্টাইন-হকিং
(Bekenstein-Hawking)
সীমা বলে।

পক্ষান্তরে ওয়ার্মহোলের দ্বারা
সংযুক্ত অসংখ্য সমান্তরাল
মহাবিশ্বের বেশ কিছু উপযোগী
বৈশিষ্ট্যের জন্য পরিবেষ্টিত স্থানের
ঘনফল আয়তন বৃদ্ধি পায় মূল
দূরত্ব থেকে ক্রমাগ্রামে। এই
মহাবিশ্বের সবকিছুর প্রসারণ ঘটে
চিরকাল। উদাহরণ স্বরূপ আমাদের
মহাবিশ্বের একটি গাছ অবিরাম
শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে
পরিশেষে তা থেমে যাবে, অথচ
সমান্তরাল মহাবিশ্বে এর বৃদ্ধি ঘটবে
চিরকাল জালের মত।

কোং জান্নাত চিরস্থায়ী-----আমার দেওয়া জীবন
সম্পদ যা শেষ হবে না। ৩৮৮৫০-৫৪, ৩৫৮৩৩,
২৯৮৫৮, ৫৬৮৩০-৩৩

অনুরূপভাবে অনেক হাদীসেও একই বর্ণনা রয়েছে।
হাঃ বেহেশতের একটি গাছের নিম্ন-ভাগ অতিক্রম
করতে সবচেয়ে, দ্রুতগামী অশ্঵ারোহীর একশত
বৎসর সময় লাগবে- বুধারী ও মুসলিম শরীফে আবু
সায়িদ আল খুদরী (রাঃ) বর্ণিত।

কোরাণ ও হাদীসের বেহেশত সম্পর্কিত বিভিন্ন
বর্ণনার ভিত্তিতে ইবন মাযাহ কর্তৃক বর্ণিত আল
সুনান কিতাব আল জুহদের ভাষায় জান্নাত “এটি
দীপ্তিমান আলো, সৌরভময় উত্তিদ, অত্যুচ্চ থাসাদ,
প্রবাহিত নদী, পাকা ফল-মূল, অপূর্ব সুন্দরী স্তৰ
এবং পর্যাণ পোশাক-পরিচ্ছদ, চিরস্থায়ীভাবে আনন্দ
দিতে উত্তোলিত অপূর্ব সুন্দর, সুনিপুনভাবে গড়া উচ্চ
বাঢ়ীতে বাস।

সমান্তরাল মহাবিশ্বে অস্তুদ বহিরাগত (exotic) পদার্থ সমূহ

সার-সংক্ষেপ (বিজ্ঞান)	কোরআন/হাদীস/ ব্যাখ্যা
১৭। ব্রহ্মের উপর স্তর সজ্জিত অসংখ্য সমান্তরাল মহাবিশ্ব। আমাদের মহাবিশ্ব যেমন সবকিছুর চারমাত্রায় (তিনটি স্থান ও একটি কালমাত্রা) সীমাবদ্ধ, সমান্তরাল মহাবিশ্বগুলিতে চারের অধিকমাত্রা থাকতে পারে। সেখানে আমাদের বিশ্বের চেয়ে অন্তর বিভিন্ন ধরনের বহিরাগত পদার্থ (exotic matter) থাকতে পারে পর্যাণ পরিমাণে।	কোরানের বিভিন্ন সুরায় জান্নাত সংক্রান্ত আয়াতে এ ধরণের উন্নত পদার্থ ও উপকরণের বর্ণনা পাওয়া যায়; নিম্নে তার কিছু উন্নত হল। কোং স্বর্ণের কঙ্কন, সূক্ষ্ম ও স্তুল রেশমের সবুজ বস্ত্র- ১৮৮৩১, ২২৯২৩, ৩৫৮৩৩ কোং অপরিমিত জীবনোপকরণ দেওয়া হবে। ৪০৯৪০ কোং রৌপ্য পাত্র ও স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ পানপাত্র। ৭৬৯১৫- ১৬ কোং ওদের সোনার থালায় ও পানপাত্রে খাদ্য ও পানীয় পরিবেশন করা হবে, সেখানে আছে অন্তর যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃণ হয়, সমস্ত কিছু, সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে। ৪৩৯১ কোং নিশ্চয় সংশীলগণ কর্পূর মিশ্রিত পানপাত্র হতে পান করবে। এ (কর্পূর) একটি বিশেষ প্রস্তাবণ যা হতে আল্লাহর দাসগণ পান করবে তারা এই প্রস্তাবণকে যথা ইচ্ছা প্রবাহিত করবে। ৭৬৯৫-৬ কোং ভোগ-বিলাসের উপকরণ এবং বিশাল রাজ্য। ৭৬৯২০, ৫২৯১৭ কোং চির কিশোরগণ মনে হবে যেন বিক্ষিণু মণি-মুক্ত।

৭৬৪১৯

কোঁ সুলোচনা, সুন্দরীগণ, সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ্য। ৫৬৪২২-২৩
হ্যরত মুহাম্মদ (সঃ) এর বর্ণনাতেও জান্মাতে অভূত পর্যাপ্ত
পরিমাণ বিভিন্ন ধরনের বিলাস উপকরণের উল্লেখ আছে।
সাহাবাদের এক প্রশ্নের উত্তরে জান্মাতের প্রাসাদের এক অপূর্ব
বর্ণনা নিম্নরূপ।

হাঃ স্বর্ণ ও কুপার ইট, কস্তরীর আন্তর সম্মুক্ষ সৌরভ, মুক্তার
শিলা-ফটিক ও নীলকান্ত মণি এবং জাফরানের ভূমি। যে কেহ
এখানে প্রবেশ করলে আনন্দে উত্সুসিত হবে এবং কখনও
ইনতা অনুভব করবে না। সে এখানে চিরকাল বাস করবে
কখনও মৃত্যু হবে না, তাদের পোশাক কখনও জীর্ণ হবে না,
এবং তাদের যৌবন কখনও মলিন হবে না। মিশকাত শরীরে
আহাম্মদ তিরমিদি বর্ণিত।

হাঃ বেহেশতে এমন কোন গাছ নেই যার কান্ড স্বর্ণের নয়।
তিরমিজ শরীরে আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণিত।

আমাদের মহাবিশ্বের সবকিছুই সর্বদা ওয়ার্মহোল দ্বারা সমান্তরাল মহাবিশ্বের সঙ্গে সংযুক্ত।

সার-সংক্ষেপ (বিজ্ঞান)	কোরআন/হাদীস/ ব্যাখ্যা
১৭। গ) আমরা আমাদের চার পাশে যা কিছু দেখছি তথা মহাবিশ্বের সবকিছু বিভিন্ন মৌলকণা (Subatomic particles) দ্বারা গঠিত (দালানের ইটের মত) বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন মৌলকণাগুলি বিশেষ করে ইলেক্ট্রনস এর গতি প্রকৃতি থেকে প্রথম ওয়ার্মহোলের ধারণা পোষণ করেন। যদি কোন একটি ইলেক্ট্রনের বাস্তব অস্তিত্ব কোন এক বিন্দুতে পদার্থ হিসাবে গণ্য করা হয় তবে সেই বিন্দুর চারিদিকে স্থান-কালের অবস্থান সঠিক বর্ণনার জন্য শোয়ার্জশীল মাপবিজ্ঞান অনুসারে একটি সম্পূর্ণ ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক ওয়ার্মহোল (microscopic wormhole) যা অন্য মহাবিশ্বের সংগে সংযোগ সৃষ্টি করে। যেমন বৈদ্যুতিক চার্জ সৃষ্টি হয়	হ্যরত মোহাম্মদ (সাঃ) বেশ কিছু হাদিস থেকে (অন্য সমান্তরাল মহাবিশ্ব) জান্মাত/জাহান্মাম এর অস্তিত্ব পৃথিবী থেকে (আমাদের মহাবিশ্ব) অনুভব করার কথা বর্ণনা করেছেন। মুসলিম শরীরে আল বারা ইবন আজিব (রাঃ) বর্ণিত মৃত ব্যক্তিকে ফেরেশতা কর্তৃক প্রশ্ন উত্তরের সুন্দীর্ঘ হাদীসের অংশ বিশেষ। হাঃ স্বর্গ থেকে একটি কস্তুর আসবে আমার বান্দা সত্য বলেছে, সুতরাং বেহেশত থেকে তার জন্য একটি বিছানা প্রসারিত কর, বেহেশত থেকে তাকে পোশাকাচ্ছাদিত কর এবং বেহেশত থেকে তার জন্য একটি দরজা খুলে দাও। যাতে এর কিছু বাতাস ও সৌরভ তার কাছে পৌছায়। হাঃ স্বর্গ থেকে একটি ঘোষণা আসবে, সে মিথ্যা বলেছে সুতরাং জাহান্মাম থেকে তার জন্য বিছানা প্রসারিত কর। জাহান্মাম থেকে তাকে পোশাকাচ্ছাদিত কর এবং তার জন্য জাহান্মাম থেকে

বলের ক্ষেত্রগুলি থেকে (fields of force) এখানে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র যা সম্ভবত অন্য কোন মহাবিশ্ব থেকে ওয়ার্মহোলের সঙ্গীর্ণ পথে এসে থাকে। সমস্ত পদার্থের গঠন কণিকা বিন্দুর মাধ্যমে ঘটে এবং তা স্থান-কালে বক্রতা সৃষ্টি করে। এটিই সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের ব্যাখ্যা। ১৪ই ফেব্রুয়ারী ২০০২ সালে বিবিসির বিজ্ঞান বিষয়ক বেতার/টিভির প্রচারিত অনুষ্ঠানের ওয়েভ সাইট থেকে সমান্তরাল মহাবিশ্বসমূহ নামে প্রকাশিত প্রবন্ধের ভূমিকার কিছু হ্রবহু বাংলা অনুবাদ। “এখানে আপনারা যা কিছু পড়বেন সব অসম্ভব এবং পাগলের প্রলাপ বলেই মনে হবে, যা বিজ্ঞান কল্পকাহিনীকেও হার মানায়। তথাপি সবকিছুই সত্য।

বিজ্ঞানীরা এখন বিশ্বাস করেন সমান্তরাল মহাবিশ্ব আছে প্রকৃতপক্ষে অগণিত সংখ্যক সমান্তরাল মহাবিশ্বের একটিতে আমরা বাস করছি। অন্য মহাবিশ্বে স্থান-কাল এবং আরও বিচ্ছিন্ন বহিরাগত পদার্থ (exotic matter) আছে। এই জাতীয় পদার্থের মধ্যে এমনকি আপনিও হতে পারেন সামান্য কিছু ব্যতিক্রমসহ। সবচেয়ে বিশ্বয়কর হল বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন এই সমস্ত সমান্তরাল মহাবিশ্বের অস্তিত্ব আমাদের থেকে মাত্র এক মিলিমিটির দূরে। প্রকৃতপক্ষে কেবলমাত্র দূর্বল সঙ্কেত হিসাবে আমাদের মহাকর্ষ (gravity) অন্য কোন মহাবিশ্ব থেকে আমাদের মহাবিশ্বে প্রবিষ্ট হচ্ছে।”

একটা দরজা খুলে দাও। তারপর এর উত্তাপ ও ক্ষতিকারক বাতাস তার নিকট আসবে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফের আদ্বুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণিত-

হাঃ তোমাদের যে কেহ মৃত্যুবরণ করলে সকাল এবং সন্ধ্যায় তাকে তার অবস্থান দেখান হবে। সে যদি বেহেশতী হয় তখন সে বেহেশতবাসীদের মধ্যে একজন হবে এবং সে যদি জাহানামী হয় তখন সে জাহানামবাসীদের মধ্যে একজন হবে এবং তাকে বলা হবে, এটাই তোমার অবস্থান। আল্লাহ যতক্ষণ পর্যন্ত না পুনরুত্থান দিবসে তোমাকে পুনজাগরণ করেন। বুখারী শরীফে আদ্বুল্লাহ বিন মাসুদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের অংশ বিশেষ-

হাঃ তোমাদের মধ্যে হয়ত কেহ বেহেশতবাসী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কর্ম এত বেশী করে থাকতে পার ফলে বেহেশত এবং তার মধ্যে দূরত্ব হবে মাত্র একহাত কিন্তু তার সম্পর্কে যা লেখা হয়েছিল (মাত্রগর্ভে) তার আচরণ তদ্বপ হবে এবং সে এমন ধরনের কাজ (কু) করবে যা জাহানামী বৈশিষ্ট্য পূর্ণ (ফলে) জাহানামে প্রবেশ করবে এবং তোমাদের মধ্যে কেহ এত বেশী কাজ (কু) করতে পার যা জাহানামী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ফলে তার এবং জাহানামের মধ্যে ব্যবধান হবে মাত্র এক হাত তারপর তার জন্য যা লেখা হয়েছিল সে অনুসারে আচরণ করবে এবং তারপর সে এমন কাজ (ভাল) করতে থাকবে যা বেহেশতবাসী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং (পরিণামে) বেহেশতে প্রবেশ করবে।

ইবনে হাজারের ফতুল্ল বারী গছে এবং ইবনে কাসীরের তাফসীর গছে হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীস।

হাঃ অন্যান্য পৃথিবীতেও তোমাদের নবীর মত নবী আছেন, আদমের মত আদম আছেন, নূহের মত নূহ, ইবরাহীমের মত ইবরাহীম ও ঈসার মত ঈসা রয়েছেন।

কোন এক সূর্য গ্রহণের দিন দীর্ঘ নামাজের সময়

হয়রত মুহাম্মদ (সা:) কে জান্নাত ও জাহন্নাম দেখান হয়।

মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং বুখারী ও মুসলিম শরীফে আন্দুল্লাহ ইবনে আবুস (রাঃ) বর্ণিত হাদীস থেকে এটা জানা যায়। এছাড়া মুসলিম শরীফে আলাস (রাঃ) বর্ণিত অনুরূপ হাদীস আছে।

নিখিল মহাবিশ্ব সমপরিমাণ বস্তু এবং প্রতিবস্তু (matter & antimatter) দ্বারা গঠিত।

সার-সংক্ষেপ (বিজ্ঞান)	কোরআন/হাদীস/ ব্যাখ্যা
<p>১৮। ১৯৩২ সালে প্রথম ল্যাবরেটরীতে পজিট্রন আবিস্কৃত হয়। পজিট্রন হ'ল ইলেক্ট্রনের বিপরীত উপ-পারমাণবিক কণা অর্থাৎ সমান ওজনের অর্থচ একটি অপরাদির বিপরীত বৈদ্যুতিক চার্জ বহনকারী কণা। পরবর্তীতে দীর্ঘ, ব্যয়বহুল সাফল্যজনক অনুসন্ধানের ফলে প্রতিকণার সন্ধান পাওয়া যায়। এর থেকে জগৎ বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন সমগ্র নিখিল মহাবিশ্ব সমপরিমাণ বস্তু এবং প্রতিবস্তু (matter and antimatter) দ্বারা গঠিত।</p>	<p>কোরানের তিনটি সুরায় পৃথক পৃথকভাবে তিনটি আয়াতে বিজ্ঞানীদের অতি সাম্প্রতিক আবিস্কারের কথা চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে কোরানে উল্লেখ আছে।</p> <p>কোঃ আমি প্রত্যেক বস্তু জোড়ায় জোড়ায় (matter-antimatter) সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা সঠিকভাবে পুনঃ প্রকাশিত হও। (reflect) ৫১:১৯</p> <p>কোঃ তিনি সমস্ত কিছু যুগল ঝাপে সৃষ্টি করেন। ৪৩:১২</p> <p>কোঃ পবিত্র সে মহান সত্তা যিনি প্রতিটি বস্তুকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন, (যেমন) যমীন থেকে যা উদগত হয় তার থেকে, তাদের নিজেদের থেকে এবং যা সম্পর্কে তাদের জানা নেই তার থেকে ৩৬:৩৬। অনুরূপ আয়াত ৪২:১।</p>

কের ব্ল্যাকহোলের (ঘূর্ণায়মান ব্ল্যাকহোল) উন্নুক্ত অনন্যতার (naked singularity) খণ্ডাত্মক অঞ্চল (negative region) ও হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর মিরাজ।

সার-সংক্ষেপ (বিজ্ঞান)	কোরান/ হাদীস/ ব্যাখ্যা
<p>১৯। ইতিমধ্যে আলোচিত হয়েছে মহাবিশ্বে ঘূর্ণায়মান ব্ল্যাকহোল অর্থাৎ কের-ব্ল্যাকহোলের সংখ্যাই বেশী। কের ব্ল্যাকহোলের অনন্যতাটি বলয় (ring)</p>	<p>মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদীনায় হিজরতের এক বছর পূর্বে রজব মাসের ২৭ তারিখের রাতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ অলৌকিক নির্দশন মিরাজ সংগঠিত</p>

আকৃতির। এই অনন্যতার মাঝখানে (কোনক্রমেই অনন্যতাকে আঘাত করা চলবে না) বাপ দিলে সম্পূর্ণ নতুন মহাবিশ্ব নিয়ে যাবে। পথটি একমুখী এবং কোন ক্রমেই পূর্বের অবস্থানে ফিরে আসা যাবে না।

কের ব্ল্যাকহোলের কৌণিক গতি (angular speed) যদি কোন কারণে অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায় তবে উভয় ঘটনা দিগন্তকে প্রবলবেগে নিষ্ক্রিয় ক'রে অনন্যতাকে উম্মুক্ত করে। জ্যোতির্পদার্থবিদরা যদিও মনে করেন এইরূপ উম্মুক্ত অনন্যতা গঠন হওয়া খুবই জটিল তবুও আইনষ্টাইনের সমীকরণের সমাধান উম্মুক্ত অনন্যতার বাস্তবে সৃষ্টির সম্ভাবনাকে একেবারে নাকচ করে না।

উম্মুক্ত অনন্যতার মাধ্যমে পরিভ্রমণ ছাড়াও ভিতর থেকে অনেক দূর অসংখ্য মহাবিশ্ব দেখা সম্ভব। এই বলয় অনন্যতাটি আলোর চেয়ে দ্রুতগামী (time-like) ফলে এই পথে আলোর চেয়ে কম গতিতে অতিক্রম করা সম্ভব। অনন্যতার ভিতর অঞ্চলটি ঝণাত্মক বন্ধ আলোর চেয়ে দ্রুতগামী (negative closed time like loop) কুণ্ডলী। এটি এমন একটি অঞ্চল যেখানে 'অতীত' এবং 'ভবিষ্যৎ' এর স্বাভাবিক প্রতিবন্ধকতা অর্থহীন হয়ে যায়। একজন ভ্রমণকারী এই অঞ্চলে যে কোন অতীত-ভবিষ্যৎ পরিদর্শন করতে পারবে। এই বলয়ের ভিতর দিয়ে যদি ঝণাত্মক অঞ্চলে (negative region) পরিভ্রমণ করা যায় তবে তা পূর্বের মত একমুখী পথ হবে না যা যাত্রারাস্ত স্থানে ফিরে যেতে বাধা দিত।

ঝণাত্মক মহাবিশ্ব (negative universe) এবং ধণাত্মক মহাবিশ্ব

হয়।

মি'রাজ আরবী শব্দ এর অর্থ উর্ধ্বগমন সিড়ি বা সোপান।

হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ) মি'রাজে দু'টি যানবাহন ব্যবহার করেন। প্রথমটি হ'ল 'বুরাক' আর দ্বিতীয়টি 'রাফরাফ'। বুরাক শব্দের অর্থ হ'ল বিদ্যুৎ। আর আমরা জানি বিদ্যুৎ আলোর গতিতে অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার চলে। আর দ্বিতীয় পরিভ্রমণের জন্য যানবাহনটি 'রাফরাফ' এর গতি বুরাকের চেয়ে অনেকগুণ বেশী ছিল। হাদীসের বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় উপরোক্ত বাহকের মাধ্যমে হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ) মি'রাজ সশরীরে সংগঠিত হয়। এছাড়াও মি'রাজের পূর্বে ফেরেশতারা মহানবীর হন্দয় বিদীর্ঘ ক'রে তা ধোত ক'রে আরও কিছু প্রক্রিয়া করেছিলেন। মি'রাজ হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ) সঙ্গ আসমান, জান্নাত, জাহান্নাম, অদৃশ্য জগতের রহস্যাবলী প্রদর্শন করেন, বহুনবী-রসূলের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ এবং তিনি নবী ও ফেরেশতাদের নামাযে ইমামতি করেন। জান্নাত ও জাহান্নামের অধিবাসীদের প্রত্যক্ষ করেছিলেন, মহান আল্লাহর সঙ্গে কথা বলেছিলেন এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায়ের বিধান এনেছেন।

সমস্ত সৃষ্টি জগতের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তিনি যখন পৃথিবীতে মুক্তা নগরীতে স্বীয় বাসগ্রহে ফিরে আসেন, তখনও ওয়ূর অবশিষ্ট পানিটুকু গড়িয়ে যাচ্ছে, তাঁর বিছানার উষ্ণতা বিদ্যমান ছিল। এ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণনা আছে। এই সমস্ত মি'রাজ বা পরিভ্রমণের জন্য পার্থিব সময় হয়তো বা এক মিনিটেও কম লেগেছে।

হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ) মি'রাজ সম্পর্কে পবিত্র কোরানের কিছু আয়াত আছে।

(positive universe) কে বিচ্ছিন্নতাকারী এই বলয় অনন্যতার মাধ্যমে যে কোন কিছু এক মহাবিশ্ব থেকে অন্য মহাবিশ্বে যাতায়াত করতে পারে। নীতিগতভাবে যে কোন মহাবিশ্বের স্থান-কালের (space-time) যে কোন বিন্দু থেকে এই অনন্যতার দিকে অগ্রসর হওয়া যাবে। অনন্যতার কক্ষপথে সঠিক উপযোগী পথে পরিচালিত হলে যাত্রার স্তরের বিন্দুতে আবার ফিরে আসা সম্ভব। শুধু তাই নয় যাত্রা শুরুর সময়ের আগেই ফিরে আসা সম্ভব। মহাবিশ্বের কোথাও যদি এরকমের রূপাকহোলের উম্মুক্ত অনন্যতা থেকে থাকে, তবে নীতিগতভাবে যে কেউ এই মুহূর্তে যেখানে বসে আছে সেখান থেকে মহাবিশ্বের যে কোন স্থানে বা যে কোন সময়ে - অতীত, বর্তমান অথবা ভবিষ্যতে ইচ্ছামত পরিভ্রমণ করতে পারে। তবে শর্ত একটি তা হ'ল সঠিক গমন পথটি অনুসরণ করতে হবে।

কোঃ তিনি পরিত্রতম ও মহিমাময়, যিনি একদা রাতে তাঁর সেবককে তাঁর নিদর্শন দেখাবার জন্য দ্রুমণ করিয়েছিলেন- মসজিদুল হারাম (খানায়ে কাবা) হতে মসজিদুল আক্সা (বায়তুল মোকাদ্দাস) পর্যন্ত, যার পরিবেশ আমি রবকমতয় করেছি যেন আমি তাকে কতিপয় নির্দর্শন প্রদর্শন করি; নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। ১৭:১

কোঃ স্মরণ করুন, আমি আপনাকে বলে দিয়েছিলাম যে, আপনার পালানকর্তা মানুষকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং যে দৃশ্য আমি আপনাকে দেখিয়েছি (মি'রাজে) তা এবং কুরআনে উল্লিখিত অভিশঙ্গ বৃক্ষটি কেবল মানুষের পরীক্ষা জন্যে। আমি তাদেরকে তায় প্রদর্শন করি। কিন্তু এতে তাদের অবাধ্যতাই আরও বৃদ্ধি পায়। ১৭:৬০

কোঃ রসূলের অন্তর মিথ্যা বলেনি যা সে দেখেছে। তোমরা কি বিষয়ে বির্তক করবে যা সে দেখেছে? নিশ্চয় সে তাকে [জিবরাইল (আঃ)] আরেকবার দেখেছিল। সিদরাতুল মুস্তাহার নিকটে যার কাছে অবস্থিত বসবাসের জান্মাত। যখন বৃক্ষটি, যার ঘারা শোভিত হবার তার ঘারা মন্ডিত ছিল। তার দৃষ্টিবিভ্রম হয়নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি। সে তো তার পালনকর্তার মহান নির্দর্শনাবলী অবলোকন করেছে। ৫৩:১১-১৮

এছাড়া মি'রাজ সংক্রান্ত মহানবী (সাঃ) এর অনেক হাদীস রয়েছে। এ সমস্ত হাদীসে তাঁর মি'রাজে যাত্রার শুরু থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে।

আপেক্ষিকতাবাদ ও কোরান

বিখ্যাত তত্ত্ব ও পদাৰ্থবিদ আলবাৰ্ট আইনষ্টাইন ১৯০৫ সালে বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব (Special Theory of relativity) প্রকাশ কৰেন। এই তত্ত্বতে তিনি দেখান নিউটনের তিনটি গতি আইন (Laws of Motion) আলোৰ বেগেৰ (Velocity) কাছাকাছি না পৌছা পৰ্যন্ত কাজ কৰে। শুন্মে (পদাৰ্থ ও মহাকৰ্ষ ক্ষেত্ৰেৰ বাহিৱে) এই আলোৰ বেগ সৰ্বদাই এক ($299,792.468$ কিঃমিঃ/সেঃ)। বস্তুৰ দ্রুতি বা বেগ অনুযায়ী স্থান ও কালেৰ পৱিতৰণ ঘটে থাকে। অন্য কথায় দ্রুতগামী বস্তুৰ ক্ষেত্ৰে সময় ধীৰে চলে (time dilation)। ১৯১৫ সালে আইনষ্টাইন ব্যাপক আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব (General theory of relativity) প্রকাশ কৰেন। এই তত্ত্বে নিউটনেৰ মহাকৰ্ষ আইন মহাকৰ্ষেৰ ক্ষেত্ৰ অতিমাত্ৰায় প্ৰবল না হওয়া পৰ্যন্ত কাজ কৰে। বৃহৎ ভৱেৰ বস্তুৰ নিকট (প্ৰবল মহাকৰ্ষ ক্ষেত্ৰ) সময় ধীৰে চলে। আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বেৰ মূল ধাৰণাই এটা।

বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব : আলোৰ গতি

সগুণশ শতক থেকেই বিজ্ঞানীৱা বিশ্বাস কৰতেন আলোৰ চেয়ে দ্রুতগামী আৱ কোন কিছুই হতে পাৰে না। পৰিবৰ্তীতে তা পৱিমাপেৰ বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

১৬৬৭ সালে গ্যালিলিও ধাৰণা দেন আলো শব্দেৰ চেয়ে কমপক্ষে দশগুণ দ্রুত।

১৬৭৫ সালে ওলি বোমার আলোৰ গতি পৱিমাপ কৰেন $200,000$ কিঃ মিঃ/ সেঃ

১৭২৮ সালে জেম্স ব্ৰাডলী আলোৰ গতি পৱিমাপ কৰেন $301,000$ কিঃ মিঃ/ সেঃ

১৮৪৯ সালে হিপপোলাই লুইস ফিজিয়াও আলোৰ গতি পৱিমাপ কৰেন $313,300$ কিঃ মিঃ/ সেঃ

১৯২৬ সালে লেয়েন ফাউকাল্ট আলোৰ গতি পৱিমাপ কৰেন $299,796$ কিঃ মিঃ/ সেঃ। আইনষ্টাইনেৰ আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব প্ৰকাশেৰ পৰ আধুনিক যন্ত্ৰপাতিৰ সাহায্যে কেবলমাত্ৰ বৰ্তমানে বিজ্ঞানীদেৱ আলোৰ গতি $299,792.468$ কিঃ মিঃ/ সেঃ ($187,370.286$ মাই/ সেঃ) নিৰ্ভুলভাৱে বেৱ কৰতে সক্ষম হয়।

১৪০০ বছৰ পূৰ্বেৰ পৰিব্রত কোৱানে কোন রকম বৈজ্ঞানিক যন্ত্ৰপাতি ব্যাতিৱিকে আলোৰ গতি নিৰ্ভুলভাৱে বৰ্ণনা কৰা হয়েছে নিম্নলিখিত আয়াতে।

—তিনি আসমান হতে জমিন পৰ্যন্ত সমুদয় বিষয় পৱিচালনা কৰেন এবং এই ব্যবস্থাপনার বিবৰণ উক্কে তাৰ সমীপে একদিনেৰ দূৰত্বে পৌছায় যা তোমাদেৱ পৱিমাপে এক হাজাৰ বছৰ। ৩২:৫

উপৱেৱ আয়াতে ‘আৱাজ’ শব্দেৰ ক্ৰিয়াপদ ‘ইয়াৰুজ’ ব্যবহৃত হয়েছে। যাৱ আভিধানিক অৰ্থ খোড়া পায়ে গমন। অন্য কথায় ‘দূৰত্ব’ কেই বুৰোন হয়েছে।

কোৱান ও হাদীসেৰ বিভিন্ন বিবৰণ থেকে জানা যায় ফেৰেশ্তারা আলোৰ তৈৱী এবং তা অপেক্ষাকৃত কম ভৱেৰ প্ৰাণী। তাদেৱ চলার গতি শূন্য থেকে আলোৰ গতি পৰ্যন্ত হতে পাৰে। ফেৰেশ্তারাই আল্লাহৰ ‘লাওহে মাহফুজ’ থেকে আল্লাহৰ যাবতীয় আদেশ আদান প্ৰদান কৰে থাকে। কোৱানেৰ উপৱেৱ আয়াতটিতে ফেৰেশ্তাদেৱ আল্লাহৰ লাওহে মাহফুজেৰ সঙ্গে যোগাযোগেৰ একটি গতি বৰ্ণনা কৰা হয়েছে। যা বিশ্ময়কৰ রূপে বৰ্তমানে বিজ্ঞানীদেৱ পাওয়া আলোৰ গতিৰ সঙ্গে মিলে যায়।

কোরানের আয়াত অনুসারে আমরা উপরের সূত্রটি গণিতের ভাষায় নিম্নরূপ লিখতে পারি। ফেরেশতাদের একদিনের অতিক্রান্ত দূরত্ব আমাদের গণনার এক হাজার বছরের সমান। অন্য কথায় চন্দ্র বছর (Lunar year) অনুযায়ী চন্দ্র এক হাজার বছরে ১২,০০০ চন্দ্র কক্ষপথ অতিক্রম করে।

একদিনে ফেরেশতাদের অতিক্রান্ত দূরত্ব = $12000 \times$ চন্দ্রের এক কক্ষপথের দূরত্ব।

আমরা জানি, দূরত্ব = গতি \times সময়।

ফেরেশতাদের অতিক্রান্ত দূরত্ব = C. t, এখানে C ফেরেশতাদের গতি যা আমরা গণনা করব। t সময় একদিন = ২৩ ঘন্টা ৫৬ মিঃ ৪.০৯০৬ সেঃ = ৮৬১৬৪.০৯০৬ সেঃ

এক চন্দ্র কক্ষের অতিক্রান্ত দূরত্ব = V_o.T. এখানে V_o চন্দ্রের জড়গতি, T চন্দ্রমাস (চন্দ্রের একমাসে পৃথিবীর প্রদক্ষিণের সময়) ২৭.৩২১ ৬৬১ দিন = ৬৫৫.৭১৯৮৬ ঘন্টা। অর্থাৎ সূত্রটি এখন দাঢ়ায় : C. t = ১২০০০ V_o.T.

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা চন্দ্রের গতি নিম্নলিখিত সূত্রে নির্ণয় করেন।

গতি = দূরত্ব \times সময় = চন্দ্রের কক্ষপথের দূরত্ব \times সময়, পৃথিবীর আপেক্ষিকতায় চন্দ্রের কক্ষপথ প্রায় বৃত্তাকার সূতরাং গড় ব্যাসার্ধ R = ৩৮৪২৬৭ কিঃ মিঃ

ধরি পৃথিবীর চারপাশে চন্দ্রের কক্ষপথের দূরত্ব 'L'

$$L = 2\pi R$$

$$V = \frac{L}{T} = 2\pi R/T$$

$$V = 2 \times 3.141593 \times 384267 / 655.71986 = 3682.092 \text{ কিঃ মিঃ/ঘ}$$

উপরের চন্দ্রের গতি পৃথিবীর আপেক্ষিকতায় যদিও প্রায় স্থিতিক ; কিন্তু এই গতি সূর্য, তারকার মহাকর্ষে প্রভাবিত। আমরা যেহেতু আলোর গতি শূন্যে অর্থাৎ সবধরনের বাহিরের বল বা মাধ্যমের প্রভাবমুক্ত, সূতরাং আমাদের চন্দ্রের গতিও বাহিরের বলের প্রভাব মুক্ত হতে হবে।

ধরা যাক সূর্যের চারিদিকে এক চন্দ্রমাসে পৃথিবী চন্দ্রের অবস্থান ϕ কৌণিক দূরত্ব অতিক্রম করে।

এক্ষেত্রে চন্দ্রের গতি 'V' হবে স্পর্শক (tangential) গতি 'V_t' এবং ব্যাসাধীয় গতি (Radial) 'V_r' (সূর্যের মহাকর্ষ জনিত টানের জন্য) যোগফলের সমান।

আমরা যেহেতু চন্দ্রের গতি আলোর গতির আপেক্ষিকতায় নির্ণয় করেছি এবং তা মহাকর্ষ প্রভাবমুক্ত সূতরাং এক্ষেত্রে আমরা ব্যাসাধীয় গতি গণ্য করব না। সূতরাং আমরা শুধুমাত্র গতির হাস-বৃন্দি হীন (Unaccelerated) স্পর্শক গতি বিবেচনায় আনব। অর্থাৎ $V_t = V \cos \phi$ । পৃথিবীর মহাকর্ষের ক্ষেত্রের প্রভাবে সংজ্ঞা অনুযায়ী 'V' পৃথিবীর আপেক্ষিকতায় চন্দ্রের স্পর্শক গতি। আর পৃথিবীর মহাকর্ষের বল এই গতির সঙ্গে লম্বালম্বি (90°)। পৃথিবীর ব্যাসাধীয় বল এবং এই স্পর্শক গতি ই চন্দ্রকে পৃথিবীর চারিদিকে কক্ষপথে পরিচালন করে, সূতরাং 'V' হচ্ছে চন্দ্রের কোন রকম গতির হাস-বৃন্দি ছাড়া (Unaccelerated) স্পর্শক গতি পৃথিবীর আপেক্ষিকতায়।

সূর্য এক চন্দ্রমাসে যে কৌণিক দূরত্ব অতিক্রম করবে তা হবে (চন্দ্র পৃথিবীর আপেক্ষিকতায়) $\phi=0$ (অগণ্য) যেহেতু $\cos\phi = 1$; $Vt = V\cos\phi = V$ অর্থাৎ গতির কোন পরিবর্তন হবে না। দূরবর্তী তারকার মহাকর্ষ বল উপেক্ষা করা যেতে পারে। কারণ চন্দ্রমাসে কোন প্রভাব পড়বে না। সূতরাং $Vt = 0$ । অথচ নিকটবর্তী সূর্যের মহাকর্ষ বল খুবই গুরুতৃপ্ত তা চন্দ্রকে ত্বরান্বিত (accelerate) করে। শূন্যে আলোর গতি নির্ণয়ে বিজ্ঞানীরা দূরের তারকার মহাকর্ষ প্রভাব উপেক্ষা করে। কিন্তু সূর্যের মহাকর্ষের প্রভাব বিবেচনায় আনে।

সূতরাং সকল মহাকর্ষের ক্ষেত্রের বাহিরে চন্দ্রের গতি –

$$V_0 = V\cos\phi, \text{ এখানে } V \text{ মহাকর্ষের ভিতরে চন্দ্রের গতি।}$$

ϕ - এক চন্দ্র মাসে সূর্যের চারিপাশে পৃথিবী-চন্দ্র পদ্ধতির অতিক্রান্ত কৌণিক দূরত্ব।

এখন আমরা ফেরেশতাদের গতি 'C' নির্ণয় করতে পারব।

$$C \cdot t = 12000 V_0 \cdot T \text{ আমরা জানি } V_0 = V\cos\phi \text{ (নিম্নে বিশ্লেষণ দেখুন)}$$

$$C = 12000 V\cos\phi T / t$$

$$= 12000 \times 3682.092 \times 0.8915685 \times 655.71986 / 86168 .0906$$

C=২৯৯৭৯২.৫ কিঃ মিঃ/সেঃ বিশ্লেষণ ভাবে বিজ্ঞানীদের পাওয়া আলোর গতির সমান !!!

[বিশ্লেষণ প্রতি দু'টি নতুন চন্দ্র (এক চন্দ্র মাসে) চন্দ্র সূর্যের আপেক্ষিকতায় ২৯.১০৬৭৫ ডিগ্রী অতিক্রম করবে। সূতরাং সূর্যের আপেক্ষিকতায় চন্দ্রের গড় কৌণিক গতি –

২৯.১০৬৭৫°/২৯.৫৩০৫৯ দিন = ০.৯৮৫৬৮৭৪২ ডিগ্রী/ দিন। সূতরাং এক চন্দ্রমাসে সূর্যের আপেক্ষিকতায় চন্দ্রের গড় কৌণিক দূরত্ব $\phi = 27.321661$ দিন \times $.9856872$ ডিগ্রী/ দিন = ২৬.৯২৯৫২ ডিগ্রী।

$$\cos 26.92952 = 0.8915685$$

কোরানের উপরোক্ত আয়াতে (৩২:৫) ১৪০০ বছর পূর্বে সংবাদ আদান-প্রদানের (ফেরেশতাদের) গতি আধুনিক বিজ্ঞানীদের প্রাণ (আপেক্ষিকতা তত্ত্বের ভিত্তিতে) আলোর গতির সমান। এটি যে কোন বিবেকমান মানুষের মনে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহতালা রাক্খুল আলআমীনের কাছ থেকে প্রাণ জ্বানের প্রমাণ নয় কি? কোরানের নিম্নের আয়াতটিও যেন তারই প্রতিধ্বনি করে।

—তিনিই সূর্যকে তেজদীপ্ত ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করেছেন এবং তার মন্দ্যিল সমূহ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যাতে তোমরা বর্ষের গণনা ও হিসাব (গণিত) অবগত হও। আল্লাহ এটি নির্থক সৃষ্টি করেননি, তিনি বিজ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য এ সমস্ত নির্দেশন বিশদভাবে বিবৃত করেন। ১০:৫

সময়ের মন্তব্য (Time Dilation)

আইনষ্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব আমাদেরকে জানায় অতি দ্রুতগামী বন্ধুর সময় ধীরে চলে (Time Dilation)। কোরানের অন্য আর একটি আয়াতে এই তত্ত্বের সত্যতা বর্ণনা করা হয়েছে।

- ফেরেশতা ও রূহ তার সমীপে আরোহণ করে পৌছায় এমন একটা দিনে (সময়ে গতিতে) যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর। ৭০:৪

উপরোক্ত আয়াতে ফেরেশতাদের একদিনে অতিক্রান্ত দূরত্ব আমাদের পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বানুসারে সময়ের এই তারতম্য (Time Dilation) থেকে আমরা বন্ধুর পরিভ্রমণের গতি নির্ণয় করতে পারি। আমরা তা থেকে যাচাই করতে পারি ফেরেশতা বা আত্মা প্রায় আলোর গতি প্রাণ্য হয়েছে কিনা।

আইনষ্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বানুসারে স্থান, কাল এবং ভৱ পরিবর্তনশীল (not constant)। এগুলির মান চলমান বন্ধুর গতির উপর নির্ভরশীল। বন্ধুর গতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সময় ধীরে চলতে থাকে। গাণিতিকভাবে তা নিম্নরূপ।

$$\Delta t = \Delta t_0 / \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

Δt_0 – ফেরেশতাদের সময় (১দিন);

Δt – পার্থিব সময় (৫০,০০০ বছর \times ৩৬৫ দিন);

V ফেরেশতা বা আত্মার গতি যা আমরা নির্ণয় করব।

C – আলোর গতি ২৯৯৭৯২.৪৫৮ কিঃ মিঃ/ সেঃ (শূন্য)

এখানে Δt_0 সময়ের পরিমাণ যা গতিশীল বন্ধু নিজেই পরিমাপ করে।

Δt কোন স্থির কাঠামো গতিশীল বন্ধুর সময়ের পরিমাপ করে।

V কোন স্থির কাঠামোর আপেক্ষিকতায় কোন বন্ধুর গতি।

উপরের সমীকরণ থেকে –

$$V = C \sqrt{1 - \Delta t_0^2 / \Delta t^2}$$

$$= C \sqrt{1 - 1 / (50,000 \times 365)^2}$$

$$= C \times 0.999999999999999$$

$$V = 299792.45799999995499 \text{ কিঃমিঃ/সেঃ}$$

উপরের হিসাব থেকে আমরা জানতে পারি ফেরেশতা বা আত্মার আলোর গতির কাছাকাছি চলতে পারে। এটি কোন সংজ্ঞটন (Coincidence) নয়। পূর্বের চন্দ্র মাসের গণনাতেও আমরা একই পেয়েছি। আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বের সময়ের মন্তব্য (Time Dilation) আমাদেরকে একই তথ্য দেয়।

ব্যাপক আপেক্ষিকতাবাদ (General Theory of Relativity)

ব্যাপক আপেক্ষিকতাবাদ জানায় পৃথিবীর চেয়ে বিশাল আকৃতির বস্তুর (প্রবল মহাকর্ষ ক্ষেত্রে) নিকট সময় ধীরে চলে (Time Dilation)। এই তত্ত্বটির সকানও আমরা কোরানে পাই।

—তারা তোমাকে শান্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, অথচ আল্লাহ তার প্রতিজ্ঞা কখনও ভঙ্গ করেন না। তোমার প্রতিপালকের একদিন (প্রতিশ্রূত জান্নাত/জাহান্নামে) তোমাদের গণনায় সহস্র বছরের সমান। ২২:৪৭

এখানে আল্লাহ অবিশ্বাসীরা যারা জাহান্নাম ও শান্তির বিশ্বাস করে না, তাদের নিকট প্রতিজ্ঞা করছেন, জাহান্নামের একদিনের শান্তি পার্থিব গণনায় এক হাজার বছরের সমান। সুতরাং এই আয়াত অনুসারে কম ভরের পৃথিবীতে সময় অধিক ভর সম্পন্ন জাহান্নাম/জান্নাতের চেয়ে দ্রুত অতিবাহিত হয়। ব্যাপক আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বে বৃহত্তর ভরের সময় ধীরে চলে উপরের আয়াতটি তাই প্রমাণ করে। জান্নাত ও জাহান্নাম পৃথিবীর চেয়ে অনেক অনেক গুণ ভর বিশিষ্ট তাই সময়ও সেখানে পৃথিবীর তুলনায় অনেক ধীরে চলবে। জান্নাত ও জাহান্নাম যে প্রবল ভর সম্পন্ন তা উল্লেখ আছে। নিম্নের আয়াতে —

হে দুই 'ওজনদার বস্তু' (জান্নাত/জাহান্নাম) শীঘ্রই তোমাদের বিষয় মীমাংসা করবার আমার অবসর হবে। ৫৫:৩১

আল্লাহর সিংহাসন ব্যাপক ও বিশাল ভর সম্পন্ন। কোরানের নিম্নের আয়াতে তার উল্লেখ আছে।

আল্লাহর সিংহাসন (কুরসী) সমগ্র নভোমভ্ল ও ভূমভ্ল ব্যাপী পরিব্যাঙ্গ হয়ে আছে ২৪:২৫৫

সুতরাং আল্লাহর সিংহাসনের ভর অকল্পনীয় এবং ব্যাপক আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বানুসারে সেখানে পৃথিবীর তুলনায় সময় খুব ধীরে চলবে। পৃথিবী কোটি কোটি বছর আল্লাহর সিংহাসনে বা আল্লাহর নিকট একদিনের সমান হবে।

কোরানের তথ্যানুসারে

আল্লাহর সিংহাসন (কুরসী)>জান্নাত/জাহান্নাম>পৃথিবী

স্বল্পভরের সময় দ্রুত অতিক্রান্ত হয়।

একবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের গবেষণায়, অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণের ফলে সৃষ্টির যে নতুন নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত হয়েছে তা কোরানের প্রতিটি আয়াতের (নিদর্শনের) বাস্তবতার দিকেই ইঙ্গিত করে নাকি? কোরানের নিম্নের আয়াতটিই তার ভবিষ্যৎবাণী করেছে।

— শীঘ্রই আমরা এদেরকে আমাদের নিদর্শন সমূহ (আয়াত) পৃথিবীর দিগন্তে ব্যক্ত করব এবং তাদের নিজেদের মধ্যেও, ফলে এদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে এই (কোরান) বাস্তবিকই সত্য। ৪১:৫৩

GLOSSARY (শব্দ কোষ)

Absolute Zero (চরম শূন্যতা) : সর্বনিম্ন তাপমাত্রা- এ অবস্থায় কোন তাপশক্তি থাকে না। চরম শীতলতা সাধারণত -273° সেলসিয়াস।

Accretion Disk (পুঞ্জিত চাকতি) : মহাবিশ্বের সবকিছু আবর্তনশীল। ব্ল্যাকহোল বা নিউটন নক্ষত্রের মত অতি ঘনসন্ধিবিষ্ট কোন বস্তুর কেন্দ্রে চারদিকে পতনশীল মহাশূন্যের যাবতীয় পদার্থ (গ্যাস, ধূলিকণা ইত্যাদি) চক্রকারে ঘূর্ণির মত আবর্তনশীল পুঞ্জিত চাকতির সৃষ্টি করে। এ ধরণের বস্তু থেকে সবধরণের বিক্ষেপিত শক্তি বিকিরণের প্রধান উৎসস্থল হল পুঞ্জিত চাকতি।

Acceleration (ত্বরণ) : কোন কিছুর গতিবেগের পরিবর্তনের হার।

Atom (পরমাণু) : মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম একক। অতিক্ষুদ্র ও ঘন কেন্দ্রককে (nucleus-প্রোটন ও নিউটনে গঠিত) প্রদক্ষিণরত অবস্থায় থাকে কতকগুলি ইলেক্ট্রন। একটি পরমাণুর ব্যাসার্ধ হলে 10^{-9} মিঃ মিঃ।

Asteroid (গ্রহাণু) : আমাদের পৃথিবী এবং সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহ যে সমস্ত পদার্থ দিয়ে তৈরী গ্রহাণুগুলি একই ধরণের পদার্থ দ্বারা তৈরী। গ্রহের মতই সূর্যকে একইভাবে প্রদক্ষিণ করে। এগুলির ব্যাস কয়েক শত মিটার/কিলোমিটার (750 কিলোমিটার পর্যন্ত) হতে পারে। এদের সংখ্যা হতে পারে লক্ষ লক্ষ। মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের মাঝখানে এবং শনি গ্রহের চতুর্দিকে অসংখ্য গ্রহাণুর বেল্ট রয়েছে।

Astronomy (জ্যোতির্বিজ্ঞান) : বিজ্ঞানের যে শাখায় পথিবীর বাহিরে মহাবিশ্বের অভ্যন্তরে যাবতীয় বস্তুর অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ করে অবস্থান, কাঠামো এবং বিভিন্ন বিজ্ঞান ভিত্তিক তথ্য সন্ধানে লিঙ্গ থাকে।

Astrophysics (জ্যোতির্পদার্থবিদ্যা) : জ্যোতির্বিজ্ঞানের যে শাখায় প্রধানত নক্ষত্র, সৌরজগৎ - বহির্ভূত বা আন্তঃনক্ষত্রমন্ডলীয় (interstellar) যাবতীয় বস্তুর পদার্থ বিদ্যাগত বা প্রাকৃতি আইন কানুন (Laws of Nature) নিয়ে পর্যবেক্ষণ করে। জ্যোতির্পদার্থবিদ্যা সূর্য এবং গ্রহের গঠন কাঠামোর এবং বায়ুমন্ডল নিয়েও পর্যবেক্ষণ করে।

Big Bang (মহাবিক্ষেপণ) : আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার কোটি বছর পূর্বে কোন এক মহাসুস্থ বিন্দুর অনন্যতা থেকে পদার্থ ও বিকিরণের এক মহাবিক্ষেপণে আজকের এই মহাবিশ্বের জন্মাত্রা শুরু হয়। এই প্রক্রিয়াকেই বিগ-ব্যাং বা মহাবিক্ষেপণ বলে।

Big Crunch (বৃহৎ সঞ্চোচন) : মহাধ্বংসের সময়ে মহাবিশ্বের যাবতীয় গ্রহ-নক্ষত্র, মুক্তগ্যাস, ধূলিকণা ইত্যাদি একত্রিত হয়ে প্রচল শক্তিশালী মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণে অতিমাত্রায় সঞ্চুচিত হয়ে মহাবিশ্বের অন্তিম অনন্যতা গঠন করবে এবং পুনরায় তা বিক্ষেপিত হয়ে নতুন মহাবিশ্বের সৃষ্টি হবে।

Binary Star (যুগ্ম-নক্ষত্র) : পাশাপাশি অবস্থানরত দু'টি নক্ষত্র যদি পরস্পরের অভিকর্ষ বলের প্রভাবে একটি অপরটির চারপাশে আবতীর্ণ হতে থাকে তবে ঐ নক্ষত্রদ্বয়কে যুগ্ম-নক্ষত্র বলে। মহাকাশে অসংখ্য নক্ষত্র binary পদ্ধতিতে আবতীর্ণ হচ্ছে। প্রতিপক্ষ নক্ষত্র যদি দৃষ্টিগোচর না হয় তবে বিজ্ঞানীরা প্রতিপক্ষকে ব্ল্যাকহোল হিসাবে গণ্য করছেন।

Beta- Decay (বিটা বি ক্ষয়/পতন) : পরমাণুর ইলেক্ট্রনকে বিটা রশ্মি নামেও অভিহিত করা হয়। পরমাণুর কেন্দ্রকের (নিউক্লিয়াসের) নিউট্রন ও ইলেক্ট্রন নির্গত করে নিজে প্রটোনে রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে Beta-Decay বলে।

Black Hole (কৃষ্ণগহৰ) : মহাকাশের স্থান-কালের অদৃশ্য এমন এক অঞ্চল যেখানে অকল্পনীয় মহাকর্ষের ফলে প্রচন্ড শক্তিতে সবকিছুকে কেন্দ্রের দিকে টানতে থাকে এবং সেখান থেকে কোন কিছুই নির্গত হতে পারে না—এমন কি আলোক রশ্মিও নয়।

Blue Sheet (নীলাঞ্চাদন) : ব্ল্যাকহোলে কোন আলো পতিত হলে তা অসীম নীলবিচ্যুতি (blue Shift) ঘটে। এটার অর্থ হল ব্ল্যাকহোলে চারদিকে প্রাচীরে শক্তি (energy) সূপীকৃত হতে থাকে। এটিই blue sheet বা নীলাঞ্চাদন।

Blue Shift (নীল বিচ্যুতি) : কোন বস্তু যদি আপনার দিকে ধাবমান হয় এবং তা থেকে আলো নির্গত করে, তবে আলোর তরঙ্গ চলন্ত বস্তুর সঙ্গে অঙ্গাঙ়ি ভাবে জড়িত থাকে। এটার অর্থ স্বল্প তরঙ্গ দৈর্ঘ্য। নীল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য লাল আলোর চেয়ে স্বল্প এটিই blue Shift। মহাকর্ষের ক্ষেত্রে পতন আলোরও নীল বিচ্যুতি ঘটে।

Center of Mass/Gravity (ভর কেন্দ্র) : কোন বস্তু বা কোন কিছুর কেন্দ্রের দূরত্ব অনুসারে ওজন পরিমাপ করে বস্তুর সমস্ত অংশের মধ্যবর্তী বা গড় ভরের অবস্থান সেই বস্তুর কেন্দ্রে থাকে। নিউটনের প্রথম গতি আইন (Law of motion) অনুসারে ভর কেন্দ্রে গতি অপরিবর্তনীয়।

Circular Velocity (বৃত্তাকার গতি) : ক্রান্তিক দ্রুতিতে (Critical Speed) আবর্তনশীল কোন বস্তুর কক্ষপথটি যখন বৃত্তাকার হয়।

Closed Time-Like Loop (CTL-কাল সাদৃশ্য কুণ্ডলকার আবদ্ধ পথ) : স্থান কালের কোন বিন্দু থেকে যাত্রা করে পুনরায় একই বিন্দুতে যাত্রা শুরুর পূর্ব সময়ে ফিরে আসার পথকে বুঝায়। পদার্থ বিজ্ঞানের আইন এ ধরণের পথকে অনুমোদন করে।

Cluster of Galaxies (গ্যালাক্সীপুঁজের গুচ্ছ) : মহাকাশে কিছু সংখ্যক থেকে শুরু করে বিরাট সংখ্যক গ্যালাক্সী একত্রে সঙ্গবন্ধ বা গ্রহণে অবস্থান করাকে গ্যালাক্সীপুঁজের গুচ্ছ বলে।

Cold Dark Matter (CDM -শীতল অদীঘ পদার্থ) : মহাবিশ্বের সমস্ত গ্যালাক্সী গুচ্ছসহ সবকিছুই ভীষণ বেগে ছুটে চলছে। এই গতি থেকে বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন বিপুল সংখ্যক অদ্বারার পদার্থের মহাকর্ষের প্রভাবে এই গতির কারণ হতে পারে। এ ধরণের শীতল অদীঘ পদার্থ কি হতে পারে এ নিয়ে অনেক ধ্যয়ারী আছে।

Comet (ধূমকেতু) : বিভিন্ন ধরণের যৌগিক পদার্থ বিশেষ করে পাথর, গ্যাস, বরফ ইত্যাদি দিয়ে গঠিত। ধূমকেতু সূর্যকে অনিয়মিতভাবে ভিন্নকেন্দ্রী বৃত্তাকারে (high eccentricity) প্রদক্ষিণ করে।

Coma (গুচ্ছ বা কুহেলী) : সূর্যের তাপে ধূমকেতুর বিভিন্ন পদার্থ গ্যাসীয় আকারে সৃষ্টি দোয়ার মেঘ।

Conservation of Energy (শক্তির নিয়ন্ত্রণ) : পদার্থবিদ্যার আইন অনুসারে কোন (শক্তি বা তার সমমানের ভর) সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না।

Conservation of Angular Momentum (কৌণিক গতির নিয়ন্ত্রণ) : যে আইন অনুসারে কোন বিন্দু বা অক্ষাশের উপর কোন বস্তুর কৌণিক গতি বাহিরের কোন বল (force) প্রভাবিত না করলে অপরিবর্তনীয় থাকে।

Coordinates (স্থানাঙ্কমাত্রা) : যে সংখ্যাগুলি স্থান-কালে (Space-time) একটি বিন্দুর অবস্থান নির্দেশ করে।

Core (কেন্দ্রীয় স্থান) : পৃথিবী, গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহণ, ধূমকেতু ইত্যাদির কেন্দ্রীয় অংশকে Core বলে। এর চতুর্দিকে একাধিক বিভিন্ন পদার্থের স্তরবিন্যাস থাকে।

Cosmology (মহাবিশ্ব তত্ত্ব) : বিজ্ঞানের যে শাখায় মহাজাগতিক সকল প্রকার বস্তু ও শক্তির সংগঠন, বিবর্তন ইত্যাদি সম্বন্ধীয় তত্ত্ব এবং গবেষণা করে।

Cosmological Constant (মহাবিশ্ব তাত্ত্বিক ধ্রবক) : হিসেবের ধারণা থেকে আইনষ্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বের সমীকরণে একটি গাণিতিক সংখ্যা যা মহাবিশ্বে এক ধরণের বিকর্ষণ বলকে (repulsive force) বুঝায়। সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্ব প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞানীরা ধ্রবকটি মহাজাগতিক বিভিন্ন মডেলের থিয়োরীতে ব্যবহার করেন।

Cosmic Rays (মহাজাগতিক রশ্মি) : অতি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মহাসূক্ষ্ম উপপারমাণবিক মৌলকণা যা প্রতিনিয়ত পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আঘাত হানে। আলোক কণা (Photons), গামারশ্মি/রঞ্জনরশ্মি ইত্যাদি এ জাতীয় রশ্মির অন্তর্ভুক্ত। এগুলি মহাশূন্যে আলোর গতিতে চলাচল করে।

Cosmic String (মহাজাগতিক তন্ত) : অকল্পনীয় ঘনত্বের শক্তির অতি সুরক্ষিত পরমাণুর নিউক্লিয়াসের চেয়ে অনেক অনেকগুণ সংকীর্ণ অথচ মহাবিশ্বের বিশাল এলাকাব্যাপী পরিব্যাণ। এগুলি বিগ-ব্যাংগের পর থেকে পরিত্যক্ত এবং খুব সম্ভব মহাকর্ষের বীজ (gravitational Seeds) হিসাবে কাজ করে এর উপর গ্যালাক্সীসমূহ সংগঠিত হয়।

Density (ঘনত্ব) : কোন বস্তুর ভর (mass) এবং আয়তনের (volume) অনুপাত।

Doppler Effect (ডপলার অভিক্রিয়া) : কোন উজ্জ্বল বস্তুর রং পর্যবেক্ষক এবং সেই বস্তুটির আপেক্ষিক গতি সঙ্গে পরিবর্তনশীল। ডপলার অভিক্রিয়া সাধারণত বিভিন্ন তরঙ্গের (আলো, শব্দ ইত্যাদি) ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়।

Doppler Shift (ডপলার বিচ্যুতি) : কোন পর্যবেক্ষণ স্থানের সঙ্গে কোন বিকিরণ উৎসের আপেক্ষিক গতির ফলে বিকিরণ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের প্রতীয়মান পরিবর্তনকে (apparent change) ডপলার বিচ্যুতি বলে।

Eclipse (গ্রাস/গ্রহণ) : মহাশূন্যে ভাসমান বিভিন্ন মহাজাগতিক বস্তু (চন্দ, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি) একটি অপরটিকে সম্মুখপানে অতিক্রম করার সময় পূর্ণ বা আংশিক আলোর পথকে ঢেকে ফেলে, এটিই Eclipse।

Einstein-Rosen Bridge (আইনষ্টাইন-রোজেন সেতু) : আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বের সমীকরণের সমাধানে মহাবিশ্বের দুটি সদূর এলাকা বা একাধিক মহাবিশ্বের সঙ্গে সংযুক্তকারী অতি সংক্ষিপ্ত পথ যা ওয়ার্মহোল বা আইনষ্টাইন-রোজেন সেতু নামে পরিচিত ।

Electric Charge (বৈদ্যুতিক চার্জ/আধান) : উপ-পারমাণবিক মৌলিকগুলির মধ্যে এমন একটি ধর্ম যার ফলে সমধৰ্মী (ধনাত্মক বা ঋণাত্মক) কণিকার মধ্যে বিকর্ষণ এবং বিপরীত ধর্মী কণিকার মধ্যে আকর্ষণ ঘটে ।

Electromagnetic Force (বিদ্যুৎ-চূম্বকীয় বল) : বৈদ্যুতিক চার্জ সম্পন্ন একাধিক কণিকার মধ্যেবর্তী যে বলের উত্তোলন হয় । চারটি মৌলিক বলের মধ্যে শক্তির দিক দিয়ে দ্বিতীয় । বৈদ্যুতিক চার্জের জন্য দায়ী ইলেক্ট্রন পরমাণুর নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে সন্তরণ অবস্থায় থাকে ।

Electro magnetic Radiation (বিদ্যুৎ-চূম্বকীয় বিকিরণ) : যে বিকিরণের তরঙ্গমালা বৈদ্যুতিক এবং চূম্বকীয় ক্ষেত্রের গঠন ও ভাঙনের মাধ্যমে প্রবাহিত হয় । বেতার, অবলোহিত (infrared), অতি বেগুনী (ultraviolet), রঞ্জন ও গামারশি ইত্যাদির তরঙ্গমালার বিকিরণ এই জাতীয় ।

Electron (ইলেক্ট্রন) : ঋণাত্মক চার্জযুক্ত উপপারমাণবিক কণিকা যা সাধারণত পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে প্রদক্ষিণ করে । সংখ্যায় সবসময় নিউক্লিয়াসের প্রোটনের সমান হয় ।

Electron Volt (ইলেক্ট্রন ভল্ট) : একক ভল্টে একটি ইলেক্ট্রন যে পরিমাণ গতিশক্তি (Kinetic energy) প্রাপ্ত হয় । এক ইলেক্ট্রন ভল্ট 1.60207×10^{-12} (erg) পরিমাণ শক্তি ।

Element (মৌলিক পদার্থ) : শুধুমাত্র একই রকম পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত পদার্থ । রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আর বিভাজন অর্থাৎ মূল উপাদানগুলো পরম্পর থেকে পৃথক করা সম্ভব নয় । এ যাবৎ প্রাপ্ত মৌলিক পদার্থের সংখ্যা প্রায় ১১৮টি । হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, অক্সিজেন, কার্বন, লৌহ ইত্যাদি ।

Energy (শক্তি) : কাজ করার সামর্থ্য বা ক্ষমতা ।

Equation of State (দশার সমীকরণ) : যে সমীকরণে কোন কিছুর চাপ, ঘনত্ব ও তাপমাত্রার সঙ্গে সম্পর্কিত অবস্থার বর্ণনা করে । উদাহরণস্বরূপ শ্বেতবামন (white dwarf) তারকার দশার সমীকরণের মাধ্যমে যদি এর ভর বৃদ্ধি করা যায় তবে তারকাটির আকৃতি কেমন হবে তা নির্ণয় করা যায় ।

Equation of Time (সময়ের সমীকরণ) : সময়ের সমীকরণ হ'ল প্রতীয়মান (apparent) এবং গড় সৌর সময়ের মধ্যে তারতম্য ।

Equator (নিরক্ষবৃত্ত) : উত্তর মেরু থেকে সমদ্বৰ্তে 90° বরাবর (পৃথিবীর) কান্নানিক বৃহৎ বৃত্ত ।

Erogosphere (অ্যারগোক্ষিয়ার) : আবর্তনশীল ব্ল্যাকহোলের চারপাশে ত্রিমাত্রিক উপবৃত্তীয় এলাকা । ঘৃণার্যমান অক্ষাংশে মেরুতে কোন অ্যারগোক্ষিয়ার থাকে না ।

Escape Velocity (নিষ্কৃতি গতি)ঃ যে গতিতে কোন কিছু যেমন কোনো পাথর উপর দিকে সরাসরি ছুড়ে মারা হয় তবে তা মহাকর্ষের টানে (gravitational pull) আর ভূ-পৃষ্ঠে ফিরে আসবে না। পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে সর্বনিম্ন নিষ্কৃতি গতি হচ্ছে ১১.২ কি.মি./সেকেন্ড। আবার ব্ল্যাকহোল থেকে এই নিষ্কৃতি গতি হচ্ছে আলোর গতির চেয়ে বেশী।

Euclidean Geometry (ইউক্লিডিয়ান জ্যামিতি)ঃ সাধারণ ক্ষেত্রের জ্যামিতি থেকে আমরা জানি একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি 180° এবং দু'টি সমান্তরাল সরলরেখা অসীম দূরত্ব পর্যন্ত একই দূরত্ব থাকে। আর ইউক্লিডিয়ান জ্যামিতির ধারা সঠিকভাবে প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন নিখৃত সমতল পৃষ্ঠ আর পৃথিবী পৃষ্ঠ হচ্ছে বক্র (Curve Surface)।

Event (অবস্থান)ঃ কোনো নির্দিষ্ট স্থান- কালের একটি বিন্দু।

Event Horizon (ঘটনা দিগন্ত)ঃ ব্ল্যাকহোলের চতুর্দিকের এমন একটা সীমানা (boundary) যেখান থেকে কোন কিছুই নিষ্কৃতি পেতে পারে না।

Field (ক্ষেত্র)ঃ যার স্থান, কালে সর্বব্যাপী অস্তিত্ব থাকে। আর এর বিপরীতে কণিকা এককালে একটি মাত্র বিন্দুতে অস্তিত্ব।

Force (বল)ঃ যা কোন কিছুর গতিবেগ (momentum) পরিবর্তন করে। অন্য কথায় বস্তুর গতিবেগ পরিবর্তনের আনুপাতিক হার নির্ণয়ের মাধ্যমে বলের পরিমাণ জানা যায়।

Frequency (স্পন্দনের দ্রুততা)ঃ একক সময়ে সম্পূর্ণ স্পন্দনের সংখ্যা। আর বিকিরণের ক্ষেত্রে একক সময়ে নির্দিষ্ট কোন বিন্দুকে অতিক্রান্ত তরঙ্গের সংখ্যা।

Fusion (একীভবণ)ঃ যে প্রক্রিয়ায় হালকা পারমাণবিক কেন্দ্রুক (নিউক্লিয়াস) একীভূত হয়ে অপেক্ষাকৃত ভারী পারমাণবিক কেন্দ্রুক গঠন করে। এতে প্রচুর শক্তি (energy) মুক্ত হয়। এই প্রক্রিয়াই সমস্ত তারকার এমন কি আমাদের সূর্যেরও শক্তি বিকিরণের প্রধান উৎস।

Galaxy (গ্যালাক্সি)ঃ অসংখ্য তারকা ধূলা-বালি গ্যাসীয় পদার্থ (নীহারিকা বা নেবুলা) নিয়ে গ্যালাক্সি গঠিত। এক একটি গ্যালাক্সিতে একশত কোটি বা তার চেয়ে অনেক বেশী তারকা থাকতে পারে। এ পর্যন্ত মহাকাশ পর্যবেক্ষণে একশত কোটি গ্যালাক্সির সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রকৃত সংখ্যা এর চেয়ে অনেক বেশী। আকৃতি ভেদে গ্যালাক্সিগুলি হতে পারে ইলেক্ট্রিক্যাল, স্পাইরাল, বারড স্পাইরাল এবং অনিয়মিত।

Gama Rays (গামা রশি)ঃ সবচেয়ে স্ফুর্দ্ধ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অথচ সবচেয়ে শক্তিশালী বিদ্যুৎ-চূম্বকীয় বিকিরণ। তেজস্ক্রিয় অবক্ষয় অথবা মৌলকণাণ্ডলির মধ্যে সংঘর্ষের ফলে এগুলো তৈরী হয়।

General Relativity (সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ)ঃ আইনস্টাইনের এই তত্ত্ব অনুসারে প্রতিটি পর্যবেক্ষক সাপেক্ষে (তারা যেভাবেই চলমান হ'ক না কেন) বিজ্ঞানের বিধিগুলি অভিন্ন থাকে। চার মাত্রিক স্থান-কালের বক্রতার সাহায্যে এই তত্ত্ব মহাকর্ষীয় বলকে ব্যাখ্যা করে।

Geodesic (অতি সংক্ষিপ্ত পথ) : মহাকাশের ব্যাপক এলাকার দুটি বিন্দুর মধ্যে সবচেয়ে স্বল্পতম দূরত্ব। সমতল পৃষ্ঠে geodisc সোজা-সুজি সরল রেখায়।

Giant Star (অতিবৃহৎ নক্ষত্র) : আমদের সূর্যের চেয়ে অনেক বড় (হতে পারে তিন/চার হাজার গুণ) আকৃতির অধিক উজ্জলতা এবং বৃহৎ ব্যাসের নক্ষত্রকে giant star বলে।

Gravitation (মহাকর্ষ/ অভিকর্ষ) : বিভিন্ন বস্তুসমূহ পরস্পরের দিকে আকর্ষণ (Force of attraction) করার প্রবণতাকে মহাকর্ষ বলে। উদাহরণ স্বরূপ কোন কিছু উপরের দিকে ছুড়ে মারলে পৃথিবীর মহাকর্ষ বল সেটিকে ভূ-পৃষ্ঠের দিকে টেনে আনে।

Gravitational Energy & Wave (মহাকর্ষ শক্তি এবং তরঙ্গ) : মহাকাশের নিয়মতাত্ত্বিকভাবে গঠিত কোন কিছু মহাকর্ষীয় বলের ধ্রংস বা আংশিক ধ্রংসের ফলে নির্গত শক্তিই gravitational energy আর মহাশূন্যের সবৰ্ত্ত তরঙ্গের আকারে বিকিরিত এই শক্তিই gravitational wave।

Gravitational Tidal Force (মহাকর্ষীয় জোয়ার বল) : বিশেষ মহাকর্ষীয় বল যা কোন বস্তুর আকৃতি পরিবর্তন করতে চায় বা করে।

Hawking Evaporation/Radiation (হকিং বিলুপ্তি/ বিকিরণ) : যে পদ্ধায় ব্যাকহোলের পদার্থের স্বল্পতম অখণ্ড পরিমাণ বিশেষের প্রভাবে (quantum effect) শক্তি নির্গমনের ফলে বাস্পীভূত বা বিলুপ্তি ঘটায়। আর হকিং বিলুপ্তির ফলে নির্গত বিকিরণই হকিং বিকিরণ।

Heavy Elements (ভরী মৌল) : হিলিয়ামের চেয়ে অধিক সংখ্যক পারমাণবিক সংখ্যা (atomic number) সম্পন্ন মৌল।

Hot Dark Matter (উত্তপ্ত অদীণ্ট পদার্থ) : শীতল অদীণ্ট পদার্থের মতই বিপুল পরিমাণ উত্তপ্ত অদীণ্ট পদার্থ মহাবিশ্বের গতিশীল সবকিছুর উপর মহাকর্ষের প্রভাব বিস্তার করে।

Hubble Constant (হাবাল প্রমাণক) : এটি এমন এক সমানুপাতিক প্রমাণক যা সুদূর এলাকার গ্যালাক্সির গতি এবং দূরত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত। হাবাল প্রমাণক প্রায় ৭৫ কিঃ মিৎ / সেকেন্ড 10^6 pc।

Hypothesis (প্রকল্পিত তত্ত্ব) : বিজ্ঞানের যে তত্ত্ব (theory) প্রাথমিক ভাবে আগাম কোন ঘটনা বা কোন কিছুর ব্যাখ্যা করে অথচ যার আরও পর্যবেক্ষন, অনুসন্ধান বা পরীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে।

Imaginary Time (কালানিক কাল) : কালানিক সংখ্যা ব্যবহার করে যে কাল নিরূপণ করা হয়।

Inflation (স্ফীতি) : মহাজাগতিক তত্ত্বে মহাবিশ্বের বয়স যখন এক সেকেন্ডের অনেক অনেক কম ছিল সেই মুহূর্তের মহাবিশ্বের অতিদ্রুত সম্প্রসারণতার ব্যাখ্যা করে।

Inertia (জড়তা) : বস্তুর এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা স্থিতিশীল বা গতিশীল অবস্থার পরিবর্তনের জন্য বল (force) প্রয়োগের প্রয়োজন হয়।

Infrared (অবলোহিত) : বিদ্যুৎ-চূম্বকীয় বিকিরণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দৃশ্যমান আলো তরঙ্গের (বর্ণালীর লোহিত কণা প্রান্তের বহিভূত) সামান্য দীর্ঘ।

Interstellar Matter (আনন্দক্ষণ্যীয় পদার্থ) : মহাকাশে অসংখ্য গ্যালাক্সি এবং অসংখ্য নক্ষত্র ছাড়াও হাইড্রোজেন এবং অন্যান্য সাধারণ মৌলের সংমিশ্রণে গঠিত বিভিন্ন রকম যৌগ পদার্থ অতিক্ষুদ্র বালিকণার আকারে বিদ্যমান থাকে। এছাড়া বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন রকম গ্যাসীয় পদার্থও থাকে। এ সমস্তই আনন্দক্ষণ্যীয় পদার্থ।

Ion (হৃলাণ্ড) : যে সমস্ত অণু বা পরমাণু ইলেকট্রন সংযোজিত অথবা বিচ্ছিন্ন হয়ে বৈদ্যুতিক চার্জ সম্পন্ন হয়।

Jupiter (বৃহস্পতি) : সৌর জগতের সূর্য থেকে পৃষ্ঠাম গ্রহ।

Kerr Black Hole (কের ব্ল্যাকহোল) : ঘূর্ণ্যমান ব্ল্যাকহোল যার সব সময় অ্যারগোফ্রিয়ার থাকে। নিউজিল্যান্ডবাসী বিজ্ঞানী রয় কেরের নামকরণে করা হয়েছে।

Kinetic Energy (গতি শক্তি) : গতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শক্তি। কোন বস্তুর গতিশক্তি হচ্ছে বস্তুটির ভর এবং গতির বর্গের গুণফলের অর্ধেক।

Light Year (আলোকবর্ষ) : শূন্য স্থানে আলো এক বছর সময়ে যে দূরত্ব অতিক্রম করে। প্রতি সেকেন্ডে আলো প্রায় দুই লক্ষ নিরানকই হাজার তিনশত সাইক্রিয় কিলোমিটার চলে। এই বেগে আলো এক আলোক বর্ষে 9.46×10^{12} ট্রিলিয়ন (9.46×10^{12}) কিলোমিটার দূরত্ব চলে।

Luminosity (দীপ্তিমান) : যে মাত্রায় মহাজাগতিক কোন বস্তু (তারকা, কোয়াসার ইত্যাদি) থেকে বিদ্যুৎ-চূম্বকীয় শক্তির মহাশূন্যে বিকিরণ ঘটায়।

Magnetic Field (চূম্বক ক্ষেত্র) : চূম্বক বলের ফলে সৃষ্টি ক্ষেত্র। বর্তমানে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের সঙ্গে একত্রে বিদ্যুৎ-চূম্বক ক্ষেত্রে অর্তভূক্ত হয়েছে।

Mars (মঙ্গল) : সৌরজগতে সূর্য থেকে চতুর্থ গ্রহের নাম।

Mass (ভর) : বস্তুপিণ্ডে পদার্থের পরিমাণ। বস্তুর জড়ত্বার (inertia) বৈশিষ্ট্য থেকে অথবা বস্তুটির অন্য বস্তুর উপর মহাকার্বের প্রভাব দ্বারা এর পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।

Meteor (উর্কা) : মহাশূন্যের কোন পাথর বা পদার্থ (meteoroid) পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে ঘর্ষণে জুলে আগনের ফুলকির মত উজ্জ্বল আলোর সৃষ্টি করে। একে Shooting star ও বলা হয়।

Meteor Shower (উর্কা বৃষ্টি) : ব্যাপক এলাকাব্যাপ্তি প্রচুর পরিমাণ উর্কা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার ফলে সংঘর্ষে উজ্জ্বল আলোর যে ফুলবুরি সৃষ্টি করে।

Meteorite (ভূ-পতিত উর্কা) : যে সমস্ত অপেক্ষাকৃত বৃহৎ আকৃতির উর্কাপিণ্ড পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের আঘাতে আংশিক ধ্বংস হয়ে ভূ-পৃষ্ঠে পতন ঘটে।

Meteoroid : মহাশূন্যে ভাসমান গ্রহাণু সাদৃশ্য প্রত্বর খন্দ যা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আঘাত করে না।

Milky Way (ছায়াপথ) : মহাকাশের অসংখ্য গ্যালাক্সি মধ্যে আমাদের সৌরজগৎ যে গ্যালাক্সি উপস্থিত সেটি milky way গ্যালাক্সি। অসংখ্য তারকা, আনন্দক্ষণ্যীয় পদার্থ এবং নেবুলা থেকে বিকীর্ণকৃত বিশাল আলো বন্ধনী সৌরজগৎকে বৃত্তাকারে পরিবেষ্টন করে আছে এ জন্যই এটিকে ছায়াপথ বলে।

Microwave Background Radiation (সূক্ষ্ম তরঙ্গের পন্থাত্ত্বমি
বিকিরণ) : মহাবিশ্বেরণ বা বিগ ব্যাংগের পর আদিম উত্তপ্তি দীপ্তি থেকে যে বিকিরণ।
অতিমাত্রায় লোহিত বিচ্যুতির ফলে আলোক রশ্মি হিসাবে বিকিরণ না ঘটিয়ে মাত্র কয়েক
সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের মাইক্রো তরঙ্গের বিকিরণ ঘটায়।

Molecule (অণু) : দুই বা ততোধিক পরমাণু রাসায়নিক বন্ধনে অবদ্ধ হয়ে
পদার্থের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম অংশ যেখানে এই পদার্থের সমস্ত রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

Momentum (ভরবেগ/ গতিবেগ) : বস্তুর জড়তা বা গতি বেগের পরিমাপক।
বস্তুর ভরবেগ হল বস্তুর ভর এবং বেগের গুণফল। বাহিরের বলের অনুপস্থিতিতে ভরবেগ
অপরিবর্তনীয়।

Naked Singularity (উন্মুক্ত অনন্যতা) : এটি স্থান-কালে ঝাঁকহোলের এমন
একটি অনন্যতা যেখানে সাধারণ ঝাঁকহোলের মত অ্যারগোফিয়ার, ঘটনাদিগন্ত ইত্যাদি
থাকে না।

Nasa (নাসা) : মহাকাশ পর্যবেক্ষণ, নিরক্ষীণ মহাকাশযান প্রেরণ ইত্যাদির জন্য
যুক্তরাষ্ট্রের একটি সরকারী সংস্থার নামের সংক্ষিপ্ত করণ The National Aeronautics
and Space Administration.

Nebula (নীহারিকা) : মহাকাশে আননক্ষত্রীয় পদার্থ যেমন ধূলা-বালি, গ্যাস
ইত্যাদির আবছায়া মেঘপূঁজি। এগুলো নতুন নতুন গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টির কাঁচামাল।

Neutrino (নিউট্রিনো) : এ ধরনের কণার কোন বৈদ্যুতিক চার্জ নেই এবং প্রায়
ভর শূন্য। এগুলো তৈরী হয় কিছু নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার ফলে এবং শক্তি বহন করে।
অতিসহজে কোন রকম মিথক্রিয়া (interact) না ঘটিয়ে সকল পদার্থের মধ্যে দিয়ে
অতিক্রম করতে পারে।

Neutron (নিউট্রন) : বৈদ্যুতিক চার্জহীন উপপারমানবিক মৌলকণ। ভর প্রায়
প্রটোনের সমান। প্রটোন ও নিউট্রন একত্রে পরমাণুর নিউক্লিয়াস গঠন করে।

Neutron Star (নিউট্রন নক্ষত্র) : তারকা বিবর্তনের তৃতীয় ধাপে অতি ঘনত্বের
সম্পূর্ণ নিউট্রন দিয়ে গঠিত তারকা। আমাদের সূর্যটি যদি নিউট্রন তারকায় পরিণত হয় তবে
আয়তনে হবে মাত্র হিমালয় পর্বতের সমান।

Neuclear Fusion (কেন্দ্রকীয় সংযোজন/ একীভূবন) : যে পদ্ধতিতে দুটি
নিউক্লিয়াস নির্দিষ্ট চাপে তাপে এবং সময়ে সংঘর্ষের ফলে সংযোজিত হয়ে একটি অধিক
গুরুত্বার নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে। তারকায় এই প্রক্রিয়ায় হালকা মৌল হাইড্রোজেন থেকে
হিলিয়াম এবং পরবর্তীতে আরও ভারী মৌল কার্বন, অক্সিজেন, লোহ ইত্যাদি তৈরী হয়। এ
সময় প্রচুর তেজস্ক্রীয়ার বিকিরণ ঘটে।

Neucleus of Atom (পরমাণুর কেন্দ্রক) : পরমাণুর সবচেয়ে ভারী অংশ যা
সাধারণত প্রটোন ও নিউট্রন দিয়ে গঠিত। এগুলি সবল বল দ্বারা সংযুক্ত থাকে এবং
ইলেক্ট্রন চারদিকে প্রদক্ষিণ করে।

Neucleus of comet (ধূমকেতুর কেন্দ্রক) : ধূমকেতুর সিথিতে উপস্থিত কঠিন পদার্থ সমূহ।

Neucleus of Galaxy (গ্যালাক্সির কেন্দ্রক) : অধিকাংশ গ্যালাক্সির কেন্দ্রে বৃহৎ আকৃতির ব্ল্যাকহোলের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে।

Orbit (কক্ষপথ) : মহাশূন্যে কোন বস্তু যখন অপর কোন বস্তু বা বিদ্যুক্তে কেন্দ্র করে যে কানুনিক পথে পরিভ্রমণ করে।

Parabola (অধিবৃত্ত) : এটি সমতলের উপর শঙ্কু যার কেন্দ্রাপসারী এক। অন্য কথায় বৃত্তাকার শঙ্কু এবং তলের প্রতিচ্ছেদ যা শঙ্কুর সমতলের সরলরেখায় সমন্তরাল এমনি একটি বক্রতল।

Period (পর্যায়কাল) : সময়ের অন্তর বা মধ্যবর্তী সময়। উদাহরণ স্বরূপ একটি পৃণাঙ্গ আবর্তণের জন্য যে সময়ের প্রয়োজন হয়।

Photon (আলোক কণা) : আলোক শক্তির অতি ক্ষুদ্রতম কণিকা যা বিদ্যুৎ-চূম্বকীয় বিকিরণের আর একটি রূপ। এটি কোয়ান্টাম বা পদার্থের ত্রুট্যতম অব্ধত পরিমাণ হিসাবে পরিগণিত হয়।

Planck Scale (প্লাঙ্কস্কেল) : স্থান ও কাল অবিচ্ছেদ্য নয়, বরং ত্রুট্যতম অব্ধত পরিমাপের (quantized) দৈর্ঘ্যের যেমন অস্তিত্ব থাকতে পারে, তেমনি হাস্তম সময়ের ও অর্থ থাকতে পারে। প্লাঙ্ক সময় হ'ল এক সেকেন্ডের 10^{-43} অংশ। প্লাঙ্ক দৈর্ঘ্য হ'ল এক সেন্টিমিটারের 20×10^{-33} অংশ (এই দূরত্বে আলো প্লাঙ্ক সময়ে চলতে পারে) প্লাঙ্ক ভরের অস্তিত্ব থাকতে পারে কেবল মাত্র ব্ল্যাকহোলে যার পরিমাণ প্লাঙ্ক দৈর্ঘ্য এক গ্রামের 2×10^{-5} অংশ। আপাতঃ দৃষ্টিতে এটি পরিমিত মাত্রা বলে মনে হতে পারে। অর্থ প্লাঙ্ক ব্ল্যাকহোলের ঘনত্ব হ'ল প্রায় 6×10^{92} গ্রাম/ঘন সেন্টিমিটার। প্লাঙ্ক ব্ল্যাকহোলের চেয়ে একটি পরমাণুর প্রটোন 10^{20} গুণ বড়।

Planet (গ্রহ) : সাধারণত নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণরত আলোহীন বস্তু। নক্ষত্রের মত এখান থেকে তাপ ও আলোর বিকিরণ ঘটে না। আমাদের পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ এমনি সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে।

Plasma (গ্লায়মা) : এক ধরনের উন্নত গ্যাসীয় পদার্থ যেখানে পরমাণুর নিউক্লিয়াস থেকে ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন হয়ে ধণাত্মক চার্জ বহনকারী স্তুলাণু সৃষ্টি করে। এটি ইলেকট্রন এবং স্তুলাণুর মিশ্রণ। সূর্য এমনি গরম প্লায়মায় গঠিত।

Positron (পজিট্রন) : ইলেকট্রনের বিপরীত কণিকা অর্থাৎ ধনাত্মক চার্জ সম্পন্ন। ভর প্রায় ইলেকট্রনের সমান।

Potential Energy (অবস্থান শক্তি) : বস্তুর অবস্থানের জন্য সংরক্ষিত শক্তি যা মহাকর্ষ শক্তিতে রূপান্তর করা যায়।

Primordial Blackhole (আদিম ব্ল্যাকহোল) : মহাবিশ্বের জন্য সূচনালগ্নে সৃষ্টি প্রটোনের চেয়ে অতি ক্ষুদ্র ব্ল্যাকহোল সমূহ।

Proportional (আনুপাতিক) : দুটি সংখ্যা আনুপাতিক বলতে প্রথম সংখ্যাটি কোন সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে যা বৃদ্ধি পাবে দ্বিতীয় সংখ্যাটিকেও একই সংখ্যা দিয়ে গুণ করে বৃদ্ধি করতে হবে। আর বিপরীত আনুপাতিক (inversely proportional) করার অর্থ প্রথম সংখ্যাকে কোন সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে দ্বিতীয় সংখ্যাকে একই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হবে।

Proton (প্রটোন) : পরমাণুর নিউক্লিয়াসের ধণাত্মক চার্জযুক্ত উপ-পারমাণবিক কণা। প্রত্যেকটি প্রটোন ইলেক্ট্রনের চেয়ে প্রায় দুই হাজার গুণ ভারী। প্রটোনের ভর হচ্ছে 1.67×10^{-28} গ্রাম।

Pulsar (পালসার) : অতিদ্রুত আবর্তনশীল নিউক্লিন নক্ষত্রের চূম্বক ক্ষেত্র থেকে এক শ্রেণীর আলোকরশ্মি (কোন সময় রঞ্জন রশ্মি) স্পন্দন নির্গত হয়। এগুলি নক্ষত্রের অক্ষের চতুর্দিকে প্রচল গতিতে আবর্তিত হয়।

Primary & Secondary Cosmic Rays (মৌলিক ও আনুষঙ্গিক মহাজাগতিক রশ্মি) : মহাশূন্য থেকে যথন কোন মহাজাগতিক রশ্মি (অর্থাৎ মৌলিক মহাজাগতিক রশ্মি) পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের অণুর সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে আনুষঙ্গিক মহাজাগতিক রশ্মি সৃষ্টি করে এবং তা মৌলিক রশ্মিকে বাধা দেয়।

Quantum (কণাবাদী) : পদার্থের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম অখণ্ড কণাবিশেষ যার অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় আলো শক্তির বিকিরণ ঘটে কোয়ান্টা বা ক্ষুদ্রতম কণা Photon বা আলোক কণার মাধ্যমে।

Quantum Mechanics (কণাবাদী বলবিদ্যা) : পদার্থবিদ্যার যে শাখা পরমাণু, উপপরমাণুর গঠন কাঠামো এবং পরম্পরের মধ্যে অভিক্রিয়া এবং বিকিরণ নিয়ে পর্যবেক্ষণ অনুসন্ধান এবং বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব দেয়।

Quark (কার্ক) : দালানের ইট স্বরূপ পদার্থের মূলভিত্তি এবং ধারণা করা হয় এগুলির আর ভাঙ্গা সম্ভব নয়। অনেক ধরনের মৌলিকগার মধ্যে এগুলি এক ধরনের মৌলিকণা যা দিয়ে উপ-পারমাণবিক কণা যেমন প্রটোন এবং নিউক্লিন তিনটি করে কার্ক দিয়ে গঠিত।

Quassar (কোয়াসার) : মহাবিশ্বের সবচেয়ে দূর প্রান্তে এক ধরনের অতি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত বস্তু। এখান থেকে প্রবল শক্তিশালী বিকিরণ নির্গত হয়। দূরের কোয়াসার আলো অতি উচ্চমাত্রার লাল-বিচুতি ঘটে। কোয়াসার যে শক্তির বিকিরণ ঘটায় সম্ভবত তা অতিবৃহৎ কোন ব্ল্যাকহোলের পুঁজির চাকতি থেকে আসে।

Radiation (বিকিরণ) : কোন উৎস থেকে শক্তির নির্গমনের পর তা পরিবাহিত হওয়ার পছ্টা। এই পরিবহন দু'ভাবে হতে পারে : বিদ্যুৎ-চূম্বকীয় তরঙ্গের আকারে অথবা সূক্ষ্ম কণিকার (Corpuscular) মধ্যে।

Radioactive Decay/Radioactivity (তেজক্রিয়তা) যে প্রণালীতে এক প্রকার পারমাণবিক কেন্দ্রিক স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ভেঙ্গে অন্য উপ-পারমাণবিক কণা ও গামারশ্মির নির্গমন ঘটায়।

Radio waves (বেতার তরঙ্গ) : লম্বা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিদ্যুৎ-চূম্বকীয় বিকিরণ।

Red Giant (লাল বামন): নক্ষত্র বিবর্তনের প্রথম পর্যায়ে তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত কমে যাওয়ায় উজ্জ্বল লাল বর্ণ ধারণ করে এবং আয়তনে অনেক গুণ বেড়ে যায়।

Red Shift (লোহিত বিচ্যুতি): ডপলার অভিক্রিয়ায় বিকিরণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বর্ণালীর লম্বা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের দিকে (লাল প্রান্ত) প্রতিসরণ ঘটে কারণ উৎসটি পর্যবেক্ষকের নিকট থেকে দূরে অপসরণ করে।

Revolution (আবর্তন): কোন বস্তু অপর কোন বস্তুর চারদিকে কোন কক্ষপথে আবর্তন করা।

Satellite (উপগ্রহ): মহাকাশে কোন গ্রহকে কেন্দ্র করে নিজস্ব কক্ষপথে অপর কোন বস্তু (হতে পারে মানুষ্য তৈরী যান) কমপক্ষে গ্রহের মুক্তি গতির সমান গতিতে আবর্তন করে। এই বস্তুটিকেই উপগ্রহ বলে।

Schwarzschild Horizon (শোয়ার্জশীল্ড দিগন্ত): ব্ল্যাকহোলের বহিপৃষ্ঠ বা উপরের স্তরকে গণিতজ্ঞ কার্ল শোয়ার্জশীল্ডের নামানুসারে নামকরণ করা হয়েছে।

Schwarzschild Radius (শোয়ার্জশীল্ড ব্যাসার্ধ) ব্ল্যাকহোলের ঘটনা দিগন্তের ব্যাসার্ধ। এটি মহাকর্ষী ব্যাসার্ধ বলা হয়। এখান থেকেই ব্ল্যাকহোলের মহাকর্ষীয় বল অনুভূত হয়।

Singularity (অনন্যতা): এটি এমন একটি বিন্দু যেখানে স্থান-কালের বক্রতা ও ঘনত্ব অসীম। এখানে পদার্থ বিজ্ঞানের কোন আইন প্রয়োগ হয় না। প্রতিটি ব্ল্যাকহোলের একটি অনন্যতা আছে। মহাবিশ্বের জন্যও সূচিত হয়েছে অনন্যতা থেকে।

Solar System (সৌরজগত): যখন কোন নক্ষত্রের মহাকর্ষ বলের প্রভাবে গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহণু, ধূমকেতু ইত্যাদি নিজ নিজ কক্ষপথে নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে থাকে। নক্ষত্রসহ সরকিছু মিলে সৌরজগত সৃষ্টি করে।

Solar Wind (সৌর প্রবাহ): সূর্যের পৃষ্ঠদেশ থেকে অতিসুস্থ কণিকার আকারে মহাশূন্যে শক্তির যে বিকিরণ ঘটে।

Spacelike Interval (স্থান সাদৃশ্য বিরতি): মহাশূন্যে স্থান কালের দু'টি বিন্দুর মধ্যে যদি আলোর চেয়ে দ্রুত গতিতে না চলে ভ্রমণ সম্ভব হয় তবে বিন্দু দু'টি স্থান সাদৃশ্য (Spacelike) বিরতির মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন।

Space-Time (স্থান-কাল): আইনষ্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বে সময়কে চতুর্থ মাত্রা হিসাবে পরিগণিত করে সমস্ত স্থান-কালের জ্যামিতিকে নতুন দিক নির্দেশন করে। আর সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বে স্থান-কালের বক্রতাই মহাকর্ষের প্রভাব ব্যাখ্যা করে।

Spatial Dimension (স্থানিক মাত্রা): স্থানের তিনটি মাত্রা অর্থাৎ দৈর্ঘ্য, প্রশস্তি এবং উচ্চতা এখানে সময়ের মাত্রা পরিগণিত হয় না।

Special & General Relativity (বিশেষ ও সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ): আইনষ্টাইনের যে তত্ত্বানুসারে দু'জন ভিন্ন পর্যবেক্ষকের যাবতীয় ভৌত অবস্থান সম্পর্কিত পরিমাপে যখন তাদের স্থির দ্রুতি থাকে তখন তা বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ আবার যখন সেই গতির ত্বরণ (acceleration) বা নির্দিষ্ট হারে দ্রুতির পরিবর্তন হয় তা সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ। অন্য কথায় গতিশীল বা চলমান বস্তুর অবস্থা বর্ণনা কারী বস্তু বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ এবং মহাকর্ষ ক্ষেত্রে বস্তুর অবস্থা বর্ণনা কারী সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ।

Species (প্রজাতি)ঃ যে সমস্ত জীব বা অবয়র সঙ্গে প্রাণী উৎপাদন করতে পারে।

Spectrum (বর্ণালী)ঃ কোন উৎস থেকে আলো যখন কোন প্রিজম বা অমসৃণ তলের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করে তখন তা বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে বিভিন্ন বর্ণ বা বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিন্যাস ঘটায়। বিদ্যুৎ-চূম্বকীয় বর্ণালী হ'ল প্রত্যেক শ্রেণীর বিদ্যুৎ - চূম্বকীয় বিকিরণ গামা রশ্মি থেকে বেতার তরঙ্গ পর্যন্ত।

Speed (বেগ)ঃ বস্তুর গতি পরিবর্তনের হার। অর্থাৎ বস্তুর অতিক্রান্ত দূরত্বকে যে সময়ে তা অতিক্রম করে তা দিয়ে ভাগ করলে বেগ পাওয়া যায়।

Strong Force (সবল বল)ঃ চারটি মৌলিক বলগুলোর মধ্যে সবচাইতে শক্তিশালী, কিন্তু বিস্তার স্বল্পতম। এই বল কার্ক গুলিকে প্রোটন এবং নিউট্রনের ভিতরে ধরে রাখে এবং প্রোটন ও নিউট্রনকে একত্রিত করে পরমাণু গঠন করে।

Supernova (সুপারনোভা)ঃ বৃহৎ আকৃতির তারকার বিস্ফোরণের মাধ্যমে বিবর্তনের পরিসম্পাদিত ঘটায়। এই বিস্ফোরণের ফলে কোটি কোটি তারকার সমান উজ্জ্বলতা আলো ও উত্তাপ সৃষ্টি করে। তারকায় সৃষ্টি বিভিন্ন মৌলিক পদার্থগুলি মহাশূন্যে ছড়ায়ে ছিটিয়ে পড়ে। এটিই সুপারনোভা। তারকাটির অবশিষ্টাংশ হয় নিউট্রনও স্টার অথবা ব্ল্যাকহোলে পরিণত হয়।

Tacyon (ট্যাকিয়ন)ঃ আইনষ্টানের আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বের সমীকরণ থেকে জানা যায় আলোর চেয়ে কম দ্রুতি সম্পন্ন কোন বস্তু কখনও আলোর চেয়ে বেশী গতি পেতে পারে না আবার সমীকরণগুলি এটিও বলে যে নীতিগত ভাবে যা আলোর চেয়ে দ্রুত চলে তা কখনও আলোর গতির চেয়ে নীচে আনা সম্ভব নয়। এগুলি সময়ের পিছনেও চলতে পারে। আলোর চেয়ে দ্রুতগামী বস্তুই ট্যাকিয়ন।

Theory (তত্ত্ব)ঃ কোন বিষয়ের উপর কিছু তথ্য ও আইন যা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং তা ব্যাপক ভাবে একই বিষয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল প্রয়োগ সম্ভব হয়েছে।

Thermodynamics (তাপশক্তি বিদ্যা)ঃ পদার্থ বিদ্যার যে শাখা তাপশক্তি এবং বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে তাপের পরিবহন নিয়ে অনুশীলন করে।

Temperature Measurement (তাপমাত্রার পরিমাপ)ঃ সেন্টিগ্রেড স্কেল ($^{\circ}\text{C}$) : পানি হিমায়িত হওয়ার তাপমাত্রা 0° এবং বাস্পীভূত হওয়ার তাপমাত্রা 100° ।

ফারেনহাইট স্কেল ($^{\circ}\text{F}$): পানি হিমায়িত হওয়ার তাপমাত্রা 32° এবং বাস্পীভূত হওয়ার তাপমাত্রা 212° ।

চরম বা অসীম (absolute) তাপমাত্রা : চরম শূন্যতা (-273°C) থেকে সেন্টিগ্রেডে যে তাপমাত্রা মাপা হয়।

কেলভিন : সেন্টিগ্রেড ডিগ্রীতে চরম তাপমাত্রার পরিমাপ।

এছাড়া মহাকাশের তারকা ব্ল্যাকহোল এবং বিভিন্ন আনন্দক্ষণ্যের পদার্থের তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয় আলোর উজ্জ্বলতা, শক্তির বিকিরণ, বর্ণালী, তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, গতি ইত্যাদির তথ্য থেকে।

Tidal Force (জোয়ার বল): বিশেষ মহাকর্ষীয় বল যা কোন বস্তুর আকৃতি পরিবর্তন করতে চায় বা করে।

Timelike Interval (কাল সাদৃশ্য বিরতি): হ্রান-কালে দুটি বিন্দুর মধ্যে যদি আলোর চেয়ে দ্রুত না চলে ভ্রমণ অসম্ভব হয় তবে বিন্দু দুটি কাল সাদৃশ্য বিরতির মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন।

Ultraviolet (অতিবেগুণী): যে বিদ্যুৎ-চূম্বকীয় বিকিরণের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য দৃশ্যমান আলোক রশ্মির চেয়ে সামান্য ছোট।

Virtual Particle (কল্পিত কণিকা): কণাবাদী বল বিদ্যায় যে কণিকাকে কখনই প্রত্যক্ষভাবে সনাক্ত করা যায় না, কিন্তু যার অস্তিত্ব নির্ণয়ের পক্ষতি রয়েছে।

Watt (ওয়াট): শক্তির মাপকের একক যা প্রতি সেকেন্ডের দশ মিলিয়ন আর্গ প্রবাহিত হয়। রেলওয়ে ইঞ্জিনের আবিষ্কারক জেমস ওয়াটের নামানুসারে।

Wavelength (তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য): পাশাপাশি দুটি তরঙ্গের শীর্ষ কিম্বা পাদ প্রান্তের দূরত্ব।

Weak Force (দূর্বল বল): চারটি মৌলিক বলের ভিতরে শক্তি মাত্রায় দ্বিতীয় এবং বিস্তারের অধিক খুব কম। সমস্ত উপ-পারমাণবিক মৌলকণা এই বল প্রভাবিত করে কিন্তু বল বহনকারী কণিকাগুলিকে প্রভাবিত করে না।

Weight (ওজন): বস্তুর ওজন হচ্ছে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র দ্বারা প্রযুক্ত বল। ওজন ভরের আনুপাতিক কিন্তু ভর ও ওজন অভিন্ন নয়।

White Dwarf (শ্বেত বামন): তারকার প্রায় শেষ বিবর্তন ধারায় পারমাণবিক জ্বালানী প্রায় সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায় তখন তারকাটি ধ্বংস হয়ে খুব ছোট আকৃতি ধারণ করে।

White Hole (শ্বেত গহ্বর): ব্ল্যাকহোলের বিপরীত। ব্ল্যাকহোলে সমস্ত পদার্থ অনন্যতার দিকে অগ্রসর হয়ে ধ্বংস হয়। অন্যদিকে হোয়াইট হোলের অনন্যতা থেকে পদার্থ নির্গত হয়। বিগ ব্যাংগের সঙ্গে হোয়াইট হোলের কিছুটা সাদৃশ্য আছে।

Worm Hole (ওয়ার্মহোল): হ্রান-কালের এটি এমন একটি সুড়ঙ্গ পথ যা ব্ল্যাকহোলের মধ্যে দিয়ে অন্য ব্ল্যাকহোল বা অন্য কোন হ্রানের সঙ্গে সংযুক্ত করে।

X- Rays (রঞ্জন রশ্মি): সংক্ষিপ্ত বিদ্যুৎ-চূম্বকীয় বিকিরণ যার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অতি-বেগুণী এবং গামারশ্মির মাঝামাঝি। যে কোন প্রাণীর জন্য বিপদজনক রশ্মি।

X- Ray Star (রঞ্জ-রশ্মির তারকা): যে সমস্ত নক্ষত্র (সূর্য ছাড়া) লক্ষণীয় পরিমাণ রঞ্জের রশ্মির স্পন্দনের সমপরিমাণ বিকিরণ ঘটায়।

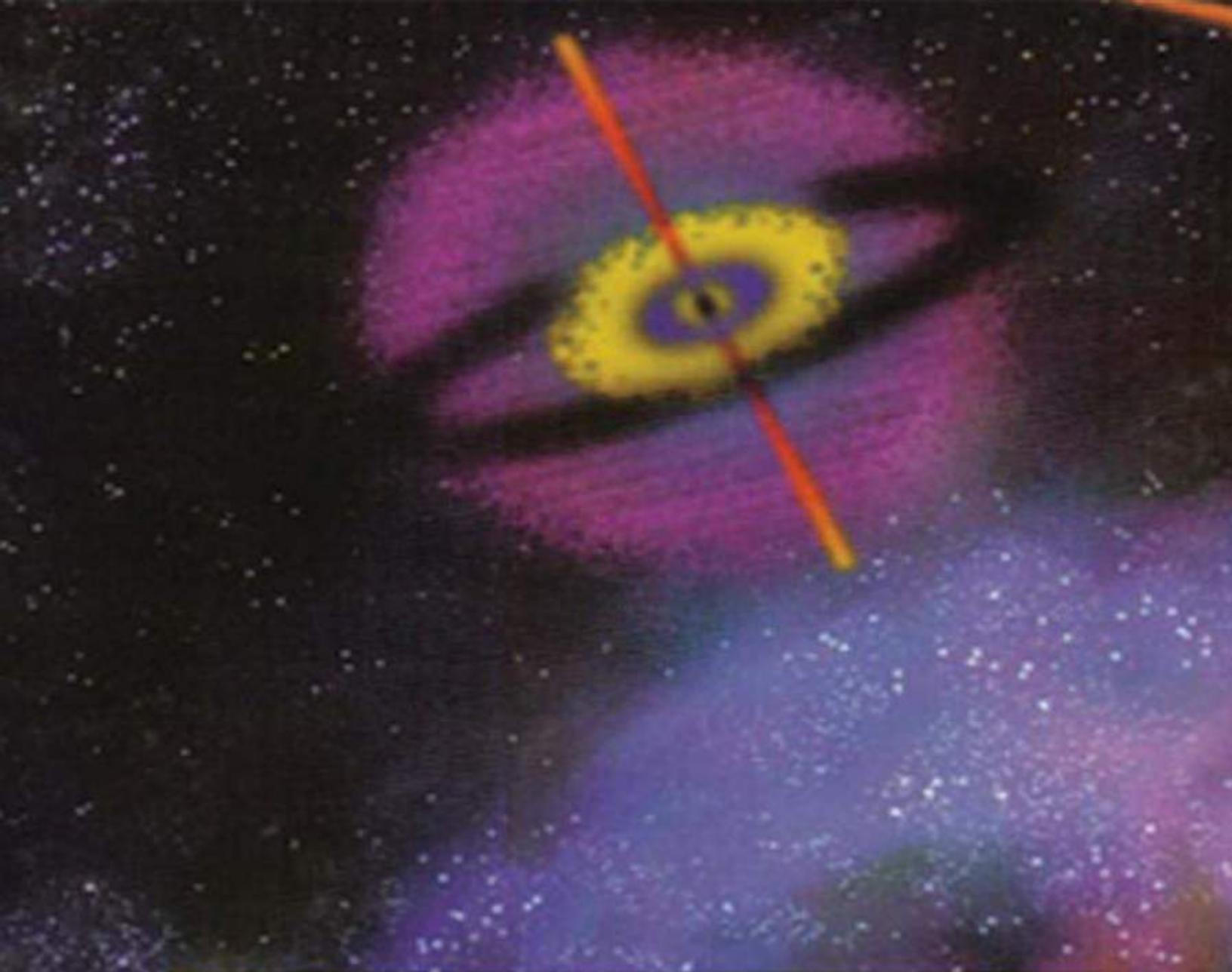
Zeeman Effect (জীমান অভিক্রিয়া): চূম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে বর্ণলীর রেখাসমূহ বিঘুক্ত বা বিস্তৃত হওয়া।

BIBLIOGRAPHY

1. The Holy Quran, English translation of the meanings and Commentary. King Fahd Holy Qur-an printing complex. 1411H
2. পবিত্র কোরআনুল করীম (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফসীর) বাদশাহ ফাহদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হিজরী।
3. নূর বঙ্গানুবাদ কোরআন শরীফ, প্রকাশক : আলহাজ্র মোঃ সোলায়ামান মিয়া, ঢাকা ১৪১৫হিজে।
4. শব্দার্থের আল-কুরআনুল মজীদ (১০খন্দে সমাপ্ত) অনুবাদঃ মতিউর রহমান খান, প্রকাশকঃ আধুনিক প্রকাশনী, ২০০৩।
5. কোরআন শরীফ বঙ্গানুবাদ ডঃ ওসমান গনী, প্রকাশক মালিক ব্রাদার্স, কলকাতা, ১৯৯৫।
6. The Meaning of the Glorious Koran. By Mohammed Marmaduke Pickthall.
7. Interpretation of the Meanings of the noble Qur-an. in the English language, By- Dr. Muhammad Musin Khan & Dr. Muhammad Taqiuud. Din Al-Hilalii. Riyadh 1997.
8. Qur-an Majid with Arabic text & English Translation. By Dr. M. Mustafizur Rahman, Pub. khosroz Kitab Mahal, Dhaka. 2002.
9. The meaning of the Holy Qur-an, By Abdullah, Yusuf Ali. Amna Publications. USA 1995.
10. Vocabulary of The Holy Qur-an. By Dr. Abdullah Abbas Al Nadwi, Darul-Ishaat, Karachi 1999.
11. কোরআনের অভিধান, মুনির উদ্দিন আহমদ, প্রীতি প্রকাশক, ঢাকা, ১৯৯৩
12. আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান, ডঃ মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, রিয়াদ প্রকাশনী, ঢাকা ২০০২।
13. Samsad English, Bengali Dictionary, By Late Sailendra Biswas. Sahitya Samsad, Calcutta-2002.
14. Bangla Academy Bengali-English Dictionary. By Latifur Rahman. Dhaka-1996.
15. Sahih Bukhari USC Educ, Dept. MSA. Fundamentals Hadith Sunnah 2002. Volume 01 Books 8, Volume 2, Book 21, Book 22, Volume 3 Book 31; Volume 4 Book 53, 54, 55, 57, Volume 5 Book 58, Volume 6 Book 60, 61, Volume 7 Book 71, Volume 8 Book 76,78; Volume 9, Book 87,88,93.
16. Sahih Muslim, USC Educ. Dept. MSA. Fundamentals Hadithsunnah 2002. Book 001, 004, 006, 008, 030, 031, 037, 039, 040, 041,042.

17. Sunan Abu Dawud. USC, Educ, Dept MSA. Fundamentas Hadithsunnah 2002. Book 40.
18. মাসিক মদীনা জুন ২০০১ (পঃ৪৮৬)
19. Exploration of the Universe By George Abell. Pub. Holt, Rinehart and Winston , Inc. USA.
20. The Creation of the Universe By Harun Yahya. Al-Attique Publishers Inc. Canada-2000.
21. Cassell's Laws of Nature By. James Trefil Published by Cassell, London-2002.
22. The Qur-an for Astronomy and Earth Exploration from Space By. S Waqar Ahmed Husaini published by Institute of Islamic Science U S A. 1999.
23. The Universe Seen Through The Quran By Dr. Mir. Anees-u-din, Al Attique Publishers. Toronto, 1999
24. Life, Death And The Life After, By Dr. Ahmad H.Sakar, Published by Islamic Book Service, New Delhi-2000.
25. Asimovi's new guide to science By Isaac Asimovs. Pub: by Penguin Group. England-1987.
26. The Final Day Paradise and Hell in the light of the Quran and Sunnah, By Dr. Umar Sulaiman Al Ashqar, Translated by Nasir-u-ddin Alkhattab. International Islamic Publishing House. Riyadh- 1999.
27. Cycles of Fire Stars, Galaxies and the wonder of Deep Space. William K. Hartmann and Ron Miller, Workman Pub: New York.
28. Black Holes, J.P Luminet Cambridge University Press.
29. In Search of the Edge of time, Black Holes, White Holes, Worm Holes John Gribbin-Penguin Science-1998.
30. Black Hole, Heather Couper and Nigel Henbest. Stoddart Publishing Co. Ltd. 1996.
31. Jillian's Guide to Black Holes.
32. A Classical instability of Reissner-Nordstrom Solutions and the fate of magnetically Charged Black Holes Leek; Nair V.P; Weinberg E.J.
33. Encyclopaedia Britannica inc. 1994 -2000. (CD-Rom)
34. Imagine the Universe. Dr. Jim Lochner & Meredith Bene thnat NASA- 2002.
35. Prisons of Light Black Holes by Kitty Ferguson, Cambridge University Press.
36. Traversable Wormholes Some Implications. By Michael Clive Price UK 1993.

38. NASA Image Satellite, Ask the Space Scientist Archive By Dr. Sten Odenwald-2001.
39. Black Holes Frequently Asked Question By Ted Bunn-2002.
40. BBC Homepage Science Horizeon - Parallel Universes August. 04/2002. By Dr. Michio Kaku.
41. CNN. Com/ Science & Space By Richard Stenger Oct 18/02.
42. National Geographic June-1983.
43. National Geographic January-1994.
44. Black Holes, The End of the Universe? John Taylor, Cambridge.
45. কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, টিফেন হকিং অনুঃশক্রজিত দাশগুপ্ত, বাউল্মন।
46. কৃষ্ণহর এবং শিশু মহাবিশ্ব ও অন্যান্য রচনা; টিফেন হকিং অনুঃশক্রজিত দাসগুপ্ত, বাউল্মন প্রকাশন ১৯৯৫।
47. সময়ের বিচ্ছিন্ন কাহিনী ও মহাকালের অজানা রহস্য ডঃ শহীদুল্লাহ মৃধা, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ২০০০।
48. মানুষ ও মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্য, মেজর মোঃ জাকারিয়া কামাল, জি, সিলেট, ১৯৯৭।
49. আল-কোরআন দ্য চ্যালেঞ্জ (মহাকাশ পর্ব-১)-কাজী জাহান মিয়া, মদীনা পাবলিকেশন্স-১৯৯৭।
50. আল-কোরআন দ্য-চ্যালেঞ্জ মহাকাশ পর্ব-২, কাজী জাহান মিয়া মদীনা পাবলিকেশন্স-১৯৯৭।
51. Is Anybody out there? (The search for life beyond our planet) by Heather Couper & Nigel Henbest, Dk Publishing-1998.
52. Scientific American April 1967 (Page 106-112)
53. Time (Canadian Edition/ November 29/2004 Page 102-105)
54. Beyond Faiith and Sciences, by Dr. M. Manzur-i-Khuda, Dhaka, 2000.
55. Creation and the Cosmos, by Dr. M. Manzur-i- Khuda, Dhaka, 1955
56. মহাকাল সায়রে মানব দর্শক, ম. মনমুর-এ-খুদা, ঢাকা-১৯৯৮
57. বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান, ডঃ মরিস বুকাইলি, ১৯৮৬
58. বিশ্বনবী, গোলাম মোস্তফা, ঢাকা ১৯৯৫
59. ছহীহ বাংলা বোখারী শরীফ (একত্রে), ঢাকা, ১৯৯, ২০০৮
60. ছহীহ মুসলিম শরীফ, ঢাকা, ২০০৩



আপনি কি জানতে আগ্রহী ?

অস্ত্রাদর অসীম অকল্পনীয় সৃষ্টি রহস্যের শতাধীর সবচেয়ে উৎসুককর সৃষ্টি ও কানসের সীমাবেদ্ধ ঝ্যাকহোলের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, সৃষ্টি পদ্ধতি, গবেষণা, প্রোটো বিনামূল, বিশ্লেষণা, পর্যবেক্ষণ কাঠামো। ঝ্যাকহোলের রহস্যময় বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যাবলী। ঝ্যাকহোলে প্রত্যন হলে কি ঘটবে? ঝ্যাকহোলের নিকট কিভাবে বিভিন্ন ধরণের গভৰ্মেন্ট ঝ্যার্মহোল পাঠিত হবে। গভৰ্মেন্ট নতুন বিভিন্ন জীবন বাবেহ সম্পত্তি অন্ত মহাবিশ্বে আবেশের সজ্ঞাত হত্ত্বুভিকর বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব (Theory) অন্যান্যকে কোরান ও হানীসে বর্ণিত হাশেরের কাছ থেকে আহত্ত্বাদের উপর জাপিত সেতুর সকল বা বাৰ্ষ অভিজ্ঞকাৰীৰ অস্ত্রাদী বা আহত্ত্বাদী জীবনেৰ বিশ্বকৰ তত্ত্ব। এছাড়া মহাবিশ্বেৰ সৃষ্টি ও অবিষ্যত সজ্ঞাবৰ্য পৰিষ্কৃতি বা মহাবিশ্বেৰ সম্পূর্ণে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বেৰ সমৰকারী কোরান ও হানীসেৰ উত্তৃতি।